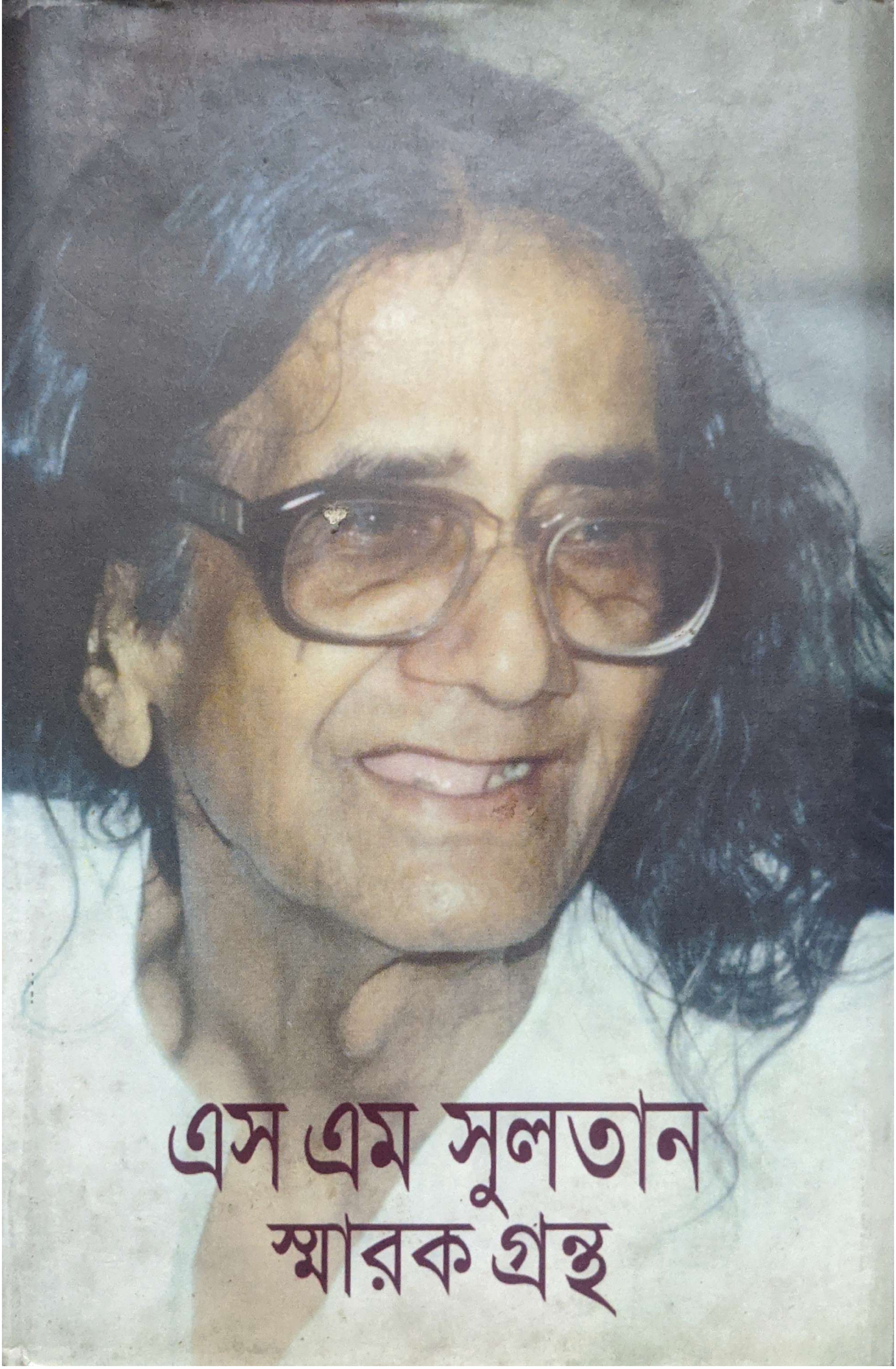
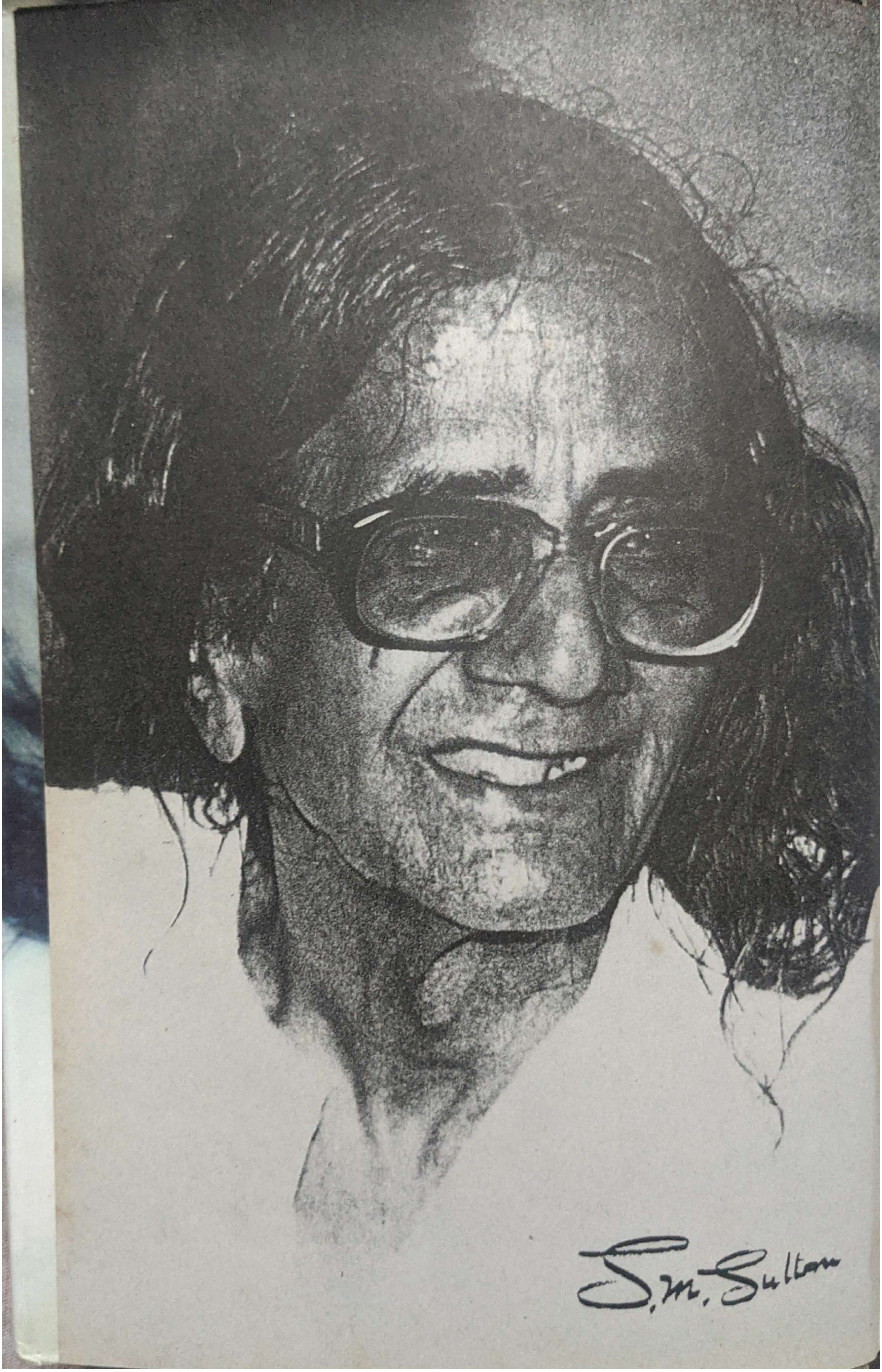
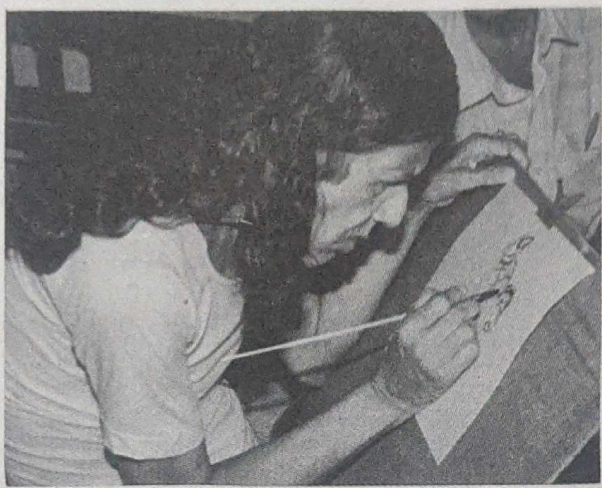


এস এম সুলতান
স্মারক গ্রন্থ


S.M. Sultan

এস এম সুলতান স্মারক গ্রন্থ



সম্পাদনা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

সুবীর চৌধুরী

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী



প্রকাশক
আখতারুন্নেছা বেগম
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী
সেগুনবাগিচা, রমনা
ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
মাহবুব আকন্দ

চিত্রকর্মের রঙ্গিন স্বচ্ছচিত্র
ফজলুর রেহমান ঝিনু

প্রকাশকাল
জুন ১৯৯৫
আষাঢ় ১৪০২

মূল্য : দুইশত টাকা মাত্র

মুদ্রণ
ব্র্যাক প্রিন্টার্স

S.M. Sultan Memorial Volume, Edited by S. Manzoorul Islam and Subir Choudhury; Published by : Akhtarunnessa Begum, Director-in-Charge, Research and Publication, Bangladesh Shilpakala Academy (National Academy of Fine and Performing Arts), Segunbagicha, Raman, Dhaka-1000

Price : Taka Two hundred only

মুখবন্ধ

শিল্পী এস. এম. সুলতান এক কিংবদন্তীর জীবন অতিবাহিত করে গেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। ৭০ বৎসর বয়সে যখন শিল্পী প্রয়াত হন—১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাসের ১০ তারিখে—তখন তিনি পরিণত হয়েছেন লোককথার এক নায়কে। অসাধারণ প্রতিভার এই শিল্পীকে নড়াইলের মানুষ তথা বাংলাদেশের মানুষ শুধু চিত্রশিল্পী হিসেবে স্মরণ করবে না, বরং জীবনঘনিষ্ঠ, মৃত্তিকা সংলগ্ন এক স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবেও মনে রাখবে—যাঁর স্বপ্ন ছিল জীবনে শিল্পের প্রতিফলন ঘটানো। সুলতানের ভালবাসা ছিল মানুষের প্রতি, বিশেষ করে খেটে খাওয়া মানুষ এবং কৃষকের প্রতি। এদেশের কৃষকায় নিরন্ন কৃষককে তিনি এঁকেছেন অমিত ব্যক্তিধর, বলশালী মানুষ হিসেবে। সুলতান ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক—বাংলাদেশের আবহমান সবুজ, সতেজ প্রকৃতি তাঁর তুলিতে অমর হয়েছে। তিনি ছিলেন প্রাণী প্রেমিক—বনের পশুপাখি সাপখোপের প্রতি ছিল তাঁর অকাতর ভালবাসা। আর সুলতান ছিলেন শিশুদের অকৃত্রিম বন্ধু। নড়াইলে চিত্রা নদীর তীরে তাঁর আবাসস্থলে গড়ে তোলা 'শিশুস্বর্গ' আর চিত্রা নদীতে ভাসমান বিশাল নৌকাটি ওই বন্ধুত্বের দু'টি প্রতীক।

এই বিচিত্র কর্ম প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী সুলতান ছিলেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর রেসিডেন্ট আর্টিস্ট। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী বিভিন্ন সময়ে তাঁর কাজের প্রদর্শনী, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করেছে। তাঁর মৃত্যুর পরও তিনি যে অমর হয়ে আছেন, থাকবেন, সে বোধ থেকে আমাদের এই সামান্য আয়োজন।

এ সংকলন গ্রন্থে এস. এম. সুলতানের ওপর এদেশের জ্ঞানীগুণী ও শিল্পরসিক বোদ্ধাগণের লেখা অনেকগুলি প্রবন্ধ, আলোচনা, স্মৃতিচারণ সংগৃহীত হয়েছে। দু'একটি সাক্ষাৎকারও আছে। অনেক প্রবন্ধ ও রচনা নানা জায়গায় হয়তো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিন্তু, স্থানাভাবে সেগুলোর অন্তর্ভুক্তি সম্ভব হয়নি।

আমি আশা করব এ গ্রন্থটি শিল্পী এস. এম. সুলতানের কর্মময় জীবন ও তাঁর বহুমুখী প্রতিভার কিছুটা পরিচয় অন্তত পাঠকদের দিতে পারবে।

কালজয়ী শিল্পী সুলতানকে আমাদের শ্রদ্ধা।

মোবারক হোসেন খান
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

পূর্বকথা

১. শেখ মুহম্মদ সুলতানের জীবন সকল অর্থেই ছিল বিচিত্র, বর্ণাঢ্য। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন নড়াইলের এক অস্বচ্ছল পরিবারে। তাঁর পিতার এমন সামর্থ ছিলনা যে তাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠা দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং অন্যান্য সহায়তা দেন। যদি সম্ভব হত পরিবারটি তাঁকে প্রায়োগিক অথবা পেশাভিত্তিক শিক্ষাই দিত। তবুও, সুলতান কোলকাতায় আর্ট কলেজে শিক্ষালাভ করেছেন, যদিও পাঠক্রম শেষ না করেই অজানার পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সুযোগ হয়েছিল শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর মতো শিল্পসমালোচক এবং শিল্প ইতিহাসবিদের সাহচর্যে আসার। জীবনের ওই পর্যায় পর্যন্ত একটি সিন্ডারেলা কাহিনীর কেন্দ্রে ছিলেন তিনি। অনেকগুলি আপতিক যোগাযোগ না ঘটে গেলে মাছিমদিয়া থেকে শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর লাইব্রেরি পর্যন্ত তিনি চলে আসতে পারতেন না হয়তো। এর পেছনে জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের অবদানটি নিশ্চয় মুখ্য। কিন্তু আমরা জানি, সবচেয়ে বড় অবদানটি ছিল সুলতানের নিজের। সেই অল্প বয়সেই তিনি তাঁর মেধার যে স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তাতে জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ থেকে শাহেদ সোহরাওয়ার্দী পর্যন্ত সকলেই তাঁর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে এই মেধাকে সম্বল করেই তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন এবং দীর্ঘদিন জীবিকা নির্বাহ করে গেছেন। এই পর্যায়ে আমরা তাঁকে দেখি ভারতের নানা যায়গায়। তাঁর ভবঘুরে এবং বোহেমিয়ান শিল্পী জীবনের শুরু এখান থেকেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লড়াই করতে আসা ইংরেজ ও আমেরিকান সৈন্যদের কাছে তিনি ছবি বিক্রী করেছেন, প্রদর্শনী করেছেন, এবং শিল্পী হিসেবেও যথকিঞ্চিৎ পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছেন। কিন্তু পার্থিব বিষয় সম্পর্কে উদাসীনতা, খ্যাতি অথবা প্রচার বিমুখতা, নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে এক ধরনের নির্মোহ দৃষ্টি এবং কোনো স্থানে শিকড় ছড়িয়ে বসতে অনীহা—এসব একদিকে তাঁকে ভ্রাম্যমান এবং ভাসমান করেছে, অন্যদিকে তাঁর প্রথম দিকের কাজগুলিকে চিরদিনের জন্য আমাদের দৃষ্টির বাইরে নিয়ে গেছে। এখনও সুলতানের চিত্রকলা বলতে সত্তুরের দশক থেকে করা কাজই আমরা বুঝি-- আগের প্রায় তিরিশ বছরের কাজের কোনো নমুনা বলতে গেলে আমাদের কাছে নেই। হয়তো কিছু ছবির ফটোগ্রাফ বা প্রিন্ট আছে, কিন্তু মূল কাজগুলি হারিয়ে গেছে। নিজের কাজ সম্পর্কে এরকম উদাসীনতা খুব কম শিল্পীই দেখাতে পারেন। পরের কাজগুলিও খুব বেশিদিন যে টিকে থাকবে, তা মনে হয়না, তেলরঙের কাজগুলি চটের ক্যানভাসে করা, রংও উন্নতমানের নয়। বড় ক্যানভাসে করা অনেক কাজে রং ফেটে যাচ্ছে, খসেও যাচ্ছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। তবে ছবিগুলো নষ্ট হয়ে গেলেও সুলতানের ছবি অমর। তারা ইতিমধ্যে বাঙালি জাতির ইতিহাস ও মিথ-এর অংশ হয়ে গেছে। আমাদের নান্দনিক উত্তরাধিকারের উল্লেখযোগ্য অংশ এসব ছবি।

ভারত বিভাগের পর সুলতান দেশে ফিরে এলেন, কিন্তু আবার প্রবাসী হলেন। এবার গেলেন পাকিস্তান—পরে ইংলন্ড, আমেরিকাতে। পাকিস্তানে তিনি দ্রুত প্রথম সারির শিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেন। এসময় তিনি এঁকেছেন কাশ্মীর এবং বাংলাদেশের নিসর্গ—তাঁর জীবনের এই তৃতীয় পর্যায়ে। কাশ্মীরের নিসর্গ তিনি এঁকেছেন কাশ্মীরে বসে, কিন্তু বাংলাদেশের ছবি ছিল তাঁর স্মৃতির পটে আঁকা। বাংলাদেশই ছিল তাঁর বিশ্বের কেন্দ্র, তাঁর সৃষ্টিশীলতার উৎস ভূমি। সত্তুরের দশক থেকে আবার যখন ছবি আঁকতে শুরু করেন সুলতান, তখন অনুপস্থিত কাশ্মীরের কোনো দৃশ্য তিনি আঁকেননি অথবা বিদেশী কোনো মানুষের প্রতিকৃতি—তিনি শুধুই এঁকেছেন বাংলাদেশের ছবি এবং কৃষক ও কিষাণীর জীবনের চালচিত্র। তাঁর নন্দনতত্ত্বের মূল নিহিত ছিল যে জীবনচিন্তায়, তার প্রকাশেই তিনি ব্যাপৃত ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

পাকিস্তানে থাকার সময় সুলতান যেসব ছবি এঁকেছেন, তাদের নমুনাও এখন অনুপস্থিত। তবে তাঁর কাজের বিবরণ কিছু লেখালেখি থেকে আমরা পাই। আমরা বুঝতে পারি, সুলতানের নিজস্ব শিল্পচিন্তা তখনই দানা বাঁধতে শুরু করেছে, তার স্টাইলটি তিনি আবিষ্কার করেছেন, তাঁর বিষয়বস্তুও তিনি নির্দিষ্ট করেছেন। ঐ পঞ্চাশের দশকে এই উপমহাদেশে বিমূর্ত প্রকাশবাদের জোয়ার লেগেছে, আধুনিকতার পশ্চিমা ধ্যানধারণাগুলি সাহিত্যে এবং শিল্পকলায় প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। একদিকে এই পশ্চিম তথা ইউরো-কেন্দ্রিক আধুনিকতা, অন্যদিকে বেঙ্গল স্কুল নির্দেশিত প্রাচ্যবাদের চর্চা—এ দুয়ের মধ্যে সুলতান একটি সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী উদ্ভাবন করলেন তাঁর গ্রামীণ জীবনের চিত্রায়ণে, যেখানে মানব মানবীর দেহাবয়ব অতিরঞ্জিত, যেখানে জীবনের রূপটি আদর্শিক এবং যেখানে তাঁর ছবির অন্বিষ্ট একটি নিম্নবর্গীয় স্বপ্ন—একটি subaltern vision। হয়তো এই সব উপাদান তখনো সমন্বিত হয়নি তাঁর ক্যানভাসে, ক্যানভাসও হয়তো এতটা বিশাল ছিলনা। কিন্তু নানা বর্ণনা বিবরণ থেকে, সুলতানের নিজস্ব বক্তব্য থেকে এসব উপাদানকে বিভিন্ন ভাবে আমরা তাঁর নন্দনচিন্তায় ও কাজে উপস্থিত দেখতে পাই। একারণেই হয়তো লন্ডনে আধুনিকতার গুরু পিকাসো, পল ক্লী—এঁদের সঙ্গে একত্রে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় সুলতানের চিত্রকলার। উদ্যোক্তাদের নিশ্চয় অভূতপূর্ব মনে হয়েছিল সুলতানের চিত্রকর্ম। আধুনিকতার ইউরো-কেন্দ্রিক প্রকাশকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে যেসব চিত্র তিনি উপহার দিয়েছিলেন, সেখানে এক উত্তর-উপনিবেশী ব্যাখ্যা ছিল শিল্পের, ছিল ইতিহাসের এক বিকল্প নির্মিতির। শিল্পের ভিতরে subaltern দ্রোহ এবং উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যটি অনেকটা পরবর্তী নব্য-ইতিহাসতত্ত্বের বিদ্রোহের সামিল।

দেশে ফিরে সুলতান যদি ঢাকায় বসবাস করতে শুরু করতেন, আঁকতে এবং প্রদর্শনী করতে শুরু করতেন, তাহলে হয়তো তিনি বহু আগেই সকলের গোচরে চলে আসতেন। কিন্তু সুলতানের জীবনের ছন্দটি ছিল প্রকৃতি এবং গ্রামের মানুষের জীবনের সঙ্গে বাঁধা। তিনি ঢাকায় থেকে কোনো প্রতিষ্ঠানের অধীনে থেকে নিয়ম-নীতির অধীন হয়ে জীবনযাপন করতে অস্বীকৃতি জানালেন। বস্তুতঃ সত্তুরের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি দেশের মানুষের দৃষ্টির বাইরেই রয়ে গেলেন। এসময় তাঁকে কাছে পেয়েছে নড়াইলের মানুষজন, তাঁর গ্রাম, আশেপাশের গ্রাম ও চিত্রার তীরের

জনপদগুলির মানুষ। নিম্নবর্গীয় মানুষজনের সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করে তিনি তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়ে পড়লেন।

সুলতানের জীবনের চতুর্থ পর্যায়ের শুরু মধ্য সত্তর থেকে, যখন তাঁর কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী এবং চিন্তাসঙ্গীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তিনি ঢাকা আসেন, ছবি আঁকেন, শিল্পকলা একাডেমীতে একটি একক প্রদর্শনী করেন এবং বাংলাদেশের শিল্পকলার নতুন একটি মাত্রা যোগ করেন। বাংলাদেশের শিল্পকলা অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং গতিশীল—জয়নুল আবেদিন এবং কামরুল হাসান সেখানে দু'টি প্রধান ধারার জন্ম দিয়েছেন। শফিউদ্দিন আহমদ থেকে কিবরিয়া, আমিনুল, মুর্তজা বশির, দেবদাস চক্রবর্তী হয়ে শাহতাব, মনিরুল সহ আরো অনেকের অবদানে সমৃদ্ধ অন্য একটি ধারা—যদিও এ তিনটি ধারা যে একেবারে পৃথক এবং কামরাবদ্ধ, তা নয়। তাদেরও মিশ্রণ আছে, পারস্পরিক অনুপ্রবেশ আছে। সেখানে সুলতানের চিত্রকলা এক নতুন বৈশিষ্ট নিয়ে উপস্থিত হল। তবে জয়নুল, কামরুল, শফিউদ্দিন সকলেরই উত্তরসূরী বর্তমান। তাঁদের প্রচেষ্টার সঙ্গে অন্য অনেকেরই সচেতন প্রয়াসও যুক্ত হয়েছে। কিন্তু সুলতানের কোনো প্রকৃত উত্তরসূরী নেই। তাঁর স্টাইল কেউ অনুসরণ করেননি। তিনি নিজেই নিজের ধারার প্রথম এবং শেষ শিল্পী—অন্তত: এ পর্যন্ত। এ বিষয়টি আমাদের গবেষণার দাবী রাখে। আমাদের এরকম মনে হয়—সুলতানের স্টাইলটি সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত ছিল তার জীবনদর্শন ও নন্দনচিন্তার সঙ্গে। এবং সেই দর্শন ও সেই নন্দনচিন্তা, অন্যদিকে সম্পৃক্ত ছিল মৃত্তিকা ও মৃত্তিকাসংলগ্ন জীবন এবং subaltern vision এর সঙ্গে। কেউ যদি ঘনিষ্ঠভাবে ঐ দর্শন এবং নন্দনচিন্তার চর্চা না করেন তার কাছে সুলতানের স্টাইলটিও থেকে যাবে দূরবর্তী একটি বিষয় হিসেবে।

আশির দশক থেকে সুলতানকে সংসারী হতে হয়েছে, প্রধানতঃ পরিবেশের চাপে, তবে শিশু ও জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ থেকেও। তাঁর নড়াইলের বাড়িটি হয়ে দাঁড়িয়েছে এক শিল্পতীর্থকেন্দ্র, অনেক মানুষের আশ্রয়স্থল, জীবজন্তুর অভয়াশ্রম এবং শিশুদের স্বর্গ। এই সংসারী হওয়ার মধ্যে মানুষের প্রতি সুলতানের অকৃত্রিম ভালবাসা ফুটে উঠেছে, যেমন প্রকৃতি ও জীবজন্তুর প্রতি ভালবাসাও। ইচ্ছে থাকলেও তিনি আর ভবঘুরে হতে পারেন নি—একটি বিরাট সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে তিনি নড়াইলেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করলেন। অবশ্য শিল্পী হিসেবে একটি দায়বোধও কাজ করেছে তার মধ্যে—তিনি তাঁর সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার কিছুটা পরবর্তী প্রজন্মগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার একটা তাগিদও অনুভব করেছেন। সুলতান যে প্রচুর সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, অন্তরঙ্গ নানা আলোচনা করেছেন শিল্প নিয়ে, তাঁর বাড়িতে শিল্প কর্মশালার আয়োজন করতে দিয়েছেন, এসবই এর প্রমাণ।

সুলতানের স্বাস্থ্য শেষ দিকে এসে দ্রুত খারাপ হতে থাকে। ১৯৯৪ তে ঢাকার গ্যালারি টোন-এ তাঁর শেষ প্রদর্শনীটির সময় তাঁকে খুব কাহিল দেখাচ্ছিল। সে বছর আগস্ট মাসে নড়াইলে তাঁর বাড়িতে তাঁর জন্মদিন পালিত হয়েছিল বিস্তৃত আয়োজনে। সে অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা গেছে অত্যন্ত দুর্বল এবং ভগ্নস্বাস্থ্যের একজন মানুষের মত। যদিও সুলতানের মানসিক শক্তি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল অটুট। ১৯৯৪ সালের ১০ অক্টোবর যশোর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

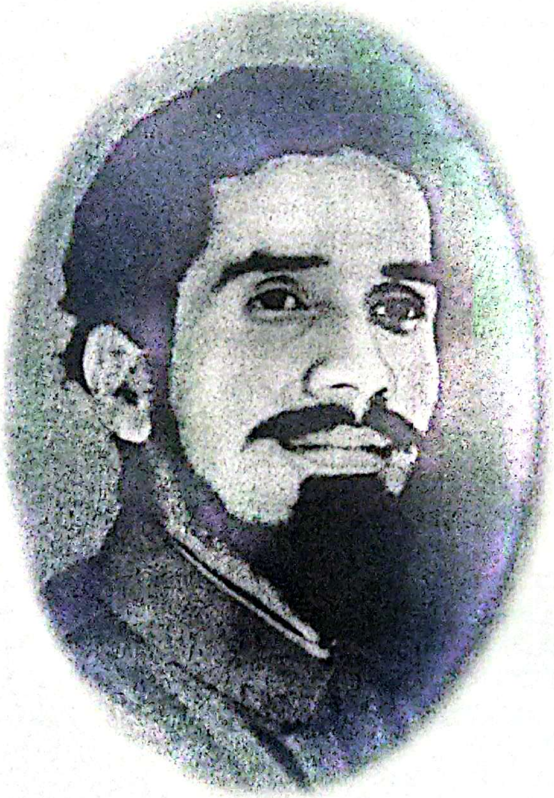
২. সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে অসংখ্য লেখালেখি হয়েছে পত্রপত্রিকায়। ১৯৭৬-এর প্রদর্শনীর পর মাত্র কুড়ি বছরে সুলতান জয় করে নিয়েছিলেন বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়, তাঁর চিত্রকলা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের চিরায়ত জীবনের একটি ব্যতিক্রমী রূপায়ণ, যা মানুষকে আশা দিয়েছে, বিশ্বাস দিয়েছে। একই সঙ্গে, সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি প্রকাশভঙ্গী ছিল সেসব চিত্রকলার, যার সাথে জীবনের বাস্তবের একটি যোগাযোগ আপনা থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের প্যাস্টোরাল শিল্পের তিনি পুনরুত্থান ঘটিয়েছিলেন, কিন্তু বাস্তবের টানাপোড়েন, তার নানা সংঘাত ও দ্বন্দ্বকে তিনি কখনো এড়িয়ে যাননি—বরং সেগুলিই প্রধান হয়ে দেখা দেয় তাঁর কাজে। শিল্পকে তিনি জীবনের সমার্থক করেছেন, জীবনকে নিয়ে এসেছেন শিল্পের কেন্দ্রে। এই কাজটি করতে গিয়ে তাঁকে ধারণ করতে হয়েছে একই সাথে এদেশের ও এদেশের মানুষের ইতিহাস ও কিংবদন্তী, সমাজ ও রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং প্রতিদিনের জীবন যাপনের অভিজ্ঞতা। এটি এক বিশাল কর্মযজ্ঞ, নিঃসন্দেহে, কিন্তু সুলতান তৈরি ছিলেন এ কাজের জন্য।

সঙ্গত কারণেই মৃত্যুর আগে ও পরে সুলতান হয়ে দাঁড়িয়েছেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। যে অসংখ্য প্রবন্ধ, রচনা, পর্যালোচনা ইত্যাদি লেখা হয়েছে তাঁকে নিয়ে তার সব প্রকাশ করতে পারলে হয়তো ভাল হত। কিন্তু সেটি সম্ভব নয়। এ জন্য বেছে বেছে কিছু লেখা নিয়ে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী। বর্তমান স্মারক গ্রন্থটির পর আরো একটি গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠানটির আছে। বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠিত শিল্প সমালোচকের লেখা বর্তমান গ্রন্থটিতে সংকলিত করা যায়নি। দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে তাঁদের লেখা থাকবে। সুলতানের প্রথম জীবনের কাজের ফটোগ্রাফ/প্রতিলিপি খোঁজার চেষ্টা চলছে; সেগুলোর একটি সংগ্রহ থাকবে দ্বিতীয় গ্রন্থে।

৩. সুলতানের চিত্রকলা একটি নতুন প্রকাশভঙ্গী দিয়েছে বাংলাদেশের চিত্রকলার জগতে এবং একই সঙ্গে একটি নতুন শিল্পচিন্তা—যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সমাজ ও রাজনীতি এবং বাস্তবের ও ইতিহাসের নানা প্রসঙ্গ। এই অর্জনটি সুলতানকে অমর করেছে এবং এজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

এই প্রকৃত শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে আমরা গর্বিত।

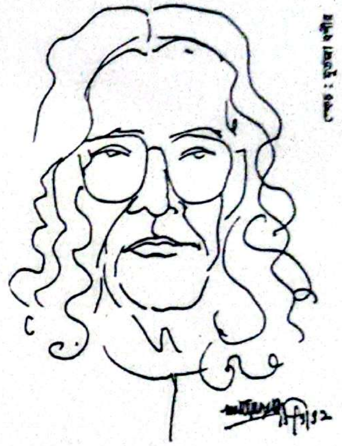
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সুবীর চৌধুরী



যৌবনে শিল্পী সুলতান



সূচিপত্র



সুলতানের ছবি

আবদুর রাজ্জাক

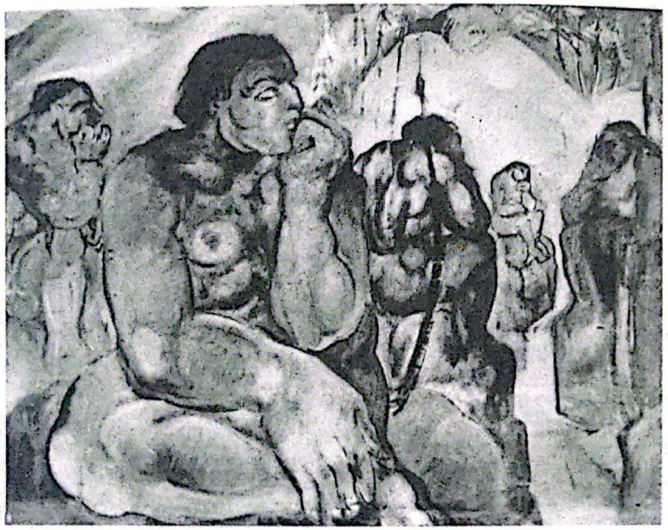
জসীম উদ্দীন, জয়নুল আবেদিন, এস.এম. সুলতান এদের শিল্পকর্ম একান্তই বাংলাদেশের। একান্তই বাংলাদেশের জলহাওয়াতেই এদের শিল্পকর্মের পরিপুষ্টি। অন্য কোন জমিনে চাষ করে কেউ ফসলের এই রং এই রস ফুটিয়ে তুলতে পারতো কিনা সন্দেহ। তার একটা কারণ এই হতে পারে যে, এদের মানসিকতা দৃষ্টিভঙ্গি সবই বাঙালীর —অবশ্যই বলতে হবে অসাধারণ বাঙালীর।

বাংলাদেশ কখনো বর্ণাশ্রম ধর্ম মেনে নেয়নি। বাঙালী ব্রাহ্মণ এবং অন্য ব্রাহ্মণের মধ্যে এখনও জল চল নয়। বাঙালী মুসলমানের মধ্যে আশরাফ আতরাফও নিতান্তই কথার কথা। তা সুলতানের ছবির জগতে যাদের দেখি, তারা বাংলার সাধারণ মানুষ। এই সব সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে দেখার ক্ষমতাই সুলতানের ছবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ছবিসমূহের মধ্য দিয়ে শিল্পী একটি 'ম্যাসেজ' পাঠিয়েছেন। সুলতানের ছবি যাঁরা দেখেছেন, তারা সজ্ঞানে অতোটা অনুভব করতে না পারলেও অন্তরে অন্তরে ম্যাসেজটি গ্রহণ করতে কোনো বেগই পেতে হয়নি। বাংলার মানুষের প্রতি সুলতানের স্বতোৎসারিত ভালোবাসা এবং অগাধ শ্রদ্ধাবোধ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এই 'ম্যাসেজ'।

সুগভীর ইতিহাসবোধ এবং ইতিহাসের প্রতি একটা অকুণ্ঠ আনুগত্য না থাকলে কারো তুলি এ রকম সৃষ্টি করতে পারে না, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া

সুলতানের ছবির বিষয়ে আরো একটা বিষয় ভেবে দেখার আছে, সুলতান বাংলা এবং বাঙালী বিষয়বস্তু নিয়ে যে সকল ছবি এঁকেছেন, সেগুলো দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম করে সব মানবের উজ্জ্বল উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছে।

এ রকম একটা গুজব সমস্ত দুনিয়াতেই চলে আসছে যে শিল্পীর শিল্পকর্ম আর শিল্পীর ব্যবহারিক জীবন এক নয়। রবীন্দ্রনাথ তো বলেছেনই, 'কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো'। কিন্তু এস. এম. সুলতান সম্বন্ধে একথা একেবারেই খাটে না। সুলতানের সংজ্ঞা বহির্ভূত জীবন-প্রণালী থেকেই এই সব অপূর্ব চিত্রমালা সম্ভাবিত হয়ে উঠেছে।



অতীত দিনের স্মৃতি   তেল রং   ১৯৭৬

জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের লেখাটি সুলতানের ১৯৮৭-র প্রদর্শনীর স্যুভেনির থেকে নেয়া



শেখ মুহম্মদ সুলতান

কবীর চৌধুরী

শিল্পী শেখ মুহম্মদ সুলতান চলে গেলেন। জানতাম যে তিনি অসুস্থ। এও জানতাম যে, বিগত কিছুকাল ধরে তিনি মাঝে মাঝেই শারীরিক দিক থেকে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হচ্ছিলেন। তবু তিনি যে সত্যি সত্যি এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে যাবেন তা কখনো ভাবিনি।

সুলতান ছিলেন এক ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ। শিল্পী হিসেবেও নানা দিক দিয়ে তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী। কী উদ্দাম জীবন কাটিয়েছেন এক সময়! পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে, কাশ্মীরে, বাংলাদেশের ঢাকায় চালচুলোহীন ঠিকানাহীন প্রায় যাযাবর জীবনযাপন করেছেন তিনি। আর ছবি এঁকেছেন। অজস্র ছবি। ছোট বড়, প্রকৃতির, মানুষের। সিমলায় প্রদর্শনী করলেন ১৯৪৫ সালে, লাহোরে ১৯৪৮ সালে আর করাচীতে ১৯৪৯ সালে। বেশির ভাগই বাংলা ও কাশ্মীরের নয়নাভিরাম ল্যাণ্ডস্কেপ, কিছুটা আদর্শায়িত। জল রং-এর কাজ ও তৈলচিত্র। মানুষের কিছু ফিগারস্টাডিও ছিল, ড্রাইপয়েন্ট রেখাচিত্র আর ক্রেয়নের কাজ। বিশাল প্যানেলও ছিল। শিল্প সমালোচক সৈয়দ আমজাদ আলী ১৯৫২ সালে শিল্পী এস. এম. সুলতান সম্পর্কে লিখেছিলেন, "অতীতে তিনি কি ধরনের ছবি আঁকতেন জানি না, শুধু জানি জীবন থেকে নেয়া অনেক ছবি তিনি এঁকেছেন। এখন তিনি প্রধানত বাংলা ও কাশ্মীরের নৈসর্গিক ছবি আঁকছেন কিন্তু গত চার বছরের মধ্যে তিনি কাশ্মীর যান নি। বাংলায় যাননি ত বারো বছর। তাই তাঁর সব ছবিই স্মৃতিনির্ভর। ...বাংলার নিসর্গ দৃশ্য প্রধানত জল রং-এ করা। সেখানে অথৈ জলের বিস্তার আর আকাশ, বিলীয়মান দিগন্ত, তাল গাছ, নৌকা, জেলে, কুঁড়েঘর—শান্ত পল্লীর মায়াবী পরিবেশ। কাশ্মীরের

নিসর্গ দৃশ্য সাধারণত তেল রং-এ করা। সেখানে গাঢ় বেগুনি পাহাড়, বিচিত্র লতাগুল্ম ও বৃক্ষরাজি, হ্রদ ও স্রোতস্বিনীর বর্ণাঢ্য উচ্ছলতা। ...তবে সুলতান শুধু ল্যাণ্ডস্কেপ চিত্রকরই নন। সম্প্রতি তিনি দুটি বিরাট প্যানেলে একরাশ উদ্বাস্তু ও দারিদ্র্য লাঞ্ছিত জনগোষ্ঠীর ছবি এঁকেছেন। মানবমূর্তির রেখায়নে কঠিন নির্বাচন, বিরাটত্ব ও দৃপ্ত ভাবারোপ এবং সর্বোপরি মানবিক মমত্ববোধ ও ট্র্যাজেডির আভাস তাঁর বিকাশমান দক্ষ হাতের স্বাগতিক স্বাক্ষর বহন করছে।" আমজাদ আলী তাঁর লেখাটি শেষ করেছিলেন এইভাবে : "আমার মনে হয় সুলতান কারিগরি কৌশলের দিক থেকে তাঁর সাফল্য অর্জন করেছেন। এখন দরকার মহৎ আইডিয়া আর জীবনের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতাবলী, যার মাধ্যমে তিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন চিত্রকলার মাস্টারপীসসমূহ।" ভবিষ্যদ্বাণীই করেছিলেন আমজাদ আলী। পঞ্চাশের দশকেই সুলতান যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচটি এবং বিলেতে চারটি প্রদর্শনী করেন। এর মধ্যে একটি ছিল যৌথ প্রদর্শনী, যেখানে পাবলো পিকাসো, সালভাদর দালি, মাতিস, ব্রাক ও ক্লীর মত বিশ্বনন্দিত আধুনিক সেরা শিল্পীদের চিত্রকর্মের সঙ্গে প্রদর্শিত হয় শেখ মুহম্মদ সুলতানের চিত্রকর্ম।

কিন্তু আমরা বাংলাদেশের মানুষ তখনো তাঁর কথা বিশেষ কিছু জানতাম না। সে সুযোগ ঘটলো দেশ স্বাধীন হবার পর। ১৯৭৬-এ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে তাঁর একটি চিত্র প্রদর্শনী হল। বড় প্রদর্শনী। তখনো ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়নি। আমি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হই ১৯৮৭ সালে, যখন ঢাকাস্থ গ্যোয়েটে ইন্সটিটিউটে তাঁর কাজের একটি সাড়া জাগানো প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এর আগেই অবশ্য আমি সুলতানের শিল্প প্রতিভার কথা জানতে পাই, তাঁর বেশ কিছু কাজ দেখি, তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করি। ১৯৮৭ সালের প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় আমি একটা ছোট লেখাও লিখেছিলাম। আজ তিনি চিরবিদায় নেবার পর নানা ব্যক্তিগত স্মৃতি মনে জেগে উঠছে।

গত তিন বছরের মধ্যে আমি একাধিকবার নড়াইলে তাঁর বাসায় গিয়েছি। সে এক আশ্রমের মতো পরিবেশ। গাছ-গাছালিতে পূর্ণ। পোষা কুকুর, বিড়াল, বেজী, খরগোস, বানর আর কয়েক রকম পাখি নিয়ে চিত্রা নদীর তীরে চিরকুমার সুলতান যে জীবন যাপন করছিলেন, গভীর প্রশান্তির মধ্যে, তা আমার মত সদাব্যস্ত মহানগরীর মানুষের কাছে খুবই ব্যতিক্রমী মনে হয়েছিল। তাঁর দেখাশোনা করতেন নীহারবালা আর নীহারবালার কন্যা। সুলতানই তাদের চরম দুর্দিনে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তারাও শেষ দিন পর্যন্ত সুলতানকে গভীর মমতার সঙ্গে সেবাযত্ন করেছেন। আমি বার তিনেক নড়াইলে সুলতানের বাসভবনে গিয়েছিলাম, প্রতিবারই কয়েক ঘণ্টা ছিলাম সেখানে, গল্প করেছি, একসঙ্গে বসে খেয়েছি। নীহারবালা কী তীক্ষ্ণ সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখতেন সুলতানের সুখ-সুবিধার ব্যাপারে তা দেখেছি। হাঁপানির অবস্থা কেমন আছে জেনে নেয়া, ওষুধ ঠিক সময়ে তাঁর সামনে সাজিয়ে

রাখা, খাবার সময় জিনিসপত্র এগিয়ে দেয়া, স্নানের সময় গায়ে পানি ঢালা, পরে তাঁর দীর্ঘ চুল মুছে আঁচড়ে দেয়া—সব করতে দেখেছি ওই মহিলাকে।

সুলতানের জীবনের শেষ কয়েক বছরের স্বপ্ন ছিল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু করা। গ্রামের অবহেলিত বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য। ছবি আঁকা শেখানো, তাদের চিত্তে সৌন্দর্যের বোধ জাগানো, প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেয়া। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি "শিশু স্বর্গ" নামে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার কাজে নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। সুলতান নিজে আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাঁর "শিশু স্বর্গ" দেখিয়েছিলেন। তাঁর বাসভবন সংলগ্ন একটি ঘরে ও বারান্দায় যেখানে ছোটরা তাঁর তত্ত্বাবধানে ছবি আঁকে তাও দেখিয়েছিলেন। তাঁর আরেকটি চমৎকার পরিকল্পনা ছিল। বিশাল একটি নৌকা তৈরি করিয়েছিলেন। চল্লিশ-পঞ্চাশ জন বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী ওই নৌকায় চড়ে নদীপথে ঘুরবে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানি, আকাশ, তীরের গাছপালা, বাড়িঘর, মানুষজন, খেতখামার, গরুছাগল, পাখ-পাখালি দেখবে, তাদের ছবি আঁকবে। আমি যখন নৌকাটা দেখি তখন নৌকা তৈরির কাজ প্রায় শেষের দিকে। ওইসব স্বপ্ন নিয়েই সুলতান বিভোর। এই মানুষকে ব্যতিক্রমী মানুষ না বললে কাকে বলবো?

ততদিনে তো স্বদেশে তিনি বিরাট সম্মানের আসনে আসীন। ১৯৮২ সালে লাভ করেন একুশে পদক। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে শিল্পকলা একাডেমীর সঙ্গে যুক্ত রেসিডেন্ট আর্টিস্টের সম্মান প্রদান করেন। তিনি রাজধানী শহর ঢাকায় আমৃত্যু বিশেষ ব্যবস্থায় থাকতে পারতেন, কিন্তু চিত্রা নদী তীরবর্তী তাঁর শান্ত শ্রীমণ্ডিত গ্রামীণ আবাসটি তিনি ছেড়ে থাকতে পারলেন না। তিনি দূরে থাকতে পারলেন না তাঁর "শিশু স্বর্গ" থেকে, তাঁর স্বপ্নের নৌকা থেকে।

জীবনের শেষ দশ বছরে তিনি থেমে থেমে ও সময় নিয়ে আঁকলেও খুব কম সংখ্যক ছবি আঁকেননি। বেশ কয়েকটি বিশালাকার ক্যানভাস এঁকেছেন এই সময়ে এবং সেসব কাজেও, তাঁর আগের কাজের মতোই, আমরা লক্ষ্য করি ব্যতিক্রমী শিল্পী সুলতানকে। আর কারো মতোই নন এই শিল্পী। তিনি তাঁর ছবিতে স্বপ্নকল্পনা ও বাস্তবতা, পুরনো দিনের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব। তাঁর চাষীরা, চাষী রমণীরা, জেলেরা, আঁশবটিতে মাছ কাটা জেলেনীরা বিপুলদেহী, তাদের মাংসপেশী স্ফীত, শরীর গিটপড়া। এক পলকের দৃষ্টিতেই মনে হয় কী সাহসী, প্রত্যয়ী, পরিশ্রমী, সকল প্রতিকূলতার মোকাবিলায় কী দৃঢ়সংকল্প। হয়ত বাস্তব এ্যানাটমির নিরিখে ভুল আছে এসব মানবদেহের চিত্রায়নে, কিন্তু সুলতান সচেতনভাবেই সে সবের প্রতি নজর দেননি। তাঁর অন্বিষ্ট ছিল ভিন্ন জিনিস। ১৯৮৭ সালে ঢাকার গ্যোয়েটে ইন্সটিটিউটে সুলতানের চিত্রপ্রদর্শনী উপলক্ষে ইন্সটিটিউটের অধিকর্তা পিটার জেভিটস যা বলেছিলেন এ প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করা যায়। জেভিটস বলেছিলেন, "এই উপমহাদেশের গুটিকয়েক

অসামান্য শিল্পীর মধ্যে সবচাইতে জমকালো সুলতান। তিনি এশিয়ার কণ্ঠস্বর। সুলতানের শক্তির উৎস তাঁর টিকে থাকার ক্ষমতায়। যেসব মানবমূর্তি তিনি রচনা করেছেন, সেসব জীবনযুদ্ধে মানুষের টিকে থাকার বার্তাবহ। বাংলাদেশ আর বাংলাদেশীদের টিকে থাকার ক্ষমতা ছাড়া তেমন কিছু নেই। তাই সে সব ছবিতে এ জাতির স্বকীয়তার প্রতীক সনাক্ত করা যায়।"

ব্যতিক্রমী চিত্রশিল্পী সুলতান কিন্তু একান্তভাবে বাংলাদেশেরই শিল্পী। তাঁর আঁকা চাষী জেলেরা বাস্তবের চাইতে বিস্তৃততর, বেশি পেশীবহুল, বেশি কর্মতৎপর, যৌথ উদ্যোগে বেশি সমর্পিত, যেমন শান্তির সময়ে ফসল ফলানোর কাজে তেমনি বিপ্লব, উপ-বিপ্লব, বিদ্রোহের সময় প্রবল প্রতিরোধে। বাঙালি তাই তো ছিল, তা না হলে কেমন করে টিকে আছে আজও, এতো বিপর্যয়ের পরে? আবারো বাঙালি, বাংলাদেশের মানুষ, ওই রকম হবে। সুলতান ওই স্বপ্নই দেখতেন। ১৯৮৭ সালের প্রদর্শনী উপলক্ষে রচিত জাতীয় প্রফেসর আবদুর রাজ্জাকের একটি মন্তব্যে সেই ইঙ্গিতই বিধৃত। প্রফেসর রাজ্জাক লিখেছিলেন, "......সুলতানের ছবির জগতে যাদের দেখি তারা বাংলার সাধারণ মানুষ। এইসব সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে দেখার ক্ষমতাই ছবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।"

সুলতান আর আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তাঁর ছবি আছে। আর আছে মানুষ সুলতানের স্মৃতি। দুই-ই আমাদের অফুরন্ত অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।



লেখক প্রফেসর কবির চৌধুরী ও শিল্পী সুলতান (১৯৯১)



সুলতান তাঁর সালতানাত ত্যাগ করেননি

শামসুর রাহমান

এক মুহূর্তে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে যায়। সবই ঠিক ছিল, জীবন চলছে তার নিজস্ব গতিতে। হঠাৎ কেমন ওলট পালট হয়ে যায়। গত ১০ অক্টোবর ভোরবেলা খবরের কাগজে একটি খবর পড়ে মন খারাপ হয়ে গেলো। আমাদের দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর এস. এম. সুলতানের অবস্থার অবনতি, এই শিরোনামায় একটি খবর ছাপা হয়েছে—কালো হরফগুলো একটি আশঙ্কাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, প্রয়োজনীয় সব রকমের চিকিৎসার পরও তাঁর অবস্থার কোনোরকম উন্নতি হচ্ছে না, বরং অবনতির দিকে যাচ্ছে। এই মন খারাপ করা খবর পড়ার পরও আশা ছিল সুলতান আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন। এর আগেও তিনি গুরুতর অসুখে ভুগেছেন, কিন্তু সঙ্কট কাটিয়ে উঠেছেন একাধিকবার। ফলে, তাঁর নিরাময়ের আশা নিভে যায়নি। সেদিনই সন্ধ্যাবেলা 'ওস্তাদ মমতাজ আলী খান স্মৃতি ও সঙ্গীত পরিষদ'-এর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যাই। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পুরস্কারপ্রাপ্ত মুস্তফা জামান আব্বাসী এবং তার স্ত্রী আসমা আব্বাসী। কথা বলার এক ফাঁকে আসমা আমাকে জানালেন, শিল্পী এস. এম. সুলতান হয়তো বাঁচবেন না। তার কণ্ঠে উদ্বেগ ছিল, শোকের ছায়া ছিল। একটু পরে তার কাছ থেকেই জানলাম, আমাদের দেশের গৌরব, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রকর সুলতান আর নেই। মন বিষাদে ভরে গেলো।

এস. এম. সুলতানের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তাঁকে প্রথম দেখি পঞ্চাশের দশকের আদি পর্বে। তখন আমি পুরনো ঢাকার সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেনে অর্থাৎ আশেক লেনে থাকি। প্রায় রোজই যাই হামিদুর রহমানের বাসায়। আশেক লেনে আসার কিছুদিনের মধ্যেই হামিদের সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং আমরা পরস্পর বন্ধু হয়ে যাই। হামিদুর রহমান তখনো শিল্পী হয়ে ওঠেন নি, সবেমাত্র গল্প এবং কবিতা লেখা মশকো করতে চেষ্টাশীল। একদিন সকাল ন'টার দিকে রওয়ানা হয়েছি হামিদের বাসার দিকে। আমাদের দু'জনের বাসা এতো কাছাকাছি ছিল যে, তিন চার মিনিটে আসা-যাওয়া করা যেতো। হামিদুর রহমান থাকতেন বাড়ির শেষপ্রান্তে ছোট একটি ঘরে। সেই ঘরে পৌছতে হলে একটি নাতিদীর্ঘ গলি পেরুতে হতো। গলিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই কানে ভেসে এলো বাঁশির সুর। হামিদের ঘরে ঢুকে দেখি একজন তন্ময় হয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিচ্ছেন আর সারা ঘরে পুষ্পবৃষ্টির মতো ঝরছে সুর। সুর থেমে গেলে হামিদ সেই বংশীবাদকের সঙ্গে আমার পরচয় করিয়ে দেন। সেই অপূর্ব বংশীবাদকই শিল্পী এস. এম. সুলতান। তখন সুলতানের চুল এতো দীর্ঘ ছিল না, বেশ ছোটই ছিল। কিন্তু তাঁর মুখে পরিব্যাপ্ত ছিল উদাস প্রসন্নতা এবং সারা শরীরে ছিল এক ধরনের আচ্ছন্নতা, যা গঞ্জিকাসেবনেরই প্রসূন হয়তো। কথা তেমন কিছুই হয়নি, কিন্তু বুঝতে পারলাম আমি একজন অসাধারণ ব্যক্তির মুখোমুখি বসে আছি। তখন তিনি সদ্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসেছেন ঢাকায়। তিনি বেশ কিছুকাল ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। কিন্তু কোথাও বেশিদিন স্থির হয়ে বসার মানুষ নন জাতশিল্পী সুলতান। শুধু শেষের দিকে কয়েক বছর থিতু হয়েছিলেন তাঁর আপন নড়াইলে।

সুলতান বর্ণাঢ্য জীবনযাপন করে গেছেন। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন সম্পর্কে বিশদ জানতে হলে সকলের অবশ্য পাঠ্য আমাদের অন্যতম কৃতী কথাশিল্পী হাসনাত আবদুল হাই-এর লেখা উপন্যাস 'সুলতান'। যদিও উপন্যাস, তবু এই বইয়ে চিত্রকর এস.এম.সুলতানের জীবনের বহু সত্য ঘটনাই বিবৃত। এতে প্রকাশিত হয়েছে একজন অসামান্য শিল্পীর প্রকৃত জীবন। হাসনাত আবদুল হাই-এর 'সুলতান' এবং বাস্তব জীবনের সুলতানের মধ্যে কিছু ভেদ অবশ্যই আছে, কিন্তু এই ভেদরেখা এমনই ক্ষীণ যে, তা' নিয়ে কথা বলা অবান্তর। একজন শিল্পীর জীবনকে হাসনাত আবদুল হাই লিপিবদ্ধ করেছেন বিশিষ্ট রূপদক্ষতায়। গ্রামের একটি সাধারণ পরিবারের এক বালক লাল মিয়া কী করে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে একজন অসাধারণ মানুষ এবং শিল্পীতে বিকশিত হয়ে উঠলো তারই ইতিহাস 'সুলতান'।

বহুদিন পর বাংলাদেশে সুলতান যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত চিত্রকর হয়ে ওঠেন তার পেছনে যে দু'তিনজনের অবদান রয়েছে তাঁরা হলেন শক্তিমান লেখক আহমদ ছফা, তরুণ শর্টফিল্ম নির্মাতা তারেক মাসুদ এবং আমার প্রয়াত বন্ধু আশরাফ আলী। কয়েক বছর আগে আহমদ ছফা সুলতান বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। আশরাফ আলী লেখেন ইংরেজিতে, সম্ভবত হলিডে পত্রিকায়। তারেক মাসুদ 'আদম সুরত' নামে সুলতান সম্পর্কে একটি চমৎকার শর্টফিল্ম নির্মাণ করেন। জার্মানিতে যে সাম্প্রতিককালে আমাদের প্রিয় শিল্পী এস.এম. সুলতান বরণীয় হয়ে ওঠেন, নিঃসন্দেহে তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার জন্যই, তবে সেখানে তাঁর চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠান এবং প্রচারের পক্ষে কাজ করেছিলেন আহমদ ছফা। মনে পড়ে, 'আদম সুরত' শর্টফিল্মে আশরাফ আলী সুলতান-এর সঙ্গে আলাপচারী হয়েছিলেন নড়াইলে শিল্পীর ধ্বংসস্তূপপ্রতিম বাসভবনে।

সুলতানের সেই লতাগুল্ম এবং গাছপালা ভরা, কালের ক্ষতচিহ্ন বহনকারী বাড়ি অনেকের স্মৃতিতেই ভাস্বর হয়ে আছে। আমরা যারা যাইনি নানা পশুপাখিময় সেই ভবনে তাদেরও কল্পনায় জাগ্রত তার পরিবেশ, অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠ। বিভিন্ন ব্যক্তির বর্ণনা শুনে, বিশেষত হাসনাত আবদুল হাই-এর সৌজন্যে প্রবাদপ্রতিম সুলতানের ক্ষয়িষ্ণু প্রাসাদ একটি বিশিষ্ট চরিত্রের মর্যাদা পেয়েছে আমার কাছে। পশুপাখি ও গাছপালার প্রতি সুলতানের ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম এবং গভীর। তিনি যে কী রকম বৃক্ষপ্রেমিক তার ঈষৎ পরিচয় পাই বিখ্যাত ত্রৈমাসিক মীজানুর রহমানের পত্রিকার সম্পাদকের ধানমন্ডির বাসায়। এক শীত রাতে সুলতান এবং আমি আমন্ত্রিত ছিলাম বন্ধু মীজানের বাসায়। মীজানও পুষ্পবিলাসী এবং বৃক্ষপ্রিয়। এ জন্যই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তাঁর ত্রৈমাসিকের অসাধারণ একটি বৃক্ষসংখ্যা প্রকাশ করা। শীতের কুয়াশায় বুকে হাঁপানির টান নিয়ে সুলতান মীজানের বাগানের গাছ দেখতে গেলেন। সে-রাতে কথা বলতে গিয়ে লক্ষ্য করেছিলাম, সুলতানের মধ্যে এক ধরনের আধ্যাত্মিক তরঙ্গ বয়ে যায়।

সাধারণ মানুষের প্রতি প্রাণের টান ছিল সুলতানের। তিনি চাইতেন এ দেশের মানুষ বলিষ্ঠ, প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক। এই আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয়েছে তাঁর বহু ক্যানভাসে। তাঁর ক্যানভাসে আমরা সেসব পেশীবহুল, প্রাণবন্ত নারী পুরুষদের দেখতে পাই, যাদের শ্রমে গড়ে ওঠে কৃষিসভ্যতা। শিশুদের নিয়ে বড় রকমের স্বপ্ন ছিল এই অকৃতদার শিল্পী মানুষটির। এ জন্যই তিনি হাতে নিয়েছিলেন একটি প্রকল্প—যেখানে ছেলেমেয়েরা মনের আনন্দে শিল্পশিক্ষা পাবে, সুযোগ পাবে সুন্দর জীবন

চর্চার। শিশুদের বিষয়ে, মনে পড়ে, তিনি একটি স্মরণীয় বক্তৃতা করেছিলেন নারায়ণগঞ্জে এক বছর আগে। সুলতান প্রাণত্যাগ করেছেন সত্য, কিন্তু তাঁর সাল্‌তানাত অর্থাৎ শিল্পসৃষ্টি ত্যাগ করেননি। কোনো প্রকৃত শিল্পীই তা' করেন না-- তাঁর শিল্পের রাজ্য থেকে যায় কালের আক্রমণ সত্ত্বেও বর্তমান এবং ভবিষ্যতের অনাগত ভোক্তাদের জন্য। আমি এই মুহূর্তে দেখছি, কারুকাজময় একটি বিশাল নৌকায় অনেক শিশু যাত্রা করেছে সুন্দরের সন্ধানে, বৃহত্তর জীবনের দিকে।

বড় মাপের ব্যক্তি ও শিল্পী সুলতানকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি।



ছবি সৌজন্যে : মহসিন হোসাইন

কবি শামসুর রাহমান এবং কবি আহমদ ছফার সংগে শিল্পী সুলতান (১৯৯১)



দেশজ আধুনিকতা ॥ সুলতানের কাজ

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

সুলতান তিন অর্থে আদিম। তাঁর কাজ লোকজ এবং আধুনিক ঐতিহ্যের প্রান্তে; তাঁর বিষয়াবলী, প্রায়শই, কৃষক জীবনের উপাখ্যান এবং কর্মতৎপরতা থেকে উত্থিত এবং সবশেষে তাঁর কাজে মানুষ এবং মানুষীর ফিগরসকল শ্রমজীবী শ্রেণী থেকে নেয়া। তিনি এক একক যাত্রী, মুসাফির কিংবা বৈরাগী, সে জন্য তিনি নির্দিষ্ট একটি ধারা কিংবা আচরণবিধির উত্তরাধিকারী নন। তিনি কদাচিৎ ব্যবহার করেছেন ইংরেজ-ভারতীয় ঐতিহ্যের চিত্রগত ব্যাকরণ; সে জন্য তাঁর মধ্যে ব্যাকরণ নেই। আধুনিক প্রথাসমূহ থেকে বিবর্তিত আঙ্গিক দক্ষতার ওপর তিনি কর্তৃত্ব বিস্তার করেননি, সেজন্য তাঁকে চিত্রস্ত মনে হয়। চিত্রগত সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁর সমাধান পুনরাবৃত্তিক, সে জন্য তাঁকে মনে হয় গ্রাম্য সরল। এসব হচ্ছে তাঁর ছেদ এবং এসব ছেদ তাঁকে ভিন্ন করেছে।

সুলতানের শক্তির ভিত্তি তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা। তাঁর কৃষক উৎস এবং তাঁর বোহেমিয়ান জীবনস্টাইল পরস্পর প্রবিষ্ট এবং তাঁর চেতনাকে আকার দিয়েছে। তাঁর কাজের দিকে তাকালে মানতে বাধ্য হই এ সকল কাজ উৎসারিত হয়েছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এবং প্রায়শই উদ্দীপিত এবং উচ্চকিত হয়েছে অভিজ্ঞতার ঐ প্রগাঢ়তা থেকে। তিনি তাঁর কৃষক উৎস থেকে দূরে যেতে পেরেছেন এবং অন্যপক্ষে তাঁর

বোহেমিয়ানিজম শ্রেণী বিভাজনের পরপারে তাঁকে নিয়ে গিয়েছে। এ সবই তাঁর কাজে তৈরি করেছে এক ধরনের টেনসন, সে জন্য তাঁর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র উম্মাতাল। তাঁর ফিগরসকল সাধারণত মনুমেন্টাল। মনুমেন্টালিটির কারণে তাদের এবং চতুর্পাশ্বের মধ্যে কোন সঙ্গতি নেই। সে জন্য তাদের মনে হয় নাটকীয়। এই নাটকীয়তা তাঁর কাজের কেন্দ্রবিন্দুর ক্ষেত্রে বিপত্তি তৈরি করে। পটভূমির নিসর্গ রংয়ের বাজনায় নাচে, কিন্তু তাঁর নাটকীয় ফিগরসকল কৃষকের শ্রমের নিষ্ঠুর এবং স্থুল শারীরিকতার প্রতিভূ, এই শ্রমের নিষ্ঠুরতা এবং শারীরিকতা রংয়ের নরম নমিত স্কীমের সঙ্গে মেলে না। তাঁর পুরুষ এবং নারী ফিগরের মধ্যে তফাত আছে। যে ক্ষেত্রে তাঁর পুরুষ ফিগর দৈত্যাকার এবং পেশল এবং আদিম, সে ক্ষেত্রে তাঁর নারী ফিগর গোলাকৃতি, মদির এবং লাবণ্যময়। একই কাজে, যেমন তেল রংয়ে আঁকা গ্রামের বিকেল, তৈরি করে বিষমতা, এক ধরনের দূরত্ব। তেল রংয়ে আঁকা ধান তোলা, নদী পার হওয়া, ধান মাড়াই, পুকুরে গ্রাম্য রমণীদের গোসল— এসব কাজে নারী ফিগর মদির এবং মায়াময়, যেন গ্রাম্য কিসসা কাহিনী, গীত থেকে উঠে এসেছে। বিপরীতে তাঁর পুরুষ ফিগরসকল — তেল রংয়ে আঁকা জমি দখলের লড়াই, ধান ক্ষেতে কৃষক, লাঙ্গল গরু কৃষক — এ সব জমিন থেকে উঠে এসেছে, যে জমিন তৈরী হয়েছে বাংলাদেশের ভূগোল এবং ইতিহাস থেকে, যে ভূগোল এবং ইতিহাসের মধ্যে আছে কৃষকের সঙ্গে জমির, কৃষকের সঙ্গে ধানক্ষেতের, কৃষকের সঙ্গে হালবলদের, কৃষকের সঙ্গে জমির দখলের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক নিষ্ঠুর এবং কর্কশ, আবার ভালোবাসার এবং মমতার। কৃষক লড়াকু, কৃষক আবার তার ধানগাছ, তার হালবলদ, তার নারীর প্রেমিক।

সুলতান তাহলে কি? একজন লুকানো পিকাসো? একজন গোপন ভিনসেন্ট ভান ঘ? সুলতান দুই-ই, খুব সম্ভব আরও। পিকাসোর সঙ্গে তাঁর কতক মিল আছে নাটকীয় ফিগরদের জন্য তাঁর প্যাশনের কারণে। তিনি ভান ঘ'র কাছের তাঁর ব্রাশ স্ট্রোকের ভঙ্গি এবং শক্তির জন্য। তিনি আরও অধিক বিষয়ের সঙ্গে তাঁর গভীর এবং নিবিড় মমত্ববোধের জন্য। ফল হচ্ছে: একটি ব্যক্তিক ভিশনের উৎপাদন: কিংবদন্তীর বাংলাদেশের ভিশন যার মধ্যে তিনি মিলিয়েছেন তাঁর কৃষক চতুর্পার্শ্ব। এর ফলে গ্রাম্য মোহনতা কিংবা ভাবালুতা আক্রান্ত গ্রামীণ নিসর্গ আঁকা থেকে তিনি বেঁচে গেছেন। এ ভাবে তাঁর কৃষক সকল অর্জন করেছে একটি মিথনির্ভর বাস্তবতা, আদিমদের এক ধরনের শক্তি এবং ইচ্ছার জোর। তারা সবাই প্রস্তুত, ক্ষিপ্র এবং উদ্যত সংস্কৃতিবান শ্রেণীদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে। তাঁর দরকার আদিমদের ইচ্ছার জোর, তাঁর প্রয়োজন শ্রেণীচৈতন্যের উদ্দীপনা মধ্যশ্রেণীর ভদ্রতা

ছিন্নভিন্ন এবং ইংরেজ-ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যের দৃশ্যমান মদিরতা এবং নিরক্ত কাব্যিকতা বদলে দেয়ার জন্য। তিনি ভিন্ন এবং উম্মাতাল: শিল্প ভুবনের এক কৃষক, অভিজ্ঞতা এবং মনোভঙ্গির দিক থেকে বুর্জোয়াদের বিরোধী এবং বিপরীত।

২

মধ্য পঞ্চাশ দশক। আমিনুল আমাকে বললেন, সুলতান ঢাকায় এসেছে। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, পাকিস্তান ঘুরে। সবার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সুলতান তখনি একটি কিংবদন্তী। শিল্পী, ভবঘুরে, মুসাফির, বৈরাগী : হতচ্ছাড়া, ছন্নছাড়া, ছবি আঁকে ছবি ফেলে দেয়, ছবির মালিকানার চেয়ে ছবি নির্মাণেই তাঁর আনন্দ। আর বাঁশি বাজায়, গাঁজা খায়, রাধা খুঁজে বেড়ায় কিংবা নিজেকেই রাধা মনে করে। তখনকার আর্ট স্কুলে আমিনুলের একটি ঘর ছিল: তাঁর স্টুডিও। সুলতানকে দেখলাম, কালো পেড়ে শাড়ি পরা, বাঁশি বাজাচ্ছে। বকুলতালায় রোদ, রোদের মধ্যে পিঠ দিয়ে বসে আছে একটি কাক, আকাশে মেঘের শাদা : সুলতানের বাঁশির মধ্যে মোচড় দিচ্ছে শহর ঢাকা, ঢাকা ছাড়িয়ে গ্রাম নদী গাছপালা, এ সবটারই নাম নড়াইল, নড়াইলের ডাকাতিয়া বাঁশি। বাঁশি শেষ, গাঁজায় দম, সুলতান উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, রাধা এসেছে, রাধা বুড়িগঙ্গায় নৌকায় বসে, আমি যাই। সুলতানের পাশাপাশি কিংবা পিছু পিছু আমরা জনাতিনেক, সুলতানের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বুড়িগঙ্গার পাড়ে। রাস্তায় মানুষজন অবাক, মধ্যে মধ্যে সুলতানের রাধা রাধা বোল এবং একটু নাচের ভঙ্গি, আমরা অদৃশ্য ঢোল এবং করতালের তালে তাল দিচ্ছি। বুড়িগঙ্গায় নৌকায় অনেকক্ষণ ঘোরা, মধ্যে মধ্যে সুলতানের বাঁশি, নদীর ঢেউগুলি গ্রীবা উঁচিয়ে শুনছে। ফের ফিরে আসা আর্ট স্কুলে, ক্ষিপ্র আঙ্গুলে ড্রইং-এর পর ড্রইং : গাছপালা নদী পশুপাখি, চেনা বিষয়ের মধ্যে অচেনার ইঙ্গিত, দৃশ্যের মধ্যে অদৃশ্যের হাতছানি। পরদিন খোঁজ নিতে এসে শুনি সুলতান উধাও, খুব সম্ভব নড়াইল চলে গেছে। রেখে গেছে তাঁর কয়েকটা ড্রইং শিট : তাঁর ঝোলা, তাঁর বাঁশি, তাঁর সুলতানকে নিয়ে সুলতান ফের বৈরাগী মুসাফির ভবঘুরে হতচ্ছাড়া ছন্নছাড়া। সুলতান সব পার্থিব সম্পদ ফেলে যায়, কিন্তু একটি সম্পদ তাঁর সঙ্গে থেকেই যায়। সে হচ্ছে সুলতানের সুলতান। সুলতান কখনোই তাঁর সুলতানকে কারো কাছে সঁপে দেয়নি, কিংবা জিম্মী করেনি : খ্যাতির কাছে নয়, পদের কাছে নয়, অর্থের কাছে নয়, প্রতিষ্ঠানের কাছে নয়, এমনকি কোন নারীর কাছে নয়। এই তাঁর স্থায়ী সম্পদ : তাঁর বেঁচে থাকার রসদ, উৎস, ভিত্তি, কেন্দ্র, মূল।

৩

সুলতানের এই মনোভঙ্গিটাই আমি থেকে থেকে তদন্ত করেছি। সুলতান প্রত্যাখ্যান

করেছে পশ্চিমের আধুনিকতা, প্রত্যাখ্যান করেছে পাকিস্তানের কলোনীর আধুনিকতা, সুলতান বারবার ফিরে গিয়েছে তাঁর শিকড়ে। অধস্তন বিশ্বের বাসিন্দাদের অভিজ্ঞতা কি প্রান্তিক? ইংল্যান্ড, আমেরিকা, পাকিস্তান ফেরৎ সুলতানের বক্তব্য হচ্ছে : অধস্তন বিশ্বের শিল্পীরা কেবল এথনিক শিল্পী নয়, তাঁরা প্রান্তিক অভিজ্ঞতার প্রবক্তা কেবল নয়, যে অভিজ্ঞতা অতীতের মধ্যে আবদ্ধ, আধুনিকতা থেকে দূরে। অধস্তনদের অভিজ্ঞতা ঔপনিবেশিকতা, পরাধীনতা এবং দাসত্বের কারণে জটিল, স্বতন্ত্র এবং অনন্য; এই অভিজ্ঞতা জনসমষ্টিকে একটি স্বতন্ত্র কণ্ঠে এবং চোখে বলবার, দেখবার ভাববার ক্ষমতা প্রদান করেছে। এই কণ্ঠ এবং চোখ আধুনিকতার উৎপাদন থেকে বহির্ভূত নয়। এ হচ্ছে অন্য এক আধুনিকতা। এ হচ্ছে দেশজ আধুনিকতা, এ হচ্ছে কৃষকদের অভিজ্ঞতা, আউল-বাউল-ফকিরদের গীতের আধুনিকতা, এ হচ্ছে অধস্তন লাঞ্ছিত পরাজিত কৃষক আউল-বাউল-ফকীরদের প্রতিরোধের অভিজ্ঞতা। প্রাত্যহিক জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতা আধুনিকতা নামক ক্ষমতা সম্পর্কের মধ্যে ভিন্ন এক চয়ন এবং বুনন। এই চয়ন এবং বুনন থেকে তৈরি হয় দেশজ আধুনিকতা।

সুলতান যেসব কাজ করেছেন তাতে মনে হয় তিনি একপক্ষে প্রত্যাখ্যান করেছেন বৈশ্বিক আধুনিকতা এবং অন্যপক্ষে প্রত্যাখ্যান করেছেন বৈশ্বিক আধুনিকতার অন্তর্গত পাকিস্তানী কলোনীর ধর্মমনস্কতা। রাধা, কৃষক, পশুপাখি, হালবলদ সে জন্য প্রতীক, ফিরে যাওয়ার এবং প্রত্যাখ্যান করার এবং নির্মাণ করার। এ সব থেকে তৈরি হয়েছে দেশজ আধুনিকতার দুই পরিপ্রেক্ষিত এবং দুই পরিপ্রেক্ষিত উদ্ভুত স্থানিক বাঙালি সংস্কৃতি। এই স্থানিক বাঙালি সংস্কৃতি (স্থানিকতা নড়াইল অঞ্চল অর্থে) টিকে থাকে সকল পরিবর্তন এবং দুর্যোগের মধ্যে, টিকে থাকার মধ্যে দিয়ে এই সংস্কৃতি অন্তরিত হয়েছে এবং আকার দিয়েছে বাঙালিত্বকে, এই বাঙালিত্বের মধ্যে নিমজ্জিত বিভিন্ন প্রান্তিক সংস্কৃতি : কৃষক-আউল-বাউল, লোকজ-ধর্মজ মনোভাব। অন্যপক্ষে এই স্থানিকতা হচ্ছে এক সার প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়া নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ এবং ভেঙ্গে ফেলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদান। এভাবে সুলতানের স্থানিক সংস্কৃতি তৈরি করেছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ফর্ম, যেসব প্রশ্ন করেছে বৈশ্বিক সংস্কৃতি এবং পাকিস্তানী সংস্কৃতির পরিসর। বৈশ্বিক আধুনিকতার বিপরীত হচ্ছে স্থানিক আবহমানতা, এই আবহমানতা ফের রুখে দাঁড়িয়েছে পাকিস্তানী ধর্মমনস্ক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে রাধা, কৃষক, পশুপাখি, হালবলদের ফর্ম নিয়ে। সে জন্য স্থানিকতা একই সঙ্গে আবহমানতা এবং প্রতিরোধ। এই আবহমানতা হচ্ছে মিথ এবং প্রতিরোধ হচ্ছে স্মৃতিনির্ভর। মিথ থেকে তৈরি হচ্ছে সকল দুর্যোগ এবং দুর্ভোগের

মধ্যে টিকে থাকার শক্তি; অন্যপক্ষে প্রতিরোধ থেকে তৈরি হচ্ছে জীবনদর্পিতা : জমির জন্য, ধানের জন্য, সন্তানের জন্য, হালবলদের জন্য, প্রেয়সীর জন্য রুখে দাঁড়ানোর ভঙ্গি। আবহমানতার এই ভঙ্গিটি দেশজ আধুনিকতার শক্তি। সে জন্য সুলতানের দেশজ আধুনিকতা বাস্তব, স্পষ্ট এবং ফিগরটিভ। ফিগরের মধ্যে দিয়ে তিনি আবহমানতার শক্তি এবং প্রতিরোধের ডালপালা তৈরি করেছেন। এই ফিগর মধ্য-ভিকটোরীয় স্থাণু ফিগর নয়, এই ফিগর পিকাসোর সক্রিয়তার আমদানি নয়, এই ফিগর ভান ঘ'র সন্ত্রাস তাড়িত নয় : এই ফিগর নড়াইলের জমি থেকে উত্থিত, নড়াইলের আউল-বাউল-বৈরাগীর খঞ্জনীতে স্পন্দিত।

দেশজ আধুনিকতা কতগুলো জিজ্ঞাসার সূত্র মেলে ধরে। বৈশ্বিক আধুনিকতার মধ্যে ক্রিয়াশীল কলোনিয়াল প্রভুত্ব কলোনীর মধ্যে কতগুলো জিজ্ঞাসা উত্থাপিত করে : ক. কলোনীর বাসিন্দাদের কেন কোন কণ্ঠ/চোখ নেই, খ. তাদের ইতিহাস কেন বিকৃত এবং অধস্তন, গ. তাদের উৎসে ফেরার উপায় কেন সরল নয় এবং ঘ. বিভিন্ন ছেদের মধ্যে তাদের জীবনযাপন কেন যথার্থ নয়। এসব জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে তারা বৈশ্বিক আধুনিকতার অ-যথার্থতা এবং কলোনিয়াল নির্যাতনের প্রচণ্ডতা উপস্থাপিত করে। এই উপস্থাপন সে জন্য প্রতীক খোঁজার মধ্যে। এই প্রতীক তাই বাস্তবের বর্ণনা : এই বর্ণনাটাই সুলতান করেছেন দক্ষতা এবং যত্নের সঙ্গে। তাঁর বর্ণিত নড়াইল কিংবা বাংলাদেশ ইতিহাসের কোন পর্বে এটি শনাক্ত করা সহজ নয়। এই নড়াইল কি স্বাধীন বাংলাদেশের মুজিব আমলের? এই নড়াইল কি পাকিস্তানী কলোনিয়াল আইয়ুব আমলের? এই নড়াইল কি কলোনিয়াল বৃটিশ আমলের? কিংবা তারও আগের? আসলে সুলতানের এটি হচ্ছে প্রয়াস ফিরে পাওয়ার এবং প্রতিষ্ঠিত করার একটি জনসমষ্টিকে প্রতীকের মধ্যে দিয়ে একটি অভিজ্ঞতার সঙ্গে পুনর্বার যুক্ত করার, যে যুক্ততা এই জনসমষ্টিকে ভাষা খুঁজতে সাহায্য করবে যাতে করে তারা ফের নিজেদের নিজস্ব ইতিহাসসমূহ আত্মসাত করতে পারে। বৈশ্বিক আধুনিকতা এই নিজস্ব ইতিহাসসমূহ উদ্ধার কিংবা পুনরুদ্ধারের সহায় শক্তি নয় এবং কলোনীর আধুনিকতা এই নিজস্ব ইতিহাসসমূহ অধস্তন করে রাখে। সুলতান এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয় কৃষকের দৈনন্দিন জীবনযাপনের বাস্তবতা ফিরিয়ে এনেছেন। কৃষকের জীবনযাপনের অংশ সমাজের বিভিন্ন অধস্তন স্তর এবং কৃষকের মনোজীবনের অংশ সমাজের বিভিন্ন অধস্তন মনোজ্ঞতা। সুলতান রাধার কাছে, কৃষকের কাছে, পশুপাখির কাছে বাংলাদেশের বিভিন্ন ইতিহাসের মধ্য দিয়ে এবং বিভিন্ন ইতিহাসের কিংবদন্তী উপাখ্যান গীতির মধ্য দিয়ে ফিরে যেতে চেয়েছেন। সে জন্য তাঁর বাঁশি দরকার, পশুপাখি দরকার, হালবলদ দরকার ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে এবং জীবনযাপনের সরঞ্জাম হিসাবে।

৪.

বাংলাদেশের তিন বিখ্যাত শিল্পী : জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান এবং সুলতানের চোখে কৃষক বার বার হানা দিয়েছে। এই হানা দেয়া তিন জনের চোখে তিন ধরনের। বাংলাদেশের সমাজ গঠনে কৃষক অবদমিত এবং অবদমিত কৃষকের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে তিন পক্ষ দিয়ে। জয়নুল আবেদিনের ক্ষেত্রে কৃষকের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। লাঞ্ছনা এবং দুর্গতির পথ দিয়ে। কামরুল হাসানের ক্ষেত্রে কৃষকের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে গ্রামবাংলার রাজনৈতিকতার পথ দিয়ে। সুলতানের ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে কৃষকের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে। তিনজনের ক্ষেত্রে কৃষকের হানা দেয়ার অর্থ চ্যালেঞ্জ উপস্থাপিত করা ঃ তারা তিন জনই দৃশ্যমান বাস্তবের মধ্যে লুকানো অদৃশ্যমান বাস্তবতাকে চোখে মেলে ধরেছেন। ভণ্ড রাজনীতি ছিঁড়ে খুঁড়ে, উন্নয়নের চকচকে কথাবার্তা নেংটো করে কৃষক হানা দেয় বারবার, ফিরে আসে বারবার অন্তরাল থেকে, প্রচণ্ড লাঞ্ছনা নিয়ে, প্রচণ্ড বিদ্রোহ নিয়ে, প্রচণ্ড উপস্থিতি নিয়ে।

সুলতান এই উপস্থিতিটাকে বাস্তবতা দিয়েছেন। কৃষকরা মৃত নয়, অতীতের একটা অংশ নয়, তারা বিদ্যমানতা এবং বর্তমানতার মধ্যে জীবন্ত। সুলতানের কৃষক আধুনিক ঐতিহ্যের অংশ, ঐতিহ্যের অবদমিত অংশ এবং অবদমিত অংশের উপস্থিতি। এই উপস্থিতি শ্রেণী বিক্ষুব্ধতার পরিচয় নয়, কিংবা নয় ধনদৌলত এবং ক্ষমতার বঞ্চিতকরণ। এই উপস্থিতি জীবনের উপস্থিতি। সুলতান তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে মনে করিয়ে দেন কৃষকদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে জীবনে, সেই জায়গায় উৎসারিত হবে কৃষক জীবন, উত্থিত তীব্রতা, গতিময়তা, জীবন্ততা : এই প্রক্রিয়ায় জীবন্ততার বাস্তবতা শৈল্পিক, সামাজিক এবং অস্তিত্বিক স্বীকৃতি আদায় করে নেবে আমাদের চোখ থেকে।

সুলতানের কৃষকের উপস্থিতির মধ্যে আছে প্রাথমিক বাস্তবতা, মৌলিক সরলতা এবং উপস্থিতির সমগ্রতা। এই সমগ্রতা স্ব-পর্যাপ্ত, বাইরের ঘটনা কিংবা উপাদান থেকে পরিশ্রুত, যেখান থেকে শুরু করা যায় এবং শুরু করা সম্ভব। কৃষক অধস্তন শ্রেণীর অন্তর্গত, অধস্তনতার মধ্যে কৃষকের অভ্যন্তরীণ উপস্থিতি, সুলতান এই অধস্তন এবং অভ্যন্তরীণ উপস্থিতি জনসমক্ষে এনেছেন এবং অভ্যন্তরীণ উপস্থিতি পাবলিক উপস্থিতিতে বদলে দিয়েছেন। কৃষক, সুলতানের চোখে প্রকাশ্য এক সমাজ অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতা লুকানো যায় না কিংবা খাটো করা যায় না। কৃষক, এভাবে পরিবর্তন এক সমাজ বাস্তবতার এবং সমাজ কল্পনার এক সক্রিয় উপাদানে

পরিণত। সমাজ বাস্তবতা এবং সমাজ কল্পনার অংশ হওয়ার দরুন কৃষক সুলতানের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করেছে সমাজ অভিজ্ঞতায়।

বাঙালি সংস্কৃতির যে অংশ সাহিত্য সেখানে সোচ্চার ঔপনিবেশিক সভ্যতা সম্বন্ধে সাড়া এবং মনোভাব। মাইকেলের *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ,* বঙ্কিমের কৃষক, দীনবন্ধুর *নীল দর্পণ,* মীর মশাররফের জমিদার দর্পণ এবং *গাজি মিয়ার বস্তানী:* সবখানেই এই সাড়া এবং মনোভাব কৃষকদের নিয়ে আবর্তিত। কৃষকরা সমাজ কাঠামোর মধ্যে অধস্তন সত্ত্বেও তাঁদের চিন্তার ক্ষেত্রে সক্রিয়। কৃষকদের মধ্য দিয়ে এবং মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সভ্যতার নিরক্ততা, ভদ্রতা, মেকিপনা মেলে ধরেছেন এবং এই সভ্যতা যে বর্বরতার আগ্নেয়গিরি তার উল্লেখে তাঁদের কোনো দ্বিধা নেই। গ্রাম কিংবা পল্লী শান্তি কিংবা স্বপ্নময়তা নয়, গ্রাম কিংবা পল্লী দুঃখ বঞ্চনা দারিদ্র্য এবং কদর্য : এসব নিয়েই গ্রাম কিংবা পল্লীর স্বাভাবিকতা, বাঙালির উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য কর্মীরা এই সত্য তুলে ধরেছেন। এই সত্য সম্বন্ধে বিচ্ছেদ কিংবা বিপত্তি তৈরি হয় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে, ঔপনিবেশিক যান্ত্রিক সভ্যতার বিপরীত গ্রাম কিংবা গ্রামীন জীবন : এই বোধ রোমান্টিকতার পোশাকে বাঙালি সংস্কৃতিতে দেখা দেয়। বাঙালি সংস্কৃতির যে অংশ চিত্রকলা সেখানে এই রোমান্টিকতা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এর দরুন গ্রাম কিংবা কৃষক জীবন রোমান্টিক, ভাবালু, স্বপ্নমদির এবং মায়াবী হাতছানির মধ্যে হয়ে ওঠে।

এই হাতছানির মদিরতা পরপর ভেঙে দেন জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান এবং সুলতান। এই ঐতিহাসিকতার মধ্যে সুলতানকে যুক্ত করে দেখা দরকার। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের কৃষক জীবনের স্বাভাবিকতা সুলতানের কাজে উপস্থিত হয়েছে। সেজন্যে এ সকল কাজ ঔপনিবেশিক সভ্যতার নিরক্ততার প্রতিবাদ, অধস্তনতার শিল্পে উত্থান : এই উত্থান স্বাভাবিক, সরল এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

বৃটিশ ঔপনিবেশিকতা আধুনিকতার যে সংজ্ঞা তৈরি করেছে যে সংজ্ঞায় স্বাভাবিকতা, সরলতা, স্বতঃস্ফূর্ততা প্রয়োজনীয় শর্ত নয়। সেজন্যে এসব গ্রাম্যতার সঙ্গে যুক্ত কিংবা গ্রাম্যতার সমান্তরাল হিসেবে বিবেচিত। এই প্রক্রিয়ায় বৈদগ্ধ নাগরিকতার সঙ্গে এবং স্বাভাবিকতা গ্রাম্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে (মনে কি পড়ে না গোবিন্দ দাস এবং জসিম উদ্দীনের কথা, যারা 'আধুনিক' সংস্কৃতির মধ্যে অচ্ছুত রয়ে গেলেন) আবার নাগরিকতা হয়েছে বিশ্বপৃথিবী জানবার একটি মনোভঙ্গি এবং পল্লীতা পশ্চাদপদতার একটি মাপকাঠি। ঔপনিবেশিক আধুনিকতা উন্মূল করে দিয়েছে নাগরিক মনোভঙ্গি এবং গ্রামীণ সমাজ সংস্কৃতি অনবরত ছিন্নমূল হতে চলেছে ঔপনিবেশিক শোষণের

মধ্য দিয়ে, এই বোধ ধরা পড়েনি ঔপনিবেশিক আধুনিকতায়। এই আধুনিকতা বৈশ্বিক শোষণের ভিন্নরূপ, গ্রামীণ সংস্কৃতি অধস্তন করার একটি প্রক্রিয়া এবং লোকজ মনোভঙ্গি উদ্ভূত: স্বাভাবিকতা, সরলতা, স্বতঃস্ফূর্ততা প্রত্যাখান করবার বুদ্ধিবাদী পদ্ধতি। ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্র কৃষক সমাজ অধস্তন করেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টি দেশের যে অংশের বাসিন্দা সেই গ্রামাঞ্চল অধস্তন হওয়ার মধ্যে দিয়ে অন্তরালে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ জনসমষ্টির সংস্কৃতি ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্র থেকে উদ্ভূত হয়ে প্রবল হয়েছে। বৃটিশ বুর্জোয়ারা এবং দেশজ বুর্জোয়ারা একই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে অংশগ্রহণ করেছে, যদিও এই অংশগ্রহণ অসম এবং স্তর বিন্যস্ত। দেশজ বুর্জোয়ারা বৃটিশ বুর্জোয়াদের নির্মিত নান্দনিক ভুবনে প্রবেশ করেছে, নির্মাণ করেছে বোহেমিয়া : বোহেমিয়ান গ্রামীণ কল্পরাজ্য। এই কল্পরাজ্যের মধ্যে বাস্তবতা নেই। এই প্রক্রিয়ায় নির্বাসিত হয়েছে দেশজ বাস্তবতা, দেশজ বাস্তবতার মধ্যে দুই পা মেলে দাঁড়ানোর কৃষক, তৈরি হয়েছে কল্পনার গ্রাম, বাস্তবের সঙ্গে দূরত্ব রেখে তৈরি হয়েছে কল্পনার স্বর্গরাজ্য : বোহেমিয়া।

বাংলাদেশের বোহেমিয়া বৃটিশ বোহেমিয়ার যতো কাছাকাছি, বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতা থেকে ততো দূরে।

ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের নান্দনিক ভুবন হচ্ছে : বোহেমিয়া। এই বোহেমিয়ার প্রধান উপাদান নিসর্গ। এই নিসর্গ বানানো, কৃত্রিম এবং বৃটিশ বোহেমিয়ার অনুসরণে নির্মিত। সেজন্যে এর মধ্যে সুস্থ স্বাভাবিক প্যাস্টরালিজম নেই, বাস্তব গ্রামবাংলার প্রকৃতি নেই। এভাবে প্রকৃতি এবং নিসর্গের মধ্যে দূরত্ব তৈরি রয়েছে, নিসর্গ হয়ে উঠেছে শহরের আকুতি, ইচ্ছাপূরণ, বাস্তববর্জিত 'সুন্দর'। এই সুন্দরই নিসর্গের মাধ্যমে শহরের জাতীয় সাংস্কৃতিক উৎপাদনে পর্যবসিত হয়েছে। নিসর্গের এই মতাদর্শিক নির্মিতির মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক আধুনিকতা গ্রামবাংলাকে নির্বাসিত করেছে। সুলতান এই মতাদর্শ চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং নিসর্গের বিপরীতে প্রকৃতির দিকে হাত বাড়িয়েছেন।

৫

বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে ক্ষমতা হচ্ছে লোভ। এই লোভকে সর্বগ্রাসী করে তোলা হয়েছে রাজনৈতিক দলকে সশস্ত্র এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যবহার এবং প্রশাসনকে কদর্য করে। সেজন্য ন্যায় রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে স্খলিত হয়েছে এবং ন্যায়বোধ আশ্রয় নিয়েছে প্রান্তিক জনসাধারণের মধ্যে। এই ন্যায়বোধ থেকে তৈরি হয়েছে ক্ষমতার বিকল্প বোধ, যে বোধকে ব্যবহার করেছেন সুলতান (এবং

জয়নুল আবেদিন এবং কামরুল হাসান) তাঁদের কাজে। সেজন্য তাঁদের কাজ একই সঙ্গে ক্ষমতার বোধ এবং সাহসের বোধ : তাঁদের কাজের দিকে তাকালে দর্শকের চোখে এবং বুকে ক্ষমতার বোধ এবং সাহসের বোধ সঞ্চারিত হয়।

রাষ্ট্রব্যবস্থার দুইদিকে ক্ষমতার দুই বিপরীত বোধ একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল। যেক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে ক্ষমতা হচ্ছে সর্বগ্রাসী লোভ, সেক্ষেত্রে সুলতানদের, আবেদিনদের, কামরুল হাসানদের কাছে ক্ষমতা হচ্ছে জনসাধারণের ক্রোধের সাহসের ঘণীভূত অবস্থা/অবস্থান। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভিজ্ঞতার বিপরীত কিংবা বিরোধী হচ্ছে প্রান্তিক জনসমষ্টির অবস্থানের অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি সুলতানদের চোখে। এই চোখে সবকিছু থেকে যায়, এই চোখ থেকে কিছু লুকানো যায় না, সেজন্য সুলতানদের চোখে সতত উপস্থিত সবকিছু : রাজনৈতিক নেতৃত্বের লোভ, এই লোভকে স্থায়ী করার জন্য রাজনৈতিক দলের সশস্ত্রতা, রাষ্ট্রের বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহার, উগ্রতা এবং প্রশাসনিক কদর্যতা।

৬

সুলতান এবং জয়নুল আবেদিন এবং কামরুল হাসান ক্ষমতার রাজনৈতিকতাকে অগ্রাহ্য করেছেন। ক্ষমতার রাজনৈতিকতা রাষ্ট্রব্যবস্থার শোষণ এবং নির্যাতনের সঙ্গে যুক্ত। এই যুক্ততার দরুন মানুষ, প্রান্তিক মানুষ, প্রান্তিক জনসমষ্টি নিজেদের মহিমা খুঁজে পায় না এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে নিজেদের ক্ষুদ্র করে তোলে। এই মহিমা নষ্ট হওয়া এবং ক্ষুদ্র হওয়ার মধ্য দিয়ে তৈরি হয় আশরাফ আতরাফ বোধ, মালিক-চাষী বোধ, জমিদার-কৃষক বোধ, সরকার-প্রজা বোধ। আতরাফ, চাষী, কৃষক, প্রজা সর্বত্রই ক্ষুদ্র এবং মহিমাহীন; সর্বত্রই নির্ভরশীল আশরাফ, মালিক, জমিদার, সরকারের ওপর। এই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। এই প্রক্রিয়ায় কৃষক আশরাফ, মালিক, জমিদার, সরকারের বিষয় নয়। তারা আছে, থাকে নির্যাতন এবং শোষণ বৈধ করার জন্য। তারা আছে, থাকে রাষ্ট্রগঠনের একটি উপাদান : জনসংখ্যার শর্ত পূরণের জন্য।

৭

সুলতান এবং আবেদিন এবং কামরুল হাসান শান্তভাবে এই বোধের সামাজিকতা বদলে দিয়েছেন। শান্তভাবে কিন্তু দুঃসাহসের সঙ্গে। ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক সমাজে সেই সংস্কৃতির প্রয়োজন যে সংস্কৃতি ইমেজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই সমাজ এবং সংস্কৃতির প্রয়োজন একটি বিনোদন ব্যবস্থার, যে ব্যবস্থায় প্রান্তিক মানুষ,

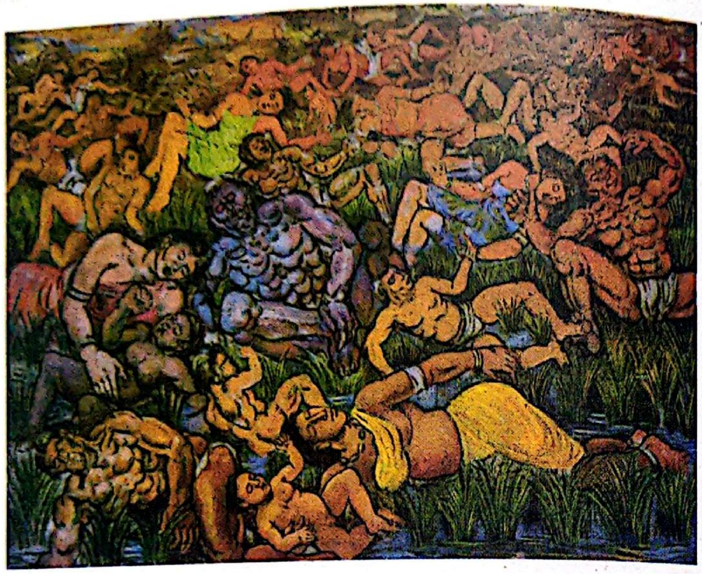
কিংবা প্রান্তিক জনসমষ্টি ভাঁড়, বোকা, সরল হয়ে যায়; এই ভাঁড় হওয়া, বোকা হওয়া, সরল হওয়ার মধ্য দিয়ে শ্রেণী, স্তর লিঙ্গজ লাঞ্ছনা ভুলিয়ে দেয়া যায়। এই মডেলে বঙ্গীয় সাহিত্যে প্রান্তিক মানুষ কিংবা জনসমষ্টির চরিত্র নির্মিত হয়েছে। অন্যপক্ষে এই সমাজ এবং সংস্কৃতি পরিচালনার জন্য দরকার অপরিমাণ তথ্য : প্রান্তিক মানুষ কিংবা জনসমষ্টি সম্বন্ধে, যাতে বাড়ানো যায় উৎপাদন, রক্ষা করা যায় শান্তি শৃঙ্খলা, হওয়া যায় সশস্ত্র, তৈরি করা যায় চাকরি খবরদারি করার জন্য। বঙ্কিমের বৈষ্ণবীরা, রবীন্দ্রনাথের বৈরাগীরা এই ইমেজে তৈরি, ভাঁড়, বোকা, সরল মানুষের মিছিল, প্রান্তিক মানুষ কিংবা প্রান্তিক জনসমষ্টির জীবন পদ্ধতি। বিংশ শতাব্দীর তিরিশ দশকে এই ইমেজের ফের বদল হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পতিত ব্রাহ্মণ কাহার ডোম এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোর ছেঁচোর ভিখারীরা হচ্ছে প্রান্তিক মানুষ কিংবা প্রান্তিক জনসমষ্টি। এই ইমেজ এবং ইমেজের বদল ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কেন্দ্র ভিত্তিমূল। কিন্তু এই ইমেজ এবং ইমেজের বদলের মধ্যে সংস্কৃতির পরিবর্তন কিংবা সংস্কৃতির বর্তমানতা কিংবা সংস্কৃতির অতীত নেই। বর্তমানহীনতা এবং অতীতহীনতার ইমেজ থেকে বিকল্প ভবিষ্যত তৈরি হয় না। এই ভবিষ্যত আশা : যা আমাদের দরকার যদি আমাদের টিকিয়ে রাখতে হয় লড়াই এবং প্রতিরোধ ধনতান্ত্রিক সমাজ এবং সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। বৈষ্ণব, বৈরাগী, ডোম, চোর, ভিখিরীর ইমেজের প্রান্তিকতার মধ্যে আছে চূড়ান্ত এক আতঙ্ক, সমাজ এবং সংস্কৃতির নেতিবাদী উন্মোচন। সে হচ্ছে সমাজ এবং সংস্কৃতির কেন্দ্র থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যাওয়া এবং কেন্দ্রে ফিরে আসবার চেষ্টা থেকে বিরত হওয়া। এ থেকে তৈরি হয় আত্মমগ্নতা, আত্মধিক্কার, আত্মহত্যার প্রবণতা, এমনকি অপরাধ বোধ। বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত এই আত্মমগ্নতার বিভিন্ন ইমেজ বঙ্গীয় সংস্কৃতিকে আচ্ছন্ন করেছে। প্রান্তিকতার এই নির্মিতি কি একমাত্র কিংবা চরম?

৮

এই প্রশ্নটির ভিন্ন জবাব সুলতান এবং আবেদিন এবং কামরুল হাসান বিকল্পের মধ্যে খুঁজেছেন। শিল্পের মধ্যে অতীতের হাড়গোড় থাকে, যা কিছু ঘটছে তার রেশ থাকে, বর্তমানতা থাকে। যারা জীবন্ত, যেসব শিল্পী বেঁচে আছে তারা যদি অতীত এবং বর্তমানতা জনসাধারণের বেঁচে থাকার কেন্দ্র হয়, তাহলে শিল্পমাত্রের দরকার একটা জীবন্ত পরিসর, শিল্প থেকে যায় তখন সময়ের মধ্যে। এভাবে শিল্প সামাজিকতা এবং রাজনৈতিকতা খুঁজে পায় কিংবা সামাজিকতার এবং রাজনৈতিকতার ক্ষমতা অর্জন করে। শিল্পের ক্ষমতার মধ্যে ক্রিয়াশীল হয় অতীত



প্রথম রোপণ ক্যানভাসে তেল রং ১৯৭৬



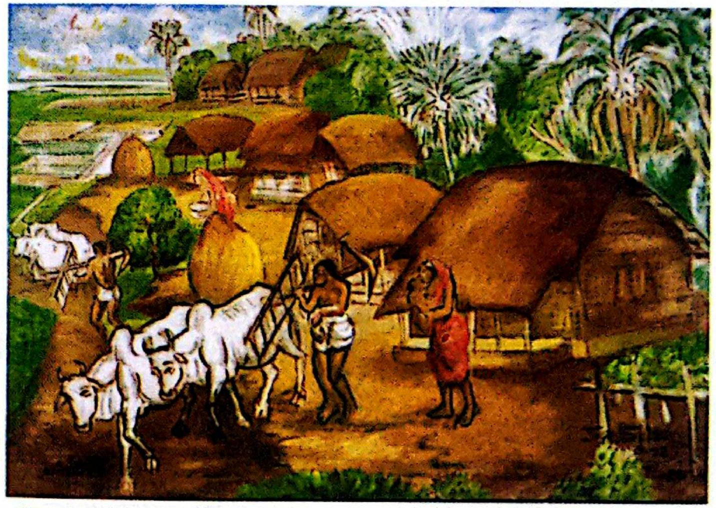
হত্যাযজ্ঞ ক্যানভাসে তেল রং ১৯৮৭



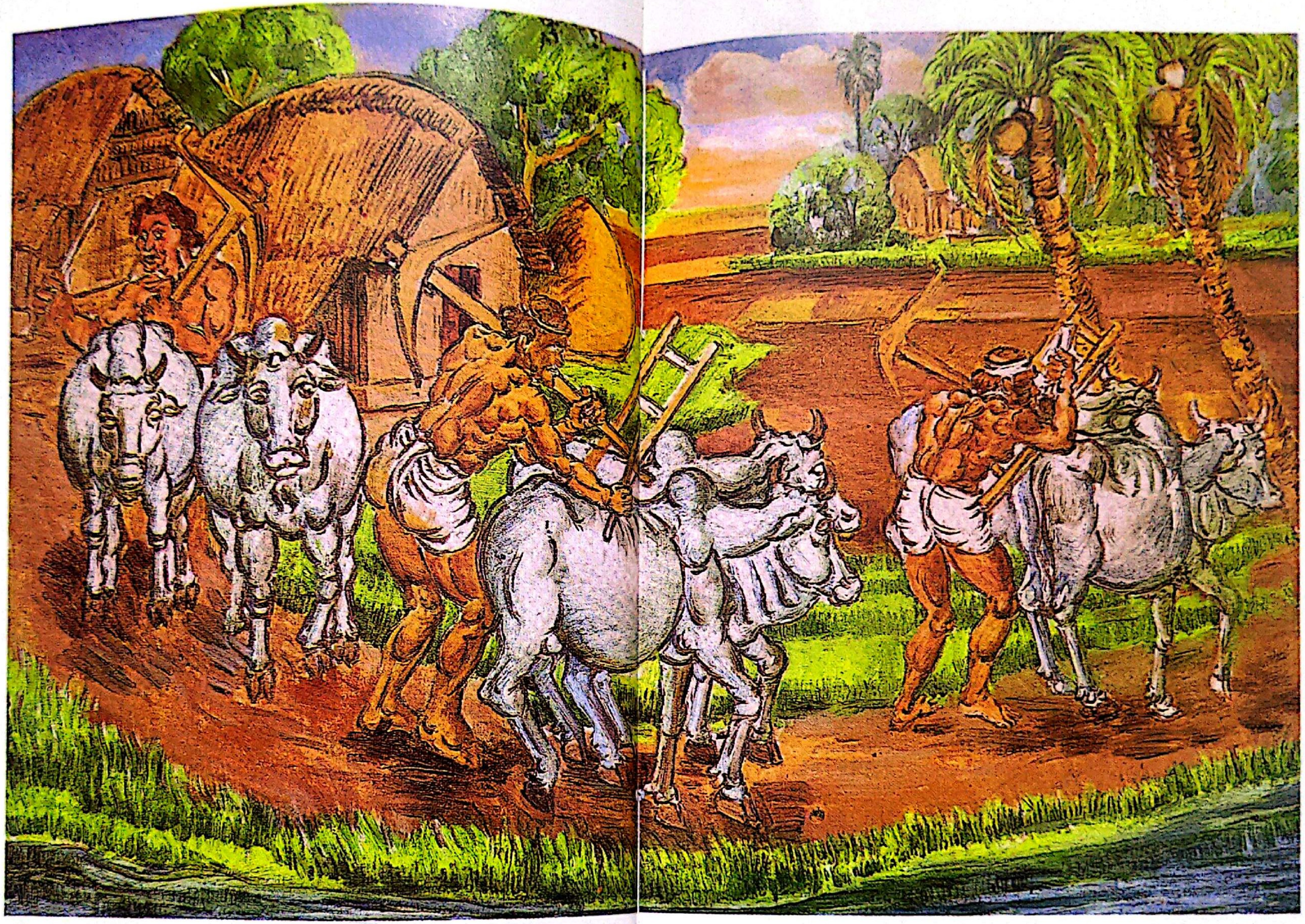
গাঁতায় কৃষক বোর্ডে তেল রং ১৯৭৫



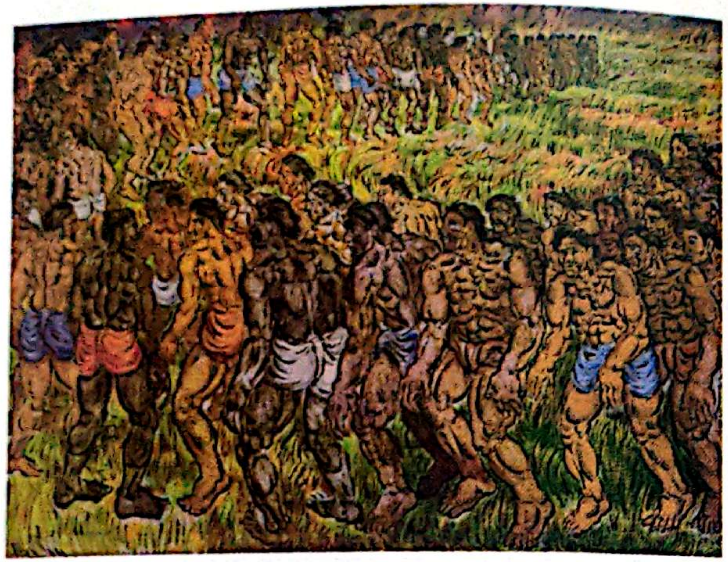
মাছ কাটা ক্যানভাসে তেল রং ১৯৮৭



জমি কর্ষণে যাত্রা-২ ক্যানভাসে তেল রং ১৯৮৯



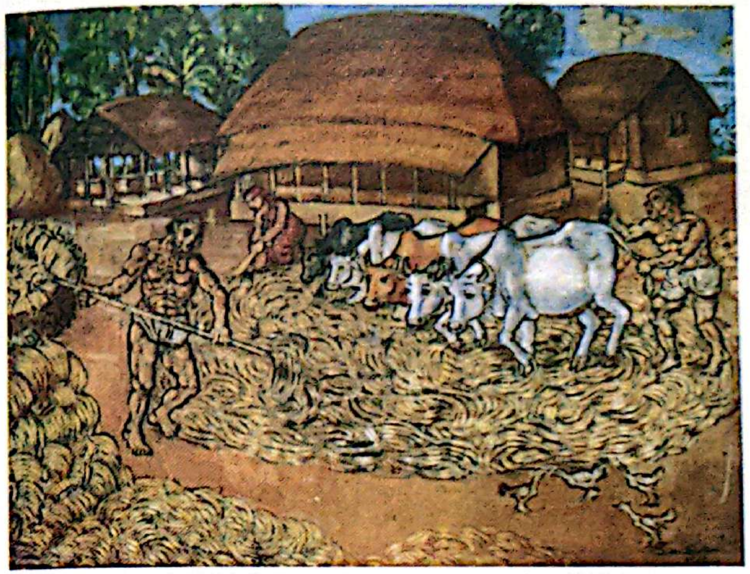
জমি কর্ষণে যাত্রা-১ ক্যানভাসে তেল রং ১৯৮৭



যাত্রা ক্যানভাসে তেল রং ১৯৮৭



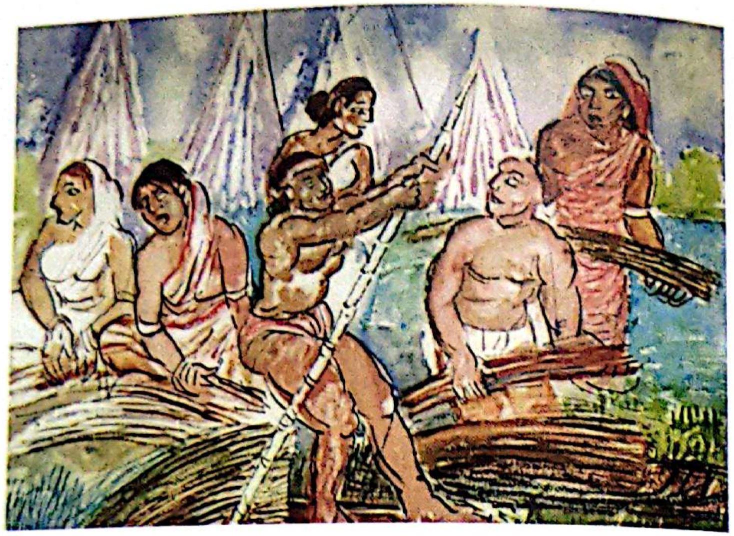
পানি ভরা ক্যানভাসে তেল রং ১৯৮৯



ধান মাড়াই ক্যানভাসে তেল রং ১৯৯২



ফেরা ক্যানভাসে তেল রং ১৯৯৩



পাট ধোয়া কাগজে জল রং ১৯৯১



ধান কাটা কাগজে জল রং ১৯৯১

এবং বর্তমানতার মানুষী স্মৃতি এবং আবেগ এবং অনুভব। এ হচ্ছে শিল্পের বিকল্প পরিসর : সুলতান, আবেদিন, কামরুল হাসান এভাবে শিল্পকে অন্তরীণ করেছেন একটি জনসমষ্টির সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্মৃতির মধ্যে। সুলতান কিংবা আবেদিন কিংবা কামরুল হাসানের কৃষক কিংবা প্রান্তিক জনসমষ্টি সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্মৃতি অথবা সামাজিক এবং রাজনৈতিক বর্তমানতা। এসব কাজ কিংবা এদের কাজ বুর্জোয়া, জেনারেল, মন্ত্রী, আমলাদের খুশি করবার জন্য নির্মিত হয়নি। এসব কাজ কিংবা এসব ইমেজের লক্ষ্য সেসব যন্ত্রণা, উল্লাস যেসব বর্ণিত, বিশ্লেষিত, উদ্ভাবিত আমাদের চোখে এবং আমাদের বেঁচে থাকার মধ্যে। সেজন্য সুলতানের আবেদিনের কামরুল হাসানের বর্ণনা, বক্তব্য, বার্তা একই সঙ্গে ব্যক্তিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রাত্যহিক, ঐতিহাসিক এবং নাটকীয়। সুলতানের 'সৃজন' আবেদিনের 'নবান্ন' কামরুল হাসানের 'নবান্ন' কাজ একই সঙ্গে বর্ণনা, বক্তব্য, বার্তা : এসবের পরতে পরতে আছে রাজনৈতিকতা, অর্থনৈতিকতা, ঐতিহাসিকতা, প্রাত্যহিকতা এবং নাটকীয়তা। কাজগুলি অনেক আয়তনের মধ্যে আমাদের নিয়ে যায়, তাদের অভিজ্ঞতার গতকাল এবং আগামীকাল এবং আমাদের অভিজ্ঞতার গতকাল এবং আগামীকাল মিশে যায় বিভিন্ন লক্ষ্যে। শিল্পীদের অভিজ্ঞতা থেকে শিল্পের অভিজ্ঞতা তৈরি হয় এবং দর্শকদের অভিজ্ঞতা থেকে শিল্পের অভিজ্ঞতা তৈরি হয় এবং দর্শকদের অভিজ্ঞতা শিল্পের অভিজ্ঞতার মধ্যে সংক্রমিত হয়। আবার দর্শকরা শিল্প ছাড়িয়ে পৌছে যায় শিল্পীদের অভিজ্ঞতায়। এই ঘূর্ণায়মানতা থেকে তৈরি হয় বোঝার জানার দেখার ক্ষমতার বোধ। এই ক্ষমতার বোধ রাজনৈতিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট করে। মার্ক্স সেজন্য লিখেছেন, 'প্রকৃতির মানবিক অন্তঃসার প্রথমত সামাজিক মানুষের জন্য বিদ্যমান; কারণ এ ক্ষেত্রেই কেবল প্রকৃতি বিদ্যমান তার নিজস্ব মানুষী অস্তিত্বের ভিত্তি হিসাবে। এ ক্ষেত্রেই কেবল তার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে মানুষী অস্তিত্ব, প্রকৃতি হয়ে ওঠে তার জন্য মানুষ। এভাবে সমাজ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ঐক্যসূত্র–প্রকৃতির যথার্থ পুনরুজ্জীবন–মানুষের স্বাভাবিকতা এবং প্রকৃতির মানবিকতা দুই-ই সম্পূর্ণতা পায়। রাজনৈতিক ক্ষমতা যেভাবে বাংলাদেশে ব্যবহৃত এবং পরিচালিত তার মধ্যে এই সম্পূর্ণতার কোনো বোধ নেই। যা স্পষ্ট এবং উচ্চারিত তা লোভ, উদগ্র অন্ধলোভের গ্রাস।

সুলতান, আবেদিন, কামরুল হাসান এই লোভকে নেংটো করেছেন বিভিন্নভাবে। সুলতানের, আবেদিনের, কামরুল হাসানের কাজের পাশাপাশি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *নয়নচারা* এবং *লালসালু*, শওকত ওসমানের *বনী আদম* এবং *জননী*, শামসুদ্দীন আবুল কালামের *পথ জানা নাই*, আবু ইসহাকের *সূর্য দীঘল বাড়ি*, শহীদুল্লাহ কায়সারের *সারেং বউ* এবং *সংশপ্তক* পড়ি তাহলে, গ্রাম, গ্রামবাংলা, কৃষক, কৃষকের

ঘরগৃহস্থালী, অতীতময়তা এবং বর্তমানতার জীবন্ততা, ভয়াবহতা কদর্যতার মধ্যে মানুষ এবং কৃষকের বেঁচে থাকার ক্ষমতার রাজনৈতিকতা আমাদের চোখে ভর করে। আমরা বুঝি কেন এই ক্ষমতা রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষমতার বোধের চেয়ে ভিন্ন, আমরা বুঝি কেন রাজনৈতিক নেতৃত্ব দুর্ভিক্ষ, দেশ বিভাগ, দেশ শাসনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার লোভে আমগ্ন। আমাদের সমস্ত শরীর দিয়ে এই লোভকে অভিশাপ দেই। আমাদের সমস্ত শরীর ক্রোধে রি রি করে ওঠে, আমাদের ক্রোধে গেঁথে যায় তেভাগা, হাজং জিরাতিয়া, নানকার কৃষক বিদ্রোহ, আমাদের ক্রোধে পরিব্যাপ্ত হয় মুক্তিযুদ্ধ এবং আমাদের ক্রোধে বেপরোয়া হয় এই সেদিনের সার বিদ্রোহ : আমরা অতীতের ক্রোধ দিয়ে বর্তমানে ক্রোধ দিয়ে বেঁচে থাকার ক্রোধ দিয়ে ঘেরাও করে রাখি রাজনৈতিক লোভের ঐতিহাসিকতা : এই হচ্ছে আমাদের কাছে, সাধারণ মানুষের কাছে জবাবদিহিতার শর্ত।

৯

সুলতানের কাজ বহু ব্যাখ্যার দাবি করে না। বরং তাঁর কাজ শোনার জন্য অপেক্ষমান : আমরা, দর্শকরা কি বলছি, তা শোনার জন্য। আমরা তাঁর কাজ থেকে যে জবাব খুঁজি তার পরিসর তাঁর কাজের মধ্যেই আছে। তাঁর জীবন, তাঁর দারিদ্র, তাঁর লড়াই, তাঁর ভবঘুরেপনা সবই এখন জানা। কিন্তু তাঁর কাজ বিভিন্নভাবে বিভিন্নজনকে কেন উদ্দীপ্ত করে তার সঙ্গে তাঁর জীবনচরিতের সম্পর্ক কম। সুলতানের কাজে দুরূহতা নেই, বাস্তব চেনা; কাজটির মধ্যে কোথাও কোন চিহ্ন নেই শিল্পীর লড়াইয়ের। ইমেজটি সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণতার মধ্য দিয়ে শিল্পী আস্তে আস্তে পটভূমি থেকে সরে যান এবং সম্পূর্ণ ইমেজটি চোখ দখল করে নেয়। বিষয়টি, বাস্তবটি কাছে এসে যায়।

সুলতানের বিশেষ আবেদন নিশ্চিতভাবেই শিল্পী হিসাবে তাঁর পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত। তাঁর পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে তিনি দৃশ্যমানতাকে তাঁর ভিশনে বদলে দিতে থাকেন। এই প্রক্রিয়ায় বাস্তব হয়ে ওঠে অধিকতর বাস্তব, বাস্তবের চেয়েও বাস্তব। তাঁর ছবি আঁকার পদ্ধতির মধ্যে বাস্তবের এই রূপান্তরণ কিংবা বাস্তবের অধিকতর বাস্তব হওয়ার প্রক্রিয়াটি উদ্ভাসিত। বাস্তবের ইমেজটি আমাদের দিকে এগিয়ে আসে এবং আমাদের ঘিরে ধরে। সেজন্য যখন আমরা তাঁর কাজটিকে দেখি তখন আমাদের চোখের সামনে কাজটি জ্বলজ্বল করতে থাকে, চেনা ইমেজ, যে-ইমেজটিকে বহুবার আমরা দেখেছি। আমরা কাজটির মধ্যে অংশ নিই এবং ভাবতে থাকি সুলতানের ভিশন নিয়ে। আমরা ভাবি : কেন বাস্তব মাত্রই ভিশন হয় না।

সুলতানের কৃষকের ঘর-গৃহস্থালি, হালবলদ, জমির লড়াই বাস্তবের মধ্যকার বাস্তবের বোধ তুলে ধরেছে। সেজন্য এসব হচ্ছে বাস্তবের চেয়ে আরো প্রখর, আরো ক্ষিপ্র, আরো তীব্র। সুলতান একটি নির্দিষ্ট বাস্তবের মধ্যে একটি আবহমান বাস্তবের বোধ গেঁথে দিয়েছেন, আবার আবহমান বাস্তবের বোধ দিয়ে বিদ্যমান বাস্তবকে পরাভূত করেছেন। কখনো কখনো আবহমান বাস্তবকে ব্যবহার করা যায় আত্মরক্ষার জন্য এবং আক্রমণের জন্য। সুলতান সেই কাজটি করেছেন তাঁর পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে।

সুলতানের ফিগরসকল কার্ভ। একটি ফ্ল্যাট সারফেসে কার্ভ ফিগরসকল ভল্যুমের বোধ তৈরি করে এবং ফিগরসকলের মধ্যে আরও তৈরি করে তীব্রতা তাঁর ফিগরসকলের স্থান ইমেজের ক্ষেত্রে কার্ভের তীব্রতা আরও তৈরি করে দীপ্ততা। এভাবে তিনি তৈরি করেন চেনা ফিগরের মধ্যে যাদু : এ যেন সরলতার সঙ্গে জটিলতার এক দ্বান্দ্বিকতা। বিষয়ের সরলতা ফিগর নির্মাণের জটিলতার মধ্যে স্পন্দিত হতে থাকে : আমাদের চোখে দুই-ই পরপর কিংবা একসঙ্গে উদ্ভাসিত হতে থাকে। সরল বাস্তবের মধ্যে প্রোথিত থাকে জটিল বাস্তব, চেনা বাস্তবের মধ্যে গ্রথিত থাকে অধিকতর বাস্তব। সেজন্য অধিকতর বাস্তব বিদ্যমান বাস্তবের এক ধরনের সমালোচনা এবং অধিকতর বাস্তব আবহমান বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে বর্তমানতার সীমাবদ্ধতা করে স্পষ্ট।

সুলতানের ফিগরদের চোখে দৃষ্টি নেই। প্রায় পুরুষ ফিগর পেশল কিন্তু চোখে তাদের দৃষ্টি নেই এবং নারী ফিগরদের চোখ সম্মুখে নিবদ্ধ নয়। এই সমস্যা আমাকে থেকে থেকে ভাবায়। এর কারণ কি তাঁর ফিগররা যা করে তাতেই আবদ্ধ, নিয়োজিত; প্রকৃতি/নিয়তি/ঈশ্বর কিংবা আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত? সে জন্য হয়তো তাদের মধ্যে একটা অন্ধ ঝোঁক আছে : তারা চাষে উন্মাতাল, লড়াইতে উন্মাতাল, দৈনন্দিন কাজে উন্মাতাল। কাজের বাইরে পরপারে চোখ খুলে তাকাবার কোন অর্থ নেই কিংবা সময় নেই। তারা নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ, নিজেদের পরপারে তাদের কোন আগ্রহ নেই, উৎসাহ নেই। তাদের ওপর ভর করেছে তাদের নিয়তি। তারা মগ্ন এবং তাড়িত। তাদের অভিজ্ঞতা গভীর। তাদের দাবি তাদের এভাবেই দেখতে হবে : বিকৃত, অতিরঞ্জিত, 'সুন্দর' না করে। তারা যা তাই, এখানেই তাদের যথার্থতা।

সুলতান এই যথার্থতাই খুঁজেছেন। তিনি বঙ্গীয় শিল্পের ইংরেজ-ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে জন্মাননি। ছবি আঁকার সমাজ পরিসর তাঁর ছিল না, এই সমাজ পরিসরের মধ্যে তিনি বেড়ে ওঠেননি এবং এই সমাজ পরিসর খুঁজতে হলে মিউজিয়ামে যেতে

হয়। নড়াইলে কিংবা যশোরে কোন মিউজিয়াম নেই, মিউজিয়াম অনেক দূরে, কলকাতায় বৃটিশ বাংলার রাজধানীতে। সেখানে কৃষক সন্তান লাল মিয়ার স্বাভাবিকভাবে পৌছবার কথা নয়। তাঁর শক্তি তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতার মধ্যে তিনি বেঁচে থেকেছেন, এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে শিল্পী হতে বাধ্য করেছে, কিন্তু বঙ্গীয় শিল্পের ঐতিহ্যে এই অভিজ্ঞতার কোন জায়গা নেই। তিনি এটা কি করে বুঝেছেন কোন মিউজিয়ামে কিশোর বয়সে না গিয়ে? তিনি বুঝেছেন যে, তাঁর সমগ্র অভিজ্ঞতা তাঁর সমাজস্থ ব্যবহারের বর্হিভূত এবং তিনি আস্তে আস্তে বুঝেছেন যে, শিল্প এক ধরনের ক্ষমতাই। যাদের আমরা আদিম বলি তাদের বিশ্বাস উৎসারিত হয় নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে এবং তাদের থাকে চারপাশের সমাজ সম্বন্ধে সন্দেহ। সুলতান এই প্রক্রিয়ায় নিজের ক্ষমতার ওপর বিশ্বাসী হন এবং সমাজ সম্বন্ধে সন্দিহান হন। শিল্পী শিল্পের বাধ্য হন এবং এই বাধ্যতা তৈরি হয় শিল্পীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে, যে অভিজ্ঞতা শিল্পের ঐতিহ্য থেকে বহির্ভূত। সংস্কৃতির শ্রেণী ব্যবস্থার বিরোধিতা করেই সুলতান শিল্পের শক্তি এবং গুণ অর্জন করেন। তাঁর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তিনি বাদশা এবং এখানকার আশমানদারী তাঁর নিজস্ব নিয়মের অধীন। তাঁর শিল্পের নিয়ম তাঁর তৈরি করা।

শিল্পের ঐতিহ্য এবং শিল্পীর অভিজ্ঞতার মধ্যে ফারাক থাকতে পারে, যেমন থেকেছে সুলতানের ক্ষেত্রে। সুলতান এক পক্ষে বঙ্গীয় শিল্পের পেশাদারী ঐতিহ্য বিস্তৃত করেছেন এবং অন্যপক্ষে এই ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে শিল্পবহির্ভূত অন্যান্য শ্রেণীর অভিজ্ঞতা প্রকাশের আয়তন তৈরি করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত লড়াই, তাঁর ব্যর্থতা, বিরোধিতা সবই তাঁর প্রজেক্টের বিশালতর ইঙ্গিতবহ। শিল্প বহির্ভূত অন্যান্য শ্রেণীর অভিজ্ঞতা শিল্প ক্ষেত্রে বিস্তৃত করার প্রয়াস সঙ্কট মেলে ধরে। শিল্পের ঐতিহ্য তিনি ভেঙ্গে ফেলেছেন। ব্রিটিশ আমলের বঙ্গীয় শিল্পীরা অভিজ্ঞতার একটি সূত্র কিংবা উৎস ব্যবহার করেছেন। সেজন্য সে সময়কার শিল্প বিভিন্ন ধরনের বিচ্ছিন্নতার অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেছে এবং চিত্রকলার সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্যে আবদ্ধ থেকেছে। বিচ্ছিন্নতার অভিজ্ঞতার এক সূত্র হচ্ছে বৃটিশ শিল্প অনুসরণের প্রয়াস এবং অন্য সূত্র হচ্ছে মুসলমান সমাজ অভিজ্ঞতার পরপারে বিভিন্ন ধর্মজ পুরাণ অনুকরণ। এই দ্বিবিধ অভিজ্ঞতা পুনরাবৃত্তিত হয়েছে চিত্রকলার সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্যে। সেজন্য শিল্পক্ষেত্রে স্বাধীনতার পরিসর তৈরি হয়নি। জয়নুল আবেদিন এবং কামরুল হাসান এবং সুলতান শিল্পক্ষেত্রে শিল্প বহির্ভূত অন্যান্য শ্রেণীর অভিজ্ঞতা এনেছেন এবং শিল্প ঐতিহ্য ভেঙ্গে ফেলার মধ্যে দিয়ে শিল্পক্ষেত্রে স্বাধীনতার সংজ্ঞা ও লুকানো আছে। অন্যের অভিজ্ঞতা শিল্পক্ষেত্রে স্বাধীনতার অপ্রত্যাশিত ভুবন উন্মোচিত করে,

বাস্তবতার অন্য এক পৃথিবীর উন্মিলিত করে এবং বাস্তবের সেইসব বিষয় এবং ইমেজ যা স্বভাবত উল্লিখিত হয় না, সেইসব এবং একই সঙ্গে সেই সব বিষয় এবং ইমেজ যা স্বভাবত উল্লিখিত হয় না, সেইসব এবং একই সঙ্গে সেইসব বিষয় এবং ইমেজ যা হারিয়ে গেছে কিংবা লুণ্ঠিত হয়েছে কিংবা স্থানচ্যুত হয়েছে, সেইসব ফিরে ফিরে আসে। এ হচ্ছে দেশজ আধুনিকতার অন্য এক মুখ, দেশজ বাস্তবতার মুখোশহীন, নগ্ন মুখ, যে-মুখকে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার বর্তমানতা ঢেকে রাখে এবং দেশজ আধুনিকতা মৌলিকতাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

এই অন্যতার উদ্ভব এবং উদ্ভাবন এবং ব্যবহার বাংলাদেশে জয়নুল আবেদিন এবং কামরুল হাসান এবং সুলতান করেছেন মেসিয়ানিক আবেগে। সেজন্য তাঁরা তিনজনই শিল্পের মূলধারায় যেমন সংযোজন করেছেন, তেমনি মূলধারার মধ্যে অন্তর্ঘাতী ইমেজ এবং বিষয় লিপ্ত করেছেন। এই লিপ্ততার দরুন বাস্তবের উপস্থিতি এক পক্ষে বিরোধিতা করেছে শিল্পের প্রতিভাস, অন্যপক্ষে জীবন্ততার উদ্ভব এবং উদ্ভাসন ঘটেছে অন্য স্পেস থেকে। যেন এই উদ্ভব এবং উদ্ভাসনের মধ্য দিয়ে ন্যায়ের বোধ তৈরি করেছে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার বিপরীতে।

ন্যায়ের বোধ শিল্পেক্ষেত্রে? শিল্পের অর্থ যদি অভিজ্ঞতার উন্মোচন হয় তাহলে, সাধারণত একটি শ্রেণীর অভিজ্ঞতা এবং ঐ শ্রেণীর অপরাপর শ্রেণী সম্বন্ধে করুণাজাত অভিজ্ঞতা কেন শিল্পকে এবং শিল্পবোধকে দখল করে রাখবে? অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক এবং অভিজ্ঞতার কোন একটি কেন্দ্র নেই। অভিজ্ঞতা বহু কেন্দ্রিক, বহু শ্রেণী এবং বহু স্তর উত্থিত, সেজন্য একটি অভিজ্ঞতা কিংবা একটি উদ্ভাবন শিল্পের পরিসর গ্রাস করে নিলে শিল্প থেকে স্খলিত হয় ন্যায়ের বোধ। এই বোধটির প্রতিষ্ঠার জন্য জয়নুল আবেদিন এবং কামরুল হাসান এবং সুলতান লড়াই করেছেন। তাঁরা যে-সময়ের বাসিন্দা সে সময়টা ঔপনিবেশিকতা এবং আধুনিকতার মধ্যবর্তী, কিংবা ঔপনিবেশিক গ্রামীণতা এবং আধুনিকতার ইউরোপীয় প্রবলতার মধ্যবর্তী, এই মধ্যবর্তী অবস্থান থেকে তাঁরা ফিরেছেন তাঁদের উৎসে। ফিরে তাকানোর মধ্য অতীতে প্রত্যাবর্তন নয়, অতীতকে বোঝার চেষ্টা। এই চেষ্টার জন্য ইউরোপীয় আধুনিকতার দিকে তাকানো দরকার।

সুলতানের বিধি মোতাবেক আর্ট স্কুলে পড়াশোনা ছিল না বলে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে স্থানচ্যুতির সত্য উত্থাপন করা। কৃষকরা নিজের দেশ এবং নিজের সময়ে স্থানচ্যুত; সেজন্য তারা নিজের দেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ শিক্ষিত শ্রেণীর চোখের বিষয় নয়। এই স্থানচ্যুতি যেমন ঔপনিবেশকিতার কারণে, তেমনি আধুনিকতার কারণে।

সেজন্য স্থানচ্যুতির মধ্য দিয়ে তাদের ঔপনিবেশিকতা অতিক্রমণ সম্ভব এবং আধুনিকতা দখল করা সম্ভব। এই অতিক্রমণ ঔপনিবেশিকতার সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে নয়, কিংবা নয় আধুনিকতার ধনতন্ত্রের মাধ্যমে। সুলতান এই বোধটাকে ধরতে চেয়েছেন, সেজন্য তাঁর ফিগরসকল আতঙ্ক ও উদ্বেগতাড়িত, একই সঙ্গে শান্তির মধ্যে স্বাভাবিক। তাঁর বিষয় একটা সম্ভাবনার দিকে উন্মীলিত, সেখানে তাঁর ফিগরসকল সব সময় উপস্থিত থাকার জন্য তাড়িত। সেজন্য তারা বিরাট বিষয় ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। তাঁর ফিগরসকল খাড়াখাড়া, তাদের শরীরের অভ্যন্তরের আয়তনে তারা প্রচণ্ড রকম জ্যামিতিক শরীরটাই তির্যক রেখা; তারা এতদিনকার অধিকারবোধ ধসিয়ে দিতে উদ্যত, তারা কাউকে গ্রাহ্য করে না এবং তাদের গ্রাহ্যে কিছু নেই; তারা নিজেদের ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য দখল নিচ্ছে বিষয়, ক্যানভাস এবং দর্শকের চোখ। এতদিনকার বিষয়ের বদলে ভিন্ন বিষয় এবং দর্শকের চোখে এতদিনকার বিষয়ের বদলে ভিন্ন বিষয়। দর্শক জানতে বাধ্য হচ্ছে সুলতান এবং সুলতানের বিষয়কে। এও একধরনের ন্যায়ের বোধ প্রতিষ্ঠা শিল্পের মাঝে এবং দর্শকের চোখে।

সুলতানের কল্পনাকুশলতার ধরন ভাস্কর্যের মতো। ভাস্কর্যের প্রধান ক্ষেত্র মানুষের শরীর, সুলতানেরও তাই। তিনি যা বলতে চান মানুষের শরীরের পরিমাণেই তা বলা সম্ভব। তাঁর মনুমেন্টাল কাজের বিষয় হচ্ছে : মানুষের শরীর। সেজন্য শরীর হয়ে উঠেছে প্রতীক, শরীরের মধ্যে ভর করেছে প্রতীকময়তা, শারীর ফর্মে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন দিক। তিনি শরীরের সুন্দর নিয়ে ব্যস্ত কিংবা ব্যাপৃত নন, তিনি মগ্ন শরীরের ক্রিয়াশীলতা, তার শক্তি, তার প্রতিরোধ, তার সীমাবদ্ধতা এবং তার রহস্যময়তা নিয়ে।

শরীরের মধ্যে সুলতান কি খুঁজেছেন? তিনি খুঁজেছেন আবেগ, আবেগের নাটক। তিনি ভেবেছেন শরীর হচ্ছে মন কিংবা হৃদয়ের অনুভবের প্রকাশ। তাঁর বিষয় : কৃষক। কৃষকের মন এবং হৃদয় কৃষকের শরীরে কোন ধরনের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, যন্ত্রণা, দ্রোহ তৈরি করে। সুলতান কৃষকের শরীরের মধ্যে এবং শরীরের মাধ্যমে এই প্রশ্নটা বুঝতে চেয়েছেন। সেজন্য তিনি একপক্ষে মানুষের শরীর এঁকেছেন, অন্যপক্ষে মানুষের শরীরটাকে কৃষকের অন্যদিকে আছে বেপরোয়াভাব। অভিজ্ঞতার এ দুটি দিক সুলতান ধরেছেন। এবং এ দুটি দিকের নির্যাস থেকে তৈরি করেছেন সহ্যশক্তি। এই সহ্যশক্তিটাই ছবিকে গ্রাস করে রাখে। সেজন্য তাঁর যে কোন ফিগরের দিকে তাকাল মনে হয় ফিগরটা বেড়ে উঠেছে ক্যানভাস ছাড়িয়ে।

সেজন্য তাঁর ফিগরের সঙ্গে চারপাশের স্পেসের সম্পর্ক খাপ খাওয়ানোর। একটা

সীমান্ত আছে, সীমান্তটা স্পষ্ট নয়। এভাবে তিনি তাঁর কাজের মধ্যে বহু ফিগর রেখে একটা স্পেসের বোধ তৈরি করে দেন। তাঁর কাজ সেজন্য ভিড়াক্রান্ত নয়, চারপাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁর বিশালতার এবং ওজনদার ফিগরসকল নিজেদের চলাফেরার জন্য একটা স্পেস পেয়ে যায়। সুলতানের এই কৃতিত্ব ঈর্ষাযোগ্য। তাঁর ফিগরগুলির মধ্যে বেড় ওঠার বোধ আছে বলেই ফিগরসকল মনুমেন্টাল হয়ে ওঠে। এটা তাঁর কাজের একটা রহস্য।

জয়নুল আবেদিনের বিপরীত দিক থেকে সুলতান বাংলাদেশে চিত্রশিল্পে লাঞ্ছনা এবং ক্ষতকে আবিষ্কার এবং উদ্ভাবন করেছেন। কৃষকরা দরিদ্র্য, তাদের দারিদ্র্য বাস্তবতার প্রকাশবহ। এই দারিদ্রের বাস্তবতা একই সঙ্গে আবহমান এবং শরীর করেছেন। এর মধ্যে একটা দূরত্ব আছে। শরীর এবং কৃষকের শরীরের মধ্যকার দূরত্ব তিনি সারা জীবন অতিক্রম করতে চেয়েছেন। তাঁর ট্র্যাজিডি তিনি এই দূরত্বের মধ্যে সারা জীবন হেঁটেছেন।

এই দূরত্ব তাঁর চোখে স্বপ্ন এবং যন্ত্রণা তৈরি করেছে। তিনি কৃষকদের নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখতেন, আবার কৃষকদের বেঁচে থাকার নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় তিনি চিৎকার করতেন। স্বপ্ন দেখা এবং চিৎকার করার মধ্যে একটা বৈপরীত্য, একটা দ্বন্দ্ব আছে। তিনি স্বপ্ন দেখতেন মানুষের শরীর যেন মহান হয়। তিনি চিৎকার করতেন কৃষকের শরীর কেন লজ্ঘিত হয়। প্রথমটির মধ্যে দ্বিতীয়টির অভিজ্ঞতা নেই। দ্বিতীয়টির অভিজ্ঞতা প্রথমটি থেকে দূরে। এই দ্বন্দ্ব এবং বৈপরীত্য থেকে তাঁর মনে একটা প্রশ্ন জাগ্রত হয় : কৃষকের দেশে কৃষকের অভিজ্ঞতা সর্বজনীন নয় কেন?

এই প্রশ্নটা সুলতানের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করেছে। আতঙ্ক তিনি অভ্যন্তরীণ করেছেন এবং অভ্যন্তরীণতার চাপে তাঁর ফিগরসকল স্বাভাবিকতার পরিসরে বিশাল, ভারি, ওজনদার হয়েছে এবং ফিগরসকল কতকগুলো মৌল অভিজ্ঞতার সংকেত তৈরি করেছে। এই মৌল অভিজ্ঞতাগুলো কৃষক জীবন এবং অস্তিত্বের। এই জীবনটা কর্মাক্ত এবং ঘর্মাক্ত; এই অস্তিত্বটা নিষ্ঠুর। মোহনতা মদিরতা কোথাও নেই। কৃষকের মৌল অভিজ্ঞতার কেন্দ্র হচ্ছে : সহ্য শক্তি। জমির উত্তরাধিকার নষ্ট হলেও কৃষক সহ্য করে। জমিদার, ক্ষমতাবান, রাষ্ট্র অত্যাচার করলেও কৃষক সহ্য করে। প্রকৃতি বেপরোয়া হলেও কৃষক সহ্য করে। ঈশ্বর নিষ্ঠুর হলেও কৃষক সহ্য করে। এই সহ্য করার শক্তিটা তাকে আবহমান করেছে এবং এই কাজ করার শক্তিটার মধ্যে দিয়ে কৃষক সবাইকে পরাস্ত করেছে। এই শক্তিটা তাই কর্কশ, লাবণ্যহীন, রুক্ষ কোমল। সুলতান এই শক্তিটার বিভিন্ন দিক বার বার এঁকেছেন। সেজন্য তাঁর কাজে

ভাস্কর্যের গুণ এসেছে : বিশাল এবং ওজনদার।

সুলতান তাঁর বিশাল এবং ওজনদার ফিগরসকল নিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছেন প্রাত্যহিক বাস্তবতা। প্রাত্যহিক বাস্তবতায় তাঁর কৃষকরা অনুপস্থিত, বুর্জোয়া রাজনীতির বাস্তবতায় তাঁর কৃষকরা অধস্তন। তিনি তিন ধরনের বাস্তবতা চ্যালেঞ্জ করে এই কৃষকের গ্রামের রুক্ষ কদর্য নিষ্ঠুর জীবন ছবির মধ্যে নিয়ে এলেন, ছবির মধ্যে কৃষকরা একটা আবাসভূমি খুঁজে পেলেন এবং এই আবাসভূমিকে তিনি বাসযোগ্য করে তুললেন কল্পনার নান্দনিক ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে। তাঁর ছবিতে কেউ একা নয়, সবাই যুক্ত, অনেক মানুষ গমগম করে। তাঁর কাজ তাই মূলত ভিড়, কিংবা অনেকের সঙ্গে এক সঙ্গে দেখার জন্য। এটা ভেবেই খুব সম্ভব তিনি তাঁর কাজ এমনভাবে নির্মাণ করেছেন। এক সঙ্গে দেখার কারণে সবাই অভিজ্ঞতার কোন না কোন অংশের মধ্যে মগ্ন হয়। এই মগ্নতার জন্য ব্যক্তিটি দর্শকের মধ্য থেকে একই সঙ্গে সুলতানের অভিজ্ঞতা এবং কৃষকের অভিজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যান। এই নিমজ্জনটাই সুলতান চেয়েছেন কিংবা সুলতানের কাজের বিশিষ্টতা। তিনি বার বার মনে করিয়ে দেন তিনি একা নন, তিনি কৃষকদের অভিজ্ঞতার মধ্যে মগ্ন এবং দর্শকরাও এই অভিজ্ঞতার মধ্যে মগ্ন হয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে যায়। তিনি নিজেকে পৌঁছে দেন কৃষকদের কাছে আর কৃষকদের মধ্যে। কৃষকদের অভিজ্ঞতা তাঁর এবং দর্শকদের মধ্যে।

কৃষকদের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের আবহমান অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত রূপ। এই অভিজ্ঞতার একদিকে আছে লাঞ্ছনা, বর্তমান। সুলতান চোখের মাধ্যমে এই বাস্তবতাকে ছিঁড়ে দিয়েছেন, বাস্তবতার পরবর্তী আয়তন উন্মোচন করার জন্য, যাতে আমরা দর্শকরা এই উন্মোচনের পিছনকার সত্যের সম্মুখীন হতে পারি। সত্যের সম্মুখীন হওয়ার মর্ম আতঙ্কের সম্মুখীন হওয়া। সেজন্য তিনি বার বার দেখিয়েছেন যে, দৃশ্যমান হচ্ছে মায়া, দৃশ্যমানতাই সবকিছু নয়, অদৃশ্যমানতার মধ্যে যে আতঙ্ক, তাকে মনে করিয়ে দেবার কৌশল মাত্র। সেজন্য কৃষক এবং তার কাজ দারিদ্রের যে চালচিত্র তৈরি করে তার পরপারে অন্য এক বাস্তব, অন্য এক সত্য আছে।

সুলতান পরিণত বয়সেই দৃশ্যমান বাস্তব এবং অদৃশ্যমান বাস্তবের মধ্যকার আয়না ভেঙ্গে ফেলেছেন, দেখেছেন শরীর ভগ্ন, বিকৃত, লাঞ্ছিত। কৃষক জীবনের বাস্তবতা যেন এক দিগন্ত বিস্তৃত অন্ধকার, সে অন্ধকার থেকে তিনি চোখ তুলে তাকিয়েছেন প্রতীয়মানতার ধ্বংসস্তূপের দিকে (তাঁর ব্রাশ স্ট্রোকের দিকে তাকালে তা বোঝা

যায়), শরীরের টুকরো টুকরো অংশ তুলে এনেছেন, জোড়া লাগিয়েছেন। একটা তমিস্রা লক লক করে ওঠে তাঁর কাজে; সুলতান দৃশ্যমানতার বিচ্ছিন্ন, বিকৃত, বিখণ্ডিত টুকরোগুলো দিয়ে কাজে মগ্ন হয়েছেন। এসব ভাঙ্গা টুকরো, সেজন্য আমরা এর পিছনকার পটভূমি দেখি; আমরা দেখি দারিদ্রের আবহমান অন্ধকার।

এই প্রক্রিয়ায় এবং এই প্রকাশিতব্যের মধ্যে দিয়ে সুলতান বাস্তবতাকে অভিজ্ঞতার মধ্যে আয়ত্ত করেছেন। এনাটমি তাঁর জন্য একটা অনাবশ্যক কাজ, এই কাজের সঙ্গে শরীরের বর্বর যন্ত্রণার কোন সম্পর্ক নেই। সুলতানের কাজের সম্মুখে আমাদের চোখ শরীরের অংশ থেকে অংশে, হাত থেকে পায়ে, হাঁটু থেকে কাঁধে ঘুরে বেড়ায়, যেন আমরা একটা সিনেমা দেখছি। আমরা মগ্ন হই বিভিন্ন দিকে, একই সঙ্গে; বিভিন্ন দিক একই সঙ্গে একটা সম্পূর্ণতা হয়ে আমাদের চোখ গ্রাস করে। নজির তাঁর শস্যক্ষেত্রে উৎসবের ছবি। সুলতান এঁকেছেন ক্ষেতের স্বর্গ থেকে উত্থিত তাড়িত সন্ত্রাস এবং ভয়ঙ্করতা। এক সার নারী তাদের শিশুদের নিয়ে সবুজ ধানক্ষেতের মধ্যে শয্যা পেতেছে, নারীদের শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আনন্দ এবং স্নেহ, তাদের হাতের পাশে শিশুরা কলরবে নিরাপদ। নারীদের, শিশুদের শস্যক্ষেত্রের এই আনন্দের মধ্যে তিনটি পুরুষ ফিগর তিন দিক থেকে উঠে এসেছে। তাদের পেশী ফোলা, তাদের শরীর ভয়ঙ্কর, তাদের চোখ নিষ্ঠুর, তারা রক্ষক কিংবা রক্ষা করছে একটা অসম্ভব। একটা ত্রাস তাদের শরীরে নারী শরীরের মোহনতার বিপরীতে, শিশু শরীরের মোহনতার বিপরীতে, শিশু শরীরের লাবণ্যের বিপরীতে। সুলতান এই তিনটি পুরুষ ফিগর এঁকেছেন ভয়ঙ্কর মগ্নতায়। তারা রক্ষক পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসের ঃ অসম্ভবের। তারা রক্ষক আবহমানকাল থেকে কৃষক, রমণী এবং শিশুদের ইজ্জতের, সেজন্য তারা অপেক্ষমাণ এবং হুঁশিয়ার সর্বনাশের বিরুদ্ধে, যে সর্বনাশ আবহমানকাল থেকেই দেখা দিয়েছে জমিদার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত, ক্ষমতাবানদের থেকে। সুলতান যেন বলছেন : ক্ষমতাবান যেন হাত না বাড়ায় রমণীর ইজ্জতের দিকে, শিশুদের কোলাহলের দিকে; গইয়ার মতো বলছেন : চিরকাল মানুষকে বলে যেও বর্বর না হওয়ার জন্য। ভালোবাসার এবং অন্ধকারের এক মহত্তম প্রকাশ সুলতানের এই কাজটি। এই তিনটি ফিগর যন্ত্রণায় উত্তোলিত, সুলতান তাদের রক্ষক করেছেন বাংলাদেশকে লুণ্ঠন থেকে বাঁচাবার জন্য; বাংলাদেশের লুণ্ঠিত নিসর্গের অভ্যন্তর থেকেই এই তিনটি ফিগর আবহমান উঠে এসেছে সর্বনাশের বিরুদ্ধে। এক অসম্ভবের রক্ষক তারা, সুলতানের এই তিন পুরুষ ফিগর।



পূর্ব বঙ্গের এক তরুণ শিল্পী

এস. আমজাদ আলী

এস. এম. সুলতানের ছবি বোঝার জন্য তাঁর জীবনের এ ঘটনাগুলো গুরুত্বপূর্ণ : তিনি তাঁর বাল্যকাল কাটিয়েছেন বাংলার গ্রামে-গঞ্জে। একজন বালক-বিস্ময় হিসেবে কলকাতার স্কুল অব আর্টস-এ তিনি কিছুটা প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, কিন্তু শিক্ষা শেষ না করেই তিনি স্কুল ছেড়ে দেন, এবং তারপর থেকে সারা উপমহাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বলা যায়, তিনি কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পাননি, তবে বিস্ময়ের দৃষ্টি দিয়ে তিনি আধুনিক শিল্পগুরুদের কাজের অনুকৃতি দেখেছেন, যদিও তারা যে প্রকরণগত এবং নান্দনিক বিপ্লবের প্রতিনিধিত্ব করে, তা তিনি বুঝতে পারেননি। তিনি পেন্সিল ও তুলি সম্বল করে কোনোক্রমে জীবন ধারণ করছেন, এবং নিজের ভরনপোষণের জন্য আর কোনো পেশা তাঁর জানা নেই। তিনি বাণিজ্যিক ছবি আঁকতে কখনো রাজি হবেন না। তাছাড়া বাণিজ্যিক কোনো কাজে হাত দেবার মত সুস্থিরতা তাঁর নেই। এর ফল হয়েছে এই যে, সারাজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে তিনি বসবাস করলেন, যদিও মাঝে মধ্যে সচ্ছলতার মুখ তিনি দেখেছেন, মাঝে মাঝে তিনি বেহিসেবীও হয়েছেন। যেহেতু তিনি যুদ্ধের সময় দিয়ে বেড়ে উঠেছেন, কাকতালীয়ভাবে তাই তাঁর ক্রেতাদের বড় অংশই এসেছে বৃটিশ সামরিক অফিসারদের মধ্য থেকে, যারা তাদের ভারত-বাসের স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে অনেক কিছুর সাথে তাঁর ছবি কিনে নিয়ে গেছে। এই বিদেশী শিল্প-প্রেমিক এবং শিল্পীদের

মধ্যে ঘুরাফেরা করে সুলতান তাদের ধ্যান ধারণা ও রুচির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এতক্ষণ যা বলা হল, তা কিন্তু এমন কোনো যুক্তির প্রস্তাবনা নয়, যা থেকে মাত্র একটি সিদ্ধান্তেই আসা যায়। বস্তুতঃ এ অবস্থায় থেকে একজন শিল্পী বিচিত্র অনেক ধারার ছবি আঁকতে পারেন। আমরা ধরে নিতে পারি যে সুলতান প্রাচীন মুঘল চিত্রকলার-অনুকরণে ছবি এঁকেছেন, কারণ যুদ্ধের সময় সংগ্রহযোগ্য হিসেবে এগুলোর উচ্চ মূল্য ছিল। তবে সুলতানের মধ্যে ছিল প্রকাশোন্মুখ একটি শিল্পী মন, যা যান্ত্রিক 'ছবি বানানো'তে আঁটকে থাকতে রাজি ছিলনা। প্রত্যেক শিল্পীই ছবি আঁকেন নিজেকে এবং তাঁর ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করতে। সুলতানের কাছে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি জরুরী হলেও এর মানে এ নয় যে, তিনি এমন একটি স্টাইল বেছে নেননি, যা তাঁর মেজাজের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ। সকল তরুণ শিল্পীর মত তিনি সেই তৈরি স্টাইলকে আঁকড়ে ধরেন, যা তাঁর ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে পারে। তবে তাঁর মধ্যে যখন এরকম একটি অতৃপ্তি জন্ম নেয় যে, তিনি যা বলতে চাচ্ছেন এসব স্টাইল তা ঠিকমত তুলে ধরতে পারছেনা, তখনি তিনি নিজের জন্য একটি আলাদা পথ তৈরি করে নেন। সুলতান ধীরে ধীরে এই পথেই এগুচ্ছেন।

সুলতানের সংগ্রহে পুরোনো কোনো কাজ নেই, কারণ তিনি সব ছবি বিক্রি করে দেন। সেজন্য আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয় পাকিস্তান সৃষ্টির আগে তিনি কি এঁকেছিলেন। তবে এটুকু জানি যে তিনি প্রচুর এঁকেছেন, এবং সেসবের বিষয়বস্তু জীবন। এরপর থেকে অবশ্য তিনি প্রধানতঃ নিসর্গ দৃশ্যই আঁকছেন—বাংলার এবং কাশ্মীরের, যদিও গত চার বছর তিনি কাশ্মীর থেকে দূরে, আর বাংলার বাইরে তিনি গত বারো বছর ধরে। তাঁর প্রায় সকল নিসর্গ চিত্রায়নই তাই স্মৃতি নির্ভর। এ জন্য, অনিবার্যভাবেই এসব ছবিতে আদর্শায়নের একটি প্রবণতা আসে, এবং তারা কিছুটা আবেগধর্মী হয়ে পড়ে, বিশেষ করে যখন স্থানীয় গ্রামীণ লোকজন ক্যানভাসে চলে আসে। এ উভয় বৈশিষ্ট্যই, আমি মনে করি, সুলতান অর্জন করেছিলেন যখন বিদেশী ক্রেতাদের জন্য তিনি ছবি আঁকছিলেন। তাছাড়া দ্রুত ছবি আঁকার সুবিধার জন্য স্টাইলটিও নিশ্চয় সেরকম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুলতানের ছবি আঁকার সাচ্ছন্দ্য অবিশ্বাস্য : তিনি কখনো দীর্ঘ সময় নিয়ে ছবি আঁকতে গলদঘর্ম হননা—হওয়া সম্ভবও হয়তো নয়। তাঁর অস্থিরচিত্ততাও এজন্য অনেকটা দায়ী। এর ফলে যা হয়েছে, তা হল : সুলতান কখনো সুচারুভাবে তাঁর ছবি শেষ করেন না এবং তাঁর বেশিরভাগ কাজই দ্রুত করা স্কেচ পর্যায়ের। শুধু ভাল কাজগুলিতে তিনি এক

ধরনের প্রভাববাদী ছাপ রাখেন।

স্টাইলের বৈচিত্র্য

সুলতানের কাজের বিশেষ গুণাবলী নির্ধারণের জন্য তাঁর কাজগুলি খুঁটিয়ে দেখা যাক। আমার মতে একজন দর্শককে যা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে তাঁর স্টাইলের বিস্ময়কর বৈচিত্র্য। প্রথমতঃ জলরঙে করা বাংলার নিসর্গ দৃশ্যের নরম, অনুচ্চকিত বর্ণবিন্যাস, যেখানে আকাশ ও পানির অবাধ বিস্তার, অদৃশ্য হতে থাকা দিগন্ত, নারিকেল গাছ এবং নৌকা, জেলে এবং ছবির মত কুটির—এক শান্তশ্রী গ্রামীণ পরিবেশকে ফুটিয়ে তোলে। অগভীর তরল এবং সমতল !

এরপর আছে কাশ্মীরের নিসর্গ চিত্রায়ন, যার অধিকাংশ তেল রং-এ করা, এবং সবই খুব রঙিন, বলা যায় উচ্চকিত বর্ণিল। এসব ছবিতে গভীর বেগুণী রঙের পর্বত, বিচিত্র ঝোপঝাড় এবং বৃক্ষ, হ্রদ ও নদী এমন এক চিত্র আঁকে যা বাংলার নিসর্গ দৃশ্যের একঘেঁয়ে বিস্তারের একেবারে বিপরীত।

এ দুই শ্রেণীর ছবিতেই একটি সাহিত্যিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় — আগ্রহ, বলা যায়, অ-শিল্পীসুলভ, কারণ তাতে উল্লেখযোগ্য বস্তু বা আকর্ষণীয় নিসর্গ চিহ্ন আঁকার পেছনে প্রধান কারণ হচ্ছে তাদের একটি পরিচিতি তুলে ধরা, —ফর্ম ও রঙের পঠন পাঠন হিসেবে তাদের শৈল্পিক মূল্য অন্বেষণ নয়, যা এসব বস্তুকে একটি উদ্দেশ্যমূলক বিন্যাসে সমন্বিত করতে পারত। সামগ্রিকভাবে, অথবা আলাদা আলাদা বর্ণনায়, প্রকৃত একটি কাঠামোর বিশ্বাসযোগ্যতা এসব ছবিতে অনুপস্থিত, কারণ তাৎক্ষণিক কোনো অবলোকন থেকে তারা সৃষ্ট নয়, এবং এসব নিসর্গদৃশ্য দ্রুত এক অতি সূক্ষ্ম বিস্তারে আবর্তিত হতে থাকে, যা বিশাল চিত্রতলে আলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে ছবির প্রধান বিষয়ে পরিণত করে।

অবশ্য সুলতানের কাজ শুধু এটুকু নয়। অনেক কাছে থেকে দেখা দৃশ্য আছে, জলরঙে করা নিসর্গদৃশ্য আছে যেখানে সতেজ সবুজ একটি ফসলের মাঠ, ঝোপঝাড় অথবা একটি নিঃসঙ্গ বৃক্ষ তাদের মনোমুগ্ধকর আলোছায়ার বিস্তার নিয়ে আমাদের আকর্ষণ করে। এসব ছবি তিনি এঁকেছেন পত্রপল্লব এবং ছায়ার ওপর বদলে যেতে থাকা রঙের সূক্ষ্ম প্রভাবকে মনে রেখে। এসব কাজে তিনি প্রদর্শন করেন এক অসামান্য উদ্দীপনা—কারণ এই বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার শুধু দক্ষতা ও শিল্প কুশলতা এবং একের পর এক ওয়াশ চড়ানোর সাবলীলতা থাকলেই চলবে না, তার সাথে থাকা চাই ব্যঞ্জনাধর্মী নানা কুশলী স্পর্শে ছবিকে সঞ্জীবিত করার সামর্থ্য, যা জীবন ও

গতিময়তার সকল কম্প্রমান তীব্রতা নিয়ে বাস্তবতাকে পুনর্নির্মাণ করতে মনকে সাহায্য করবে। একটি বৃক্ষের বৈশিষ্ট্যকে এভাবে শুধু যে অনেক চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তা নয়, বরং রেখা ও রং, আলো ও ছায়ার বিন্যাস হিসেবে এরকম একটি ছবি হয়ে দাঁড়ায় অনেক উন্নত শ্রেণীর।

উপরে বর্ণিত কাজে সুলতান তাঁর চিত্রতল, গন্তব্য এবং ফর্মকে ওলটপালট করে দেন রং ও বর্ণশ্রেণীর অন্তর্গত সুসঙ্গতির প্রতি প্রচন্ড আকর্ষণের জন্য : কিন্তু ছোট আকারের চমৎকার নিসর্গ দৃশ্যগুলিতে, বিশেষ করে যেগুলো তেল রং-এ এবং চাকু দিয়ে করা, এ কথা তেমন প্রযোজ্য নয়। এসব ছবিতে বিষয়ের নমনীয়তা সম্পর্কে গভীর ও উপরিতলের সম্পর্ক এবং মূল্যবোধের সার্বিক নির্মিতি সম্পর্কে তিনি অনেক বেশি সংবেদনশীল। এসব ছবিতে উপরিতল অপরিবর্তনশীল কোনো সমতল মাত্র নয়, বরং রঙের কিছু গাঢ়, পুরু, বাঙ্ময় প্রয়োগ এবং উচ্চনাদী বর্ণবিন্যাস এদের বৈশিষ্ট্য। একই রঙের নানা মাত্রা সংবেদনশীলতার সাথে পাশাপাশি বিন্যস্ত হয়েছে যাতে একটি সজীবতার আবহ তৈরি হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন রং চড়িয়ে একটি বিশ্বাসযোগ্য কাঠামো এবং একই সঙ্গে ত্রুটিহীন একটি সাঙ্গীতিক সুষমাও তৈরি করেছেন শিল্পী। সেজান যেমন বলেন, "রং যখন তার সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যায়, ফর্ম ও তখন তার শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করে।" এসব ছবিতে শুধুমাত্র সাহিত্যিক আগ্রহ বলে কিছু নেই। পাহাড় ও উপত্যকা, পাথর ও বৃক্ষ, ফর্ম ও রং-কে বোঝার এবং ব্যক্তিত্ব প্রকাশের একটি উপায় মাত্র। উপরের মন্তব্যগুলি সুলতানের সেইসব জলরঙের ছবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে তিনি ছাড়া ছাড়া, স্কেচধর্মী স্টাইলের পরিবর্তে অনেক বেশি সুসম্পন্ন (যদিও প্রভাববাদী) ধরনের চর্চা করেছেন, যেমন তাঁর সমৃদ্ধ এবং পরিপক্ক হেমন্ত দৃশ্যের ছবিটিতে, যে ছবিকে আমি তাঁর একটি মাস্টারপিস হিসেবে বিবেচনা করি। এ ছবির মডেলিং চমকপ্রদ, এর বর্ণ বিন্যাসে সুমিতি উল্লেখযোগ্য এবং এর নক্সাটি তৃপ্তিদায়ক। এর বাস্তব ভিত্তিটিও অবহেলিত নয়। এ ধরনের স্টাইলের নিচের সারিতে আছে আরেকটি কাশ্মীর দৃশ্যের ছবি, যার নক্সাটিই চোখে পড়ে প্রথমে। তবে আখরোট গাছের নিচে কাশ্মীরি মেয়েদের ছবিটি চমৎকার। গাছটির পত্রপল্লব কিছুটা রীতিবদ্ধ—সুলতানের ছবিতে এসব কখনো বাস্তবধর্মী হয়না—কিন্তু গুঁড়িটি তার ঘন বলিষ্ঠতার জন্য এক ধরনের স্থাপত্যধর্মিতা লাভ করেছে। হয়তো কখনো তাঁর হাতে যখন সময় ছিল, সুলতান দীর্ঘক্ষণ খুঁটিনাটি পরীক্ষা করেছেন এবং ভাসমান প্রভাবনিচয় থেকে দূরে পরস্পর গ্রথিত অন্তর্দৃষ্টির বলয়ে প্রবেশ করেছেন। এর ফলে কাশ্মীরের হেমন্তদৃশ্যের এক অসাধারণ পট তিনি এঁকেছেন যেখানে একটি বজরা নৌকা সামনের অঞ্চলটি দখল করে আছে। এ ছবির

নক্সাটি অপূর্ব—গাছের আঁকাবাঁকা ডালপালার সমৃদ্ধ বিস্তার প্রায় প্রতীকী একটি তাৎপর্য তুলে ধরে। স্পেস বা দেশ নিয়ে যে নির্মিতি এ ছবিটিতে দেখা যায় তার দক্ষতা এবং বাস্তবতা প্রশ্নাতীত। তাড়াহুড়ায় করা স্কেচ এবং অনেক পরিশ্রমে শেষ করা কাজের মাঝামাঝি একটি সুমিতি অর্জন করে এ ছবিটি, যা একটি অ-প্রভাববাদী ছবিকেও আধুনিক শিল্পের অনুরাগীদের জন্য সুখকর একটি অভিজ্ঞতায় পরিণত করে।

তবে এ কথাটি অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, সুলতান শুধুমাত্র নিসর্গ দৃশ্যের চিত্রী নন। তিনি মানুষের ফিগার নিয়ে অনেক চমকপ্রদ কাজ করেছেন, এবং আমি তাঁর ড্রাইপয়েন্ট স্কেচ এবং ক্র্যায়নে করা বড় কাজ দেখেছি, যাদের উঁচুমাত্রার কাজ বলে আমার মনে হয়েছে। তবে আমার জন্য একটি চমৎকার বিস্ময় ছিল সম্প্রতি করা তাঁর দুটি বিশাল প্যানেল, যেগুলি ভীড়াক্রান্ত উদ্বাস্তু এবং দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষজনে। মানুষের ফর্ম তিনি যেভাবে আঁকেন, তার প্রশংসা করতেই হয়। তাঁর কম্পোজিশনও বিস্ময়কর। মানুষের ফিগার আঁকতে গিয়ে তিনি যে কঠোরতা নিয়ে রেখা নির্বাচন করেছেন, পুরো কম্পোজিশনের বিশালতা এবং সপ্রতিভতা এবং সর্বোপরি এসব প্যানেলের মানবিক আগ্রহ এবং ট্র্যাজিক চেতনা আমার কাছে তাঁর বেড়ে ওঠা এবং পরিপক্কতার অভ্যর্থনাযোগ্য চিহ্ন বলে মনে হয়েছে। আমার বিশ্বাস প্রকরণ ও কৌশলগত ক্ষেত্রে সুলতান সাফল্য অর্জন করেছেন। এখন তাঁর যা প্রয়োজন তা হল, মহৎ ধ্যান-ধারণার সঙ্গে এবং জীবন ও শিল্পের কিছু সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয়, যা তাঁকে তুলনাহীন শিল্পসৃষ্টিতে সাহায্য করবে। আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিনিয়োগ কার্যক্রমের অধীনে আমেরিকায় তাঁর বর্তমান ভ্রমণ এদিক দিয়ে একটি সঠিক পদক্ষেপ যা তাঁর জন্য হয়তো সুফল বয়ে আনবে।

পাকিস্তান কোয়ার্টার্লি, জানুয়ারি ১৯৫২ তে প্রকাশিত ইংরেজি নিবন্ধের অনুবাদ।



সুলতানের শিল্পকর্ম

নজরুল ইসলাম

ঢাকার শিল্পরসিকদের কাছে, বিশেষ করে তরুণদের কাছে, এস. এম. সুলতান এক আশ্চর্য প্রতিভা হিসেবে আবির্ভূত হন শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত প্রথম জাতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনীতে (১৯৭৫)। পঞ্চাশ দশকের প্রতিভাবান শিল্পী সুলতানের শিল্পকর্মের সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের কম দর্শকেরই পরিচয় ছিল[১]। তারপর ১৯৭৬-এর সেপ্টেম্বরে একাডেমী গ্যালারীতে সুলতানের ৭৫টিরও বেশী চিত্রকর্ম নিয়ে যে একক প্রদর্শনী[২] হয়, তার মাধ্যমে তিনি ঢাকার সাধারণ শিল্পরসিকদের রীতিমত চমৎকৃত করেন। শিল্পবোদ্ধাদের কেউ কেউ তাঁর ভক্ত ও নিত্য সহচর হয়ে পড়েন। জনপ্রিয়তার কারণেই শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এবং কামরুল হাসানের পাশাপাশি সুলতানের নামও স্থান পেতে থাকে। প্রধানত তাঁদের চিত্রকলার বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই তিন শিল্পীকে একসাথে স্মরণ করা হয়, শুধু বয়োজ্যেষ্ঠতার জন্য নয়। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য এই তিন শিল্পীর কাজ প্রায় অভিন্ন — পল্লীবাংলার শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের জীবন ও সংগ্রামই এঁদের ছবির প্রধান বিষয়বস্তু। তিনজনের শিল্পশৈলী ভিন্ন হলেও মূলত বাস্তবভিত্তিক। অবশ্য জয়নুল আবেদিন এবং কামরুল হাসান, উভয়েই সুলতানের তুলনায় প্রচলিত অর্থে অনেক বেশি ব্যাকরণসিদ্ধ আধুনিক ছবি এঁকেছেন। সুলতান সম্ভবত ইচ্ছাকৃতভাবেই অনাধুনিক বা 'নাইভ' প্রকৃতির ছবি আঁকেন। তিনজন শিল্পীর মধ্যে আরেক ধরনের পার্থক্য আছে। জয়নুল আবেদিন এবং কামরুল হাসান এদেশের বৃহত্তর সাংস্কৃতিক

আন্দোলনে, বিশেষ করে শিল্পকলার প্রতিষ্ঠান প্রবর্তনে, যে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন বা রাখার সুযোগ পেয়েছেন, সুলতান সে অবদান রাখার সুযোগ পাননি। তিনি আন্দোলন করেছেন ভিন্ন ধরনের, প্রায় এককভাবে গ্রামীণ পরিবেশে শিশুদের নিয়ে। আরেকটি বিষয়ে কিছুটা অবাক হতে হয়। ১৯৭৬-এ সুলতানের আলোড়ন সৃষ্টিকারী একক প্রদর্শনীর পর আজ প্রায় তিন যুগ পার হয়ে গেল ; এদেশের অন্য কোনো শিল্পীর কাজে সুলতানের শিল্প বৈশিষ্ট্যের তেমন কোনো প্রভাব চোখে পড়ল না, তেমন কোনো শৈল্পিক অনুসরণও নয়। তা হলে তাঁর স্টাইল কি শিল্পীদের কাছে তেমন গ্রহণীয় নয়? অপেক্ষাকৃত তরুণ শিল্পীরাও এখন সমাজ বাস্তবতার ছবি আঁকছেন, কিন্তু সুলতানের আঙ্গিকের নয়। শাহাবুদ্দিনও এদেশের বিপন্ন মানুষের ছবি আঁকেন, সংগ্রামী মানুষেরও ছবি, এবং সেখানেও মানুষ, বিশেষত পুরুষ, বাস্তবভঙ্গিতে আঁকা, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে। বাংলাদেশের আরো অনেক তরুণ শিল্পী বর্তমান সমাজ ও মানুষ নিয়ে ছবি আঁকছেন, তাঁদের ছবির আঙ্গিক ভিন্ন। প্রধানত আধুনিক, প্রতীকী, আধাবিমূর্ত, স্যাটারিকাল। এস. এম. সুলতানের সাম্প্রতিক চিত্রকলার আঙ্গিকগত ও বক্তব্যগত বিশিষ্টতা সম্পূর্ণভাবেই উপলব্ধি করা গেছে তাঁর ১৯৭৬-এর একক প্রদর্শনীতে। পরবর্তী তিন দশকে তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহ তেমনভাবে পরিবর্তিত হয়নি বরং আরো জোরালো হয়েছে। কর্মী মানুষ, উৎপাদনকারী মানুষ, অর্থনৈতিক ভিত্তির মূল স্থপতি যে মানুষ, এরাই সুলতানের চিত্রকলার মূল নায়ক-নায়িকা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই মানুষ যে কৃষক ও কৃষক পরিবার, এই প্রত্যয়টি অতি স্বচ্ছ সুলতানের কাছে। বাংলার কৃষক ও অর্থনীতি যে এখনও মূলত প্রকৃতি নির্ভর, এই সত্যও সুলতানের কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার। উৎপাদনের মূল উপাদান জমি, আর তাই জমিকে দখলে রাখার জন্য কৃষকদের নিজেদের মধ্যে লড়াই অনেক বেশি গুরুত্ব পায় সুলতানের ছবিতে, ভাষার জন্য লড়াইয়ের চাইতে। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, সম্ভবত তাও দূরবর্তী বিষয় মনে হয়। যে জমি একেবারেই নিজস্ব জীবনধারণের জন্য, তার ওপর দখলদারিত্বই প্রাধান্য পায়। হয় এইসব কারণে, তা নাহলে গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে ব্যক্তিগত নস্টালজিয়ার জন্যই সুলতানের ছবিতে গ্রামীণ জীবনের চিরন্তন রূপ (অথবা কিছুটা অতীত বাস্তবতা) বেশি প্রাধান্য পায়।

১৯৮৭ সনের এপ্রিল-মে তে ঢাকার জার্মান কালচারাল ইন্সটিটিউটে এস. এম. সুলতানের শিল্পী জীবনের বিভিন্ন সময়ের কাজের নমুনা এবং মধ্য আশির অনেকগুলো পেইন্টিং এবং ড্রইং নিয়ে এক বিরাট একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। নিঃসন্দেহে ঢাকার চিত্রকলা জগতে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রদর্শনীতে

একশরও বেশি কাজ ছিল। এতে যেমন স্থান পেয়েছিল তাঁর আঁকা পঞ্চাশের দশকের আকর্ষণীয় নিসর্গদৃশ্য (বন); তেমনি প্রদর্শনীর সময়ে আঁকা ড্রইং। খুব ছোট ছবি এবং বিরাট বিরাট প্যানেল। সম্ভবত এতগুলো এত বড় মাপের তেলরঙ ছবি এদেশের কোনো শিল্পীই কখনও প্রদর্শন করেন নি। হয়তো আঁকেনও নি। এই একটি কারণেও প্রদর্শনীটি স্মরণীয়।

সুলতানের ছবির একটি বৈশিষ্ট্য বাংলার কৃষকের শরীরকে অস্বাভাবিকভাবে পেশীবহুল, বিশাল ও শক্তিশালী করে দেখানো। অথচ বাঙালী কৃষকের মতো শীর্ণ, দুর্বল দেহ পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যাবে কিনা সন্দেহ। এই দুর্বলদেহ চাষী সুলতানের কাছে অসম শক্তির অধিকারী। অন্ততঃ তাই হওয়া উচিত, হোক, এটাই তিনি চান। যখন দেখি শীর্ণদেহী ষাট-উত্তর এক শিল্পী সুলতানকে এবং তাঁর হাতেই আঁকা পঁচিশ তিরিশ ফুট দীর্ঘ এবং পাঁচ সাত ফুট প্রস্থ-বিশিষ্ট বিশাল পটভূমিসহ ক্যানভাসে অসংখ্য ফিগারসমূহ জীবন্ত তেলরঙে, তখন বুঝতে তেমন কষ্ট হয় না কেন সুলতান আপাতশীর্ণ বাঙালীকে এত শক্তিশালী করে দেখাতে ভালবাসতেন। শক্তি আসলে ভেতরের, শুধু বাইরের নয়।

সুলতান প্রথম বয়সে অত্যন্ত প্রতিভাবান নিসর্গ শিল্পী ছিলেন, তাঁর পুরাতন কাজে এটা যেমন পরিষ্কার তেমনি আশির দশকেও যে তিনি জলরঙে চমৎকার নিসর্গ-দৃশ্য রচনায় পারদর্শী, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে ১৯৮৭-র প্রদর্শনীতে। পঞ্চাশের দশকে আঁকা সুলতানের কয়েকটি নিসর্গ চিত্রের কথা আলোচনা করা যায় : এরকম দু'টি ছবির অনুলিপি পাওয়া যায় জালাল উদ্দিন আহমেদ রচিত পাকিস্তান পাবলিকেশন্স্ প্রকাশিত *Art in Pakistan* (তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৪) গ্রন্থটিতে[৩]। দুটো ছবিই তেলরঙে, সম্ভবত যশোহর এলাকার নিসর্গ দৃশ্যভিত্তিক। একটিতে গাছেঢাকা কাঁচা সড়ক ধরে এগিয়ে যাচ্ছে একটি গরুর গাড়ী। অনুলিপিটি সাদাকালোয়। অন্যটিতে ছোট বাঁকা নদীর ধারে গাছের নীচে বসে আহার এবং বিশ্রামরত জনাচারেক দরিদ্র গ্রামবাসী। দুটো ছবিরই কম্পোজিশন সুষম। যদিও দ্বিতীয় ছবিতে কেন্দ্রীয় ফোকাস কিছুটা অনিশ্চিত। অঙ্কনরীতি ভ্যান গগীয় ইম্প্রেশনিস্ট। রঙ নির্বাচন এবং তুলির স্ট্রোকের ধরন স্পটতই এরকম ধারণাই দেয়। দ্বিতীয় ছবিটি সুলতানের তখনকার দিনের দার্শনিক চিন্তারও পরিচায়ক কিছুটা। নিসর্গ প্রাধান্য পেয়েছে ছবিটিতে। মানুষ সেখানে গৌণ ভূমিকায় অবতীর্ণ। আশপাশের গাছপালার তুলনায় আনুপাতিকভাবে অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকারে উপস্থাপিত হয়েছে মানুষ। সুলতানের পরবর্তী পরিণত পর্যায়ের

শিল্পদর্শনে এর উল্টোটাই লক্ষণীয়, নিসর্গ সেখানে গৌণ, মানুষই বিপুলভাবে মুখ্য। তৃতীয় একটি নিসর্গ চিত্রের রঙিন অনুলিপি রয়েছে ১৯৮৭ সনে জার্মান কালচারাল ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত সুলতানের একক প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগে। এটি একটি বিশুদ্ধ নিসর্গদৃশ্য। প্যাস্টেলে আঁকা। বিষয়, তিনটি গাছ। ছবিতে কোনো জন-প্রাণী নেই। চমৎকার ইম্প্রেশনিস্ট ধারার ছবি। ছবিতে শিল্পীর নাম সাক্ষর নেই, তারিখও নেই। আলাদা করে দেখালে সুলতানেরই ছবি, এমন সনাক্ত করা কিছুটা কঠিন হতে পারে।

বড় মাপের তেলরঙে যে সব ফিগার তিনি ব্যবহার করেন সেগুলো যে অনুপাতহীন বা ড্রইং বিকৃত, তা যে নেহাৎই ইচ্ছাকৃত, সেটাও প্রতীয়মান হয় তাঁর সাম্প্রতিক বেশ কিছু পোর্ট্রেট ড্রইং থেকে। মার্কার পেন অথবা পেন্সিলে আঁকা এসব প্রতিকৃতিতে ড্রইং অনবদ্য। সুলতানের প্রধান ছবিগুলোর বৈশিষ্ট্য বিষয়গত দিক থেকে ঘটনা-নির্ভরতা। এই ঘটনাসমূহ হতে পারে ফসল বোনা, ফসল তোলা, গোলায় শস্য তোলা অথবা চরদখল বা জমিদখল নিয়ে গোত্রীয় কলহ। কৃষিকাজ ও গৃহস্থালী বিষয়ক আরো অনেক বিষয়ও স্থান পেয়েছে তাঁর ক্যানভাসে। তাছাড়া চিরন্তন গ্রামীণ দৃশ্যাবলী, যেমন : স্নানরতা মহিলারা, কেশবিন্যাসে বা মাছ কুটতে ব্যস্ত মহিলারা, এই সব। সাম্প্রতিক কাজে ঝড়, বন্যা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপন্ন গ্রামবাসীদের দৃশ্যও গুরুত্ব পেয়েছে। তবু বলতে হয়, বিষয়বস্তু নির্বাচনে একটি প্রধান গণ্ডীর মধ্যেই তিনি অবস্থান করেন আর এই বিষয় হলো, কৃষক ও কৃষক পরিবার। অঙ্কন-শৈলীতে সুলতান মূলতই পাশ্চাত্য ধারার শিল্পী এবং বিভিন্ন কারণে তাঁর ছবি ভ্যান গগ, পল গঁগা অথবা পাবলো পিকাসোর কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর বেশ কিছু ছবিতে (যেমন 'ধান ক্ষেতে কৃষক', 'ধান মাড়াই', 'গোলায় ধান তোলা') হলুদ রংয়ের প্রাধান্য এবং তুলির স্ট্রোক এই দুই কারণেই তাঁকে ভ্যান গগের কাছাকাছি মনে হয়। আবার 'মাছ কোটা' কিংবা 'ঝড়ের পরে' ধরনের ছবিতে রঙের বৈশিষ্ট্য (গাঢ় সবুজ, মিশ্র লাল, খয়েরী, বেগুনী) এবং নারীমুখের আদল (বিশেষত 'মাছ কোটা' ছবিতে) পল গঁগার কাজের সাথে কিছু সাদৃশ্য তুলে ধরে। 'মাছ কোটা' ছবিটি (মা ঘরে বসে বড় বটিতে রুই মাছ কাটছে, মেয়ে, ছেলে ও বিড়াল সামনে বসে সাগ্রহে দেখছে, পেছনে গাভী এবং বাছুর) একাধারে কালিঘাটের পট এবং পল গঁগার ছবির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সুলতানের কিছু কিছু ছবিতে তাঁর অত্যন্ত নিজস্ব একটি রঙ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। বিশেষ করে 'জমিদখলে কৃষকদের কলহ' শীর্ষক ছবিগুলোতে এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলোতে রঙ প্রধানত মেটে সবুজ (ভূমি) এবং বাদামী ও খয়েরী (মানুষের



শাপলা তোলা   তেল রং   ১৯৭৬



পাট ও চাষী   তেল রং   ১৯৭৬

অবয়ব এবং বর্শা, ঢাল) মিশ্র-চাপা প্রকৃতির রঙ।

সুলতানের চিত্রকর্ম দেখে পিকাসোর কথা মনে হতে পারে। উভয়ের কাজে মানুষকে বিশাল মূর্তিতে চিত্রিত করার প্রবণতাটি লক্ষণীয়। অবশ্য পিকাসোর ক্ষেত্রে এই প্রবণতা ছিল সাময়িক। প্রসঙ্গত পিকাসোর 'উৎস' (১৯২১) ইত্যাদি ছবির কথা স্মরণীয়। মহিলাদের অত্যন্ত মনুমেন্টাল সব উপস্থাপন। পিকাসোর ছবিতে মহিলা চরিত্র হয় অবসরে উপবিষ্টা অথবা বিনোদনে শায়িতা। সুলতানের ছবিতে নারী-পুরুষ প্রায় সময়েই কর্মে এবং উৎপাদনে নিয়োজিত। কর্মী মানুষই সুলতানের মুখ্য চরিত্র।

সুলতানের ছবিতে মানুষের সাথে জন্তুর উপস্থিতি, বিশেষত গরুর ছবি, পিকাসোসহ অন্যান্য শিল্পীর ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। জয়নুল আবেদিন কিংবা কামরুল হাসানও বিভিন্নভাবে তাঁদের ছবিতে গরুকে প্রধান্য দিয়েছেন। এম. এফ. হোসেন ঘোড়াকে দিয়েছেন এক আশ্চর্য প্রতীকী স্থান। তরুণ শাহাবুদ্দিনও কুকুর, ঘোড়া ও গরুকে এনেছেন মানুষের পাশাপাশি। সুলতানের কাজে গরু অত্যন্ত প্রাত্যহিক বাস্তব ও সামাজিক প্রতীক। অন্যদের ক্ষেত্রে প্রধানত নান্দনিকভাবে প্রতীকী।

সুলতান মানুষের শরীর আঁকেন পেশীবহুলতা দেখিয়ে। সাধারণত পরিলেখ বা কন্টুর রেখা ভেঙে ফেলা হয়। পুরুষ-অবয়ব অঙ্কনে মাইকেলএঞ্জেলীয় ভাব থাকলেও পেশী প্রদর্শনের অতিরঞ্জন রয়েছে। এটা সুলতানের ইচ্ছাকৃত এবং তাঁর ছবির বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ মুখ প্রফাইলে আঁকা, অথচ তাদের শরীর দেখানো হয় সামনে বা পেছন থেকে। কোন কোন ছবিতে ভঙ্গি প্রায় ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যহীন। এমনকি পৌনঃপুনিকভাবে একই। নারীদেহ সুগঠিত তবে কমনীয়। দেহের পরিলেখ দীর্ঘ, কোমল ; অনেকটা ধ্রুপদী ভারতীয় চিত্রকলার নারীদেহের মতো। এমনকি এরকম ছবি যেখানে পুরুষ ও নারী উভয়ের একাধিক অবয়ব এসেছে, সেখানে পেশীবহুল পুরুষের পাশাপাশি কোমল নারীদেহ যেন পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দুই রীতির ড্রইং-এর সুন্দর সমাবেশ ঘটিয়েছে।

সুলতানের চিত্রকলার অন্যতম প্রধান চমৎকারিত্ব তাঁর রঙ নির্বাচন ও প্রয়োগকৌশল (যদিও একথা তাঁর সব ছবির জন্য প্রযোজ্য নয়)। নানা ধরনের হলুদ, সবুজ, নীল এবং লাল তিনি ব্যবহার করেন। সামগ্রিক রঙ বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল। বেশ কিছু ছবিতে খয়েরী এবং বাদামীর প্রাধান্য ; বৈপরীত্য কম ; যে কারণে এসব ছবির সাদা-কালো রিপ্রোডাকশন দেখে ছবির স্বাদ একেবারেই পাওয়া যায়না। মূল ছবি কিংবা কমপক্ষে উত্তম রঙিন রিপ্রোডাকশন দেখাই বাঞ্ছনীয়।

সুলতানের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ছবি ব্যাপক গ্রামীণ বিষয়বস্তু নিয়ে। প্রায় প্যানেল চিত্র ধরনের। অনেক ছবিতেই কেন্দ্রীয় ফোকাস জাতীয় কিছু থাকে না। আলোছায়ার সাধারণ ব্যাকরণও অনেকক্ষেত্রে মানা হয় না। পারস্পেকটিভের বেলাতেও নিয়মভাঙার উদাহরণ লক্ষণীয়। এসবই সম্ভবত: শিল্পীর ইচ্ছাকৃত। এবং এসব সত্ত্বেও চূড়ান্ত পর্যায়ে-সুলতানের চিত্রকলা শিল্পরসজ্ঞ ও সাধারণ, উভয় পর্যায়ের দর্শককেই আকৃষ্ট করে, আন্দোলিত করে। শিল্পকলার অন্যতম উদ্দেশ্য যদি হয় জীবনকে সমৃদ্ধ করা, নিঃসন্দেহে সুলতানের চিত্রকলা সে উদ্দেশ্য অনেকটাই বাস্তবায়ন করে। মহৎ বক্তব্য এবং চমৎকার (যদিও অপ্রথাসিদ্ধ) চিত্রশৈলীর কারণে সুলতান এক অনন্য শিল্পী। গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী। তাঁর ভিন্নধর্মী ও নির্মোহ ব্যক্তিত্বের কারণেও অবশ্য তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং আকর্ষণীয়।

সুলতানের ১৯৭৬-এর প্রদর্শনীতে যেমন তেমনি ১৯৮৭'র প্রদর্শনীতে দেখা গেছে, বেশ বড় বড় কাজেও তিনি স্বল্পস্থায়ী চিত্রাঙ্কন উপাদান ব্যবহার করেছেন। কখনো কখনো তাঁর ছবির ক্যানভাস উন্নতমানের নয়। মাঝে মধ্যে তিনি নিজেই ছবির জন্য রঙ তৈরি করতেন। এসব রঙ শেষ পর্যন্ত হয়তো স্থায়ী হয়না। ইংরেজ শিল্পী উইলিয়াম ব্লেকও এরকম করতেন। তাঁর অনেক ছবিই কালক্রমে নষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্য শিল্পীদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যারা তাঁদের শিল্পকর্মের স্থায়ীত্বের ওপর গুরুত্ব দেন না, তাঁদের কাছে আঁকাটাই প্রধান, ছবির প্রদর্শন বা স্থায়ীত্ব ততটা নয়।

সুলতানের ১৯৭৬-এর একক প্রদর্শনীর পর থেকে তাঁর ছবির পৃষ্ঠপোষকতা বা সমঝদারিতে প্রচণ্ড রকম পরিবর্তন এসেছে সন্দেহ নেই। ১৯৮৭'র প্রদর্শনীতে তাঁর বড় বড় ছবি বেশ উঁচুদামে বিক্রী হয়েছে। ব্যক্তিগত সংগ্রহে ভাল দামে শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ কাজ চলে যাচ্ছে ভাল কথা, তবে সাধারণ মানুষের ছবি যেন সাধারণ মানুষ সবসময় দেখার সুযোগ পায় সেজন্য গণভবনসমূহেও (পাবলিক বিল্ডিং অর্থে) যেন এ ধরনের ছবি স্থায়ী স্থান পায় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে একটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী চিত্রকলা সংগ্রহ রয়েছে তা হলো জাতীয় যাদুঘরের সংগ্রহটি। এখনো এই সংগ্রহে সুলতানের কোনো ছবি স্থান পায়নি। তথ্যটি বিস্ময়কর। এক্ষেত্রে যাদুঘর কর্তৃপক্ষ যেমন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, সুলতান অনুরাগী কোটিপতি শিল্পরসিকরাও তেমনি উদাসীনতার উদাহরণ রেখেছেন। তাঁদের যে কেউ অন্তত সুলতানের একটি শ্রেষ্ঠ ছবি জনগণের জন্য জাতীয় যাদুঘর সংগ্রহে দান করতে পারতেন। অনেক শিল্পরসিক নামমাত্র মূল্যে অথবা বিনা মূল্যে সুলতানের ছবির মালিক হয়েছেন। জাতীয় স্বার্থে তাদের মধ্যে

দুয়েকজন প্রয়োজনে এগিয়ে আসতে পারেন। জয়নুল ও কামরুল সংগ্রহের মতো করে জাতীয় যাদুঘরে সুলতানের বাছাই করা কিছু ছবির একটি বিশেষ সংগ্রহ দাঁড় করানো উচিত। অথবা প্রস্তাবিত জাতীয় চিত্রকলা সংগ্রহশালায় এরকম কিছু করা উচিত হবে। সাধারণ মানুষের কাছে সুলতানের ছবির প্রচণ্ড আবেদন আছে বলে মনে করা যায়। তাঁর (এবং জয়নুল আবেদিন এবং কামরুল হাসানের) চিত্রকলার প্রকৃতিই এমন যে এগুলোকে শুধু গ্যালারীর দেয়ালে সীমিত না রেখে, গুরুত্বপূর্ণ গণভবনসমূহে দেয়াল-চিত্র হিসেবে রূপান্তর করা যায়। এ প্রসঙ্গে ১৯৭৬ সনে এদেশে সুলতানের প্রথম একক চিত্রপ্রদর্শনীর ওপর লেখা এবং *গণসাহিত্যে* প্রকাশিত আমার একটি নিবন্ধের অংশ বিশেষের পুনরোল্লেখ করছি : "সুলতানের চিত্র ফ্রেস্কো অথবা দেওয়াল চিত্রে রূপান্তরিত করবার জন্য অত্যন্ত উপযোগী এবং সামাজিক অর্থে উপকারী হবে বলেই আমার ধারণা। জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসানের মতই সুলতান বাংলাদেশের গণমানুষ ও গণজীবনকে অত্যন্ত দরদের সাথে ও শৈল্পিক উৎকর্ষতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এই তিন শিল্পীর চিত্রকলার উপর ভিত্তি করে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারী ভবনসমূহে দেওয়াল চিত্র বা ফ্রেস্কো চিত্র তৈরি করলে জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করা হবে।"[৪]

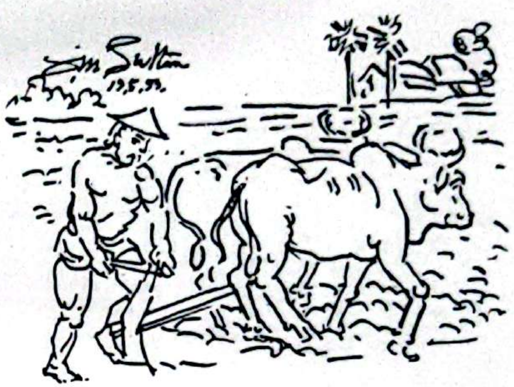
তথ্যসূত্র :

১. ১৯৭৪ সনে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের *চিত্রশিল্প : বাংলাদেশের* শীর্ষক উল্লেখযোগ্য বইটিতে জয়নুল আবেদিন থেকে শুরু করে নিতুন কুণ্ডু পর্যন্ত ১৬ জন সমকালীন শিল্পীর ওপর আলোচনা স্থান পেয়েছে, কিন্তু এস. এম. সুলতান সেখানে অনুপস্থিত। ১৯৭৫-পূর্ব সময়ের অন্যান্য লেখালেখিতেও এরকম পরিস্থিতি লক্ষ করা গেছে।

২. নজরুল ইসলাম, "সুলতান : সামাজিক বাস্তবতার শিল্পী", *গণসাহিত্য*, পঞ্চম বর্ষ ১-৩ সংখ্যা, ভাদ্র-কার্তিক, ১৩৮৩ (নভেম্বর, ১৯৭৬)।

৩. Jalal Uddin Ahmed, *Art in Pakistan*, 3rd Edition, (Karachi : Pakistan Publications, 1964).

৪. নজরুল ইসলাম, "সুলতান: সামাজিক বাস্তবতার শিল্পী", **গণসাহিত্য**, পঞ্চম বর্ষ ১-৩ সংখ্যা, ভাদ্র-কার্তিক, ১৩৮৩ (নভেম্বর, ১৯৭৬)।

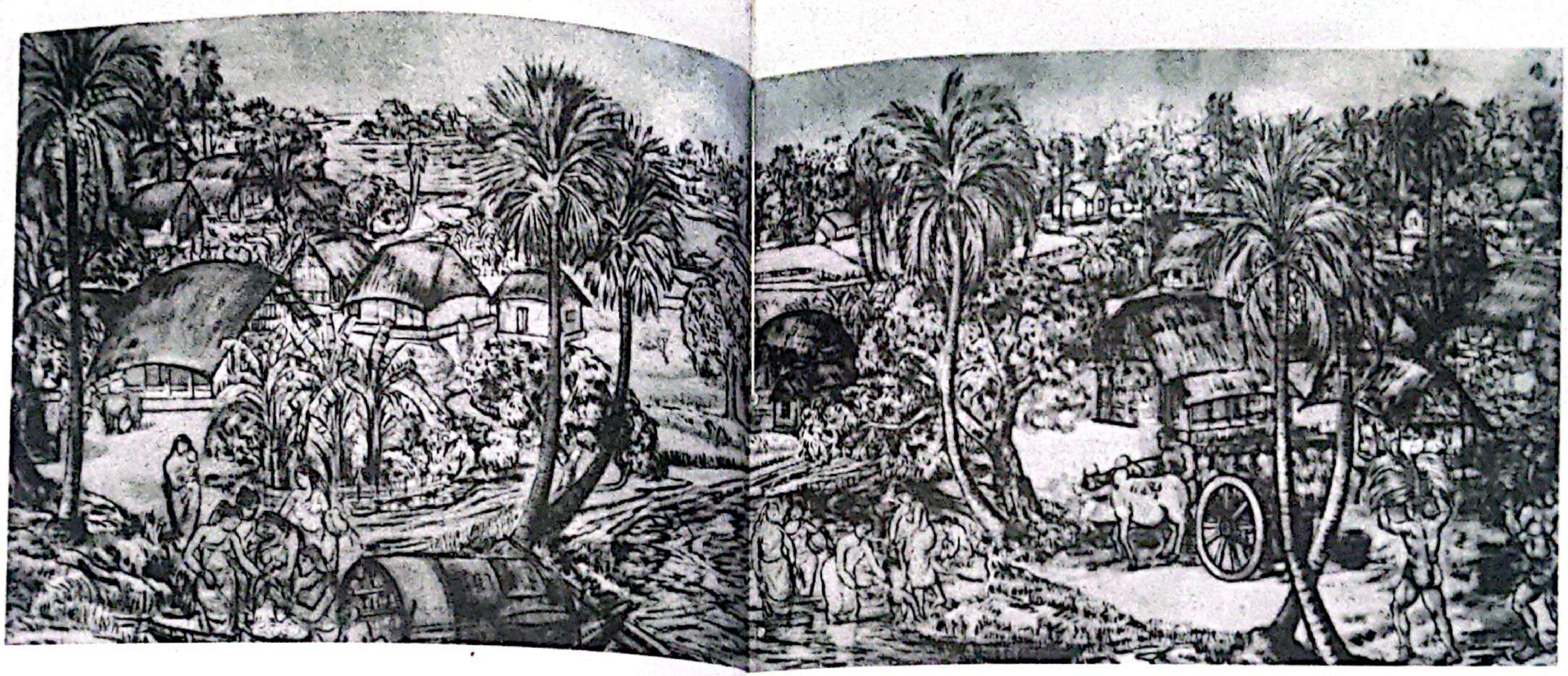


সুলতান ভাই কিছু স্মৃতিকথা

সৈয়দ জাহাঙ্গীর

কিছু কিছু ব্যক্তি থাকেন যাঁরা মুহূর্তের সাহচর্যে অন্যকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করেন, আকৃষ্ট করেন, সম্মোহিত করেন। এমনি এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন শিল্পী এস.এম. সুলতান। আমাদের সুলতান ভাই। জীবন, জীবন-যাপন, জীবন-যাপনের উপকরণ সম্পর্কে যাঁর ছিল অপরিসীম নির্লিপ্ততা। অন্যদিকে সামাজিক অধঃপতন, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সর্বোপরি এদেশের দিশেহারা কোটি অসহায় মানুষের প্রতি সহমর্মিতায় তিনি ছিলেন সদা সচেতন। এদেশের শতকরা আশিভাগ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসরত মানুষের যথার্থ অবস্থান উপলব্ধি করেই হয়ত তিনি তাদের আঁকতেন বলিষ্ঠ, পেশল অতিকায় এক একজন মানুষ হিসেবে। দৈনন্দিন জীবনে কর্মরত মানুষ, বিরূপ প্রকৃতির সাথে সংগ্রামে লিপ্ত মানুষ অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার বাস্তবরূপ—সব কিছুতেই তিনি পেতেন এক গভীর আত্মতৃপ্তি।

সুলতান ভাইকে আমার সংগে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেয় শিল্পী হামিদুর রহমান তার ইসলামপুরের পৈতৃক বাড়ীতে। সম্ভবত ১৯৫৯ সালের গোড়ার দিকে। আমি তখন সবে আমেরিকা ও ইউরোপে বছর খানেক ঘুরে দেশে ফিরেছি। একদিন সকালে হামিদের বাসায় গিয়ে দেখলাম অদ্ভুত ধরনের একজন লোক বসে আছেন সোফায়। গেরুয়া রঙের একটা শাড়ী পরা আর একটা শাড়ী কাঁধে, ছিপছিপে, পেশীবহুল, সুন্দর সুঠাম শরীর। লম্বা পিঠ-ছাওয়া কালো কোঁকড়ানো চুল। হামিদ বললো, 'আরে



শরতে গ্রামীণ জীবন   তেল রং   ১৯৭৬

কৃষ্ণকে চেন না?' কৃষ্ণের অবতারই বটে। ভাবলাম যাত্রা দলের কোনো অভিনেতা-টেতা হবেন। নীরবে সোফার ঠিক মাঝখানে বসে সামনের টেবিল থেকে মাংস আর পরোটার একটা অংশ মুখে দিতে যাবেন, ঠিক ঐ সময় আমার আগমনে তিনি পরোটাটি না খেয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং বিনয়ের সংগে একটা মৌন সম্বোধন জানালেন আমাকে। হামিদ হেসে বলল, উনি শিল্পী, এস.এম. সুলতান। সুলতানের নাম শুনেছিলাম কিন্তু ইতিপূর্বে পরিচয় হয়নি কখনো। হামিদ যখন আমার পরিচয় তাঁর কাছে ব্যক্ত করলো, সুলতান বললেন 'ও, তাই নাকি।' আলাপে বুঝলাম, তিনি নাটক করেন না, ছবি আঁকেন। আঁকতেন, এখন আঁকেন না। আমি শিল্পী জেনে আমার স্টুডিওতে আসার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে কিছুক্ষণ গল্প করে তিনি বিদায় নিলেন সেদিনের মত। এর দু'দিন পর বিকেলে হামিদ এলো আমার তারাবাগের স্টুডিওতে। জিজ্ঞেস করল, সুলতান এসেছিল? আমি বললাম, কই না ত! হামিদ বললো, আমার কাছ থেকে দু'টাকা রিকসা ভাড়া নিয়ে তোমার এখানে আসার জন্যে সে-ত সেই সকাল দশটায় চলে এসেছে আমার বাসা থেকে। তাহলে গেল কোথায়? পরে জেনেছিলাম, হামিদই বলেছিল, 'ঐদিন সুলতান তোমার বাসায় আসার আগে

এক টাকার নেশা করেছিল। পরে বিকেল পর্যন্ত চেষ্টা করেও তোমার স্টুডিওর রাস্তা আর সে খুঁজে পায়নি তাই আর আসাও হয় নি।'

এর কয়েকদিন পর হামিদ নিজই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো সুলতান ভাইকে। অনেকক্ষণ আড্ডা দেয়ার পর দুপুরে ভালো করে খাওয়া দাওয়া সেরে, ভুরিভোজনের তৃপ্তি নিয়ে সুলতান ভাই তাঁর গাঁট থেকে বের করলেন একটা কলকি আর নেশার কিছু সরঞ্জাম। কিছু শুকনো পাতা আর ইটের একটা ছোট্ট টুকরো। ইটের টুকরোটাকে কলকির মাঝখানে বসিয়ে শুকনো পাতাগুলো খুব সযত্নে আঙুল দিয়ে টিপে টিপে গুঁজে দিলেন ঐ কলকির মধ্যে। তারপর একটা দেয়াশলাইর কাঠি জ্বালিয়ে পাতায় আগুন ধরিয়ে দু'হাতের মুঠোর মধ্যে কলকিটাকে চেপে ধরলেন, যেমন করে গলফের স্টিক ধরতে হয় অনেকটা তেমনি ভাবে। তারপর কষে একটান। সমস্ত ধুঁয়াটা ফুসফুসের মধ্যে মিনিটখানেক ধরে রেখে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিলেন। এই পদ্ধতিতে আরো একটান দিয়ে রেখে দিলেন কলকিটা আমার বইয়ের শেলফটার এক কোণে।

হামিদ এবং আমি দুজনেই এই দৃশ্যটি খুব মনযোগ দিয়ে দেখলাম এবং একে অন্যের দিকে চোখ মেলালাম। ইঙ্গিত বুঝে হামিদ সুলতান ভাইকে বললো, 'সুলতান, আমাদের জন্যেও একটা বানান না।' 'খাবেন?' সুলতান বলেন। এবং তারপর কলকিটাকে পরিষ্কার করে একই ভাবে আরো একবার কলকি ধরিয়ে দিলেন। হামিদ আমাকে বললো, 'খাও'। আমি বললাম, 'তুমি আগে খাও'। অনেকদিন থেকেই এই নেশার গল্প শুনছি। এটা খেলে নাকি শরীর হাল্কা হয়, ইচ্ছে করলে গাছের ডালে চড়া যায়, গাছের ধারে কাছে না গিয়েও। এবং গাছের ডালে বসে মনের আনন্দে পা-নাচানো যায় আর দেখা যায় গাছের নিচে দিয়ে লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। ইচ্ছে করলে আকাশেও উড়ে যাওয়া যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব গল্প শুনেছিলাম বন্ধু খালেদ চৌধুরীর কাছে। বলা বাহুল্য, খালেদ ঐ সময়ের একজন পরিচিত পন্ডিত, ইনটেলেকচুয়াল। খালেদ ঐ নেশার একজন উচ্চমানের সমঝদার ছিলেন। যদিও কেবল এই বিষয়টিতেই তার একক পারদর্শিতা ছিল না — বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের প্রায় তাবৎ ঘটনাবলীর তিনি যেন প্রত্যক্ষদর্শী, অংশগ্রহণকারী একজন ছিলেন, এভাবেই যুক্তি তর্ক দিয়ে তা আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করতেন। তাই ঐ বিষয়টি সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় অত্যাবশ্যক ছিল বলেই আমরা আগ্রহী হয়েছিলাম।

হামিদ সুলতান ভাইয়ের অনুকরণে গোটা দুই টান দিয়ে কলকিটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমিও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ না হারিয়ে বুকভরে টান দিতে শুরু করলাম।

ততক্ষণে সুলতান ভাই আমার শেলফ থেকে নারকেল তেলের বোতলটা নিয়ে হাতের তালুতে কিছুটা তেল ঢেলে চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে অত্যন্ত যত্নসহকারে মেয়েদের মত তেল মাখতে শুরু করেছেন। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল আমাদের। কোন নেশাই হয় না। হামিদকে বললাম, 'হামিদ, যে জন্যে খাওয়া সেটাই ত হলো না, তা হলে লাভ কি। আর একবার খাওয়া যাক।' সুলতান ভাইকে একথা জানাতে তিনি বললেন, আর প্রয়োজন নেই, ওতেই হবে। আমরা জিদ ধরলাম। না, আর একবার হয়ে যাক। সুলতান ভাই আর কথা না বাড়িয়ে আর এক কলকি বানিয়ে দিলেন। আমরাও আর উচ্চবাচ্য না করে দ্বিতীয় কলকির সদ্ব্যবহার করে ফেললাম। হয়ত মিনিট বিশেক হবে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল, এর মধ্যে হঠাৎ আমার দরজায় টোকা। 'কে?' জবাব এলো, শমু। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শমু। সুলতান ভাই চেয়ারে বসে, আর আমরা দু'জন আমার বিছানায়। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই মনে হল আমার হাটুর নীচের অংশটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে—অর্থাৎ আমি যেখানে পা ফেলছি বলে

ভাবছি, পা টা সেখানে পড়ছে না। আসলে পা-টা ওখানেই পড়ছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। শমুকে একটা ধমক লাগালাম, 'এখন, এই দুপুর বেলা তুমি এখানে এসেছে কেন, যাও ঘুমাও গিয়ে'। শমু চলে গেল, কিন্তু আমি যেন আর হাঁটতে পারছিনা—হামিদকে বললাম ব্যাপারটা। হামিদেরও একই অবস্থা। এরপর মনে হচ্ছিল শরীরের সব জোড়গুলো যেন খুলে গেছে এবং আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে তারা। বিছানায় শুয়ে পড়লাম। খুব খারাপ লাগছিল। মাথাও ঘুরছে। হঠাৎ এক ফোঁটা বৃষ্টি আমার গালে এসে পড়ল। হাত দিয়ে মুছে ফেললাম। আমার স্টুডিওর ছাদের টিনে ছিল বেশ কয়েকটা ছিদ্র, সেখান দিয়ে বর্ষার দিনে বৃষ্টি পড়ত ঘরের মধ্যে। কিন্তু খেয়াল হল, এখন ত বৃষ্টি নেই খাঁ খাঁ রোদ্দুর, তা হলে? তা হলে বৃষ্টির ফোটা পড়ার মত অনুভূতি চামড়ার ওপর আর কিছুই নয়, নেশা। নেশায় ধরেছে। সুলতান ভাইকে বললাম, এখন কি করা যায়? অনেকক্ষণ পর তিনি বললেন, 'বলেছিলাম না একটাতেই হবে। এখন চুপ করে শুয়ে থাকুন সব ঠিক হয়ে যাবে'। 'কতক্ষণ লাগবে ঠিক হতে'? 'এই ঘণ্টা তিনেক। আমার লাগে ঘণ্টা দুই'। খুব অস্বস্তি লাগছিল। বললাম, 'কফি টফি খেলে ঠিক হয় না?' সুলতান ভাই হাত দেড়েক লম্বা একটা বাঁশি হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা বাজান, মজা পাবেন। তখন আর রসিকতাও ভালো লাগছিল না।

ইতিমধ্যে সুলতান ভাই পাহাড়ী ধুনে বাঁশি বাজাতে শুরু করেছেন। অপূর্ব লাগছিল সেই শ্রুতি। সাত আট ফুট দূরে শুয়ে থেকেও মনে হচ্ছিল যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে সেই বাঁশির সুর। সুলতান ভাই বললেন, দেখতে পাচ্ছেন ওকে। বললাম 'কাকে?' 'কেন ভালো করে শোনেন, দেখবেন ও স্নান সেরে কলশী কাঁখে পুকুরের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছে। আপনি নিজেকে পুকুরের জলের মধ্যে নিয়ে যান, দেখবেন এক একটা সিঁড়িতে ওঠার সময় তার শরীরের দোল খাওয়া ভঙ্গিগুলো। দেখছেন, দেখুন, দেখুন। বাঁশির সুরে তিনি যেন ঐ ভঙ্গিগুলোকেই বর্ণনা করছেন। আবার এক হাতে বাঁশি আর অন্য হাত দিয়ে সেই কম্পিত অপ্সরীর শরীরের সীমারেখার গঠন দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। বললেন 'ঐত রাধা। একটা সাবান চেয়েছিল আজ সকালে। হামিদের কাছ থেকে একটা টাকা নিয়ে ওকে সেই সাবান কিনে দিয়েছি, খুব খুশী।'

এদিকে আমাদের শারীরিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। আমরা দুজনেই বিছানায় শুয়ে আর সুলতান ভাই মনের আনন্দে বাঁশি বাজিয়ে চলেছেন। হঠাৎ বাজনা থামিয়ে মেঝেতে পা ঠুকতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, 'যাহ, যাহ...' তারপর বিড় বিড় করে কি যেন বলতে লাগলেন এবং ঐ বাঁশিটা বদলে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট

বাঁশী হাতে নিয়ে নাড়া চাড়া করে আবার রেখে দিলেন এবং অন্য একটা বাঁশি তুলে নিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কাকে তাড়াচ্ছিলেন?' 'দেখলেন না ও কেমন বিরক্ত করছিল?' বললেন সুলতান ভাই। 'ও' অর্থাৎ রাধা। রাধা নাকি প্রায়ই তাঁর কাছে এসে এটা সেটা বায়না ধরে তাই তিনি ধমক দিয়ে যেতে বলেন। অন্যমনস্কভাবে মাটিতে পা ঠুকে 'যাহ্' 'যাহ্' বলতে দেখতাম তাঁকে প্রায়ই। বোধ হয় রাধাকেই যেতে বলতেন। তাঁর কাছে যে চার পাঁচটা বাঁশি ছিল, প্রথমে তা লক্ষ্য করিনি। সুলতান ভাই আবার তার কল্পিত রাধাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

কৃষ্ণমূর্তি সুলতানের সম্বল গাঁটের একটা কলকি আর কিছু শুকনো পাতা আর এক গোছা বাঁশি। কখন যে কৃষ্ণ বিদায় নিয়েছিলেন আর কখনই বা হামিদ চলে গিয়েছিল আমার মনে পড়েনা। শুধু মনে পড়ে, এর পরের দিন-পাঁচেক যেন আমার ঘাড়ের ওপরের মাথাটা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। যেন, যখন যেদিকে খুশী কাত হয়ে পড়ে যেতে পারে। এবং পরে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে পৃথিবীর তাবৎ নেশার মধ্যে এটাই বোধ হয় নিকৃষ্ঠতম নেশা। '....যাবো ফের কান মলি ভাই, ও পথে আর যদি যাই...'।

এরপর বছর খানেক ছিলাম দেশে। তখন সুলতান ভাই প্রায়ই আসতেন আমার স্টুডিওতে। সারাদিন গল্প করতেন। তার শিক্ষা জীবনের কথা, কি করে শাহেদ সোহরাওয়ার্দী তাঁকে কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। ভালো না লাগায় কেমন করে একদিন পাড়ি জমালেন বিদেশের পথে। লন্ডন, আমেরিকা এবং পাকিস্তান ভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা করতেন। দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতন্ত্র, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে অনর্গল কথা বলতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অবাক লাগতো তাঁর জ্ঞানের বিস্তার দেখে। কখনই এমন হতো না যে তিনি একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করে আলোচনা করছেন। কোনো শিল্পী বা কারো সম্পর্কে কখনই কোনো বিরূপ মন্তব্য করতেন না। কখনও তাঁকে রাগ করতেও দেখিনি। সেরকম পরিস্থিতি হলে চুপ করে থাকতেন।

সুলতান ভাইয়ের যে শিল্পকর্মটি আমি প্রথম দেখে মগ্ন হয়েছিলাম, সেটি ছিল একটি খবরের কাগজের ওপর জল রঙে আঁকা লাল ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়ার কয়েকটি গুচ্ছ। অপূর্ব স্বাচ্ছন্দ ছিল তুলির টানে আর রঙের ব্যবহারে। সম্ভবতঃ ঐ ছবিটি কোন ক্যালেন্ডারে ছাপা হয়েছিল, এখন আর তা সঠিক মনে নেই। এরপর, পশ্চিম পাকিস্তানের একজন বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারী, সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবী হামেদ

জালালের বাসায় তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে সুলতানের আরো একটি কাজ দেখেছিলাম। ভূস্বর্গ কাশ্মীরের একটি নিসর্গ চিত্র। অপূর্ব সুন্দর রঙ ব্যবহার। বরফে ঢাকা পর্বত শৃঙ্গ, ইউক্যালিপটাস গাছের সারি, সামনে ডাললেক। লেকে হাউজ-বোট আর শিকারা (বিশেষ ধরনের নৌকা) বেঁধে রাখা। আর তার ছায়া পড়েছে স্বচ্ছ স্ফটিক জলে। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম ছবিটা দেখে। আমি নিজেও অসংখ্য জলরঙ-এর কাজ করেছি ঐ ধরনের পাহাড়ীদৃশ্যের; কিন্তু সুলতান ভাইয়ের কাজে কম্পোজিশন এবং রঙ ব্যবহারের পরিমিতি আর দক্ষতা সত্যিই উচ্চ মানের।

সুলতান ভাইয়ের সদৃশ আর একজন শিল্পী ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। সাদেকায়েন। সাদেকায়েন ছিলেন সুলতানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং শিষ্য। দুজনের মধ্যে শারীরিক সাদৃশ্য ছাড়াও মিল ছিল ছবি আঁকার ধরন প্রণালীতে। বড় বড় ক্যানভাসে বিশাল ফিগারে আঁকতেন তারা ছবি। সাদেকায়েনের ছবির ফিগারগুলো ছিল অনেকটা 'বার্নার্ড বুফের' ফিগারের মত রোগা-পাতলা। আর সুলতানের ছিল সুপুষ্ট পেশীবহুল দীর্ঘকায় মানুষ। দুজনেই আঁকতেন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এবং এক নাগাড়ে কয়েকদিন ধরে অবিশ্রাম গতিতে।

এরপর বহু বছর আমার সংগে সুলতান ভাই-এর তেমন কোনো যোগাযোগ ছিল না। ১৯৭৭ এর শেষের দিকে আমি যখন শিল্পকলা একাডেমীতে চারুকলা বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব নিলাম তার কিছুদিন পূর্বে ১৯৭৬-এ একাডেমীতে সুলতান ভাইয়ের একটি একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। চার ফুট খাড়া, আট ফুট লম্বা তেল রঙে বড় এবং ছোট ক্যানভাসে আরো কিছু তেল রঙসহ কাগজে আঁকা বেশ কিছু ড্রইং ছিল। তাঁর হার্ডবোর্ডের ওপর আঁকা গোটা বিশেক চিত্রও ছিল এই প্রদর্শনীতে। একাডেমীর ঐ গোল ঘরটার মধ্যে তিনি থাকতেন এবং ছবি আঁকতেন। একাডেমীর তৎকালীন মহাপরিচালক ড. সিরাজুল ইসলামের সহযোগিতায় ঐ প্রদর্শনী হতে যাচ্ছিল। দায়িত্ব ছিল সুবীর চৌধুরী আর সায়মন পেরেরার ওপর। অবশ্য সায়মন পেরেরাই তখন ছিলেন তার প্রায় সার্বক্ষণিক সঙ্গী। রঙ, তুলি, ক্যানভাস আর নেশার সরঞ্জাম জুগিয়ে দেবার দায়িত্ব ছিল তারই। সায়মনের কাছেই শুনেছি, কি অপরিসীম ধৈর্য্য আর সাহসিকতার সাথে তিনি ঐ বড় বড় ছবিগুলো আঁকতেন। ছবির বিষয়বস্তু ছিল—মুক্তিযুদ্ধ, বাঙলার কৃষক, আদিম মানুষের প্রথম বৃক্ষরোপণ ও এদেশের মানুষ আর এদের জীবন সংগ্রামের দৃশ্যাবলী ছিল তাঁর বিষয়বস্তু। কখনো আবার কিছুটা কল্পনা প্রসূত বিমূর্ত ধরনের কাজও করেছিলেন তিনি।

নতুন কিছু করার ইচ্ছায় প্রায়শঃই আবেগ তাড়িত হতেন সুলতান ভাই। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, পুরোনো শহর সোনারগাঁ-র দু'একটি ভবন এখনও যা ব্যবহারযোগ্য, সে রকম একটা ভবন পেলে তিনি তাঁর স্টুডিও তৈরি করতেন। তাই করা হলো। তৎকালীন ঢাকার জেলা প্রশাসক শওকত আলী সাহেবের সহযোগিতায় একটি ভবনে নামমাত্র ভাড়ায় সুলতান ভাইকে স্টুডিও তৈরি করতে অনুমতি দেয়া হলো। যদিও একাজে একাডেমীর তদারকির কোন সরাসরি দায়িত্ব ছিল না তবুও আমি মাঝে মধ্যে যেতাম সুলতান ভাইকে দেখতে। সুলতান ভাই ছবি আঁকতেন কাগজে, ড্রইং অথবা জলরঙে। ছোট ছোট ক্যানভাসে দু-একটা তেল রঙ-এ কাজ করতেন তিনি। সেগুলোকে টাঙিয়ে রেখে একটা গ্যালারীর মত করেছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে কিছু পর্যটক যেত তা দেখতে। ওখানে তিনি যে কাজে বেশী মনোযোগী ছিলেন তা হলো রাতে গান বাজনা আর নেশার আড্ডা। সঙ্গী ছিলেন স্থানীয় এক নরসুন্দর যিনি ছিলেন একাধারে তাঁর পাচক ও সহকারী। এ ব্যবস্থাও তাঁর ভালো লাগলো না বেশী দিন। তা ছাড়া ঐ বাড়ীর সামান্য ভাড়াও তিনি দিতেন না। এবং এই সাথে যোগ হলো তাঁর রাতের আড্ডা সম্বন্ধে অভিযোগ, তাই তাঁকে শীঘ্রই ওখানকার পাট চুকিয়ে চলে যেতে হলো নড়াইলে। কোনো এক জমিদারের পোড়ো বাড়ীতে বাস করতে গেলেন তিনি।

একাডেমীতে অনুষ্ঠিত তাঁর প্রদর্শনীর বড় বড় কিছু ছবি তিনি রেখে ছিলেন জাতীয়



ফসল কাটার ক্ষণে তেল রং ১৯৭৬



অধ্যাপক রাজ্জাক সাহেবের বাসায়। শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় সংগ্রহ হলো একটি ট্রাক এবং সেই ট্রাকে করে নিয়ে গেলেন তিনি তার ঐ সব হার্ডবোর্ডে আঁকা ছবিগুলো যার অধিকাংশই তখন অযত্ন আর অবহেলায় দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে ছিল।

সে এক লম্বা কাহিনী। তাঁর ঐ জমিদার বাড়ী পরিষ্কার করা এবং বসবাস শুরু করার পুরো ঘটনাটাই বলেছিলেন সুলতান ভাই এক দুপুরে আমি যখন তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম ঐ বাড়ীতে আশির দশকের গোড়ার দিকে। পায়রা, মুরগী, বিড়াল, আরো কিছু পাখী-সাপ ইত্যাদি সহযোগে তাঁর নিজের বাসস্থান অনেকটা ঐ পরিবেশের সংগে বেশ মানানসই লাগছিল। দোতলায় থাকেন তিনি। এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যেতে যে বারান্দা, তার অর্ধেকটা ভাঙা, ওপরে ছাত নেই। পা ফসকে পড়ে গেলে নীচের জঙ্গলে পড়তে হবে এবং নির্ঘাৎ সর্পদংশিত হতে হবে।

যাই হোক ইতিমধ্যে তিনি একটি অসহায় হিন্দু পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিলেন ঐ ভাঙা ঘরে। দুটি কন্যা আর তাদের বিধবা মা। প্রতিদানে তারাই তখন সুলতান ভাইকে দেখাশুনা করেন। সুলতান ভাই খুব আগ্রহ নিয়ে একটি মেয়েকে ছবি আঁকা শেখাতেন। বিছানার তলা থেকে বের করলেন অনেকগুলো কাজ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে দেখালেন আমাকে ঐ কাজগুলো। জল রঙের আঁকা কাঁচা হাতের কাজ—মাঝে মাঝে শিক্ষকের তুলির টান বোঝা যায় স্পষ্ট।

এরপরেও সুলতান ভাইকে দেখতে গেছি বেশ কয়েকবার। তিনি তখন বাড়ী

বদলেছেন। নতুন বাড়ী বানিয়ে দিয়েছেন যশোর সেনা নিবাসের তদানীন্তন জিওসি। সুন্দর ছিমছাম তিন কামরার একটি বাস গৃহ। আর ছবি আঁকার জন্য বড় সাইজের একটা ও তার সংগে ছোট্ট আরো একটা কামরা বিশিষ্ট দুটি ঘর। ইতিমধ্যে সুলতান ভাই সেখানে গড়ে তুলেছেন 'শিশু স্বর্গ'। শিশুদের প্রকৃতির কাছে থেকে এ ধরনের অন্য কোনো স্কুল এদেশে তখন আর কোথাও ছিল না। ছবি আঁকার স্কুলের পাশাপাশি তিনি গড়ে তুলেছিলেন আরও এক নতুন ভবন —একটি মিনি চিড়িয়াখানা। উটপাখী, কাক, মদন টাক, একপাল বিড়াল, হরিণ, ডজন খানেক খরগোস, পায়রা, মুরগী, ঘুঘু ইত্যাদি মিলে প্রায় শ' খানেক প্রাণী। এদের খাদ্য সংগ্রহ করতেই হিম শিম খেতে হতো সুলতান ভাইকে। ঘুরে ঘুরে দেখতেন তিনি স্বযত্নে গড়ে তোলা তাঁর প্রিয় চিড়িয়াখানা, ফুলের বাগান —নানা জাতের পাতাবাহার গাছ। আবার কখনো নিজে যেতেন পাশের চিত্রা নদীর তীরে। ঘুরতে ঘুরতে দেখাতেন আর বলতেন, এখানে আমি একটা নৌকা বানাবো নূহের নৌকার মত। সেই নৌকায় করে আমার শিশু ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বেড়াতে যাবো তাদেরকে বাংলার রূপ-বৈচিত্র্য দেখাতে। তিনি নৌকা বানিয়েও ছিলেন পরবর্তীতে। এবং শিশুদের নিয়ে ঐ নৌকা ক'রে দু'একবার বেড়াতেও গিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে সরকার কর্তৃক সুলতান ভাইকে এদেশের এক বিরল সম্মান 'রেসিডেন্ট-আর্টিস্ট' প্রদান করা হয়। যার বাস্তব ব্যাখ্যা : শিল্পী এস. এম. সুলতানকে সরকার প্রতিমাসে তাঁর প্রয়োজনীয় রঙ,তুলি, ক্যানভাস কেনার জন্য এবং সংসার পরিচালনার জন্য একটা নির্দিষ্ট অংকের অর্থ প্রদান করবে। এ ব্যবস্থা দু'বছর বলবৎ থাকবে বিনিময়ে তিনি বছরে ছ'টি করে ছবি একাডেমীকে দেবেন। এ ছাড়া বছরে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পকলার ওপর একটি করে লেকচার দেবেন। উদ্দেশ্য হলো, তিনি যেন অর্থাভাবে ছবি আঁকা বন্ধ না করেন। পরে অবশ্য এই রেসিডেন্সির সময়সীমা বর্ধিত করে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বহাল রাখা হয়েছিল। এই সময় তিনি, বলতে গেলে নিয়মিতই ছবি আঁকতেন। অনেক বড় বড় ক্যানভাসে তিনি কাজ করেছেন যা এ-দেশে এখনও কোনো শিল্পী তেমন করে আঁকেননি। তিনি তাঁর কাজে কখনো সম্পূর্ণ পারসপেকটিভ বজায় রেখেছেন, আবার কখনো দ্বিমাত্রিকভাবে বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে পাশাপাশি সংস্থাপন করেছেন। তাঁর বেশীর ভাগ কাজে তিনি বাদামী, হালকা বাদামী, হলুদ আর কখনো সামান্য লাল রঙ ব্যবহার করতেন যা তাঁর কাজকে অনন্য বিশিষ্টতা এনে দিয়েছে।

আপাত দৃষ্টিতে কথা কম বলেন বলে মনে হলেও সুলতান ভাই প্রচুর কথা বলতেন। একবার আমার বাসায় তিনি দিনতিনেক ছিলেন। আমি তখন ধানমন্ডির ১৯ নম্বর

সড়কের এক বাসায় দোতলায় থাকতাম। নীচের তলায় থাকতো রশীদ চৌধুরী। ঐ সময় সুলতান ভাই নাওয়া খাওয়া আর ঘুমানোর অল্প কিছু সময় বাদ দিয়ে বাকী প্রায় সব সময়ই কথা বলতেন। কথা বলতেন আমার মেয়ে টুকির সংগে। টুকি নামটা তার খুব পছন্দ ছিল। টুকির জন্য কয়েকটা ড্রইং ও তার একটা পোর্ট্রেটও করেছিলেন ঐ সময়। তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি বর্ণনা করতেন টুকির কাছে—কি করে তিনি তাঁর রাজমিস্ত্রি বাবার কাছ থেকে নকশা করা শিখতেন। পৃথক পৃথক নকশার সমতা, সাযুজ্য এবং সেগুলির ব্যবহারের কায়দা কানুন শেখার বিষয় নিয়েও করতেন দীর্ঘ আলাপ। তবে তিনি কখনো একেবারেই ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কারো সংগে আলাপ করতেন না।

আবার রাতে কখনো রশীদ আর আমার সংগে বসে আলাপ করতেন দর্শন, আধ্যাত্মবাদ আর বিজ্ঞান বিষয়ে। কখনো আমরা একমত হতাম, আবার কখনো ভিন্নমত পোষণ করতাম। সুলতান ভাই বিতর্কের বিষয়গুলো কৌশলে এড়িয়ে যেতেন সহসা উত্তেজিত হতেন না। হঠাৎ কখনও উত্তেজিত হলে, কিছু না বলে কল্কিতে অগ্নি সংযোগ করতেন। যদিও তিনি বলতেন, 'আমি এখন ও-সব নেশা-টেশা একদম ছেড়ে দিয়েছি'। আসলে ওটা তিনি কখনই ছাড়তে পারেননি। তবে কমিয়ে ফেলেছিলেন অনেক।

রশীদ হয়ত চলে গেছে, আমিও ধারে কাছে নেই। সুলতান ভাই বাঁশি নিয়ে বসে যেতেন। তখনও পর্যন্ত বাঁশি তিনি কাছ ছাড়া করতেন না।

'জন্তু-জানোয়ারগুলো বোধহয় না খেয়ে আছে।' 'আমি না থাকলে ওদের খাওয়া দাওয়া ঠিক মত হয় না।' 'ওরা কিন্তু সব বোঝে। আবার রাগও করে।' 'রাগ হলে আমি ডাকলে ওরা তখন সাড়া দেয় না। অভিমান করে থাকে।' এ ধরনের কথাবার্তা বলে সুলতান ভাই বুঝাতে চাইতেন যে তাঁকে এখন আবার নড়াইল ফিরে যেতে হবে।

চলে যেতেন। কিন্তু ছবি আঁকার কাজ প্রায় বন্ধ। পীড়াপীড়ি করলে তিনি একদিন বললেন, 'ওখানে থেকে আমার ছবি আঁকা হচ্ছে না। আমি শহরে একটা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতে চাই যেখানে বসে নিরিবিলিতে ছবি আঁকবো। তাঁর জন্যে মীরপুরে তাঁর পছন্দমত একটা বাসা ভাড়া করে দেয়া হলো সরকারী ব্যয়ে। বছর খানেক রাখা হয়েছিল বাসাটা। কিন্তু তিনি নানা অজুহাত দেখিয়ে কখনই ঐ বাসায় থাকেননি, ছবিও আঁকেননি ওখানে থেকে। ওর কিছু শাগরেদ থাকত ঐ বাসায়। নেশার আড্ডা আর হট্টোগোল করার অভিযোগে বাড়ীওয়ালা ক্ষতিপূরণ দাবী করে বাড়ী ছাড়াতে

নোটিশ দিল একদিন। কাজেই সে বাড়ী ছাড়তে হয়েছিল। পরবর্তীতে ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে একটা সমঝোতা হয়েছিল বাড়ীওয়ালার সংগে।

বাংলাদেশের যে তিনজন শিল্পীকে এ দেশের মাটি ও মানুষের শিল্পী বলা হয় তাদের মধ্যে সুলতান ভাই অবশ্যই অন্যতম। সুলতান ভাইয়ের ছবির বিষয়বস্তু ছিল, মুক্তিযুদ্ধ, ধানকাটা, চর দখলের জন্য ঢাল-সড়কীর লড়াই, গ্রামীণ দৃশ্য, ঘর গেরস্থালির দৃশ্য, ধান মাড়াই, মেঠোপথে গরুরগাড়ী, লাঙল চাষ ইত্যাদি। মোট কথা সবই গ্রাম ভিত্তিক বিষয়বস্তু। একটা বিষয় নিঃসন্দেহে বলা যায়, তা হলো : সুলতানভাই হিউম্যান এনাটমি (মানুষের শারীরিক গঠনের) ড্রইং-এ ছিলেন একেবারে সিদ্ধ হস্ত। যদিও তা ছিলো কিছু অতিরঞ্জিত। তবু একেবারে সঠিক এবং মাপসই। এভাবে পেশী গঠনের পদ্ধতি সম্প্রতিকালে শাহাবুদ্দিন রপ্ত করলেও আর কারো কাছে ও ধরনের নৈপুণ্য দেখা যায় না। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ড্রইং ছিল অতি উচ্চ মানের কিন্তু কিছুটা ভিন্ন ধরনের একাডেমিক। আর কামরুল হাসানের ছিল স্টাইলাইজড ড্রইং। তিনজনই ছিলেন ভাব-প্রবণ, আবেগ-তাড়িত এবং কারিগরি দক্ষতায় সিদ্ধহস্ত।

সুলতান ভাইয়ের সাহচর্যের স্মৃতিকথার বহু ঘটনা এখন আর স্মরণ নেই। সব ঘটনার বর্ণনা দেয়াও সম্ভব নয়। শুরুতেই বলেছি সুলতান ভাইয়ের মধ্যে একটা সম্মোহনী আকর্ষণ ছিল। যার ফলশ্রুতিতে তিনি আজীবন সম্মান এবং অকৃপণ সহযোগিতা পেয়েছেন সকলের কাছ থেকে, প্রায় সর্বক্ষেত্রে। জীবনে তিনি ছবি এঁকেছেন অসংখ্য। অর্থ উপার্জনও করেছেন প্রচুর। কিন্তু সে অর্থ সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারেন নি তিনি। বিশৃঙ্খল জীবন যাপনের ফলে নিশ্চিন্ত হতে পারেননি জীবনের শেষ দিনগুলোতে। এ দেশের বহু নব্য-ধনী ব্যক্তিদের সংগ্রহে রয়ে গেছে এস.এম. সুলতানের অসংখ্য চিত্রকর্ম। হয়ত একদিন ভ্যান গঘের মত সুলতানেরও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের কথা ভুলে গিয়ে লোকে তার শিল্পকর্মের মূল্য যাচাই নিয়েই কেবল মাথা ঘামাবে।



জীবন, প্রকৃতি ও শিল্পের এক অভিনব মালাকার

নাজিম মাহমুদ

শিল্প ও প্রকৃতিরাজ্যে তিনি ছিলেন এক সুলতান। স্বদেশে এমনই এক মহিমান্বিত কমলাসন শেষ জীবনে পেয়েছিলেন শিল্পী এস. এম. সুলতান। জীবনকালে এক কিংবদন্তী, এক রূপকথার নায়ক তিনি। উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের উপাদান এবং শত শত প্রবন্ধ-নিবন্ধ শিরোনাম হয়ে ঘরে ঘরে তিনি আজ এক পরিচিত মানুষ। যতো লেখাই হোক তবুও তাঁর সম্পর্কে সাধারণ কৌতূহল অন্তহীন।

রূপকথায় যে রাজার হাতি পথের অচেনা ছেলেকে হঠাৎ শুঁড়ে তুলে পিঠে নিয়ে প্রাসাদে শূন্য সিংহাসনে বসিয়ে দেয়, শিল্পী সুলতানের জীবনেও এ ধরনের এক ব্যাপার আছে। প্রফেসর শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে বালক সুলতানের যোগাযোগ প্রায় এমনই এক ঘটনা বলে আমরা ভাবতে পারি। কেননা সেখানে দুয়ে-দুয়ে চার মেলাবারই মতো কিছু ছিল না। তবুও সেখানে দুয়ে-দুয়ে পাঁচ হয়ে যাবার মতোই অসম্ভব কিছু আমরা পাই। প্রফেসর সোহরাওয়ার্দী এক বিস্ময়কর শিল্প জহুরী বটে। নইলে যে পরিবেশ ও পটভূমিতে সুলতানের জন্ম, তা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর নাগাল তাঁকে সহজে পাইয়ে দেবে, এমন ছিল না। কবি গ্রে যেমন বলেছেন, 'কত ফুল সলাজ ফুটে যায় চোখের আড়ালে,' শিল্পী সলুতানও হয়ত তেমন অখ্যাত অবজ্ঞাত অনাদৃত এক বিরল পুষ্পোদগম হয়েই ঝরে যেতেন। শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। এই যে হয়নি, তার কারণ যে তিনি কোমর বেঁধে আদাজল খেয়ে না খেয়ে লেগেছিলেন, তা মনে হয় না। মানুষের জীবনে কোনো কোনো প্লাবনে ভাসতে

পারলে সৌভাগ্যতীর্থে পৌছে যাওয়া যায় বলে শেকসপীয়র যে কথা লিখেছেন, তেমন জোয়ারে ভাসার সুযোগ পেয়েও শিল্পী সুলতান তা গ্রহণ করেননি। প্রতিষ্ঠান তাঁকে বাঁধতে পারেনি। প্রচারবিমুখ তিনি আজন্ম। যে সময়ে এই শিল্পীর ছবি দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে প্রশংসিত তারপর কতকাল তিনি স্বদেশে প্রায় নেপথ্যচারী। প্রতিভা তাঁর কত বিশাল এবং সেই মনীষার স্বীকৃতি কতটুকু হলো না হলো, এ নিয়ে তাঁর আদৌ ভাবনা ছিল না। কালো আলখেল্লা গায়ে ওঠার আগেই তাঁর নাম বিশ্বের বড় বড় প্রদর্শনীতে উঠে গেছে। তখনও তিনি পোশাকে আশাকে চলাফেরায় অনুল্লেখ্য। ওই সময়ে "যশোর তসবীর মহলে" কোনো এক নাট্য মহড়ার ফাঁকে নাট্য পরিচালক (অধ্যাপক নূরুল হালিম) একজন আপাত অতি সাধারণ মানুষকে দেখিয়ে আমাকে বললেন, 'উনি বিরাট শিল্পী, ইউরোপ আমেরিকায় ওঁর ছবির খ্যাতি।' মানুষটিকে দেখে সে কথা বিশ্বাস করাই যায় না। নানা মাপের মোটা সরু ডজনখানেক বাঁশী ঝোলার নিয়ে বসে আছেন তিনি, কথা বলছেন আশপাশের মানুষের সাথে। এমন সহজ সেই আলাপ, বোঝার কোনো উপায় নেই যে তিনি অনন্য। শুনেছি, জংলা ভাঙাচোরা ভূতড়ে বাড়িতে সাপকোপের সাথে তখন নাকি তিনি স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করছেন, বন্ধু অধ্যাপকদের সাথে আড্ডা দিচ্ছেন, রঙ তৈরি করছেন, খুশি মতো ছবি এঁকে অকাতরে একে-ওকে বিলিয়ে দিচ্ছেন সেই সৃষ্টি। তখনকার সেই চিত্র প্রাপকগণ সবাই যে তাঁর ছবি সযত্নে রক্ষা করেছেন, তা নয়। কেন রক্ষা করা সম্ভব হয়নি, এমন এক প্রশ্নের উত্তরে তখনকার ভাগ্যবান চিত্রপ্রাপক একজন কিছুদিন আগে আমাকে অকপটে বলেছেন—'তখন ওই ছবির মূল্য ও মর্ম ঠিক বুঝিনি।' বিশ্রুত শিল্পবোদ্ধা প্রফেসর শাহেদ সোহরাওয়ার্দী একনজরে বালক এস. এম. সুলতানের মাঝে আগামী শিল্প জগতের এক সুলতানের বিপুল সম্ভাবনাময় আবির্ভাব দেখতে পেয়েছিলেন। এ দেশের মানুষ বহুকাল এই শিল্পীর খোঁজ পায়নি। তাঁর সম্পর্কে তেমন আগ্রহ কারো ছিল না। এজন্যে দায়ী কি শিল্পবোধে আমাদের সাধারণ দৈন্য? হতে পারে। তবে প্রচারবিমুখ শিল্পীও যে কখনো তাঁর প্রকৃতির আড়াল ছেড়ে রাজধানীর বুকে খ্যাতির বরণমালা কুড়োতে আসেননি-সে কথাও একশ' ভাগ সত্যি। এক সময় আমার এমন সংশয় ছিল যে এ দেশের গুণী শিল্পীরাও বুঝি এস. এম. সুলতানের নাম জানেন না। একেবারেই ভ্রান্ত ছিল আমার ধারণা। বাহাত্তর সালের কোনো এক সময়ে একদিন কথা প্রসঙ্গে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'স্যার, আপনি কি শিল্পী সুলতানকে চেনেন?' অবাক হয়ে আমার মুখে তাকিয়ে শিল্পাচার্য বললেন-- 'আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় শিল্পীকে আমি চিনবো না?' নির্বোধ ও অর্বাচীনের

মতো প্রশ্ন করায় আমি তখন লজ্জিত হলাম বটে, কিন্তু সেই মুহূর্তে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মনের বিশালতাও সাধারণ পরিমাপ ছাড়িয়ে গেল। একজন মহান শিল্পী বুঝি এমন করেই আর এক মহান শিল্পীর প্রতি তাঁর স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধাবোধ জানান। এই ঘটনার পর আমার আদৌ দুর্ভাবনা ছিল না, আমরা জেলার প্রচারবিমুখ এই শিল্পীকে কে চেনে-না-চেনে। তাছাড়া আমরাও তো তাঁর প্রথম মূল্যায়ন করেছি পাশ্চাত্য শিল্পবেত্তাদের প্রশংসা শুনে। প্রায় ক্ষেত্রেই যা ঘটে আর কি।

শিল্পী সুলতান দীর্ঘকাল এক রকম স্বেচ্ছা অন্তরীণ ছিলেন। পোশাকি ব্যাপার-স্যাপারে বড় একটা বের হননি। তবুও কিছু কিছু বিদগ্ধ শিল্প রসিক সরকারি কর্মকর্তা ও সংস্কৃতিকর্মী গভীর ঔৎসুক্যে প্রকৃতির আড়াল থেকে তাঁকে ধীরে ধীরে টেনে এনে দেশের পাদপ্রদীপের পুরোভাগে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এই কাজে যে ব্যক্তিরা অগ্রণী ছিলেন, তাঁদের কাছে আমাদের ঋণ কোনোদিন শোধ হবার নয়। কোনো কোনো নাছোড়বান্দা সংস্কৃতিকর্মী শিল্পী সুলতানকে এমন করে তাঁর গ্রামের বাইরে নিতেন বলেই তার হাতে খুলনার কবিতালাপের ভালোবাসা গ্রহণের সৌভাগ্য হলো আমার।

সুলতানকে আবিষ্কার করা মানে শুধুমাত্র কোনো শিল্পীকে দেখাই ছিল না, এক মহৎ শিল্প সৃষ্টিরও মুখোমুখি হবার মতো অভিজ্ঞতা ছিল তা। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় কবি নজরুল যেমন বলেছেন, 'রস পান করে আমি হয়ে গেছি রস'- শিল্পী সুলতানও ছিলেন শিল্প সাধনায় একাত্ম ও নিমগ্ন প্রকৃতির এক জীবন্ত শিল্প। অনেকবার এই মানুষটিকে দেখতে দলেবলে তার বাড়িতে গেছি। আকর্ষণ ছবি নয়, ছবির পিছনের এক দুর্লভ মানুষ, প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা এক চমক। সম্রাট শাহজাহানের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ'। মানুষ সুলতানও তেমনি তার সৃষ্টিকে পিছনে ফেলে অনেক এগিয়ে ছিলেন। এই বিস্ময়কর মানুষকে তার আপন ভুবনে দেখায় এক ধরনের থ্রিল আছে বলেই সবাই বারবার রূপগঞ্জে ছুটে গেছে। অকৃতদার, তবে সংসারবিবাগী কিংবা গজদন্ত মিনারবাসী জীবনবিযুক্ত ভোলা মানুষ তিনি ছিলেন না। তার একান্নবর্তী পরিবার যেমন বৃহৎ, তেমনি বিচিত্র। নিঃসঙ্গ হবার কোনো উপায় ছিল না তার। সেখানে বন্যপোষ্য নানা জাতের পশুপাখি প্রাণী ও তাদের পরিচর্যারত মানুষজন এবং গ্রামের শিশুদের মধ্যে সুলতান ছিলেন প্রকৃতিরই এক অংশ। এই পটভূমি থেকে পৃথক করে দেখলে তার সম্পূর্ণ দর্শন মেলে না। এখানেই তিনি ছিলেন স্বচ্ছন্দ, এখানেই তার

ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের পূর্ণ প্রকাশ। জীবন ও প্রকৃতির সাথে তিনি ছিলেন অঙ্গাঙ্গী। সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তার চেহারা খন্ডিত হয়ে যায়। আবার অন্যভাবে এ কথাও বলা যায়-তার ছবি ও তিনি ছিলেন অভিন্ন। যে মাটি, প্রকৃতি ও কৃষিনির্ভর এ দেশের মানুষের চিরায়ত জীবন সাধনা, সংগ্রাম ও বিপুল শক্তি তার ছবিতে পাই, তারই প্রতীক ছিলেন তিনি। কেবলমাত্র মানুষকে নয়, তিনি ভালোবাসতেন সমস্ত সৃষ্টিকে। গাছগাছালি ও প্রাণী জগতের সাথে তার যে মিতালী, তা দেখেও এই সখ্যের সবটা বোঝা যায়নি। ভালোবাসার ভাষায় তাদের সাথে ছিল তার ভাব বিনিময়। তাদের সুখ-দুঃখ শিল্পী বুঝতেন, তাদের আনন্দবেদনা তাকে একইভাবে আলোড়িত করতো। শিল্পীর কাছে এইসব বন্যপোষ্য প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন নাম ও পরিচয় ছিল এবং সেভাবেই ছিল তাদের ডাকাডাকি। একবার এক হিংস্র কোনো জন্তু—বাঘের বাচ্চা হয়ত — শিল্পী বাড়িতে স্বেচ্ছায় চলে এসে ধরা দেয় এবং সেখানে কিছুদিন আতিথ্য গ্রহণ করে। এ কথা শুনে একটু পরিহাস করে আমি বলেছিলাম—'শিল্পী, আপনাকে সে চিনিলো কেমনে?' শিল্পী হেসে বললেন, 'ওরা টের পায়, ওরা সব বুঝতে পারে।'

শিশুরা প্রকৃতির এক অকৃত্রিম অংশ বলেই হয়ত শিশুদের প্রতি তার মনোযোগ ছিল সবচেয়ে বেশি। কোনো শিশু একবার রঙতুলি নিয়ে ছবি আঁকলে, বড় হয়ে অসুন্দর কিছু আর সে করতে পারে না-এমন এক বিশ্বাসে তিনি 'শিশু স্বর্গ' গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। শুধু স্বপ্নই নয়, শেষ জীবনে তার ছবির বিক্রয়লব্ধ অর্থ অকাতরে ব্যয় করতেন তার সেই শিশুদের কল্যাণে। যে প্রকৃতি পাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সেই রকম এক পাঠশালায় অধ্যয়নের জন্য নিজ তত্ত্বাবধানে শিল্পী তৈরি করালেন এক বড় নৌকা। উদ্দেশ্য : শিশুদের নিয়ে তিনি চিত্রায় ভাসবেন, সুন্দরবন যাবেন। আমরা ভীতু, সাবধানী মানুষ। একবার তাকে বলা হলো, এই নৌকায় সুন্দরবন যাত্রা ঝুঁকিপূর্ণ, কেননা সেখানে নদীর বুকে চলার মতো নৌকাটি নয়। শিল্পী একমত হননি।

শিল্পী সুলতানকে তাঁর চারপাশের প্রকৃতি ও জীবন থেকে আলাদা করে দেখায় তেমন মজা ছিল না। এই 'জীবন্ত শিল্প'র প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণে সবাই তাঁকে দেখতে গেছে তার গ্রামের বাড়িতে। সেখানে বন্যপোষ্য পশুপাখি প্রাণীর বিচিত্র গন্ধের সম্মিলিত সৌরভ কখনো কখনো কারো কারো নাসিকা যন্ত্রকে একটু সুড়সুড়ি দিলেও ওই রাজ্যে এই 'বিরাট শিশু'র জীবনচর্যা এক মুহূর্তে সবাইকে মুগ্ধ করে ফেলতো। চিরায়ত বাংলার অতিথিপরায়ণতার ঐতিহ্য থেকে একতিল ভ্রষ্ট হননি শিল্পী।

একবার তো তার বাড়িতে পৌছতেই এলো ঝকঝকে কাপপিরিচে টাটকা বিস্কিট ও ধূমায়িত চা। গাছগাছালি পশুপাখি নিয়ে সংসার পাতলেও জীবনাচরণে পোশাকে-আশাকে আলাপে-সংলাপে একেবারেই তিনি জংলী ছিলেন না। মনে ও মননে যেমন, চলাফেরায় কথাবার্তায়ও তেমনি এক সংস্কৃত, পরিশীলিত মানুষ ছিলেন তিনি। গ্রামের মানুষ, গ্রামে বাস করতেন বটে, কিন্তু এতটুকু 'গাইয়া' নন। বাংলাদেশের যেখানে তার আবাস, সে স্থানের আঞ্চলিকতাও তার জিভের ডগায় কখনো শুনতে পাইনি। বাংলা বর্ণমালা ও উচ্চারণের প্রমিত ধ্বনি ও রূপটি বরাবর তাঁর বাক্যবিন্যাসে পেয়েছি। কি বাংলা কি ইংরেজি শব্দ ব্যবহারে তাঁর সচেতনতাও লক্ষ্য করেছি। এই 'সফিস্টিকেশন' অবশ্য তাঁকে কখনো প্রকৃতি থেকে বিশিষ্ট করেনি। সম্পূর্ণ সংস্কৃত এক মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর শিশুস্বর্গও তাই প্রকৃতি ও সংস্কৃতির এক মিলন সাধনা। শিশুদের গড়ে তোলায় তাঁর যে শিক্ষা ভাবনা, তার পূর্ণ রূপায়ণ তিনি দেখে যেতে পারেননি। তাঁর তিরোধানের পর এখনো এক বছর পার হয়নি। অথচ ইতিমধ্যে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তার সমগ্র পরিকল্পনা।

শুধু শিশুদের কথাই বা বলি কেন কারো মনের সুপ্ত শিল্পবোধ জাগাতে তিনি যে কতটা সফল ছিলেন, তার একটি দৃষ্টান্ত আমার জানা আছে। ফেরদৌসি প্রিয়ভাষিণী নামে যে শিকড় ভাস্কর্য শিল্পী এ দেশের শিল্পাঙ্গনে পরিচিত, শিল্পী সুলতান তাকে অনেক দিন আগে থেকেই চিনতেন। পঞ্চাশোর্ধ বয়সে ফেরদৌসি যখন নেহাৎ সখ ও খেয়ালে শত তুচ্ছের আড়ালে পড়ে থাকা মরা-পোড়া গাছের ডাল গুড়ি শিকড় বাকড় কুড়িয়ে নানা ফর্মে ঘর সাজাতে লাগলেন, একদিন শিল্পী সুলতান তা দেখে এক মুহূর্তে এই কাজের মধ্যে শিল্পের অমিত সম্ভাবনাকে বুঝতে পারলেন। ফেরদৌসিকে তিনি বললেন, এই প্রয়াস শিল্পের একটি নতুন ধারা, শিল্পের শিকড়, এক ধরনের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ব্যতিরেকে এই সংগ্রহ ও তার রূপদান সম্ভব ছিল না। শিল্পী সুলতানের বিপুল প্রেরণা না পেলে ফেরদৌসি তার খেয়ালী কর্মকে এক অভিনব শিল্পকর্মে রূপান্তর ঘটাতে এমন সিরিয়াস হতেন কিনা কে জানে। ফেরদৌসিকে হাত ধরে শিল্পের আলোময় জগতে টেনে এনেছেন তিনি। এখানে শিল্পী সুলতান যে নতুন একজন শিল্পী গড়লেন, তাই নয়। এই নতুন শিল্পীর মাধ্যমে তিনি উন্মোচন করলেন শিল্পের এক আপাত অদৃশ্য রূপ। বেঙ্গল ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে ফেরদৌসি প্রিয় ভাষিণীর 'শত তুচ্ছের আড়ালে' শীর্ষক শিল্প প্রদর্শনীর দ্বার উদঘাটন করে শিল্পের এই নতুন ধারাকে বেগবান করে গেছেন তিনি। এই প্রদর্শনী উপলক্ষে তিনি ঢাকায় এলেন। বিমানবন্দরে অভ্যর্থনায় গিয়ে দেখি তার সফরসঙ্গীর হাতে একটি ক্যানভাস। আমরা জানতে পারলাম, শিল্পী ভেবেছেন— যদি তাঁর হোটেল বিল

পরিশোধে প্রদর্শনী আয়োজকদের অসুবিধা হয়, তাহলে তিনি ছবি এঁকে ক্যানভাসটি হোটেলে দিলে বিল মেটানো যাবে।

মৃত্যুর মাত্র ক'দিন আগে শেষবার শিল্পীর সাক্ষাতে গেলাম তার গ্রামের বাড়িতে। শরীর ভালো না হলেও ভালোই। চলাফেরা করছেন। পাশে পাশে ফিরছে—মনে হলো, সাইবেরিয়ান এক স্পিৎজ। শিল্পীর বিছানা থেকে ছুটে নামলো, আগন্তুকবৃন্দের পা শুকলো। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে শিল্পীর পায়ে পায়ে জড়িয়ে রইলো। পাশের ঘরে খাবার টেবিলে একটি বিড়াল তখন গভীর দিবানিদ্রামগ্ন। টেবিলের নিচে আরেকটি কুকুর ঘুমে অচেতন। এসব পশুপ্রাণীর প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই, কিন্তু আমার সঙ্গী পুত্রবধূ পলার সে কি কৌতূহল আর উৎসাহ। আমার কাছে শিল্পীই ছিলেন প্রধান। তিনি কথা বলতেন, শুনতাম। সবটাই প্রায় তার শিশু স্বর্গের ভাবনা। শিল্পীকে মনে হতো এক চিরশিশু, পঙ্কিল সমাজে এক পবিত্রতা।

শিল্পী এস এম সুলতানের জন্মদিন (১০ই আগস্ট) এসে গেল। কিন্তু তার সব আয়োজন প্রায় বিলুপ্তির পথে। কিছুদিন আগে শিল্পীর পরম স্নেহভাজন সংস্কৃতি কর্মী শেখ হানিফ ও চন্দনার মুখে শোনা গেল কেমন করে এই সহজ সরল বিরাট শিশুকে তার আশপাশের মানুষ এবং কিছু কিছু শিল্প ব্যবসায়ী আমৃত্যু ঠকিয়েছে। আশপাশের মানুষ সরকারি অর্থ পেয়েও তার ওষুধ পথ্য কিনে দেয়নি তার মৃত্যুর আগে। এমন কি মৃত্যুর পরও তার স্বাক্ষর জাল করে তাদের বেনামা ছবি বাজারে চালাতে চেষ্টা করেছে। হানিফ জানালো, ইতিমধ্যেই পশুপ্রাণী স্থানান্তরিত হচ্ছে, কেউ কেউ অযত্ন ও অবহেলার শিকার। আর শিশু স্বর্গ? কে দেখবে তাকে?

অর্থাৎ এই হলো আমাদের জাতীয় অথবা রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা। শিল্পী সুলতানের ঐতিহ্যকে কে সমুন্নত রাখবে, কে তার উত্তরাধিকার কাঁধে তুলে নেবে। তার ভালোবাসার আলয়ে পরম নিশ্চিন্ত বন্যপোষ্য জীব ও প্রাণীরও অস্তিত্বের সংকট। শিল্পীর মৃত্যুর পর সরকারি-বেসরকারি কোনো পর্যায়ে শিল্পীর অসমাপ্ত কাজ শেষ করার কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। অথচ কত না জরুরী ছিল এই উদ্যোগ। জীবন, প্রকৃতি ও শিল্পকে এক মালায় গাঁথার চেষ্টা করে গেছেন শিল্পী সুলতান। তার এই প্রয়াসে যদি কোনো সত্য মূল্য থাকে, তাহলে সকলে, বিশেষ করে শিল্পী সমাজ, তার ঐতিহ্য রক্ষায় ব্রতী হবেন, এই আমাদের আশা। শিল্পীর স্বপ্ন ও সাধনা যদি ফলবতী না হয়, তাহলে আগামী প্রজন্মের কাছে বর্তমান অভিযুক্ত হবে নিশ্চিয়ই।



আমার দেখা সুলতান

রফিকুন নবী

১৯৫৯ সালে আর্ট কলেজে ভর্তি হলাম। বলা চলে নতুন এক জগতে প্রবেশ ঘটলো। ছবি আঁকা এবং আঁকিয়ে দুটোতেই মনযোগ। অর্থাৎ ছবি আঁকার অ আ ক খ শিখছি, সেই সাথে শিল্পীদের বিশেষ করে শিক্ষকদের ভাবভঙ্গি, চালচলন ইত্যাদির দিকেও নজর করছি। কারণ নতুন এই জগতের মানুষগুলির মধ্যে শিল্পী বলে অসাধারণত্বের কি কি গুণাবলী দৃশ্যমান আছে তাও দেখা প্রয়োজন। গল্প উপন্যাস পড়ে বা লোকমুখে শুনে শিল্পীদের সম্বন্ধে যে নানা ধরনের ধারণা পোষণ করতাম তার সাথে মিলিয়ে দেখাই ছিলো এর কারণ।

শুনতাম শিল্পীরা আত্মভোলা হন, পৃথিবীর কোন জাগতিক দিকে মোহ থাকে না। রং তুলি ক্যানভাস আর প্রেমিক হৃদয় দিয়ে সর্বক্ষণে মগ্ন থাকেন।

ভুলটা ভাঙ্গতে বিলম্ব হয়নি। দেখলাম অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ থেকে শুরু করে প্রায় সবাই-ই সুবেশী, চলাফেরাও সাধারণ মানুষের মতই। তবে শিল্পকলা নিয়ে যখন কথাবার্তা বলেন তাঁরা, বা ছবি আঁকা শেখান অথবা আঁকেন তখন ভিন্নতর। অন্য জগতের মানুষ হয়ে যান। তাঁদের দেখার, গ্রহণ করার এবং বোধের ব্যাপারটি একজন নতুন ছাত্র হিসেবে আমার কাছে অবাক ঠেকতে থাকে।

এই ভাবেই ধীরে ধীরে সবকিছু ধাতস্থ হয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু বছরখানেক পরেই একরকম ভাবে দেখে আসা, সইয়ে ফেলা ধারণায় ব্যাঘাত ঘটলো। এক সকালে ক্লাশ শুরুর সময় এই ঘটনাটি ঘটলো।

ঘটনাটি এই রকম — আর্ট কলেজের অর্থাৎ চারুকলা ইন্সটিটিউটের চত্বরে অবস্থিত গোলাকার ছোট্ট জলাশয়কে ঘিরে আবেদিন স্যারসহ বেশ কয়েকজন শিল্পী বসে। গল্প করছেন একজন মহিলা অতিথির সাথে। আমরা ক্লাশের বারান্দা থেকে দেখলাম মহিলাটি আমাদের দিকে পেছন ফিরে বসে আছেন। পিঠে ঢেউখেলানো লম্বা কালো চুল। পরনে লাল পেড়ে সাদা শাড়ী। দৃশ্যটি নতুন ঠেকলো। ক্লাশ চলাকালীন শিক্ষকরা কেউ ওখানে গল্প করতে বসেন না। মহিলাটিই বা কে যে তাঁকে ঘিরে স্যারদের এই অনিয়মে যাওয়া। ক্লাশে ঢুকে গেলাম। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ ওখানে বসে থাকা শিক্ষক মণ্ডলীর দৃষ্টিতে পাড়লে আর রক্ষা থাকবে না।

এগারোটার দিকে হঠাৎ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, শিল্পী আনোয়ারুল হক দরজা খুলে ক্লাশে ঢুকলেন। সঙ্গে সেই অতিথি। চমকে উঠলাম। অতিথিটি মহিলা নন, একজন জলজ্যান্ত পুরুষমানুষ। এবং হাতে বাঁশের বাঁশী, কাঁধে ঝোলা। আবেদিন স্যার পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর সাথে সব ছাত্রছাত্রীর। নাম বললেন, শিল্পী সুলতান।

শিল্পীদের সম্বন্ধে যে ধারণাটি পোষণ করা শুরু করেছিলাম তা গোলমেলে হয়ে গেলো। কিছুতেই বুঝতে পারলাম না — যে এই শিল্পীর এমন ধারা অবস্থা কেন? আর্ট কেলেজে ভর্তি হওয়ার আগে শিল্পীদের সম্বন্ধে যা শুনলাম তার সাথেও যেমন মিল নেই তেমনি ভর্তির পরে যা দেখেছি, জেনেছি তার সাথেও।

কয়েকদিন পর আবেদিন স্যার ক্লাশে শিল্পী সুলতান সম্পর্কে গল্পচ্ছলে অনেক কথা বললেন। এস. এম. সুলতান যে দারুণ প্রতিভাবান শিল্পী সে কথা প্রথম জানতে পারি তাঁরই মুখে। সেই সাথে এও জানতে পেরেছিলাম যে, শিল্পী সুলতানের জীবনটাও বেশ বৈচিত্রে ভরা। জীবন সম্পর্কে উদাসীন, ভবঘুরে চালচলন, দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ান, সন্যাসীদের সাথে হিমালয়ের কোন মন্দিরেও দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন এবং নিজেও প্রায় সেই রকমের নির্লোভ জীবনে বিশ্বাসী, চমৎকার বাঁশী বাজান।

শিল্পাচার্য শিল্পী সুলতানের প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁর জলরঙের কথা উল্লেখ করেছিলেন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে। তখন অবশ্য শিল্পীর কোন জলরঙ ছবি দেখিনি। দেখার সুযোগ হয়েছিলো আরো পরে, লাহোরে প্রকাশিত কোন এক পত্রিকায় ছাপান নিসর্গ ছবি দেখে। মনে আছে, ছাপা তেমন ভাল না হলেও জলরঙের গুণগত মানে টইটম্বুর একটি টলটলে ছবি ছিলো সেটি। এইটুকুই ছিলো তাঁর ছবি সম্বন্ধে আমার তখনকার জ্ঞান।

দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় শিল্পীর সাথে প্রথম আমার আলাপ হয় হঠাৎ করেই। বিকেলে ক্লাশ ছুটির পর ঘাড়ে ব্যাগ ঝুলিয়ে কলেজের গেট দিয়ে বের হচ্ছি, দেখলাম শাড়ীর মত করে পরা গেরুয়া রং-এর কাপড়ে সুলতান সাহেবও বের হচ্ছেন। আকাশে অন্ধকার মেঘ। আমি দ্বিধান্বিত। মেঘ মাথায় করে রাস্তায় নামবো কি না। কারণ সাথে এক বান্ডিল ক্লাশে আঁকা ছবি। ভিজে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

সুলতান সাহেব এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন কোথায় যাবো। বললাম, তিনিও আমার পথেই যাবেন উল্লেখ করে সিদ্ধান্ত দিলেন যে, হাঁটা শুরু করাই ভাল। কি মনে করে তাঁর সাথে রওনা দিলাম বাঁয়ে রেসকোর্সের কাঠের সাদা বেড়ার পাশ ঘেঁষে ঘেঁষে। কিছু দূরে দূরে রেসের ঘোড়া ঘাস খাওয়ায় ব্যস্ত। সহিসরা আবার কিছু ঘোড়াকে দলাই-মলাই করছে। এই দৃশ্য দেখতে শিল্পী সুলতান দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন মাঝে মাঝে। গভীর মনোনিবেশে কিছুক্ষণ দেখলেন তারপর আবার হাঁটলেন। সহিসরা তাঁর বেশ-ভূষা দেখে নিজেরা ফিসফাস করে কিছু বলে হাসলো। কিন্তু শিল্পী নির্বিকার। এইভাবে বর্ধমান হাউসের কাছে (বাংলা একাডেমী) আসতেই বাঁয়ে মাঠে অন্ধকার করে বৃষ্টি নামলো। এমন বৃষ্টি যে, মাঠের মাঝে অবস্থিত কালী-বাড়ীটিও ঝাপসা হয়ে গেলো। কিন্তু তখনও আমাদের দিকে বৃষ্টি এসে পৌছায়নি। আমি আতঙ্কিত। কি করবো ভাবছি। শিল্পী সুলতান বললেন, 'ছবি ভিজে যাবার জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে বুঝি?' আমি কোন উত্তর দেবার আগেই তিনি হাত বাড়িয়ে আমার ছবির বান্ডিলটি ধরে বললেন, 'দিন, এটা আমার কাপড়ের ভেতরে ঢেকে রাখি। মোটা কাপড়, ভিজতে সময় লাগবে।'

বলা বাহুল্য, তাঁকে চিরকাল বয়সে ছোট-বড় সবাইকে 'আপনি' সম্বোধন করতে দেখেছি। যাইহোক, শিল্পী সুলতান আর আমি হাঁটছি। আমি ভাবছিলাম বড় কোন কড়ইবৃক্ষের নীচে গিয়ে দাঁড়াবো। বললামও তাই। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ তাই ভাল। তবে এমন ঘনকাল মেঘ অথচ বৃষ্টির যে ধরন তাতে মনে হয় এটা আসল বৃষ্টি নয়। থেমে যাবে। আসলটা আসবে পরে। তার আগে আমরা কার্জন হলে পৌছে যেতে পারবো।'

বৃষ্টি থামলো না। কিন্তু বেগ কমে এলো কিছুটা। কার্জন হলের কাছে রিকসা পেয়ে যাওয়ায় দু'জন দু'দিকে চলে গেলাম। তিনি চকবাজারের দিকে আর আমি এলাম গুলিস্তান হয়ে নারিন্দার দিকে।

সেই সাক্ষাতের পর বহুকাল তাঁর সাথে আর আমার দেখা হয় নি। শুধু আমার সাথেই

নয় অনেকের সাথেই। তাঁর সম্বন্ধে কথা উঠলেই শোনা যেতো হয় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে, নয়তো বিদেশে কোথাও গেছেন। এমনও শোনা যেতো যে, হয়তো আবার কোন সাধু-সন্ত বা আখাড়ায় মনোযোগী হয়ে পড়েছেন।

যতদূর জানি এই সময়টুকু তাঁর জীবনের সব চাইতে অনিশ্চয়তার। নিয়মিত ছবি আঁকতেন কি না তার কোন সঠিক হদিস পাওয়া যায় নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার ছয়-সাত বছর পর তাঁকে আবার ঢাকাতে পেলাম। বেশ বয়স বেড়েছে। তখন কালো আলখাল্লা পরেন। শিল্পীদের নানান আসরে আসেন। হাস্যোচ্ছল চেহারা। এখানে ওখানে বক্তৃতাও দেন। শারীরিক সুস্থতার এবং মানসিকভাবে অনেক স্থিতি এসেছে। শুনলাম দেশের অনেক শুভানুধ্যায়ী তাঁকে জোর করে ধরে ধরে ছবি আঁকছেন। এবং তিনি এন্তার ছবি আঁকছেন। আশির দশকের প্রথম দিকে তাঁর ছবি প্রায় নিয়মিত বিভিন্ন প্রদর্শনীতে দেখতে পাবার সৌভাগ্য হলো। লক্ষ্য করলাম একটা নির্দিষ্ট ধরনে তিনি ছবি আঁকছেন। যার বিষয় মূলতঃ গ্রাম-বাংলা। সব ছবিতে সহজিয়া একটা ভাব। 'ফ্রি-হ্যান্ড' মতন। তাঁর বসবাস অবশ্য তখন নড়াইলে। কেউ ডাকলে বা নিয়ে এলে অথবা প্রয়োজনে ঢাকা আসেন।

আরো কিছুদিন পর, চারশিল্পী সংসদের সম্মাননা গ্রহণ করতে তিনি ঢাকা এলেন। উঠলেন আমার বাসায়। অতএব জীবনে ওই প্রথম তাঁকে অত্যন্ত কাছে থেকে দেখার সুযোগ হলো। গভীরভাবে জানতে পারলাম। প্রতিদিন গল্প হতো ঘন্টার পর ঘন্টা। তা থেকে আবিষ্কার করলাম এক ভিন্নতর সুলতানকে। সেই গল্পে গল্পে তাঁর বৈচিত্র্যে ভরা জীবনের পুরোটাই প্রায় তিনি বলে ফেলেছিলেন। কিছু কিছু পর্যায়ে অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন। বিশেষ করে ছবি আঁকার জগত থেকে প্রায় নির্বাসিত সময়কে স্মরণ করে এবং কিছু সাধারণ অথচ অসাধারণত্বের অধিকারী মানুষ, যাঁদের সাথে তিনি মিশেছেন, ভালবাসা পেয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রে দীক্ষা অথবা পরামর্শ পেয়েছেন তাঁদের কথা স্মরণ করে। এই মানুষগুলির মধ্যে তাঁর গাঁয়ের কাছের কেউ যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন বিদেশে মেশা কোন অত্যন্ত সাধারণ কেউ। তিনি সবটাই বলেছিলেন প্রায় রূপকথার ঢঙ্গে।

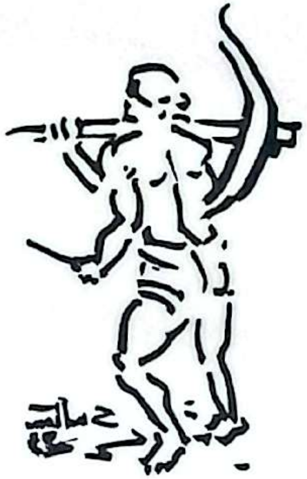
শিল্পী সুলতানকে কাছে পাওয়ার এইখানেই সমাপ্তি। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি কিংবদন্তীর নায়কে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। এস. এম. সুলতান তখন এক অসাধারণ শিল্পী ব্যক্তিত্ব। এর পরে মাঝে মধ্যেই দেখা হয়েছে, আলাপও হয়েছে। ক্রমশঃ অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখেছি। কিন্তু স্বাস্থ্য নিয়ে নৈরাশ্যে ভুগতে দেখিনি। প্রবল আত্মবিশ্বাসী এক শিল্পীকে আবিষ্কার করেছি তখন।



শিল্পাচার্যের ৭২তম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে শিল্পী এস. এম. সুলতানকে বাংলাদেশ চারুশিল্পী সংসদ সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে শিল্পীকে চাঁদর পরিয়ে দিচ্ছেন দুই তরুণ শিল্পী (১৯৮৬)



শিল্পকলা একাডেমী মঞ্চে শিল্পাচার্যের জন্ম-বার্ষিকী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন শিল্পী সুলতান (১৯৮৬)



অভিনব উদ্ভাসন

আহমদ ছফা

শেখ মুহম্মদ (এস. এম) সুলতানের আঁকা গুরুভার নিতম্ববিশিষ্ট পীনস্তনী এসকল চমৎকার স্বাস্থ্যবতী কর্মিষ্ঠা লীলাচঞ্চলা নারী, স্পর্ধিত অথচ নমনীয় সর্বক্ষণ সৃজনশীলতায় মত্ত অহল্যা পৃথিবীর প্রাণ জাগানিয়া এসকল সুঠামকান্তি কিষাণ, এসকল সুন্দর সূর্যোদয়, সুন্দর সূর্যাস্ত, রাজহাঁসের পাখনার মতো নরম তুলতুলে এসকল শুভ্র শান্ত ভোর, হিঙুল বরণ মেঘ-মেঘালীর অজস্র সম্ভার, প্রসারিত উদার আকাশ, অবারিত মাঠ গগন ললাট, তালতমাল বৃক্ষরাজির সারি, দীঘল বাঁকের নদীতীরের এসকল দৃষ্টিশোভন চর, মাঠের পর মাঠে থরে থরে ঢেউ খেলানো সোনার ধান, কলাপাতার ফাঁকে ফাঁকে জোনাকজ্বলা এমন মোহিনী অন্ধকার, আঁকাবাঁকা মেঠোপথের বাঁকে বাঁশ-কাঠে গড়া কিষাণের এসকল সরল আটচালা, এসকল আহলাদী বাছুর এবং পরিণত বয়স্ক গবাদিপশু, সর্বোপরি গোটা জনপদের জনজীবনের প্রসারিত উৎপাদন শৃঙ্খলে আবদ্ধ সভ্যতার অভিযাত্রী অজেয় মানুষ ; তারা যেন দৈনন্দিন জীবনধারণের স্রোতে কেলিকলারসে যুগ থেকে যুগান্তর পেরিয়ে অনন্তের পথে ভেসে যাচ্ছে, ক্যানভাসে তাদের প্রত্যয়দীপ্ত বলিষ্ঠ উপস্থিতি, স্বচ্ছন্দ ঋজু গতিভঙ্গিমা এমনভাবে বাঁধা পড়েছে, মনে হবে সমস্ত নিসর্গ দৃশ্য ছাপিয়ে মেঘেতে ঠেকেছে তাদের মস্তক এবং পাতালে প্রবিষ্ট হয়েছে মূল, তাদের শ্রম-ঘামের ঝঙ্কার, চেষ্টার সঙ্গীত সমস্ত প্রাকৃতিক কোলাহল ভেদ করে আকাশ গঙ্গার কিনারে কিনারে ছলাৎ ছলাৎ ধ্বনিতে একসঙ্গে ফেটে পড়ছে।

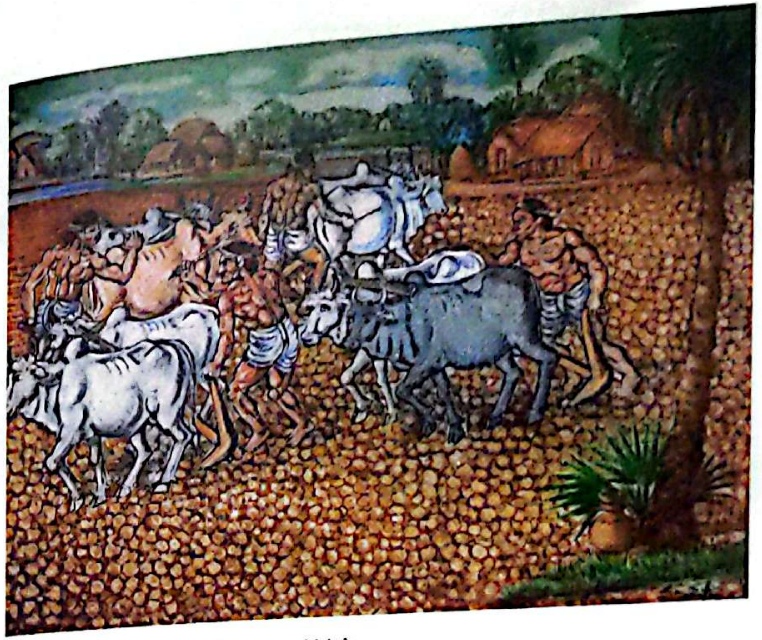
শহরের চৌমোহনার ইট-সিমেন্টের পুরো কঠিন আবরণ ফাটিয়ে একটা আস্ত ঝর্ণা যদি বন্য আদিম ভঙ্গিমায় জেগে ওঠে রঙিন জলধারা হঠাৎ করে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করতে থাকতো, পৃথিবীর অন্তরের এই নৃত্যপরায়ণ রসধারার প্রতি মানুষ যেমনি বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে দৃষ্টিপাত করতো, তেমনি চোখে মানুষ সুলতানের আঁকা এসকল ছবি দেখেছে। এই ছবিগুলো অত্যন্ত আকস্মিকভাবে বাঙালার অস্পষ্ট, ঝাপসা, কুয়াশাচ্ছন্ন, অবগুন্ঠিত অতীত ফুঁড়ে প্রবল প্রাণশক্তির তোড়ে ওপরের সমস্ত নির্মোক বিদীর্ণ করে শিল্পীর পারঙ্গম তুলির মাধ্যমে আমাদের যুগ এবং আমাদের কালের ঘাটে এসে আছড়ে পড়েছে। তারপর কোনোরকম ভনিতা না করেই বাংলাদেশের চিত্র-দর্শকদের উদ্দেশে অমোঘ নির্দেশবাণী উচ্চারণ করেছে : আমাদের দেখো। বাংলাদেশের মানুষ দেখেছে এবং মজেছে। রঙের পরশ দৃষ্টিপট ভেদ করে মনের পটে অক্ষয় হয়ে স্থির ইন্দ্রধনুর মতো ফুটে গেছে। গ্রাম বাংলার এই চলমান ইতিহাস প্রবাহের সঙ্গে দর্শকদের তন্ময় সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। তারা নিজেদের অস্তিত্বকেও এসকল কান্তিমান, আয়ুষ্মান চিত্রের অংশ হিসেবে মনে করতে বাধ্য হয়েছে।

সকলে চিত্রকলার মর্ম বোঝে না, সূক্ষ্মতর বোধ এবং উপলব্ধি অনেকের না থাকতে পারে, কিন্তু ইতিহাসকে তো কেউ অস্বীকার করতে পারে না। বিশেষত সেই ইতিহাস গাজন উৎসবের নটরাজের মতো অট্টরোলে যখন নেচে ওঠে। সুলতান বছর কয়েক আগে শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত তাঁর সর্বশেষ প্রদর্শনীটিতে বাংলার আবহমানকালের ইতিহাসটিকে নাচিয়ে দিয়েছেন। যারাই এ চিত্রগুলো দেখেছেন, তাদের উপলব্ধিতে একটি কথা ভ্রমরের মতো গুঞ্জরন করেছে। আমাদের সভ্যতার প্রাণ কৃষি আর কিষাণ হলো সভ্যতার নাটমঞ্চের একক কুশীলব। যখন মানুষের কানে মহাকাশ আর মহাপৃথিবীর শ্যামের বেণু অপূর্ব সুরলহরী বিস্তার করে দিয়ে যাচ্ছে, তখনও এই প্রাচীন ভূখণ্ডটিতে আদলে এবং অবয়বে মানুষ সেই সনাতন মানুষই রয়ে গেছে। তাই সুলতানের আঁকা এই মানুষেরা বাংলাদেশের হয়েও সমস্ত পৃথিবীর মানুষ। যেখানেই সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে সেখানেই আদিপিতা হলধর আদমের চেহারায় তারা উপস্থিত ছিলো। তারা মিশরে ছিলো, চিনে ছিলো, ভারতে, ব্যাবিলনে, গ্রীসে, রোমে সবখানে বন কেটে বসত গড়ার দিনে, মাটির মর্মমধু টেনে তোলার বেলায়, বনের অগ্নিকুণ্ড পরিত্যাগ করে ঘরের দাওয়ায় সান্ধ্য-প্রদীপ জ্বালাবার নম্র-মধুর ক্ষণে তারা হাজির ছিলো। যেখানেই মাটি শ্রমশীল কর্মিষ্ঠ মানুষের শ্রমে-যত্নে প্রসন্ন হয়ে ফুল-ফসলের বর দিয়েছে, উপহার দিয়েছে শান্ত স্নিগ্ধ গৃহকোণ সেখানেই ইতিহাস গতিচঞ্চল পথ পরিক্রমার সূচনা করেছে। মাটি এবং মানুষের এই

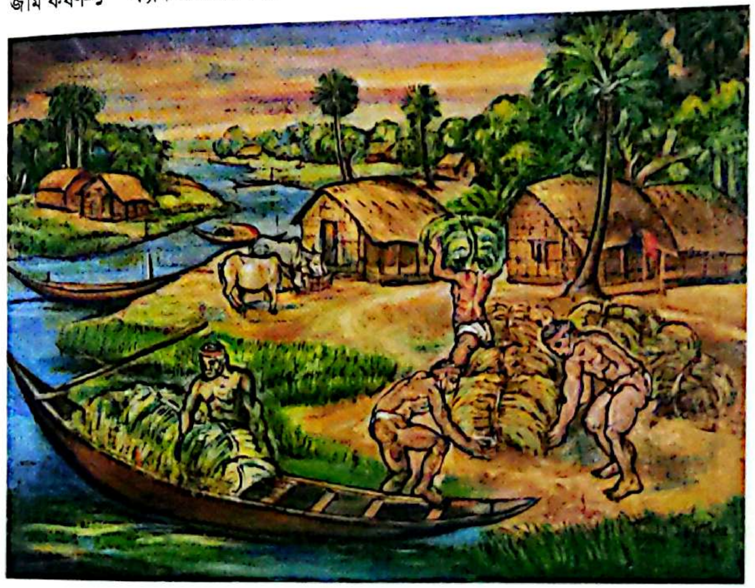
দ্বৈত সম্পর্ক, বিশদ করে বলতে গেলে, নিসর্গ এবং মানুষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সুলতানের আঁকা চিত্রমালায় এমন আকার পেয়েছে, এমন বরণ ধরেছে যে একান্ত নির্জীব এবং পাষণ্ড না হলে তার আবেদন অস্বীকার করা প্রায় একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলার বদলে সুলতান যদি আরব দেশে জন্ম নিতেন, মরুচারী বেদুইনদের ছবি আঁকতেন। যদি জন্মাতেন নরওয়ে, সুইডেনে তাহলে সমুদ্রচারী জেলেদের সভ্যতার পথিকৃৎ হিসেবে আঁকতেন। নেহায়েত বাংলাদেশে জন্ম নিয়েছেন বলেই এই কৃষকদের সভ্যতার জনপ্রিয়তা ধরে নিয়ে ছবি এঁকেছেন। সুন্দর প্রকৃতিতে নয়--মানুষের মনই সৌন্দর্যের নিবাসভূমি। চারদিকে দৃষ্টিরেখা যতদূর ধাবিত হয় এবং সামনে পেছনে চিন্তা-কল্পনা অনেক দূর বিহার করার পর যে অনড় বিন্দুটিতে এসে স্থির হয়, সংহত হয়, সেইখানে, কেবল সেইখানেই সৌন্দর্যের নিভৃত নিকুঞ্জ। সেজন্য একজন আরবের চোখে লু হাওয়া তাড়িত ধু ধু মরুভূমি সুন্দর, একজন এস্কিমোর চোখে তুষার-আচ্ছাদিত ধবল তুন্দ্রা সুন্দর।

সুলতানকে বাংলার প্রকৃতিতে, বাংলার ইতিহাসে এবং বাংলার মানুষের শ্রম, ঘাম, সংঘাতের ভেতরে সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করার জন্য পাড়ি দিতে হয়েছে দুস্তর পথ, পেরিয়ে আসতে হয়েছে সাধনা এবং নিরীক্ষার অনেকগুলো পর্যায়। তাঁর ব্যক্তি-জীবন এবং শিল্পী-জীবনের সমান্তরাল যে অগ্রগতি তা কম বিস্ময়কর নয়। পরে সে বিষয়ে আলোকপাত করা যাবে। আপন অন্তরস্থিত সৌন্দর্যবোধ, নিসর্গ, ইতিহাস এবং জীবন্ত শ্রমশীল মানুষের মধ্যে চারিয়ে দিয়ে ক্যানভাসে সবকিছু মূর্ত করে তোলা—এর সবটুকু তাঁর একক শৈল্পিক-প্রয়াসের ফলশ্রুতি নয়। তার জন্য এই সুপ্রাচীন দেশটিকে সাম্প্রতিককালে একটি রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে ঘোষণা করতে হয়েছে। একটি উদ্ভিদ-সমতুল ঘুমন্ত জাতির প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে, প্রতিটি সামাজিক স্তরের মানব সাধারণের ভেতর বন্দুকের আওয়াজে, কামানের হুঙ্কারে যে জাগরণ এসেছে, যা তাদের সম্মিলিত সৃষ্টিশক্তির তেজ উপলব্ধি করিয়ে ছেড়েছে, তার প্রয়োজন অপরিহার্য ছিলো। ইনকিউবেটর যন্ত্রের তাপে ডিমের খোলস ফেটে যেমন করে মুরগীর বাচ্চা প্রাণ পেয়ে বেরিয়ে আসে, তেমনিভাবে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের উত্তাপে শিল্পীর অন্তর চিরে এসকল ছবি বেরিয়ে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের সবটুকু আবেগ, সবটুকু জীবনোল্লাস, সবটুকু স্পর্ধা এবং দুঃসাহস এই ছবিগুলো ধরে রেখেছে। এরকম একটি প্রলয়ঙ্করী ঘটনা না ঘটলে সুলতানের তুলি কস্মিনকালেও এরকম আশ্চর্য ছবি প্রসব করতে সক্ষম হতো না, যতো



জমি কর্ষণ-১ ক্যানভাসে তেল রং ১৯৮৬



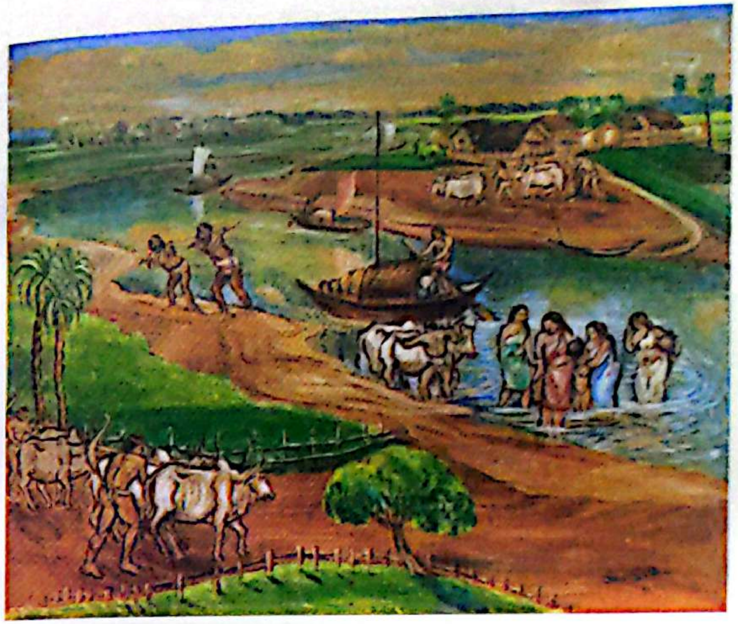
ধান তোলা ক্যানভাসে তেল রং



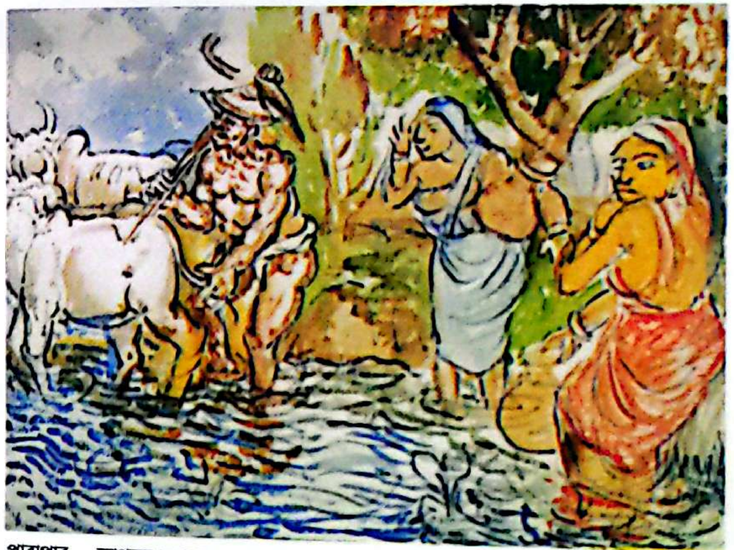
মাছ ধরা   ক্যানভাসে তেল রং   ১৯৯২



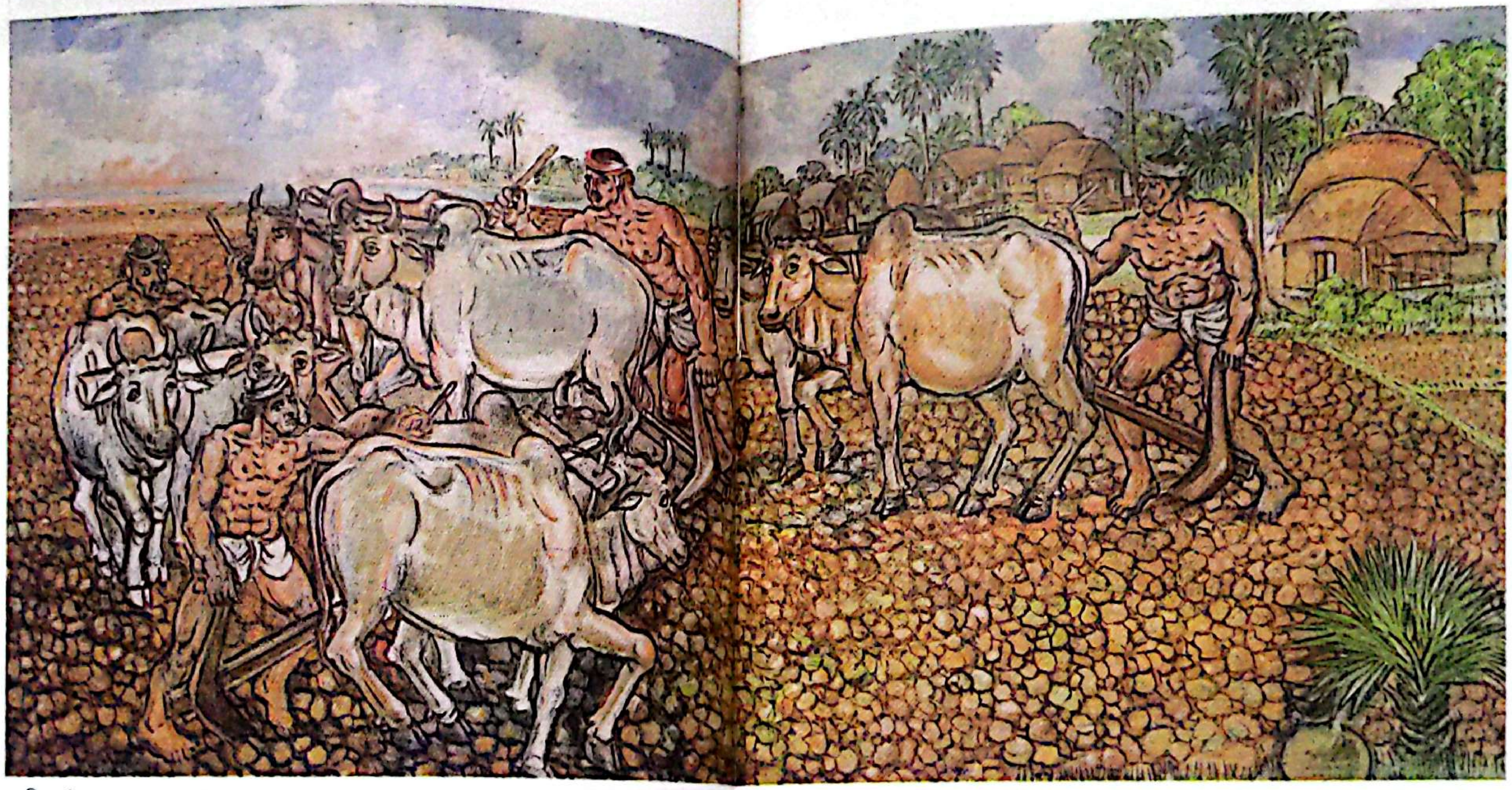
ধান কাটা   কাগজে জল রং   ১৯৯২



গুন টানা   ক্যানভাসে তেল রং   ১৯৮৯



পারাপার   কাগজে জল রং   ১৯৯২



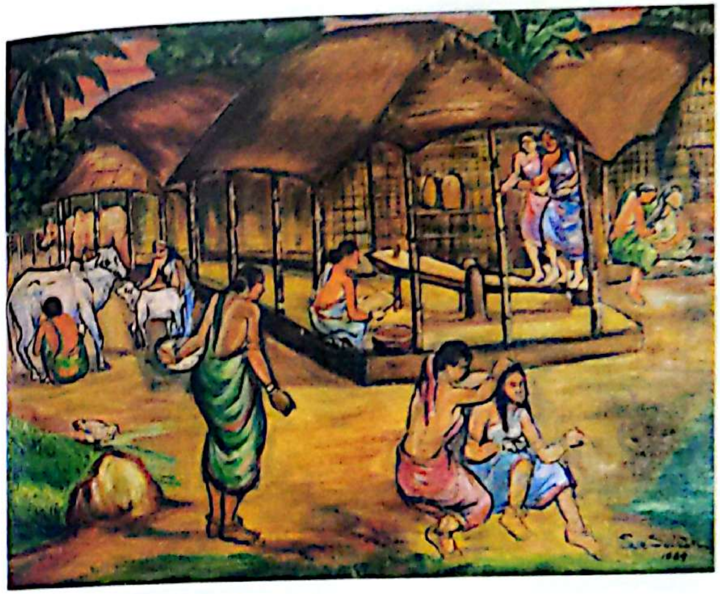
জমি কর্ষণ-২ ক্যানভাসে তেল রং ১৯৮৭



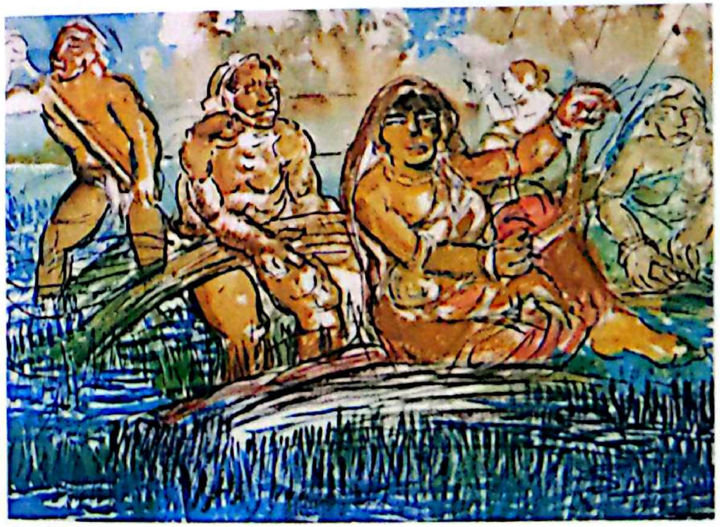
ধান ভানা ক্যানভাসে তেল রং ১৯৮৫



ধান ঝাড়া কাগজে জল রং ১৯৯৩



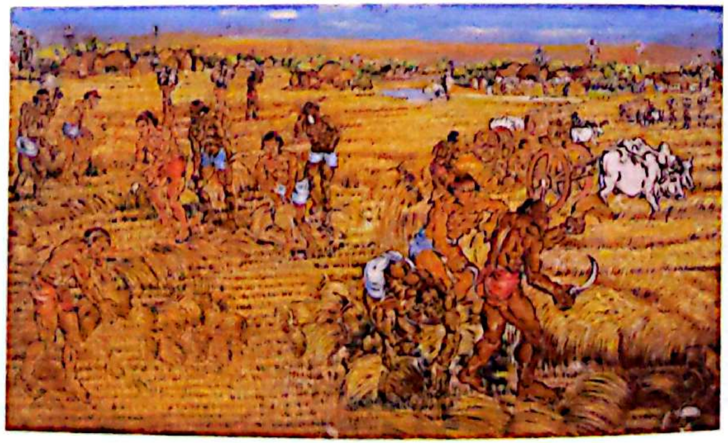
ধান ভানা ক্যানভাসে তেল রং ১৯৮৯



পাট কাটা কাগজে জল রং ১৯৯২



নদীর ঘাটে ক্যানভাসে তেল রং ১৯৯৪



ধান কাটা ক্যানভাসে তেল রং ১৯৮৭

প্রতিভাই তাঁর থাকুক, কিষাণ জীবনের প্রতি তাঁর অনুরাগ-মমতা যতোই নিবিড় গভীর হোক না কেন। বাঙালী জাতির ঐতিহাসিক সংগ্রামের একেবারে অন্তঃস্থল থেকেই এসকল চিত্রের উদ্ভব। এ কারণে এ ছবিগুলো দর্শকের মনেও প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসবোধ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম। হয়তো দর্শক সচেতনভাবে অনুভব করতে পারেন না, কিন্তু অন্তরালে এই বোধ ক্রিয়াশীল থাকে ঠিকই। ইতিহাসের এই জাগ্রত দেবতার প্রতি অজানিত শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে দলে দলে মানুষ এ সকল ছবি দর্শন করতে এসেছে। যুদ্ধে পরাজিত, আত্মগ্লানিতে দগ্ধ ভেনিসের মরমে মরে যাওয়া জনসাধারণও আজ থেকে বহুকাল আগে একদা তরুণ শিল্পী মিকেলেঞ্জেলোর অপূর্ব মূর্তি ডেভিডের দিকে ভেনিসের অপরাজেয় ক্ষাত্রশক্তির প্রতীক হিসেবে মমতা-মেদুর নয়নে দৃষ্টিপাত করেছিলো। আমাদের দেশের চিত্রশিল্পী এবং চিত্রসমালোচক এ দু'জাতের দৃষ্টিসীমার অনেক দূরে এই পরিপ্রেক্ষিতের অবস্থিতির দরুন তাঁরা এ অমর চিত্রসমূহের প্রতি শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে প্রণতি জানাতে পারেননি।

সে যাই হোক, শেখ মুহম্মদ সুলতানের চিত্রকর্ম আলোচনা করতে গেলে অবশ্যই তাঁর জীবন আলোচনা করতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ থেকে জয়নুল আবেদিন পর্যন্ত সমস্ত শিল্পীর যে জীবন বৃত্তান্ত আমরা জানি তার সঙ্গে শেখ সুলতানের জীবন-বৃত্তের সামান্যতম মিল কোথাও নেই। অন্য সকল শিল্পীর জীবন এবং তাঁদের কৃত শিল্পকর্ম একটা ছকে ফেলে বিচার করা যায়। শেখ সুলতানের জীবনকে যেমন তেমনই তাঁর ছবিকেও বিচার করতে হবে অনেকগুলো ছকে ফেলে এবং তার সবগুলো আমাদের মানস-দৃষ্টির সামনে উপস্থিতও নেই। সুলতানের জীবন বলতে বড়জোর যা বলতে পারি তা হলো লাল মিয়া নামে একটি শিশু যশোর জেলার একটি দরিদ্র কৃষক পরিবারে আজ থেকে পঞ্চান্ন কি ষাট বছর আগে জন্ম নিয়েছিলো। সেই শিশুটিই এখন শেখ সুলতান নাম ধারণ করে যশোরের সেই কৃষক সমাজে ঝাঁকড়া কেশ দুলিয়ে নমঃশূদ্র নর-নারীর আদরের গোঁসাই সেজে অর্ধেক ছন্নছাড়া-লক্ষ্মীছাড়া, অর্ধেক সন্তের বেশে সাপ-শেয়াল-ইঁদুর-বেড়াল নিয়ে রঙের সংসার পেতে বসে আছেন।

আজকের দিনে সুলতান বলতে যশোরের যে ঝাঁকড়া কেশের আউলা-ঝাউলা মানুষটিকে বোঝায়, যিনি প্রৌঢ়ত্বের চৌকাঠে বেশ কিছুদিন আগে পা রেখেছেন ; পুত্র-কন্যা-স্ত্রী-সংসারহীন একেবারে একাকী একজন-প্রাকৃতিক মানুষ ; তিনি যখন এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন, উনিশশ' ছিয়াত্তর সালে ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমীর প্রদর্শনী উপলক্ষে আঁকা এসকল চিত্র-সন্তান ছাড়া তাঁর নামের অমরতা ঘোষণা করার আর কেউ থাকবে না।

কস্তুরী হরিণের মতো আপনার গন্ধের পেছনে আপনি কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর বেগে প্রাণ-প্রবাহের তাপে, 'হেথা নয় হেথা নয়' নিরন্তর তিরিশটি বছরের ছুটে চলা জীবনের সমস্ত বেগ, সমস্ত আবেগ যশোরের ভাঙা মন্দিরের দ্বারে দ্বারে, জীর্ণ অট্টালিকার খিলানে-অলিন্দে, তরুলতার সংসারে পশু-পাখির সমাজে অসহায় শিশুর মতো গৃহ সন্ধান করে চলেছে। জীবন যাকে হেঁকচা টানে গৃহ-সমাজ-সংসারের বন্ধন খসিয়ে শিল্পতীর্থের যাত্রী করেছে, শিল্পের মানস-সায়রের উপকূলেই তো তাঁকে গৃহ সন্ধান করে নিতে হয়। এই গৃহের সন্ধান তিনি একবার পেয়ে গিয়েছিলেন। তখন উনিশশ' একাত্তুর সাল। হাজার বছরের পরাধীন বাংলা প্রাণ-পাতালের অভ্যন্তরে অপরাজেয় সত্তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে, দর্পিত শক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে, ভেতর থেকে শিউরে আগুন বরণ ফণা মেলে জেগে উঠেছিলো। বাংলার ইতিহাসের সেই অভাবিত, সেই অচিন্তিত-পূর্ব জাগরণের অরুণ আভায় তার একখানি আশ্রয় নিকুঞ্জের ছায়া দর্শন করেছিলেন শেখ সুলতান, কামান-বন্দুকের হুংকারের মধ্যে গৃহের কল-কাকলী কান পেতে শুনেছিলেন। ইতিহাসের এই থরোথরো কম্পিত জাগরণের মধ্যে তিনি ধ্যান দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন সমাজের ওপরতলার শ্রেণীগুলো, বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময়ে যারা ঔপনিবেশিক শক্তির সহায়তা দিতে দিতে উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কহীন পরগাছার মতো ফাঁপানো-ফোলানো জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, এই সামাজিক ভূমিকম্পে তাদের অস্তিত্ব তাসের ঘরের মতো ভেঙে তছনছ হয়ে যাচ্ছে, সময়ের প্রখর তাপে তারা মোমের পুতুলের মতো গলে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এই কম্পনের বেগ ধারণ করা তাদের সাধ্যের বাইরে—এই জাগরণের আগ্নেয় সংবাদ বহন করতে গিয়ে তারা জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাবে। পাশাপাশি আরেকটি শ্রেণীকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, প্রকৃতি এবং ইতিহাসের গভীরতম অঙ্গীকার যারা নিরবধিকাল ধরে বহন করে চলেছে, নতুন ফুটন্ত ইতিহাসের আবেগ-উত্তাপ সবটুকু পান করে ফুটে উঠবার বীর্য এবং বিকাশমান সৃষ্টিশীলতা যাদের আছে। সেই শ্রমজীবী কিষাণ জনগণকে তিনি বাংলার ইতিহাসের নবীন কুশীলব হিসেবে দেখতে পেরেছিলেন। এ দেখা সমাজ-বিজ্ঞানীর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সামাজিক সম্পর্কের জটা জাল বিচার নয়, অর্থশাস্ত্রীর চুলচেরা শ্রেণী-বিশ্লেষণ নয়। এ দেখা শিল্পীর দেখা : বিন্দুতে সিন্ধু ঝিলমিলিয়ে ওঠে, ক্ষুদ্র তিল পরিমাণ বীজকণার অন্তরে সম্ভাবনার স্বপ্ন নিয়ে শায়িত থাকে বিশাল মহীরূহ। তাই সুলতানের কৃষক জয়নুল আবেদিনের কৃষক নয়। জয়নুল আবেদিনের কৃষকেরা জীবনের সংগ্রাম করে। সুলতানের কৃষকেরা জীবনের সাধনায় নিমগ্ন। তারা মাটিকে চাষ করে ফসল ফলায় না। পেশীর শক্তি দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সংগম করে প্রকৃতিকে ফুলে-ফসলে সুন্দরী সন্তানবতী হতে বাধ্য করে।

এইখানে জীবনের সংগ্রাম এবং সাধনা, আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন, আজ এবং আগামীকাল একটি বিন্দুতে এসে মিশে গিয়েছে। সুলতানের কৃষকেরা নেহায়েত মাটির করুণা কাঙাল নয়। রামচন্দ্র যেমন অহল্যা পাষাণীকে স্পর্শ করে মানবী রূপ দান করেছিলেন, তেমনি তাঁর মেহনতি মানুষদের পরশ লাগা মাত্রই ভেতর থেকে মাটির প্রাণ সুন্দর মধুর স্বপ্নে ভাপিয়ে উঠতে থাকে। এ মানুষগুলো পাখা থাকলে দেবদূতের মতো আকাশের অভিমুখে উড়াল দিতে পারতো। কিন্তু একটি বিশেষ ব্রতে, একটি বিশেষ অঙ্গীকারে আবদ্ধ বলেই তারা মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে আছে। সে অঙ্গীকারটি সে ব্রতটি মাটিকে গর্ভবতী ও ফসলশালিনী করা। মাথার ওপরে স্বর্গলোকের যা কিছু প্রতিশ্রুতি, যা কিছু প্রেরণা তার সবটুকু আকাশের নীল থেকে, রামধনুর বর্ণের সুষমা থেকে ছেঁকে এনে মাটির ভেতরে চারিয়ে দিয়ে যাচ্ছে এই মানুষ-মানুষীর দল। ম্যাক্সিম গোর্কীর সেই বাক্যটি 'কি দর্পিত, কি ব্যঞ্জনাময় এই মানুষ শব্দটি' —উচ্চারণ মাত্রই নিসর্গের অন্তরে কি ব্যাকুল সাড়া এবং কানাকানি পড়ে যায়। সুলতানের আঁকা এই কৃষকদের যিনি দেখেছেন, অবশ্যই একমত হবেন, ম্যাক্সিম গোর্কীর মানুষ সম্পর্কিত মন্তব্য কতো সার্থক এবং যথার্থ হয়েছে।

শেখ সুলতানের মধ্যে দ্য ভিঞ্চি, মিকেলেঞ্জেলো, রাফায়েল প্রমুখ শিল্পীর প্রকাণ্ড কল্পনা এবং কল্পনার বলিষ্ঠতার ছাপ এতো গভীর এবং অনপনেয় যে মনে হবে, এ চিত্রসমূহ, কোনো রকমের মধ্যবর্তিতার বালাই ছাড়া, সরাসরি রেনেসাঁস যুগের চেতনার বলয় থেকে ছিটকে পড়ে এই উনিশশ' ছিয়াত্তর সালে বাংলাদেশের কৃষক সমাজে এসে নতুনভাবে জন্মগ্রহণ করেছে। এই ছবিগুলো আঁকার মতো মানসিক স্থিতাবস্থা অর্জন করার জন্য শেখ সুলতানকে সব দিতে হয়েছে। পরিবারের মায়া, বংশধারার মধ্যদিয়ে নিজের অস্তিত্বকে প্রবাহিত করার স্বাভাবিক জৈবিক আকাঙ্ক্ষা ভেতর থেকে ছেঁটে দিয়ে, এই চিত্রসন্তান জন্ম দেয়ার একাগ্র প্রায় কাপালিক সাধনায় নিযুক্ত থাকতে হয়েছে সারাজীবন। শেষপর্যন্ত অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। বাংলার শিল্পীর হাত দিয়ে বাংলার প্রকৃতি এবং বাংলার ইতিহাসের একেবারে ভেতর থেকে রেনেসাঁস যুগের ফুল ফুটেছে। সুলতানের সাধনা মিথ্যা হয়ে যেতো, যদি না বাংলার শিল্পীর সঙ্গে সহযোগিতা করে একটি যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়ে ইতিহাসের জাগ্রত দেবতা স্বরূপে শিল্পীর সামনে এসে না দাঁড়াতেন।

এইখানেই সুলতানের অনন্যতা। এইখানেই বাংলার কোনো শিল্পীর সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনো শিল্পীর সঙ্গে সুলতানের তুলনা চলে না। অবনীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, নন্দলাল, জয়নুল আবেদিন, আবদার রহমান চুঘতাই, নাগী এসকল দিকপাল

শিল্পীর মধ্যে যতোই পার্থক্য থাকুক, তবু সকলের মধ্যে অন্তর্নিহিত যোগসূত্র অবশ্যই রয়ে গেছে। হ্যাভেল ভারতীয় শিল্পাদর্শের যে ব্যাপক সংজ্ঞাটি দিয়েছেন, কেউ তার আওতা ছাড়িয়ে যেতে পারেননি—একমাত্র সুলতান ছাড়া। বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন যে কাজটি করেছেন চিত্রকলার সুলতান সেই একই কাজ করেছেন। মধুসূদন যখন মহাকাব্য লিখেছেন, তার বহু আগেই ইউরোপে মহাকাব্য লেখার কাজ চুকেবুকে গেছে। কিন্তু মধুসূদন মহাকাব্য লিখলেন বাংলা ভাষায়। মধুসূধন দত্তের মহাকাব্য বাংলার সাহিত্য গগনে সূর্য শশক্ষ দীপ্তি নিয়ে অনন্যতার নিদর্শন হয়ে মানব কল্পনার কুতুবমিনারের মতো দাঁড়িয়ে আছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অতিকায় কল্পনার বোঝা আরো অধিক বহন করবার জন্য তাঁর স্বগোত্রীয় কবিকুলের মধ্যে দু'চারজনের আকাঙ্ক্ষা জন্মালেও ক্ষমতা কারো যে ছিলো না, তা তো প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুলতানের এই চিত্রগুলোও অনেকটা সে গৌরবে গরীয়ান।

কোনো কোনো মানুষ জন্মায়, জন্মের সীমানা যাদের ধরে রাখতে পারে না। অথচ যাদের সবাইকে ক্ষণজন্মাও বলা যাবে না। এরকম অদ্ভুত প্রকৃতির শিশু অনেক জন্মগ্রহণ করে জগতে, জন্মের বন্ধন ছিন্ন করার জন্য যাদের রয়েছে এক স্বাভাবিক আকুতি। তাদের সকলের জন্মে জন্মান্তর ঘটে না। কোটিতে গুটি হয়তো মেলে যারা জন্মেই জন্মান্তরের নির্বাণ লাভ করে। জীবনের দেবতা আপনি এগিয়ে এসে তাদের প্রাণের দেহলীতে সে আশ্চর্য পিদিম জ্বালিয়ে দিয়ে যান। সৌভাগ্য হোক, দুভার্গ্য হোক এ সকলের হয় না। শেখ মুহম্মদ সুলতান সে সৌভাগ্যের বরে ভাগ্যবান, আবার সে দুর্ভাগ্যের অভিশাপে অভিশপ্ত।

সুলতান ওরফে লাল মিয়ার জন্ম যশোর জেলার নড়াইল মহকুমার একটি কৃষক পরিবারে। কৃষি ছাড়াও তাঁর বাবা বছরের অকর্মা মাসগুলোতে কিছু বাড়তি আয়ের জন্য করতেন ঘরামীর কাজ। গ্রামীণ সমাজের পেশা বিচারে ঘরামী একটি বিশিষ্ট শ্রেণী। জন্মসূত্রে সবাই ঘরামী হয় না। কেউ কেউ যেমন গ্রামীণ সমাজে গায়ক বা বয়াতি হয়ে যায় তেমনি কেউ বেত-বাঁশ নাড়াচাড়া করতে করতেই একদিন ঘরামী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই কিছুদিন আগে করোগেটেড টিন আসার পূর্বমুহূর্তটিতেও গ্রামীণ সমাজে একজন ভালো ঘরামী একজন শিল্পীর মতো খাতির-যত্ন পেতো। বাখারির বেড়াযুক্ত আটচালা, চৌচালা, শায়িত হাতীর মতো আকৃতিবিশিষ্ট দোচালা বাংলার সে বিচিত্র গৃহনির্মাণ পদ্ধতির অপমৃত্যু হয়েছে সে কবে। এখনো হয়তো দোচালা হয়, হয়তো কেউ কেউ আটচালা ঘর উঠায়। কিন্তু তাতে প্রাণের সে ললিত প্রকাশ কোথায়? কোথায় সে বেত-বাঁশের রকমারী

কারুকর্ম? এখন যে আটচালা দোচালা হয় সেগুলো তো দারিদ্র ও হতশ্রীর প্রকাশমাত্র এবং দরিদ্র মানুষদের মাথা গুঁজবার স্থূল প্রয়োজনের উৎকট নির্মাণ। শিল্পিত চাহিদার প্রতিফলন নয়। বাংলার সে ঐতিহ্যিক বাঁশ-বেত-কাঠের নির্মিত গৃহশোভা চিরতরে বিলীন হওয়ার পথে। সে যাক, উত্তরাধিকারসূত্রে বিচার করলে বড়োজোর এটুকু বলা যেতে পারে, গৃহনির্মাণ শিল্পী পিতার কাছ থেকেই লাল মিয়ার মনে অপূর্ব বস্তুনির্মাণের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। কিন্তু সেটাও সবার কাছে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হবে, তেমন বলার উপায় নেই। সে যাহোক, শিশু লাল মিয়া সুযোগ পেলেই কাঠ-কয়লা দিয়ে ছবি আঁকতো রঙ পেলে তো কথাই নেই। কিন্তু রঙ পাবে কই? তাই সে কাঁচা হলুদ আর পুঁই গাছের ফলের রস টিপে টিপে ছবি আঁকতো। একদিন লালমিয়ার আঁকা এসকল ছবি স্থানীয় জমিদারের দৃষ্টিতে পড়ে। জমিদার মহাশয় খুবই অবাক হয়ে যান। সেখানে তাঁর পড়াশোনা কতদূর হয়েছিলো, বিশদ জানা যায়নি। তবে এটুকু সত্য যে স্কুলের শেষ পরীক্ষা পাস করার আগেই লালমিয়া পালিয়ে কলকাতা চলে যায়। কলকাতাতেই কিভাবে জানা যায়নি কলা-সমালোচক শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর চোখে পড়ে কিশোর লাল মিয়ার ছবি। তিনি তাকে বাসায় নিয়ে খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করে দেন, জামা-কাপড় কিনে দেন এবং নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও সুপারিশ করে আর্ট স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। তার নামান্তর ঘটে যায়। সোহরাওয়ার্দী সাহেব লাল মিয়ার নতুন নামকরণ করলেন শেখ মুহম্মদ সুলতান। এই নামান্তর ঘটিয়েই জন্মান্তরের একটি ধাপ পার করে দিলেন। আর্ট স্কুলেও তার আঁকাবুকির পালা সাঙ্গ হবার আগে লাল মিয়া ওরফে সুলতান আরো একবার নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ালেন, রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পের সেই সুকুমার স্নিগ্ধকান্তি কিশোরটির মতো, অযাচিতভাবে পাওয়া আদর-যত্ন বিত্ত-বৈভব এবং ভাবী স্ত্রীর মায়া পরিত্যাগ করে বিয়ের আগের দিন যে কাউকে কিছু না বলে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলো। প্রথমবার গ্রামের লালমিয়া পালিয়ে শহর কলকাতায় এসেছিলো। দ্বিতীয়বার শহর কলকাতা ছেড়ে কন্যাকুমারিকা থেকে হিমালয় পর্যন্ত প্রসারিত গোটা ভারতবর্ষ অভিমুখে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন। শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর মতো একজন স্নেহশীল অভিভাবকের আশ্রয়, সোহরাওয়ার্দী পরিবারের গরিমা কিছুই সুলতানকে আটকে রাখতে পারেনি। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল। সুলতান পাঁচ-দশ টাকার বিনিময়ে গোরা সৈন্যের ছবি আঁকছে, আর ভারতের শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভয়-ভাবনা নেই, দায়-দায়িত্ব নেই, আছে শুধু সুন্দরের প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ আর ছুটে চলার গতি। এ সময়ে আঁকা ছবিগুলোর কি হয়েছে, কোথা থেকে কোথায় গেছে কেউ বলতে পারে না। ভারতবর্ষের নানা শহরে

অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীগুলোর বিলম্বিত সংবাদ আজ বুকে শুধু দীর্ঘশ্বাসের জন্ম দেবে। অনুমান করারও উপায় নেই, সে সময়ে তাঁর অঙ্কনশৈলী কিরকম ছিলো। সময়ের এবং বয়সের ব্যবধানে কতোদূর বিবর্তিত এবং রূপান্তরিত হয়েছে অঙ্কনরীতি, বোধ এবং উপলব্ধি।

তারপরে ভারত ভাগ হলো। সুলতান এলেন পাকিস্তানে। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর-করাচীতে অবস্থান করার সময় কখনো ঘর বাঁধার স্বপ্ন এ ঘরছাড়া মানুষটির মনে ঘনিয়ে এসেছিলো কিনা, সে অন্তর্গত সমাচার দেয়া রীতিমতো দুঃসাধ্য। সূর্মা-আঁকা কাজলটানা কোনো রমণীর ব্রীড়াভঙ্গী তাঁকে চঞ্চল এবং উতলা করেছিলো কিনা, বলতে পারবো না। তেমনি করতে পারবো না ছবি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য। এ সময়ে তিনি বিমূর্ত রীতিতে নাকি দেদার ছবি এঁকেছেন। পরী-কন্যার স্তরের গল্পের মতো কেবল গল্প শুনবো। কোনোদিন চোখে দেখতে পাবো না। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর অনেক প্রদর্শনী হয়েছে। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি সে সকল প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছেন, সংবাদপত্রের প্রশংসা প্রশস্তির সবটুকু হারিয়ে যায়নি। নানা সাময়িকীর কল্যাণে দুয়েকটার মুদ্রিত ব্লকও হয়তো সন্ধান করলে পাওয়া যাবে। সেগুলো তো আর ছবি নয়। ছবির ছবি। সুতরাং কোনো সুচিন্তিত মন্তব্য করা অসম্ভব। বিলেতে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর ছবিগুলো সম্পর্কেও আমরা একই রকম অন্ধকারে থেকে গেছি। যদিও 'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকায় উষ্ণ আলোচনা থেকে অনুভব করতে পারি ছবিগুলো ভালো হয়েছিলো এবং দর্শকরা প্রাণভরে উপভোগ করেছিলেন। কিন্তু আসল ছবি যেখানে অনুপস্থিত সেখানে কি কোনো কথা চলে? মন্তব্যগুলো শুনে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিলেতের পর আমেরিকা। সেখানেও সুলতান ছবি এঁকেছেন, সে ছবিগুলো কে কিনেছে, কোথায় কিভাবে আছে, অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে আছে না হারিয়ে গেছে, কার কাছে জিজ্ঞেস করলে সদুত্তর পাওয়া যাবে জানি না। এখানেই নিরুদ্দেশ যাত্রার ইতি। অন্যূন চল্লিশ বছরের জীবনের একটানা ছুটে চলা ঘর বিরাগী জীবনের সম্পর্কে কোনো গহন কথা আমরা যেমন উচ্চারণ করতে পারবো না, তেমনি তাঁর এ সুদীর্ঘকালের আঁকা ছবির ওপর কোনো বক্তব্য রাখতেও পারবো না। তাবৎ কলা-সমালোচকের মনে সুলতানের এ-পর্যায়ে আঁকা ছবিগুলো একটা অতৃপ্ত কৌতূহল এবং একটা আফসোসের বিষয় হয়ে থাকবে। সুতরাং সুলতান বলতে যশোরের গণ্ডগ্রাম নিবাসী, মুসলমান চাষী এবং নমঃশূদ্র জীবনের একান্ত শরীক এই মানুষটিকেই চরম ও পরমভাবে মেনে নিতে হবে। তাঁর জীবনের যেন কোনো সূচনা নেই, শৈশব নেই, কৈশোর নেই, হঠাৎ করে বাংলাদেশের ইতিহাসের ভেতর থেকে একরাশ কাঁচাপাকা বাবরি চুল দুলিয়ে জেগে

উঠেছেন। তাঁর ছবির সম্পর্কেও একই কথা। এ ছবিগুলোও অতীতের একেবারে কোলঘেঁষা অন্ধকার ভেদ করে দলে দলে জগৎ-সংসারের কাছে এই মানুষ এই সভ্যতা, এই সমাজ, এই ইতিহাস এবং এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের বার্তা প্রেরণ করবার জন্য যেন আচমকা কারো মন্ত্রমুগ্ধ আহবানে ছুটে এসেছে।

এই যুদ্ধ এই জাগরণের একটা উল্লসিত বার্তা তো ছবিগুলোর মধ্যে আছে। হাজার হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে একটা জাতি প্রাকৃতিক সত্যের মতো জেগে উঠছে, শিল্পীর তুলিতে যখন এ জাগরণ-বৃত্তান্ত মূর্তিমান হয়, সে প্রবল প্রাণস্পন্দন ঝংকারিত না হয়ে কি পারে? কিন্তু পাশাপাশি একটা বেদনার দিক আছে। সুলতানের আঁকা একটা ছবি আছে—যা তিনি প্রদর্শনীতে হাজির করেননি। ছবিটির নাম 'বিপ্লব'। একজন শক্ত সমর্থ মানুষ আপন হাতে তাঁর মস্তক ছিঁড়ে ফেলে ছুঁড়ে দিচ্ছে। নিজেই নিজের হাত ভেঙে ফেলছে, পা মচকে দিচ্ছে। প্রচণ্ড সামাজিক আলোড়নের ফলে যে বিপ্লবী শক্তি মুক্তি পেয়েছে, তা যে কি রকম আত্মঘাতী রূপ নিতে পারে এই ছবিটিতে তার সবটুকু বিধৃত রয়েছে। আজকের বাংলাদেশের বিপ্লবী রাজনীতির আত্মঘাতী ক্রিয়াকলাপ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সুলতানের এ ছবিটিই যথেষ্ট। অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি কোনো বিষয়ের অবতারণার প্রয়োজন নেই।

সুলতান নিরুদ্দেশ যাত্রা অন্তে যখন দেশে ফিরলেন, তখন বোধকরি উনিশশ' চুয়ান্ন কি পঞ্চান্ন সাল। ঢাকাতে জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে একটি চিত্রপীঠ স্থাপিত হয়েছে। সেখানে সুলতানের কোনো ঠাঁই হলো না। কারণ অতিশয় স্পষ্ট, যে নতুন মধ্যবিত্তটি সবেমাত্র জেগে উঠছে এবং শিল্প-সাহিত্যের নানাদিকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে পথযাত্রা শুরু করেছে, তার মানস অতিশয় সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক লক্ষ্য অস্পষ্ট কুয়াশাচ্ছন্ন শিল্প-সংস্কৃতির কোনো গভীর উপলব্ধিতে রঞ্জিত হয়নি তার মানস পরিমণ্ডল। স্নিগ্ধতার বদলে উগ্রতা, উপলব্ধির বদলে বিক্ষোভ, স্থূল আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্মর মোহ তাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে কোনো বিকশিত চেতনার প্রতি প্রণত হওয়া তার ধাতের মধ্যেই স্থান পেতে পারেনি। সুলতানের কলেজের সার্টিফিকেট নেই এটা উপলক্ষ মাত্র। এমনিভাবে এ শ্রেণী সৈয়দ মুজতবা আলীর মতো সাহিত্যের একজন দিকপালকেও দেশের বাইরে ছুঁড়ে দিতে সামান্যরকম দ্বিধান্বিত হয়নি। মুজতবা আলীর ক্ষেত্রেও উপলক্ষের অভাব ঘটেনি। আসলে সে সময়টাই ছিলো এমন : বাংলাদেশের মধ্যবিত্তটি তার ফিলিস্টিন মানসিকতার কারণে যা কিছু তার জাগতিক অধিকারবোধের বিপক্ষে যায় তার বিরোধিতা করেছে এবং প্রদর্শন করেছে অসহিষ্ণুতা। সৈয়দ মুজতবা আলীর জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী ছিলো,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ ছিলো, আর বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক সমাজ ছিলো, সর্বোপরি সমাজের ওপরতলায় একটা স্থায়ী আশ্রয় ছিলো। তাই তিনি নির্বিবাদে ফিরে যেতে পারলেন বিশ্বভারতীতে এবং সেখানে সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হলেন। কিন্তু সুলতান? তিনিতো আপন পরিচয়ের সূত্র আপন হাতে কেটে দিয়ে সমাজ এবং সময়ের স্রোতের ভেতর দিয়ে কেবল বয়েই গেছেন। মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত কোনো সমাজেই গৃহীত হওয়ার মতো কোনো কিছুই তিনি অর্জন করেননি, না স্ত্রী, না পুত্র, না স্বভাব-চরিত্র, আদব-কায়দা। বিত্ত-বেসাত, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কিছুই নেই, বুকের তলায় উজ্জ্বল আলোকিত চেতনা ছাড়া। তিনি যাবেন কোথায়? বিশ্বভুবনে এমন কে আছে তাকে গ্রহণ করে?

অগত্যা তাঁকে যেতে হলো সেই বহুকাল আগের ছেড়ে আসা পিতৃ-পুরুষের নিবাসে, সেই কিশোর লালমিয়ার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হলো। সে কি সোজা কথা-- গ্রাম বাংলার লাজুক কিশোরটির সঙ্গে বিশ্ব-পরিব্রাজকের ঋদ্ধ-সমৃদ্ধ দৃষ্টির, বোধের অনুভবের সম্মিলন। শেষ পর্যন্ত তাও সম্ভব হলো। তবে তার পেছনে সুলতানের সক্রিয় চেষ্টার চাইতে সময়ের ধারার ভূমিকাই অনেক বেশি। যে মধ্যশ্রেণীটি উনিশশ' সাতচল্লিশ সাল থেকে জেগে উঠতে শুরু করেছিলো, উনিশশো একাত্তর সালে এসে তাকে চূড়ান্ত অনিচ্ছায় একটা যুদ্ধকে কাঁধে নিতে হলো। কিন্তু শ্রেণীটির দোদুল্যমান জাতীয়তার বোধ দিয়ে না পারলো জাতীয় আকাঙ্ক্ষার বিকাশ ঘটাতে, না পারলো অর্জন করতে যুদ্ধের ভার বইবার মতো ঋজু মেরুদণ্ড। এই শ্রেণীরই শৈল্পিক প্রতিনিধি জয়নুল আবেদিন তাঁর 'মনপুরা' শীর্ষক চিত্রমালায় জানাতে বাধ্য হলেন যে বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টি ক্ষমতার সবটুকু অবসিত। সত্যি সত্যি তার নতুন কিছু সৃজন করার ক্ষমতার আর অবশিষ্ট নেই।

ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে নতুন আরেকটি শ্রেণীর ডাক পড়েছে। কিন্তু বিশিষ্ট হয়ে সে শ্রেণীটি কোনো আকার লাভ করেনি। মধ্যশ্রেণীর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার আকাঙ্ক্ষা পরস্পর বিজড়িত হয়ে রয়েছে, তার লক্ষ্য কোথায় স্থির করা হয়নি। প্রথম শিল্প-সাহিত্যেই তার প্রভাবটা বড় বেশি তীক্ষ্মভাবে অনুভূত হতে থাকলো। বাংলাদেশের পাতিবুর্জোয়া লিখতে গিয়ে বোধ করতে থাকলো, এই সময়ের উপযোগী গল্প-কবিতা তার লেখনি দিয়ে আর আসছে না। অথচ অতীতের মতো লিখতেও সে পারছে না। ঘটনার অভিঘাত অচঞ্চল চেতনাপ্রবাহে ভিন্ন একটা ঢেউ জাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রকাশ করার ভাষা তার নেই। গায়ক অনুভব করলো তার কণ্ঠের গানে সময়ের সংবেদনা বেজে উঠছে না। ছবি আঁকিয়েরা অনুভব করলো সময়ের খরতরঙ্গের

দোলা জাগছে না তাদের চিত্রলেখায়। সর্বত্র একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা, সকলে বুঝতে পারছে, তাদের অন্যকিছু করা উচিত—কিন্তু সেটা কি স্পষ্টভাবে বলতে পারছে না। এই লজ্জার কলঙ্ক ঢাকবার জন্য তারা কোলাহল দিয়ে সুরের অভাব, কথার পাশে কথা গেঁথে সাহিত্যের শূন্যতা পূরণ করার চেষ্টায় অষ্টপ্রহর ব্যস্ত। কিন্তু সময় বড়ো নিষ্ঠুর। প্রতারকদের সুযোগ দেবে কেন? দোদুল্যমান জাতীয়তায় বোধটি আরো দুলিয়ে দিয়ে তাদের নায়ক শেখ মুজিবকে সপরিবারে নিরস্তিত্ব করে দিলো সময়। কিন্তু জাতি অর্ধেক ভূমিষ্ঠ হলো, অর্ধেক রয়ে গেলো ইতিহাসের জরায়ুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে।

সুলতান শিল্পের জরায়ুর বন্ধন ছিন্ন করে জাতির ইতিহাসকে মুক্ত করে দিলেন। আগামীতে যাঁদের সাধনায় সংগ্রামে বাংলার ইতিহাস পাবে গতি, পাবে প্রাণ, সেই অনাহারক্লিষ্ট, রোগগ্রস্ত, ন্যুব্জদেহ কিষাণ-কিষাণীকে আঁকলেন বীর করে, রেনেসাঁস পেইন্টাররা যেমন তাঁদের আঁকা চিত্রে, গড়া ভাস্কর্যে মানুষ মানুষীকে সৌন্দর্য এবং অজেয়তার প্রতীক করে নির্মাণ করেছেন, সুলতান সেই সৌন্দর্য, সেই অজেয়তা চারিয়ে দিয়েছেন বাংলার কিষাণ কিষাণীর শরীরে। একটি সমাজের মানুষকে তার তুলি বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বাঙালী মধ্যবিত্তের উত্থানযুগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত' বলে বুর্জোয়ার প্রতিভূ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়ার জন্য উল্লম্ফিত আবেগে শিহরিত চমকিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তিনি কি বীররসে শেষ পর্যন্ত স্থিত থাকতে পেরেছেন? তাঁকে কি করুণ রসের অগাধ সলিলে অবগাহন করতে হয়নি? সুলতানও কি সবটুকু বীরত্বের প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছেন? তাই যদি হয়, তাহলে নায়কেরা নিজ হস্তে নিজের মস্তক কেন ছেদন করে? কেন তারা নিজের হাত-পা নিজে ভেঙে বিজয়ের উল্লাস প্রকাশ করে? তা হোক, তবু মধুসূদন একজন, তেমনি সুলতান আরেকজন। সময়, পরিবেশ, সমাজ, সামাজিক আদর্শ সব আলাদা। তবু তাঁদের কোনো পূর্বসূরী নেই।



তার তো চাইবার আগেই পাওয়ার কথা ছিল

সেলিনা হোসেন

সকালে ঘুম থেকে ওঠার আগেই মুনা চেঁচিয়ে বললো, মা এস. এম. সুলতান মারা গেছেন। তিনি আমার কাছে নন, পারিবারিকভাবে আমাদের কাছে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবরে মুনা কষ্ট পেয়েছে।

আমার কাছে সুলতান ভাইয়ের মৃত্যুকষ্ট পাওয়া না পাওয়ার বাইরের বিষয়। তাঁর জন্য আমার মনে কষ্ট জমা ছিলো অনেক দিন ধরে। সেই মুহূর্তে '৮২ সালে লেখা তাঁর চিঠিটি আমাকে ভীষণভাবে তাড়িত করে। সেদিন একজন শিল্পীর অর্থের আকুতি আমার কাছে মৃত্যুর চেয়ে বেশি মনে হয়েছিলো। তাঁর তো কোনো কিছু চাইবার আগেই পাওয়ার কথা ছিলো, বেশি না সামান্য কিছু।

দশটার দিকে বাংলা একাডেমীতে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছি। আমার ছেলে শমিক, এবার এস.এস.সি পাশ করেছে। দু'বছর বয়স থেকে সুলতান ভাইকে দেখছে। ও সরাসরি আমাকে বললো, তুমি কি আগে জানতে না যে সুলতান কতো বড়ো শিল্পী? বললাম, জানতাম। বললো, তাহলে ওনাকে কেন আমাদের সেই দোতলার ঘরে থাকতে দিয়েছিলে? ঘরটাতো ভালো ছিলো না। তুমি তখন তাকে ঠিকমতো যত্ন করোনি। যে স্মৃতি ওর মনে থাকার কথা নয়, সে স্মৃতি থেকে ও কথাগুলো বললো। আমি ওর কথার জবাব দিতে পারিনি।

আপা সেলিনা!

আশা করি খোদার ফজলে শারীরিক কুশলেই আছেন। আনোয়ার ভাইয়ের হাতের ব্যাথা কেমন, তাঁহাকে আমার ছালাম বলিবেন। নড়াইল ফিরবার পথে সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে পারি নাই, তাহার জন্যে দুঃখিত। আপা নিতান্ত অর্থাভাবে দিন যাপন করিতেছি, এই দুঃসময়ে কিছু অর্থ সাহায্য করিলে বিশেষ উপকৃত হইতাম। আশাকরি মনে কিছু করিবেন না।

বাংলা একাডেমীতে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে পারি নাই, তাহার জন্য দুঃখিত, আপনার ছেলে-মেয়েদের প্রতি আমার আন্তরিক দোয়া।

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী
ভাই
এস. এম. সুলতান

আমার ঠিকানা :-
এস. এম. সুলতান
গ্রাম – কুড়িগ্রাম (নড়াইল)
পোঃ – রতনগঞ্জ
জেলা – যশোর

আমি তো জানি এসব মানুষের যত্ন করতে আমি শিখিনি। আমার সেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নেই। এ দেশের বড়ো মাপের মানুষেরা না খেয়ে মরে যায়। এ দেশে চোরেরা বিলাসী জীবন যাপন করে। দেশের এই সাংস্কৃতিক বলয় থেকে আমি নিজেকে আলাদা করবো কি করে?

সুলতান ভাইকে ঘিরে আমার সুন্দর স্মৃতি আছে। তাঁকে নিয়ে আমরা কমলগঞ্জের মাধবপুরে গিয়েছিলাম মণিপুরীদের রাস-উৎসব দেখার জন্য। সারারাত ধরে সে উৎসব হয়। আমরা রাত জেগে উৎসব দেখেছি। তিনি চেয়েছিলেন চা বাগানে বসে ছবি আঁকবেন। তিনি ছবি এঁকেছিলেন। কতো কথা, কতো গল্প। তাঁর মুখে শোনা এক অন্য জগত। ভেবেছিলাম তাঁর এই গল্প দিয়ে উপন্যাস লিখবো। তাঁকে সে প্রস্তাব করাতে মধুর হেসে বললেন, কিইবা আমার জীবন। তাঁর বিনয়ের তুলনা হয় না।

কিন্তু চমৎকার স্মৃতি ম্লান হয়ে যায়। সুলতান ভাইয়ের চিঠি আমাকে তাড়া করে ফেরে। কিইবা টাকা আমি তাঁকে দিতে পেরেছিলাম। আমার ছেলের কাছে জবাবদিহি করে বলতে হয়, তাতেও তাঁর মতো মানুষের যত্ন করা হয় না। সুলতান ভাইয়ের ঐ চিঠি আমার সারা জীবনের এক বড়ো লজ্জা।



আমার স্মৃতিতে সুলতান

শাহাবুদ্দীন আহমেদ

সে ১৯৫৪-এর কথা। আমি দৌলতপুর বি. এল. কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, নাজিরুল ইসলাম, মোহাম্মদ সুফিয়ানের পর তখন প্রিন্সিপাল হয়ে এসেছেন ইংরেজীতে ফার্স্ট ও গোল্ড মেডেল পাওয়া ফজলুর রহমান সাহেব, যাঁর অনেক কিছুতে উৎসাহ—খেলাধুলায়, শিল্পে, সাহিত্যে ও সঙ্গীতে। আমি শরীর চর্চায় ও খেলাধুলায় উৎসাহী ছিলাম বলে আমার প্রতি তাঁর ছিল পরম স্নেহদৃষ্টি। এই সময় এস. এম. সুলতানের সঙ্গে আমার দেখা।

দৌলতপুর ফুটবল মাঠের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের একটি কদম গাছে একজন ত্রিশ বা ত্রিশোর্ধ বয়সের একহারা গড়নের এক ধুতি-গেঞ্জি পরা লোককে দেখলাম। মেয়েদের মত তাঁর চুলের মাঝখানে সিঁথি—সে চুল আধা কোঁকড়া এবং কাঁধ-ছোঁওয়া এবং অজস্র, ঘন এবং কালো। তেমনি সমস্ত মুখ গোঁফ-দাড়িতে ঢাকা। ঈষৎ লম্বা শ্যামবর্ণের মানুষ। এবং হাতে তাঁর বাঁশের বাঁশি। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হলো পাবনার হেমায়েতপুর থেকে ছাড়া পাওয়া এক পাগল।

পাগল সাধারণ মানুষের মনে যেমন ভয় ধরায় তেমনি কৌতূহলও সৃষ্টি করে। তরুণ মনে সে কৌতূহল আরও বেশী করে জাগে। আমরা কয়েকজন ছাত্র সেই কৌতূহলবশে একে একে সেই গাছের দিকে ভিড়তে লাগলাম।

তখন ক্লাস শুরু হয়নি। হয়ত সকাল ৯টা-১০টা হবে এমনি সময়। পাগল বাঁশি

বাজাতে শুরু করল। খুব মাদকতাপূর্ণ অপূর্ব বাজনা নয় ; কিন্তু এটা বোঝা গেলো এ বিদ্যায় পাগল পারদর্শী।

ক্লাশের ঘন্টা বাজল। আমরা সব ক্লাসে ঢুকলাম। একটা নোটিশ এলো প্রিন্সিপালের কাছ থেকে। বিলেত ফেরতা এক বাঙালী শিল্পী আজ দুপুর ১২টায় কলেজ হলে বক্তৃতা দেবেন তোমরা উপস্থিত থাকবে। সময়মত উপস্থিত হলাম। এবং অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, সেই ধুতি গেঞ্জি পরা বংশীবাদক সেদিনের সেই বিলেত ফেরত শিল্পী এবং বক্তা। পিছনে তাঁর বিরাট এক ব্ল্যাক বোর্ড আর হাতে সাদা চকখড়ি।

পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রিন্সিপাল ফজলুর রহমান। বললেন, উনি একজন বিখ্যাত শিল্পী। সম্প্রতি আমেরিকা, লণ্ডন ও প্যারিস ঘুরে এসেছেন। তিনি আধুনিক শিল্পের ওপর বক্তৃতা দিয়ে শিল্প কি, চিত্রশিল্প কি—এ সব তোমাদের বুঝিয়ে দেবেন। এর নাম এস.এম. সুলতান। পুরো নাম শেখ মোহাম্মদ সুলতান।

সুলতান বক্তৃতা শুরু করলেন ইংরেজীতে। ফ্লুয়েন্ট। মনে হল ইংরেজী তাঁর মাতৃভাষা। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে ব্ল্যাক বোর্ডে ছবি আঁকছিলেন। কখনো মানুষের, কখনো প্রাণীর, কখনও প্রকৃতির। তাঁর সেই স্কেচ আঁকা দেখে অভিভূত হলাম। ছবি বোঝার জন্যে নয়, অতি দ্রুত, অতি স্বচ্ছন্দ গতিতে, অতি সাবলীল ভঙ্গিতে তাঁর সেই ছবি আঁকা আমাকে মুগ্ধ করল।

আর সুলতানের সে বক্তৃতা শুধু ছবির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো না, তা সম্প্রসারিত হল দর্শনে। জগৎ ও জীবনের দর্শন নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। কৌতূহলী ছাত্রদের প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলেন। আর বারবার বলতে লাগলেন—শূন্যে ফিরত যেতে হবে-শূন্যে ফিরে যেতে হবে। শূন্য থেকে সব কিছুর উদ্ভব। সেই শূন্যতে আমাদের ফিরে যেতে হবে।

লোকটি যে সাধারণ পাগল নয়—অসাধারণ পাগল, বুঝলাম। দৌলতপুর কলেজ হোস্টেলের এক কামরায় উঠেছিলেন তিনি। ছুটির পরে আমরা সেই কামরায় গিয়ে উপস্থিত হলাম এক অদ্ভুত মানুষ সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে।

একটা স্যুটকেস থেকে এক কপি *মেঘনাদবধ কাব্য* বের করে সেখান থেকে আবৃত্তি শুরু করলেন। আমার বন্ধুরা হঠাৎ আমাকে দেখিয়ে বলল, এর নাম শাহাবুদ্দীন। ও চমৎকার আবৃত্তি করে।

তাই না-কি ! আপনি চমৎকার আবৃত্তি করেন। তাহলে আপনিই পড়ুন। আমি

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মধুসূদনকে বেশী পছন্দ করি। অসাধারণ কবি।

এই আবৃত্তির মাধ্যমে সুলতানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হল। কিন্তু তখনও সুলতানের সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় হয়নি। সুলতানের স্যুটকেস থেকে বেরিয়ে এলো কয়েকটি ইংরেজী পত্রিকা। নিউইয়র্ক টাইমস, হেরাল্ড ট্রিবিউন, ডেলী টেলিগ্রাফ প্রভৃতি। সেখানে শেরোয়ানী পরা চুল-দাড়ি ও বাবরি চুলের সুলতানের ছাপানো ছবির সঙ্গে সুলতানের আঁকা পেন্টিং-এর ওপর রিপোর্ট দেখলাম। বুঝলাম সুলতান পাগল নয়—প্রতিভা।

জানতে পারলাম, সুলতান মাইকেল মধুসূধনের মত যশোহরের লোক। প্রকৃতিগত দিক থেকে উভয়ের মধ্যে এই মিল ছিল, উভয়েই শৃঙ্খলার প্রতি উদাসীন, বেপরোয়া। তবে মধুসূদন খেতেন মদ আর সুলতান খান গাঁজা।

সুলতান আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, গাঁজা টানছিলেন, আর ছোট্ট একটা এক্সারসাইজ খাতায় পেন্সিল দিয়ে খেয়াল-খুশী মত ছবি আঁকছিলেন অবলীলাক্রমে, অতি দ্রুতগতিতে; নানা ধরনের স্কেচ। মানুষ ও প্রাণীর। আমি তখন ব্যায়াম করতাম। শরীরের প্রতিটি পেশী সম্বন্ধে আমার কিছু জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছিল। দেখলাম বডির এ্যানাটমি সম্বন্ধে সুলতানের জ্ঞান যেন চিকিৎসকের চেয়ে কম নয়। শরীরের এমন কোনো পেশী নেই যা সুলতানের জানা নেই। শুধু উপরবাহু বা ফোরআর্ম নয় ; হাতের কব্জির আশপাশের ক্ষুদ্র পেশী এবং হাতের তালুর পেশী পর্যন্ত তার নখদর্পণে। শুধু এই নয়, পেশীবহুল শরীরের শিরা –উপশিরাগুলো তার পেন্সিল ও তুলির টানে জীবন্ত হয়ে উঠতে লাগলো।

হঠাৎ ছবি আঁকা ফেলে বললেন, আপনাদের এখানে হারমোনিয়াম-তবলা আছে নাকি? হারমোনিয়াম-তবলা আসতে দেরী হল না। এবার শুরু হল গান এবং ছাত্র-তবলচীর কাছ থেকে তবলা কেড়ে নিয়ে শুরু করলেন তবলা বাজানো।

তারপর আরো অবাক কাণ্ড। তিনি নৃত্যের উপর বক্তৃতা শুরু করলেন এবং আরো অবাক কাণ্ড ছাত্র তবলচীকে তবলা বাজাতে ইঙ্গিত করে তিনি লীলায়িত ভঙ্গিতে ধ্রুপদ-নৃত্য শুরু করলেন। আমরা বুঝলাম সুলতান বহু গুণে গুণান্বিত শিল্পী। তিনি দেখালেন, একজন শিল্পী যে শিল্পের চর্চা করেন শুধু সেই নির্দিষ্ট শিল্প সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকলে তিনি আংশিক শিল্পী হবেন—পূর্ণ শিল্পী হবেন না। সুতরাং পূর্ণশিল্পী হওয়ার জন্য বিষয়-বৈচিত্রের জ্ঞান অপরিহার্য। এ যুগে আমার সঙ্গে আর একজন চিত্রশিল্পীর সাক্ষাৎ ঘটেনি যার এক সঙ্গে এত ভিন্ন বিষয়ের ওপর জ্ঞান দেখতে পেয়েছি।

হঠাৎ সুলতান হারিয়ে গেলেন। কোথায় গেলেন, এই পাগল প্রতিভা? শুনলাম, মহেশ্বরপাশা পানবাড়ির এক গাঁজাখোর সন্ন্যাসীর সাথে তাঁকে দেখা গেছে। সে সন্ন্যাসীর সঙ্গে সুলতানকেও দেখা গেছে প্রভাতের লাল উদীয়মান সূর্যের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে। তারপর শুনলাম সে মন্দিরেও সুলতান নেই। ফিরে গেছেন তিনি যশোরে। তাঁর বাড়ীতে। সুলতান আমাদের মনে নিদারুণ চমক আর কৌতূহল সৃষ্টি করে হারিয়ে গেলেন। আমাদের মনে সুলতানের ক্ষণিক সাক্ষাতের এক স্থির বিদ্যুৎ আঁকা রইলো।

সেদিন আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ঢাকার আর্ট কলেজে আপনি তো অনায়াসে শিক্ষক হতে পারতেন, কেন হলেন না। গোঁফ-দাড়ির মাঝ থেকে তাঁর ছোট ছোট পরিপাটি দাঁতের হাসি বেরিয়ে এলো। বললেন, ওদের সঙ্গে আমার বনে না। সুলতানকে অকস্মাৎ নিদারুণ অহংকারী মনে হয়েছিল। তাঁর নিচু শান্তকণ্ঠের মধ্যে এক জেদী, বিদ্রোহী, ব্যতিক্রমধর্মী নিঃসঙ্গ মানুষকে দেখলাম। যাঁর সঙ্গে অন্য শিল্পীদের বনে না। তাঁর কথা শুনেই মনে হয়েছিলো, অন্যের নীচে থেকে, নীচাসন থেকে কাজ করার লোক তিনি নন। তিনি কোথাও কাজ করলে সর্বোচ্চ আসনে বসে কাজ করবেন—অথবা থাকবেন একা-নিঃসঙ্গ। নিজের চিন্তার একাডেমীকে নিজে গড়ে তুলবেন। সুলতানের জন্য বিশেষ দুঃখবোধ নিয়ে সরে আসলাম। সুলতান কয়েক বছরের জন্যে স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেলেন।

১৯৫৮-৫৯-এর দিকে কবি জসীম উদ্দীনের বাড়ীতে সুলতানের সঙ্গে আবার দেখা হলো। এবার যে সুলতানকে দেখলাম, তিনি অন্য সুলতান। প্রথম যে জিনিসটি চোখে পড়ল, সেটা হলো সুলতানের পোশাক। মাথায় সেই আগের চুল আছে কিন্তু দাড়ি গোঁফ সম্পূর্ণ চাঁছা। পোশাক বদল। গেরুয়া রঙের ঢিলা লুঙ্গি পরা। হাতে একতারা বা দো-তারার বদলে একটা বিশাল তানপুরা।

কোথায় ছিলেন এতদিন?

পশ্চিম পাকিস্তানে।

তিনি শান্ত-ধীর নীচুকণ্ঠে কথা বলতেন, বুঝা গেল তিনি পাকিস্তানে তাঁর বেশকিছু বন্ধুর বাসায় কাটিয়ে এসেছেন। সেখানে ইচ্ছামত ছবি এঁকেছেন।

জসীম উদ্দীন সাহেবের সঙ্গে তাঁর কোথায় পরিচয় হয়েছিল জানি না।

হয়তবা পশ্চিম পাকিস্তানে হয়তবা যশোরে ; অথবা ঢাকায় তাঁর কোনো বন্ধুর বাসায়।

এক আবৃত্তি অনুষ্ঠানে যশোরে আমার সঙ্গে জসীম উদ্দীনের দেখা হয় জমিদার মনুজকান্ত মজুমদারের বাসায়। ঐ মনুজকান্ত মজুমদারের ঘরের দেয়ালে আটকানো মধুসূদন দত্তের একটা ওয়াটার কালারের প্রোট্রেট ছিল। শুনেছিলাম সেটা সুলতানের আঁকা। সৌজন্য ও ব্যবহারে নম্র ও অমায়িক সুলতান স্নেহ, ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের ডাককে ঠেলে ফেলতে পারতেন না। অনেকে তাঁর মত গুণীর সংস্পর্শে থাকা পছন্দ করতেন। বাড়ীতে দাওয়াত দিতেন এবং প্রয়োজন বোধে ভালো ভালো ছবিও আঁকিয়ে নিতেন। দাতা ও অমিতব্যয়ী সুলতান মাঝে মাঝে কপর্দকহীন হয়ে পড়তেন। চতুর বন্ধুরা সেই সুযোগে সামান্য অর্থের বিনিময়ে তাঁকে গৃহে রেখে তাঁকে দিয়ে দামী ছবি আঁকিয়ে নিতেন দেয়ালের বা গৃহের সৌন্দর্য বাড়াতে বা আভিজাত্যকে তুলে ধরতে। সম্ভবত এই ধরনের কোনো বন্ধুর বাসা থেকে জসীম উদ্দীন, পল্লী প্রকৃতির ছবির কবি জসীম উদ্দীন, প্রকৃতি ও প্রকৃতির ছবির প্রেমিক জসীম উদ্দীন সুলতানকে খুঁজে পান।

এর পরে সুলতানের সঙ্গে আমার বহু দিন দেখা হয়নি। তারপরে দেখা হলো ঢাকায় ১৯৭৬-এ। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়েছিলেন ভাস্কর মতিউর রহমান। উনি কোহিনূর কেমিলক্যালসে চাকরি করতেন এবং মূর্তি গড়তেন। এস. এম. সুলতানের অসামান্য ভক্ত। আমি তখন নজরুল একাডেমী পত্রিকা সম্পাদনা করি আর থাকি ৬২১নং উত্তর শাজাহানপুরের একটি ছোট্ট উঠোনওয়ালা ছোট্ট সুন্দর বারান্দার একতলা ভাড়াটে বাসায়।

মতিউর রহমান এ বাসাতে একদিন সুলতানকে নিয়ে হাজির হলেন। এস. এম. সুলতান তখন প্রৌঢ় পঞ্চাশোর্ধ বয়সের ভগ্ন-স্বাস্থ্যের সুলতান। পরনে সেই ধুতি পাঞ্জাবী নেই। সেই বাউলের পোশাক, গেরুয়া বসন নেই। প্যান্ট আর ফুলহাতা শার্ট পরা সুলতান। বলা বাহুল্য, স্কন্ধ নয় মধ্য পিঠেও নয় মাঝামাঝি ছড়ানো সেই চুল আছে—সেই নিবিড় ঘন আধা কোঁকড়ানো চুল। আর জসীমউদ্দীনের বাড়ীতে দেখা গোঁফ-দাড়ি-চাঁছা সুলতান। আমৃত্যু তিনি আর দাড়ি-গোঁফ কখনো রাখেননি। দৌলতপুর কলেজে তাঁকে যে রকম মুখর দেখেছিলাম জসীম উদ্দীনের বাড়ীতে তাঁকে আর তেমন দেখিনি। তখন তাঁকে অনেকখানি নীরব দেখেছিলাম। আজ দেখলাম আরও নীরব—প্রায় নিশ্চুপ। প্রয়োজনের কথা ছাড়া তিনি কথা বলেন না। হয়ে গেছেন আরও স্থির, বিনয়ী। বলা বাহুল্য, প্রকৃতিগতভাবে সুলতান ছিলেন মহাবিনয়ী যাকে বলে বিনয়ের অবতার।

এইবার সুলতানের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিন মিশবার সুযোগ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য,

ঢাকার লেখক, সাংবাদিক, কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার যেমন পরিচয় ছিল তেমনি শিল্পীদের মধ্যে কামরুল হাসান, কাইয়ুম চৌধুরী, রশীদ চৌধুরী, আব্দুর রউফ, হাশেম খান, মোস্তফা আজিজ, মোস্তফা মনোয়ার প্রমুখের সঙ্গেও আমার নিবিড় সম্পর্ক না থাকলেও পরিচয় ছিল। কিন্তু সুলতানের প্রতি আমার একটা ভিন্ন আকর্ষণ ছিল। সে আকর্ষণের কারণ শুধু যে তাঁর ছবি আঁকা তা নয়—সম্ভবত তাঁর ভিতরকার রহস্যময়তা। মানুষের নগ্ন বিকশিত বিষয়ের বা বস্তুর প্রতি যত কৌতূহল থাকে তার চেয়ে বেশী আকর্ষণ থাকে অর্ধআবৃত বস্তু ও বিষয়ের প্রতি। বিশেষ সময় বা মুহূর্তে নিস্তব্ধতা বা অন্ধকারের প্রতিও মানুষের আকর্ষণ কম নয়। সে জন্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—ও আমার আঁধার ভালো আলোর কাছে থেকে থেকে।

আমার প্রতিও সুলতানের হয়ত কোনো আকর্ষণ ছিল। সুলতানের চোখ মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, বায়রণ, নজরুল বা ফররুখের মত বিশাল ছিল না ; কিন্তু সুলতানের ছোট্ট চোখের কুপির মত কালো তারায় ছিল অন্তর্ভেদী দৃষ্টির ধার। সুলতান জানতেন আমি সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ভালোবাসী। ঐ ভালোবাসার একাত্মতা তাঁকে আমার কাছে ডেকে এনেছিল।

সুলতান মতিউর রহমানের সম্ভবতঃ খিলগাঁ চৌধুরীপাড়ার একটি ভাড়াটে বাসায় উঠেছিলেন। এরপরে ৪০০ টাকায় তাঁর জন্য পশ্চিম রামপুরায় ওয়াপদা রোডের পাশে একটি তিন কামরার একতলা বাসা ভাড়া নেয়া হয় ১৯৭৬-এ। শিল্পকলা একাডেমীতে সলুতানের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী হয়। তার সবগুলো ছবি সুলতান এই বাসাতে বসেই এঁকেছিলেন। বোধ হয় মাস চারেকের জন্য এই বাসা ভাড়া এবং ঐ স্বল্প সময়ের মধ্যে ছোট বড় প্রায় ২০০ তেল ও জলরং ছবি এঁকেছিলেন সুলতান। মতিউর রহমান সাহেব তাঁর এই ছবি আঁকার সব সাজ-সরঞ্জাম যোগাতেন। শুনেছি ঐসব ক্যানভাস, তুলি, রং এবং বাড়ী ভাড়ার টাকা সে সময়ের ইরান এমব্যাসির একজন শিল্পরসিক কূটনীতিক যোগাতেন। ১৯৪৭ সনে দেশ-বিভাগের পর সুলতান পশ্চিম পাকিস্তানে যান এবং এক পারসী স্কুলে শিল্পের শিক্ষকতা করতে যান। সে সময় থেকে হয়ত পারসী বা ইরানীদের সঙ্গে তাঁর নিগূঢ় যোগাযোগ হয়ে থাকবে।

আমি বলেছি ঢাকার আর্টিস্ট সমাজ থেকে নিজেকে তিনি দূরে রাখতেন। তাঁর ভবঘুরে, বোহেমিয়ান, নেশা-আসক্ত চরিত্র এজন্য দায়ী ছিল কি-না জানি না। তবে তাঁদের শিল্প-চিন্তার মধ্যে আদর্শগত ব্যবধান ছিল। তবু একদিন মতিউর রহমানের বাসায় আমি কয়েকজন শিল্পীকে এক কাবাব ভোজের অনুষ্ঠানে সমবেত হতে দেখেছিলাম। কাঠের কয়লা জ্বেলে ঐ বাসার উঠোনে মতিউর রহমান নিজের হাতে

কাবাব সিদ্ধ করেছিলেন। দাওয়াতপ্রাপ্ত শিল্পীদের মধ্যে রশীদ চৌধুরী ও সম্ভবত মোস্তফা মনোয়ার ছিলেন। আর কে ছিলেন মনে করতে পারছি না। মতিউর রহমান তাঁর নিজের গড়া কাষ্ঠ নির্মিত অথবা সিমেন্ট-বালু-ইটের টুকরো মিশ্রিত উপাদান দিয়ে তৈরী করা ভাস্কর মূর্তির প্রদর্শনী দেখার জন্যই হয়ত সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেদিন তরুণ শিল্পীদের অবশ্য 'সুলতান ভাই' 'সুলতান ভাই' সম্বোধন করতে দেখেছি। কিন্তু জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসানের শিষ্যদের কখনও সুলতানভক্ত হতে দেখিনি।

আমার কেন যেন মনে হয়, সুলতানকে এইভাবে দলগতভাবে অস্পৃশ্য রাখার আর একটি কারণ ঢাকার শিল্পীদের বাম রাজনীতির প্রতি আনুগত্য। সুলতান ভাবতেন যে কোনো আদর্শ যে কোনো আধুনিক রাজনৈতিক আদর্শ হলেও শেষ পর্যন্ত তা শিকল—শেষ পর্যন্ত তা খাঁচা। শিল্পী কেন ঐ খাঁচায় বন্দী হবে?

আমি সুলতানের ছবি আঁকা পছন্দ করতাম....আর সুলতান পছন্দ করতেন আমার আবৃত্তি। আমি বলতাম, আমি আবৃত্তি করলে আপনার ছবি আঁকা খারাপ হয়ে যাবে। সুলতান বলতেন, আরো ভালো হবে।

বলেছি সুলতানের গাঁজা খাওয়ার নেশা ছিল। টুকিটাকি কাজ আর ঐ গাঁজা-মাজার জন্য মতিউর রহমান সাহেব সুলতানকে একটি বালক-ভৃত্য জোগাড় করে দিয়েছিলেন।

গাঁজার ছিল দুটো কল্কে। একটি ছোট এবং একটি বড়। ছোট কল্কেতে গাঁজা খেয়ে যখন তৃপ্তি পেতেন না তখন বড় কল্কেতে গাঁজা খেয়ে সুলতান কিছুক্ষণ বুঁদ হয়ে থাকতেন তারপর বসতেন ছবি আঁকতে। তারপর সে কি ক্ষিপ্রশক্তিতে ছবি আঁকা।

আমি দেখেছি পেন্সিল কাটার দিয়ে সুলতান একটি বড় পেন্সিলকে প্রথমে চোখালো করে নিতেন। ফুল স্কেপ সাইজের একটি কাগজে যে ছবিটি আঁকতেন তার একটি ছোট মাপের খসড়া করতেন। তারপর সাদা রঙ লাগানো বিশাল ক্যানভাসের ওপর কয়লা (চারকোল) দিয়ে দুরন্ত গতিতে ছবি আঁকা শুরু করতেন। অসাধারণ অপূর্ব সেই সব স্কেচ। আমার কখনো কখনো মনে হতো রঙ চাপানোরা আগের সেই স্কেচগুলোকে যদি ক্যামেরায় ধরে রাখা যেতো তাহলে সুলতানের অসামান্য বলিষ্ঠ রেখার টানগুলো আর এক ভিন্ন চিত্রকলা হয়ে অমর হয়ে থাকত।

আমি পূর্বে বলেছি, মানুষের শরীরের প্রতিটি পেশীর সঙ্গে সুলতানের নিবিড় ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। হিউম্যান বডির এ্যানাটমি তাঁর মুখস্থ তো ছিলই। প্রতিটি অঙ্গ

সঞ্চালনে, অঙ্গভঙ্গির বিবর্তনে পেশীতে যে বহু বিচিত্র বিপরীতধর্মী ভাঁজ পড়ে, বসা ও শোয়ার, দাঁড়ানো, দৌড়ানো ও হাঁটার, হাত ও হাঁটুর ভাঁজ করার সময়, ঘাড় সোজা করা বা বাঁকানোর সময়, পাশ ফেরা, উপুড় ও চিৎ হওয়া কিংবা কাৎ হওয়া ইত্যাদির সময় পেশীর বিচিত্র বঙ্কিম ভাঁজগুলো নিখুঁতভাবে সুলতানের পেন্সিল, কয়লা বা তুলির টানে জেগে উঠতো। এই শিক্ষায় সুলতান এতটাই পরিপক্ক ও শিক্ষিত ছিলেন যে, রঙ লাগানোর আগে তাঁর অঙ্কিত ছবির নানা ভঙ্গির পেশীর বাঁকের অপূর্বতা দেখে আমার গ্রীক শিল্পীদের আঁকা ছবির কথা মনে হতো অথবা তাদের ভাস্কর মূর্তির কথা। ছাত্রজীবনে যে সামান্য কিছুদিন তিনি কলকাতার আর্ট স্কুলে পড়েন সেই সময়টুকু যে তিনি দারুণ নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় ব্যয় করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। আমি আমার জানা বহু শিল্পীকে এই পেশী আঁকতে এবং তাদের বিচিত্র রঙিন রূপ আঁকতে ও তাদের নিখুঁত বিভাজন সৃষ্টি করতে স্থূলতার ও ব্যর্থতার পরিচয় দিতে দেখেছি। সুলতানের সে অক্ষমতা ছিল না। সুলতান বলেছিলেন, 'সৎ মায়ের জ্বালায় অস্থির হয়ে আমি বাড়ী থেকে পালাই। কলকাতায় নড়াইলের জমিদার বাড়ীতে গিয়ে উঠি। বাবা এই জমিদারদের রাজমিস্ত্রী ছিলেন। জমিদারের ছোট ভাই আমার ছবি আঁকার নেশা দেখে—কেননা কয়লা পেলেই আমি তাদের বাড়ীর দেয়ালে ছবি এঁকে বসতাম—আমাকে বিলেত থেকে ইংরেজীতে লেখা দুটো বিশাল আকৃতির ছবির বই এনে দেন। সেখানে অনেক অনেক ছবি। নানা ধরনের স্কেচ। জমিদার বাবু বললেন, ছবি আঁকতে চাইলে এই প্রাথমিক বিদ্যাগুলো তোকে শিখতে হবে। আমি তখন বালক মাত্র। ওখানে দু'বছর কাটালাম। শিল্পরসিক জমিদারের ছোট ভাই এবার বললেন, লাল মিয়া যদি বড় শিল্পী হতে চাও তোমাকে আরও ভালো শিক্ষকের কাছে ছবি আঁকা শিখতে হবে। তার মানে তোমাকে আর্ট স্কুলে বা কলেজে ভর্তি হতে হবে। কিন্তু তার আগে তোমাকে ইন্টারভিউ দিতে হবে এবং সে ইন্টারভিউতে তোমাকে পাস করতে হবে।

আমি কলকাতা আর্ট স্কুলে ইন্টারভিউ দিয়ে ফার্স্ট হলাম। কিন্তু আমি তো ম্যাট্রিক পাস করিনি। ভর্তি হবো কি করে। জমিদার বাবু বললেন, উপায় একটি। শাহেদ সোহরাওয়ার্দীকে ধরতে হবে। তিনি ভর্তি কমিটির সদস্য। তিনি বলে দিলে আর সমস্যা থাকবে না।

আমি ঠিকানা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সোহরাওয়ার্দীর বাড়ী পৌঁছার মুহূর্তে দেখলাম, তিনি তাঁর প্রাইভেট কারে বেরিয়ে আসছেন। আমি তাঁর বাড়ীর সামনে দাঁড়ালাম। তিনি ইশারায় ডাকলেন এবং কারণ জিজ্ঞাসা করতে আমি সব কথা বললাম। আমি

মিথ্যা কথা বললাম যে, আমার কেউ নেই। সোহরাওয়ার্দী গাড়ী থেকে নেমে আমাকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং একটি ঘর দেখিয়ে বললেন ঐ ঘরের খাটে যে মহিলা বসে আছেন ওকে যেয়ে তুই মা বলে ডাকবি। ঐ মহিলা ছিলেন নিঃসন্তান। শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর কোনো চাচার স্ত্রী। বিশাল খাটের ধবধবে শয্যার ওপরে সোনার গহনা পরা এক সুন্দরী প্রায় পৌঢ়া মহিলাকে দেখলাম আমি। তাঁকে 'মা' সম্বোধন করলাম। তিনি আমার মুখে চোখে কি মায়া দেখলেন। খাট থেকে নেমে তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি হয়ে গেলাম সোহরাওয়ার্দী পরিবারের সদস্য। আমার আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়ায় বাধা থাকলো না। আর আর্টের অসাধারণ সমঝদার এবং সমালোচক শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর বিরাট লাইব্রেরীর আমি তত্ত্বাবধায়ক হলাম। আমার আনন্দের সীমা রইল না।'

এই পরিবারে থাকাতে সুলতানের কতকগুলা লাভ হয় বলে আমার বিশ্বাস। সোহরাওয়ার্দী পরিবারে যে ভাষা চালু ছিল তা বাংলার চেয়ে বেশী উর্দু আর ইংরেজী। মেধাবী সুলতান ঐ দুটো ভাষায় যে অনর্গল কথা বলতে পারতেন তার কারণ সেটি। আর্টের ওপর তাঁর স্বতঃস্ফূর্তভাবে বক্তৃতা দেয়ার কারণ ঐ পাঠাগার থেকে হৃদয় ভরে তিনি তাঁর জ্ঞান লাভের অমিত পিপাসা মেটাতে পেরেছিলেন। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক, প্রকৃত প্রতিভার জন্য শিক্ষকের প্রাথমিক প্রয়োজন থাকলেও কোনো মহাশিক্ষার দরকার হয় না। প্রতিভা মাত্রই স্ব-শিক্ষিত। সুলতানের জন্য শিক্ষকের শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না বলে আর্ট স্কুলের ডিগ্রী না নিয়েই সুলতান স্কুল ছেড়েছিলেন। কারণ, শিক্ষককে যিনি শেখাতে পারেন তাঁর জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতি ও প্রতিভা নিজেই তাঁর শিক্ষক। এটি শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বেলায় যেমন সত্য সুলতানের বেলাতেও তাই।

ছবি আঁকতে আঁকতে মাঝে মাঝে সুলতান ক্লান্ত হতেন। সে সময় তিনি গাঁজা খেতেন বা তাঁর চিরসঙ্গী বাঁশের বাঁশি বাজাতেন। মাঝে মাঝে বলতেন, শাহাবুদ্দীন ভাই, এবার কবিতা আবৃত্তি শুনবো। আজ বিদ্রোহী কবিতা। আমি পুরো 'বিদ্রোহী' কবিতা তাকে আবৃত্তি করে শোনাতাম। বলতেন, ক্লাসিক ক্লাসিক।

এমনি একদিন উপস্থিত কে একজন বললেন, আমি আর একজনের মুখে 'বিদ্রোহী'র সুন্দর আবৃত্তি শুনেছি। বিনয়ী সুলতান হঠাৎ রেগে গেলেন। বললেন, ঐসব পেশাদার আবৃত্তিকারদের সঙ্গে শাহাবুদ্দীন ভাই-এর আবৃত্তির তুলনা করছেন? তাদের কণ্ঠে ঐ আবেগ, ঐ উচ্চারণ, আছে না-কি! ঐ ছন্দবোধ আছে! শাহাবুদ্দীন ভাই কবিতা আবৃত্তি করেন না, ছবি আঁকেন। আপনাদের তা দেখার চোখ নেই।

সত্যিই একদিন আমার রবীন্দ্রনাথের 'পৃথিবী' কবিতার আবৃত্তি শুনে তিনি চট্‌পট্‌ এক ছবি এঁকে বসলেন। পংক্তিগুলো ছিল এই—

> বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎ চঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
> কালো শ্যেন পাখীর মতো তোমার ঝড়–
> সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর ফোলা সিংহ;
> তাঁর লেজের ঝাপটে ডালপালা আলু-থালু করে
> হতাশ বনস্পতি ধূলায় পড়ল উপুড় হয়ে;
> হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল
> শিকল ছেঁড়া কয়েদী ডাকাতের মতো।

দৈনিক পত্রিকার পুরো পৃষ্ঠার মাপের একটা সাদা কাগজে মোটা পেন্সিল দিয়ে ঝটপট তিনি একটা 'কেশর ফোলা সিংহের' ছবি আঁকলেন। পিছনে ঝড়ের আকাশের পটভূমি। অগ্নিচক্ষু শিকারোদ্যত সে সিংহ; উঁচু বল্লমের মত তার লেজ। দ্যেলক্রয়ের ঝড়-আতঙ্কিত ঘোড়া'র ছবির সঙ্গে তার মিল ছিল। এর পেন্টিং শেষ করেছিলেন কিনা আমার জানা নেই। তবে তিনি তখন যে ছবি আঁকছিলেন তার সবগুলোই স্বাস্থ্যবান, শক্তিমান মানুষ ও মানুষীর। সে সময় তিনি আমার মুখ থেকে বহুবার 'বিদ্রোহী' কবিতার আবৃত্তি শুনেছিলেন। তাঁর মনে সে সময় শক্তিমত্তার যে অনুপ্রেরণা এসেছিল 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্যে হয়তো তার আত্মিক মিল ছিল। উল্লেখযোগ্য, তিনি যেমন মধুসূদনের ভক্ত ছিলেন তেমনি ছিলেন নজরুল ও ইকবালের ভক্ত। ইকবালের 'খুদী দর্শন' তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। রাবণের শক্তিমত্তা, বিদ্রোহ, নজরুলের 'বিদ্রোহী' আর ইকবালের 'খুদী দর্শন' তাঁর চিত্তে অপরিমেয় মানবশক্তির প্রেরণা জাগাতে সাহায্য করেছিল বলে আমার ধারণা। মানুষের মানসের অন্তর্স্থলে এই ইচ্ছাশক্তির অবদান আছে বলে মানুষ পৃথিবীর ও প্রকৃতির বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে আজও বেঁচে আছে; এবং ভবিষ্যতের সুখী সমাজও সে গড়ে তুলবে এই শক্তির বলে। তাই মানুষের দুর্বল জরাজীর্ণ কঙ্কালসার ছবি আঁকলেই হবে না; তার উত্তাল-তরঙ্গায়িত পেশীর ফুঁসে ওঠার মধ্যদিয়ে মানুষের অভ্যন্তরীণ ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে দেখাতে হবে মানুষ অজেয়। সুলতানের ১৯৭৬-এ আঁকা ছবির পিছনে এই দর্শন কাজ করেছিল।

আমি কিছুদিন আগে বলেছি নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা বাংলা চতুর্দশ শতাব্দীর (ইংরেজী বিংশ শতাব্দীর) শ্রেষ্ঠ কবিতা। যেমন অনেকের মতো পিকাসোর 'গুয়েনির্কা' বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর্ম বা পেন্টিং। ঐ ছবিতে ধ্বংসের ছবি এঁকে

ফ্যাসিজমের পাশবিকতার বিরুদ্ধে পিকাসো মানবতার যে অসীম আর্তনাদকে ফুটিয়ে তুলেছেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উত্থানের বিরুদ্ধে অলৌকিক ভাষা ও ছন্দে বিদ্রোহী কবিতায় নজরুল ইসলাম তাই করেছেন, এই দিক দিয়ে বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব কাব্যে যার দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। 'গুয়েনির্কা'তে আমরা যন্ত্রণার যে নগ্ন মূর্তি দেখি, 'বিদ্রোহী'তে সেই প্রত্যক্ষ যন্ত্রণার বদলে আছে শক্তির দুর্দান্ত অভিব্যক্তি; কিন্তু বিদ্রোহীর শেষ স্তবক দু'টিই বলে দেয় 'বিদ্রোহী' শক্তিই ঐ বিশ্ব মানবতার অসহনীয় যন্ত্রণারই অভিব্যক্তি। উল্লেখযোগ্য, জার্মান ভাববাদী দার্শনিক নীৎসে ইচ্ছাশক্তি বাড়িয়ে মানুষ যত মানুষে পরিণত হতে পারে এই দর্শনে মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই দর্শন দিয়ে ধনবাদী বা সাম্রাজ্যবাদীদের উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন। অনেকের বিশ্বাস, অনেকের ধারণা, এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল হিটলার ও মুসলিনির চরিত্রে। শোষক চিরদিন শোষক থাকবে, দাস চিরদিন দাস। নীৎসের দর্শনে এই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। পিকাসো নীৎসেকে পড়েছিলেন কিন্তু সে দর্শন একটি বিপরীত ভাব নিয়ে 'গুয়েনির্কা'য় রূপ লাভ করে। শোষিতের বিরুদ্ধে মানুষের আক্রোশের যে শক্তি তা 'গুয়েনির্কায়' রূপায়িত হয়। 'বিদ্রোহী'তেও আমরা সেই নিপীড়িতের শক্তির আত্মপ্রকাশ দেখি। ইকবালের 'খুদী দর্শনে' নীৎসের অতিমানুষ হওয়ার দার্শনিক চিন্তা প্রেরণার প্রভাব রাখতে পারে কিন্তু তিনিও দানব শক্তির বিরুদ্ধে শক্তিকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। সুলতানের ১৯৭৬-এর পেশী বহুল মানব-মানবীর চিত্রপটে সেই দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছিল। সুলতান প্রত্যক্ষভাবে বা স্পষ্টভাবে বলতেন না কিন্তু জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের ছবিগুলো মানুষের মনে যে করুণার উদ্রেক করে সেই ছবি একটি তাৎক্ষণিক ছবি বলে তাঁর ধারণা ছিল। ক্ষুধিতের শীর্ণ শরীর চিত্রের মধ্যে জয়নুল আবেদিন একটি প্রশান্ত বিদ্রোহের সুর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু জয়নুলের কোন ছবিতে 'গুয়েনির্কার' মতো protest against the brutality of fascism in paricular and modern war in general লক্ষ্য করা যায়নি।

সুলতান কি মানুষের এই যন্ত্রণার বাস্তবতার প্রত্যক্ষ দিকটাকে এড়িয়ে কোনো ভবিষ্যতের স্বপ্নে ঐ কল্পনামূর্তির বিবুদ্ধ চিত্র মানুষকে উপহার দিতে চেয়েছিলেন? পিকাসোর সঙ্গে সুলতানের একটি মিল ছিল। বয়সের সাথে সাথে অনেক শিল্পীর শিল্প নৈপুণ্যে ভাটা পড়ে। কিন্তু পিকাসোর জীবনে তা ঘটেনি। ১৯৭৬-এ সুলতান পঞ্চাশ পেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার গঞ্জিকা শোষিত শীর্ণ শরীরের মধ্যে তাঁর যে মনটি ছিল তা বলিষ্ঠতায় তরুণ ষাঁড়ের চেয়ে কম ছিল না। তিনি ম্যাটাডররূপী পিকাসোর মতো ছিলেন না কিন্তু তার ঐ বয়সের আঁকা ছবির মধ্যে স্পেনের লড়াকু

ষাঁড়ের শক্তি ফুটে উঠেছিল। বাইরের বিনয়ী ক্ষীণদেহী সুলতানের মধ্যে যে কি প্রবল স্বাধীনতা প্রিয় একজন বিদ্রোহী সুলতান বাস করতেন ফুঁসে ওঠা সাগর তরঙ্গের মত পেশীর উচ্ছ্বাসের রূপ এঁকে সুলতান আমাদের তা দেখিয়েছেন।

যা হোক, ১৯৭৬-এর পর সুলতান আবার হারিয়ে গেলেন। কিন্তু ১৯৭৬-এর চিত্র প্রদর্শনীর পরে মনে হল সুলতান নব জন্মলাভ করেছেন। স্বদেশী মানুষের কাছে তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। বাংলাদেশের মানুষ যে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী শিল্প-রসিক ও সংস্কৃতি-রসিক হয়ে উঠেছেন তা বোঝা গেলো। আমি তৃপ্তি পেলাম। তরুণ বয়সে যাঁকে আমি একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী ভেবেছিলাম—সুলতান শেষ পর্যন্ত তাঁর কর্মের মাধ্যমে আমার সেই ধারণাকে সত্যে পরিণত করেছেন।

আমার সঙ্গে সুলতানের শেষ দেখা হয় শান্তিবাগে। আমি শান্তিবাগের প্রফেসর আবুল কাশেম সাহেবের (ভাষা আন্দোলনের কাশেম সাহেব নন) ১৯৫/৪-এ শান্তিবাগের তিনতলা বাড়ীর দোতলা ফ্লাটের ভাড়াটে ছিলাম। সময়টা ১৯৮৪। আমাদের বাসার সামনে গলি-রাস্তার অপর পারে থাকতেন হরদত্ত গ্লাস ফ্যাক্টরির জেনারেল ম্যানেজার কিবরিয়া সাহেব। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না, একদিন বিকেলে আমার হাতে একটি চিরকুট এলো: আর্টিস্ট সুলতান আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমার বাসায় এসেছেন। অনুগ্রহ করে আসবেন কি?

সুলতান নাম শুনে গায়ে হাওয়াই শার্ট চাপিয়ে লুঙ্গি পরে বেরিয়ে এলাম। সুলতানের সঙ্গে দেখা হলো। অধিকাংশ গঞ্জিকাসেবীদের মতো বিশুষ্ক তোবড়ানো গাল, ক্লীন শেভে সুলতান। লম্বা কালো গাউন পরা। অতি শীর্ণ কিন্তু সেই পূর্বের মতো ঋজু মেরুদন্ড এবং ঋজু গ্রীবা। পূর্বের সেই অম্লান হাসি আছে কিন্তু সেই শুভ্র সুন্দর দাঁত নেই। কিন্তু ঠোঁটে মুখে ও চোখে দাঁত না ওঠা শিশুর হাসির মাধুর্য।

ভাই কেমন আছেন? বলে দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন। দু'জনে কোলাকুলি করলাম। পরস্পর কুশল বিনিময় হল। দেখলাম সুলতানের চেহারার বদল হয়েছে কিন্তু স্বভাবের বদল হয়নি।

সুলতান এ বাসায় কেন এলেন?

সুলতান ঐ বাসায় প্রায় আসতেন। সম্ভবতঃ শিল্প রসিক এবং সঙ্গীত রসিক কিবরিয়া সাহেবের বন্ধুত্বের টানে এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনতে। কিবরিয়া সাহেবের সংগ্রহে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, করিম খাঁ, বড়ে গোলাম আলী, আমীর খাঁ প্রমুখের লং প্লেয়িং রেকর্ড ছিল। ছিল ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। আমীর আলী খাঁ, রবিশঙ্করের সরঙ্গী

সেতারের বাজনারও লং প্লেয়িং রেকর্ড। সুলতান ঢাকায় এলে তাই কিবরিয়া সাহেবের বাসায় আসতেন ঐ সব শুনতে। কিবরিয়া সাহেবের শিল্প ও সংগীত–এর তানের প্রশংসা করতেন।

সুলতান কারও সমালোচনা করতে জানতেন না—কাউকে ছোট করতে চাইতেন না। সবাই বন্ধু সবাই আত্মীয়।

সুলতান ১৯৭৬–এ আমার শাহজাহানপুরের বাসায় কয়েকবার এসেছেন। আমার স্ত্রী নূরজাহানকে বোনের মতো স্নেহ করতেন। নূরজাহান সুলতানকে জিজ্ঞেস করেছিল, ভাই আপনি বিয়ে করেননি কেন? সুলতান হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, যে বয়সে মানুষ নারী প্রেমে পড়ে সে বয়সে শিল্পের প্রেমে পড়েছিলাম তাই। আজও তো সে প্রেমে ভাটা পড়েনি।

সুলতান লোকান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু যারা অমর হওয়ার জন্য জন্মান তাঁদের যথার্থ মৃত্যু কোনোদিন হয় না।



কাজের শেষে কৃষক তেল রং ১৯৭৬



মুকুটহীন সুলতান

বুলবন ওসমান

গত বছরের আগস্ট মাসের কথা। চারুকলা বিভাগের পরিচালক সুবীর চৌধুরী শিল্পকলা একাডেমী থেকে ফোন করে : স্যার, আমরা শিল্পী এস.এম. সুলতানের সত্তরতম জন্মবার্ষিকী পালন করব নড়াইলে, আপনাকে অন্যতম আলোচক হিসেবে রেখেছি, আপনাকে যেতে হবে।

আমি জানতে চাই আর কে কে যাবেন। সাদেক খান সাহেব আছেন, আসাদ চৌধুরী আর কেরামত মওলা, সুবীরের উত্তর।

দলটি ভালো লেগে গেল। অনুষ্ঠানটিও মঙ্গলসূচক। আর ঢাকার বাইরে যাবার ডাক এলে আমার এমনিতে কেন জানি খুব ভালো লাগে।

রাজি হয়ে গেলাম।

যাবার দিন ঘনিয়ে এলো। ৯ই আগস্ট বেলা আড়াইটায় শিল্পকলা একাডেমী থেকে হবে যাত্রা।

দুপুরের আহার সেরে শিল্পকলা একাডেমী।

দু'টি গাড়িতে রওনা।

সাংবাদিকদের নিয়ে একটি মাইক্রোবাস। আর একটি কার। পর্যটনের। এসি লাগান। কারে আমি, সাদেক খান, কেরামত মওলা, আসাদ চৌধুরী আর সুবীর।

ঢাকা শহর ছাড়িয়ে গাড়ি সাভারের পথে এগিয়ে চলে। সাভারের ভূ-দৃশ্য গজারি গাছের জন্যে ইউরোপের মত লাগে। উঁচু-নীচু ভূমি, গড়ের চরিত্র ধরে কেমন একটা অচেনা ভাব তৈরি করে। মনে হয় এ-অঞ্চল যেন বাংলাদেশের নয়। কোনো শিল্পী এখানের ভূ-দৃশ্য আঁকলে লোকে হয়ত বলবে বিদেশী ছবির নকল। এমনি একটা সাজান-গোছান ভাব।

আমরা সাভার ছাড়িয়ে নয়ারহাটের কাছে পৌঁছেছি আর আকাশ কালো করে নামল ঘন বৃষ্টি। বাংলার সে এক অপরূপ রূপ। পিচঢালা রাস্তা ঝকঝক করছে জলে ভিজে। রাস্তার দু'পাশের নীচু জায়গায় কলমি আর নানা রকম জলজলতা সবুজে ছেয়ে রয়েছে। মাঠে পাট ক্ষেতও হাওয়ায় মাথা দুলিয়ে আনন্দ প্রকাশ করছে।

আরিচা ঘাটে আসতে আসতে বৃষ্টি থেমে গেল। পড়ন্ত বিকেল। নদীর ঘাটে হু হু হাওয়া। আমরা অল্পক্ষণের মধ্যে ফেরিতে। প্রথম ফেরিটিই পাওয়া গেল। ভরা নদীর খোলা জল কেটে ফেরি চলল দৌলতদিয়া অভিমুখে।

নদীতে বেশ বড় বড় ঢেউ।

বিশাল জলরাশি দেখে সবাই ভাবের রাজ্যে আনাগোনা শুরু করে। এরি মধ্যে শশা, ডাব ইত্যাদি ফলের সদব্যবহারও করে কেউ কেউ।

ভাটিতে থাকায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা দৌলতদিয়া পৌঁছে গেলাম।

আমার ধারণা ছিল না যে এদিকের রাস্তা, ঘাট এতটা উন্নত হয়েছে। আগে এখানে অনেকটা জায়গা হেঁটে তারপর বড় রাস্তায় উঠতে হতো।

চমৎকার প্রশস্ত রাস্তা, মসৃণ, দু'পাশ ঢালু ... আধুনিক প্রযুক্তির ছাপযুক্ত।

দেখতে দেখতে আমরা রাজবাড়ীর কাছে পৌঁছে গেলাম। রাজবাড়ী জেলা-শহরের কিছু কিছু সরকারি ভবন চোখে পড়তে লাগল। আগে এ-সব অজ-পাড়াগাঁ হিসেবে প্রায় পরিত্যক্ত ছিল।

সন্ধ্যার দিকে আমরা ঝিনাইদহ পৌঁছাই।

একটি মিষ্টির দোকানে সুবীর আমাদের বৈকালিক আপ্যায়নে নেয়।

এখানকার কাঁচা গোল্লা বেশ তাজা। পাউডার দুধে মিষ্টি তৈরি হয় না। বেশ ভালো স্বাদের। দামও ঢাকার তুলনায় অনেক কম।

প্রায় ন'টার দিকে আমরা যশোর পৌঁছাই।

সাংবাদিকরা এখানকার সার্কিট হাউসে থাকবে। আমরা এক কাপ চা পান করে নড়াইলের উদ্দেশে রওনা দিই।

নড়াইলগামী রাস্তাটা আগের মত প্রশস্ত নয় এবং কার্পেটিং-ও অমসৃণ। মহকুমা থেকে জেলা হবার ফল।

এই সব অঞ্চল আবার সর্বহারা পার্টির সদস্যদের দখলে, তাই কেউ কেউ আমাদের এই নৈশযাত্রাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে থাকে। যখনি দু'চার জন লোক দেখা যায় রাস্তার পাশে কেউ বলে ওঠে, এই ধরল ... সমস্ত রাস্তাটি প্রায় ফাঁকা মাঠের মাঝ দিয়ে। বসতির চিহ্ন কম। দূরে দু'একটা ঘর থেকে বাতির আভাস পাওয়া যায়।

নড়াইল অঞ্চলটিকে আমার দরিদ্রই মনে হলো। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যেতে রাস্তার পাশে যেমন চমৎকার চমৎকার দু' একটা বাড়ি দেখা যায় তেমন কোনো বাড়ির চিহ্ন নেই।

কথাটা আমি সাদেক ভাইকে বলেই ফেলি।

তিনি বললেন, যশোর কলকাতার খুব কাছে ছিল তো তাই এখানকার পয়সাওলা লোকেরা সব সম্পদ কলকাতায় ঢেলেছে। এদিকে কিছু করেনি। আর এখানে কোনো ইন্ডাস্ট্রিও গ্রো করেনি। এটাও একটা কারণ।

প্রায় দশটা সাড়ে দশটার দিকে আমরা নড়াইল সার্কিট হাউসে পৌঁছলাম। লম্বাটে দোতলা নতুন বাড়ি। দোতলায় উঠতে উঠতে প্রস্তর ফলকে দেখলাম নির্মাণের সময়। মাত্র বছর দু'য়েক হয়েছে, এখনো ভবনের মধ্যে একটা নতুন গন্ধ।

আমি আর সাদেক ভাই এক কক্ষে। পাশের কক্ষে কেরামত আর আসাদ চৌধুরী।

সার্কিট হাউসের সামনে দেয়ালের পাশে ইউক্যালিপটাসের সার। একটি বাঁধান পতাকা উত্তোলনের মঞ্চ। পাশে একটা জলাভূমি। তারপর ধানক্ষেত, বসতি।

খানিক পর আমাদের খাবার ডাক পড়ল। নীচে প্রশস্ত খাবার ঘর। বড় টেবিল। গরম ভাত, ঘনডাল, রুইমাছ ... তৃপ্তিকর খাবার।

রাত্রে সাদেক ভাই পত্রিকার ফিচার তৈরির জন্যে অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় বসে কাজ করলেন।

একে নতুন জায়গা, তায় স্পঞ্জের বিছানা ... অনেক রাত পর্যন্ত আমারও ঘুম আসে না।

সকালটা বড় চমৎকার।

সাদেক ভাই প্রভাতফেরিতে বেরিয়ে গেলেন। আমি উঠি ছাদে। দিগন্ত ছুঁয়ে সকালের ফর্সাভাব। পূবাকাশে মেঘ থাকায় সূর্যালোক বন্ধ। একটা শীতল হাওয়ার স্রোত ইউক্যালিপটাসের মাথা দুলিয়ে চলেছে। পাতায় পাতায় ঝির ঝিরে আওয়াজ। পাশের জলাভূমিতে ক্ষীণ-তরঙ্গ।

সকালটা ভ্রমণের ক্লান্তি দূর করায় ব্যস্ত।

নড়াইলের ভূ-দৃশ্য পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সাযুজ্যময়। আমাকে গৃহাভিমুখিনতায় পেয়ে বসে।

বেলা আটটার দিকে কৃষি-মন্ত্রী আসলেন।

সার্কিট হাউস সরগরম।

বেলা দশটায় শিল্পী সুলতানের জন্মদিনের অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

প্রায় দশটা বাজে। আমরা সুলতান সাহেবের বাসা অভিমুখে রওনা দিই।

সার্কিট হাউস থেকে খুব কাছেই ওঁর আবাস।

রাস্তা থেকে বাড়ি পর্যন্ত বিদ্যালয়ের বালকরা দুই সার দিয়ে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

অনেক লোক। শহরের লোক দল বেঁধে বাড়ির দিকে যাচ্ছে।

পুরো ব্যাপারটাই একটা বড় উৎসবের রূপ নিয়েছে।

আমরা সুলতান সাহেবের বাড়ি অভিমুখে এগোই।

দোতলা বাড়ির নীচতলায় তিনি একটি তক্তপোষে বসে। আমরা ঘরে প্রবেশ করি লোকজনের ভীড় কাটিয়ে।

আসাদ চৌধুরী আমার নাম বললেন, বুলবন ওসমান।

সুলতান সাহেব স্মিত হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

বললেন, ভালো আছো তো বাবা! সে কন্ঠে অদ্ভুত এক আন্তরিকতা।

তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে আমার খুব খারাপ লাগল। কেন জানি মনে হচ্ছিল তিনি

আর বেশী দিন আমাদের মধ্যে থাকবেন না।

রাত্রেই শুনেছিলাম ওঁর খুব শরীর খারাপ এবং হাঁপানির টানটা বেড়ে গেছে। আমরা বেরিয়ে পড়ি। পেছনে আরো দর্শনার্থীর চাপ।

অনুষ্ঠান যেখানে হবে আমরা গিয়ে সেখানে বসি। শুনলাম এটা ওঁর শিশু-স্বর্গের বিদ্যালয়। শুধু দুপাশের দেয়াল উঠেছে। তার ওপর টিন চাপিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন।

চালার পাশে ভাঙ্গা ইটের স্তূপ। শুনলাম এখানকার জমিদার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে এই বিদ্যালয় নির্মাণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। একটা পুরোনো ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এসে লাগছে।

সব কিছু ছাপিয়ে দীনতা প্রকটভাবে জানান দিচ্ছে। শিশু-স্বর্গে স্বর্গের কণামাত্র উপস্থিত নেই।

প্রায় এগারটার দিকে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

আমরা আলোচক, মন্ত্রী ও জেলা প্রশাসক মঞ্চে গিয়ে বসি।

শিল্পী সুলতানকে চেয়ারে বসিয়ে আনা হোলো। তাঁকে দেখাশোনা করেন যে মহিলা তিনি পেছন থেকে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন।

বক্তাদের মধ্যে আসাদ চৌধুরী খুব আবেগধর্মী বক্তৃতা দেন। আমার যখন ডাক আসে প্রথমে পুরোনো কথা বলি। মনে পড়ে প্রথম এশীয় দ্বি-বার্ষিক প্রদর্শনীর সময় একটি ক্যাসেট নিয়ে সুলতানের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় টেপ চালিয়ে দেখি যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যে কিছুই ধরা পড়েনি।

নড়াইলবাসীদের সেই দুঃখের কথা জানাই। আরো বলি : দেখুন, আমরা রাজধানীতে বসবাসকারীরা মফস্বলের ডাকে খুব একটা নড়ি না, কিন্তু শিল্পী সুলতানের জন্মদিন আমাকে নড়াইল নিয়ে আসলো। আরো বলি, দেখুন শিল্পী সুলতান বাংলার চাষীদের শুধু বড় করে দেখান নি, এর সব কাজকর্মই ছিল তাঁর কাছে বড়। বাংলার লাঠিয়ালদেরও তিনি বড় করে দেখেছেন। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে ম্যামথ শিকার থেকে শুরু করে চর দখল পর্যন্ত জীবনযুদ্ধের এপিঠ-ওপিঠ।



৭০তম জন্মদিনে শিশুদের মাঝে শিল্পী সুলতান (১৯৯৪)



৭০তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অসুস্থ শিল্পী সুলতানকে চেয়ারে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে (১৯৯৪)

প্রচুর গরম থাকায় আমি বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করি।

জেলা-প্রশাসক এবং মন্ত্রী সরকার কি কি করেছেন এবং করবেন তার একটা ফিরিস্তি দেন।

সব শেষে শিল্পীকে সবাই কিছু বলার জন্যে অনুরোধ করে।

শিল্পী সুলতান সবার অনুরোধে বলতে শুরু করেন। তিনি বলেন : প্রতিটি শিশু জন্মায় বিকাশ লাভ করার জন্যে। কিন্তু আমরা তাদের বিকাশের পরিবেশ দিতে পারি না।

শ্যাওলা ও পাথরের মধ্যে যে গাছ বেড়ে ওঠে তাদের গায়ের রঙ যেমন ঐ জায়গার মত হয়ে ওঠে, শিশুরাও তেমনি; যে-জায়গায় থাকে সে-ভাবে বেড়ে ওঠে।

তিনি কথাগুলো এমন করে বলছিলেন তা যে-কোনো দার্শনিকের উপলব্ধির চেয়ে কম ছিল না। আমি অবাক হচ্ছিলাম। এমনিতে তিনি কথা খুব সুন্দর করে বলতে পারেন, কিন্তু জীবনের শেষ পাদে এসে তা অন্য এক মাত্রা লাভ করেছে।

তাঁর ভাষণ ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত।

শরীর তাঁকে বেশি কিছু করার অনুমতি দিচ্ছিল না।

আমরা বিদায় নিয়ে তখনি সার্কিট হাউস। কালক্ষেপ না করে আহার। গাড়িতে উঠে বসতেই ঢাকার উদ্দেশে গাড়ি ছেড়ে দেয়। রাত্রের মধ্যেই সব খবর জায়গা মত পৌছে দিতে হবে। টিভি ও খবরের কাগজ যাতে সব কভার করতে পারে।

দু' মাস যেতে না যেতেই ১০ই অক্টোবর খবর পেলাম বিকেলে সুলতান সাহেব ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

তখন মনে হলো বারেক শেষ জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। না হয় আর কোনোদিন দেখা হতো না।

কানে আজো বাজে সেই কন্ঠস্বর : ভালো আছোত বাবা!

বাংলার রূপকারদের মধ্যে জয়নুল, কামরুলের সঙ্গে আর একটি নাম সব সময় উচ্চারিত হবে—যিনি মুখে সোনার চামচ নিয়ে জন্মাননি ; তিনি বাংলার মুকুটহীন সুলতান।



শিল্পী সুলতান ও তাঁর লৌকিক-ঐতিহ্যশালী অতীতাগ্র যাত্রা

রবিউল হুসাইন

পৃথিবীব সব দেশে শিল্পচর্চা সবসময় দু'টি খাতে প্রবাহিত। একটি প্রথাগত আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষানুগত ধারা আর একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক লৌকিকধর্মী ব্যক্তিগত ধারা। আমাদের দেশেও এই শিল্পপ্রবাহ পরিদৃষ্টমান হয়ে চলছে। একথা মানতেই হবে যে শিল্পের মূলধারার বিচারে প্রাতিষ্ঠানিক ধারার ক্রমবর্দ্ধমানতা এবং ক্রম অগ্রসরমানতার বিভিন্ন অবস্থাকে নির্দিষ্ট করে আর সেটাই সাধারণত একটি দেশের মূল শিল্পধারা বুঝিয়ে থাকে। শিল্পবিচারে এই দু'টি ধারা একটি অপরের পরিপূরক। মূলধারা সবসময় লৌকিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারার দ্বারাই পরিপুষ্ট হয়। সব দেশের মতো আমাদের দেশেও লৌকিক ধারার প্রচ্ছন্নগতি বয়ে যাচ্ছে, যে চিহ্ন ততো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না সচরাচর। তবে মাঝেমধ্যে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে নাগরিক সংস্কৃতিপ্রেমীদের নকশীকাঁথা, মৃন্ময়ী পাত্র ও নানান জিনিষপত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে। মজা হচ্ছে, মাটির কাজ ও ব্যবহার্য বিষয়বস্তুগুলো যেমনভাবে পূর্ণতা প্রকাশ করে তেমনভাবে আঁকাআঁকি, মনুষ্য বা জীবজন্তুর অবয়বচিত্র করে না। তবে এর মধ্য থেকে একটি আদিম শিশুসুলভ রূপ ফুটে ওঠে যা মৌল, বিশুদ্ধ, প্রভাবহীন এবং সরল। এসবের শিল্পীগণ তাই স্বাভাবিকভাবেই হয়ে পড়েন প্রাথমিকভাবে আত্মগত এক রীতির মধ্যে বন্দী যা থেকে উত্তরণ সাধারণত হয় না। কিন্তু যেহেতু তা দৈশিক সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলে তাই আমাদের জন্যে তা এক শিল্পগুণমন্ডিত একটি রূপের সৃষ্টি করতে সহায়তা করে এবং লৌকিক শিল্পের অঙ্গ

হয়ে দাঁড়ায় যার জন্যে আমরা গর্ব অনুভব করি। শিল্পী এস. এম. সুলতান এই শেষোক্ত দলের হয়তোবা শেষ শিল্পী। তাঁর তেমনভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, তাই তাঁকে নাঈভ বা অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পী বলা যায়। এবং এসব সত্বেও তিনি বাংলাদেশের এক প্রধান শিল্পী হিসেবে পরিগনিত। তাঁর প্রধান গুণ দেশজাত। তাঁর ছবির মানুষজন, জীবজন্তু এদেশেরই বিষয়। তাঁর বিষয় একটিই সেটি হচ্ছে গ্রাম বাংলা ও গ্রামের মানুষ। এই গ্রামবাংলার মানুষ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, যারা জীবন যাপন করে চাষাবাদ করে, মাছ ধরে। এইসব মানুষের সঙ্গে পোষ্য জীবজন্তু এবং অবারিত প্রকৃতির সহাবস্থান বিদ্যমান। ঘরকন্না, সংসার কর্ম, সন্তান পালন, মাঠে ফসল ফলানো, বিলে মাছ ধরা, বাজার-হাট, গাছ লাগানো অর্থাৎ গ্রাম ভিত্তিক জীবনের সম্পূর্ণ ছবি সুলতানের বিষয় এবং অবশ্যই তা মানুষকেন্দ্রীক। তাঁর ছবি সরল এই অর্থে যে সেটি গ্রামীন জীবন যাপনের সহজ বিবরণ দ্যায় কিন্তু দ্যায় না সেরূপ কোনো গূঢ় তত্ত্বগত অবচেতনগত মানবিক জটিলতার রূপ যাকে আমরা আধুনিক বা সমসাময়িক বলে অভিহিত করতে পারি। এইখানে তাঁর ছবির মূল বিষয়দর্শন পিছিয়ে থাকে একথা স্বীকার্য, কিন্তু যখনই তা দেশের মূল ঐতিহ্য ও ধারার বিষয়ে আলোকপাত করতে চায় তখনই সেটি উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত হয়। এই অনুধাবনটি বর্তমানে সোচ্চারিত। বিশেষ করে উপনিবেশিক রাষ্ট্রতন্ত্র ভেঙে যাওয়ার পর পৃথিবীর বহু দেশ যখন স্বাধীনতার স্বাদ পেতে আরম্ভ করে তখন শিল্পমূল্যের অন্যতম বিচার্য বিষয়ে দেশজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল উপস্থাপনা বিশেষভাবে বিবেচ্য হচ্ছে। একসময় যখন ইউরোপীয় সংস্কৃতি প্রতিটি অধ্যায়ে, বিশেষ করে চিত্রশিল্পে, প্রগাঢ়ভাবে শিক্ষা ও মনোগত অধিকারের বিশেষ সুবিধা পেয়ে এক অগ্রসর চেতনারূপে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিলো, তখন এই দেশজ ঐতিহ্যগত মনোভাব এটিকে অন্য এক দিকনির্দেশনার দিকে পরিচালিত করে। এবং লক্ষ্যনীয় বিষয় যে, দেশে দেশে শিল্প-সাহিত্য-স্থাপত্যে এই মনোভাবটি দিন দিন আরো সুস্পষ্ট ও সুপুষ্ট হতে চলেছে। এই দিকটির দিকে দৃষ্টিপাত করলে অবশ্যই সুলতানের ছবি অন্য একটি মাত্রা পায়। অবশ্য এই মাত্রার দিকে অনেকেই শ্রদ্ধাশীল নাও থাকতে পারেন। সেই প্রেক্ষিতে তারা সুলতানকে আধুনিক শিল্পী হিসেবে গণ্য নাও করতে পারেন। এই বিষয়ে বলা যায় একথা ঠিকই যে সুলতান আমাদের দেশের আধুনিক চিত্রশিল্পের প্রতিভূ নন এবং এ দাবী তিনি কখনো করেন নি। তিনি সবসময় তাঁর নিজস্ব জগতের শিল্পী, যে জগত এই গ্রামবাংলার আদিরূপ যা হয়তো অতীতে ছিলো, হয়তো ছিলো না, যে রূপ হয়তে ভবিষ্যতে হতে পারে আবার না-ও হতে পারে। তাঁর অতীত এবং ভবিষ্যত শিল্পকৃতি বর্তমানের ওপর দিয়েই গড়ে উঠেছে।

বর্তমানে দাঁড়িয়ে তিনি দেশকে স্বপ্নময় দেখতে চান যেখানে মানুষজন সুখী, স্বাস্থ্যশীল ও পরিপূর্ণ। তাঁর স্বপ্ন মানুষকে নিয়ে—কেননা একটি দেশের জন্য মানুষই প্রধান। এরূপ দর্শন তাঁর ছবিতে পাওয়া যায় এবং তা স্বপ্নীল এক ইউটোপিয়ান জগতের সন্ধান দেয়। ছবির বিষয়ে এই যুক্তি বেশ শক্তিশালী বিশেষ করে এককালের গৌরবময় প্রাচুর্যভরা বর্তমানে অন্যতম দরিদ্র দেশের জন্য এই স্বপ্ন খুব আশাবাদের পরিচয় দেয় এবং স্বভাবতই গঠনমূলক এই আশা প্রেরণা, সাহস ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। সুলতানের ছবির এই দিকটি অতি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। একজন শিল্পী হয়ে তিনি এইভাবে একজন সমাজ সচেতন নাগরিক হিসেবে প্রমাণিত হন যে কাজের দায়িত্ব বর্তায় সাধারণত একজন সমাজ সংস্কারক বা একজন রাজনীতিকের ওপর। দেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁর ছবি দেখে একজন দর্শক হতাশ হন না, ভেঙে পড়েন না বরং অন্য এক স্বপ্নে উজ্জীবিত হন। এই হিসেবে তাঁর সেই সুবিখ্যাত এক বৃদ্ধের হাতে মাটিতে বীজ বপণ করার ছবিটি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে আমাদের কাছে ধরা দেয়। ছবিটির মধ্য দিয়ে একটি মানুষ, গোষ্ঠী বা দেশের ভবিষ্যত স্বপ্নকে চারিত করে প্রকাশিত হয়। ছবিটির তাই বহুমাত্রিক রূপ আমরা দেখতে পাই। শিল্পী মাত্রেই স্বাপ্নিক। তাঁর দৃষ্টি ও কর্ম সুন্দর, শুদ্ধ ও শুভ্রতার প্রতি। সবকিছু মিলে এটিই স্বপ্ন। এই স্বপ্নের প্রতি দায়বদ্ধ তিনি। গ্রামের নিভৃত কোণ থেকে শিল্পী গ্রামবাংলার আদিরূপের সন্ধানে ব্রতী এবং চারপাশের প্রকৃতি, দৃশ্য ও পরিবেশ থেকে তিনি বিষয় বেছে নিয়ে তাঁর বিশাল ক্যানভাসে নিজের স্পষ্ট রং-রেখা দিয়ে ছবি সৃষ্টি করেন। ছবির মানুষ ও রেখা আদিম ও সরল। মোটা তুলির আঁচড় যেন বা অপটু হাতের অসম্পূর্ণ টানে ভারসাম্যহীন যদি আমরা শিক্ষিত দৃষ্টিতে বিচার করি। কিন্তু যদি দেখি এটি গ্রামবাংলার আদি রূপে লৌকিক ঐতিহ্যগত এক নিরাভরণ সহজিয়া মননশীলতার পরিচয়ে পরিস্ফুট তাহলে বিষয় ও বস্তু এবং রীতি কৌশল এক হয়ে ধরা দেয়। তাই সুলতানের ছবি গূঢ় এক অর্থে আদিম তাই সেটি আকৃষ্ট করে সবাইকে এর সরল-সহজ আকর্ষণের কারণে। তাঁর ছবি সরাসরি, অকপট, ঘোরপ্যাঁচহীন। তাই দর্শকদের কাছে প্রিয় হয় সহজে। এই কারণে তাঁর ছবি যেমন স্পষ্ট আবার অস্পষ্টও। তিনি অস্পষ্টতা খুঁজে পান যিনি মূর্তের মধ্যে একটি বিমূর্ত আদর্শ খুঁজতে যান। কিন্তু তাঁর ছবি এর সীমার মধ্যেই সীমিত। দেশপ্রেম, গ্রাম বাংলার আদি রূপ, মানুষের সহজ-সরল জীবন-যাপন, মানবপ্রেম, দেশকে নিয়ে চূড়ান্ত স্বপ্ন, আর্কেডিয়ার রূপ — এইরূপ চিন্তা ও দর্শনের বাইরে মানুষের ভেতরের অবচেতন জগত, বোধের সীমানায় অবস্থিত আলো-আঁধারের জগত তাঁর ছবিতে অনুপস্থিত। তাঁর ছবির ড্রইং সংগঠন, বিভিন্ন অবয়বের রূপ-কৌশল অজ্যামিতিক,

অবৈজ্ঞানিক, তাই সঠিক মূর্ততায় প্রতিবিম্বিত নয়। তিনি বাস্তবরীতির অনুসারী ঠিকই কিন্তু তা আবার পরিপূর্ণ অর্থে নয়। হুবহু বাস্তবতা থেকে সরে তিনি তাঁর নিজের মতো করে নিজস্ব রীতিতে প্রতিরূপ প্রদান করেন। সেই হিসেবে তাঁর রীতিকে আধা-বাস্তব বলা যায়। তাঁর ছবি হয়তো প্রগাঢ় চিন্তা উৎপন্ন করে না বা তাঁর ছবি সংগঠনের দিক দিয়ে একটি বুদ্ধিদীপ্ত স্থাপনা সৃষ্টি করতে পারে না ঠিকই যার জন্যে অনেকে তাঁর ছবি হয়তো পছন্দ করেন না, সেটি তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে তিনি উদ্ভাসিত হন উজ্জ্বল রূপে যখন, দেশ, বাংলা, গ্রাম, মানুষ, পরিবেশ ইত্যাদি সম্বন্ধে চিন্তা করে সেগুলোকে লোকজ ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করি। তিনি তাঁর দিক থেকে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত এক অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছেন এবং অবশ্যই তা এই দেশেরই সনাতনী ধারার অংশবিশেষ।

ব্যক্তিগত জীবনে শিল্পী সুলতান আর সাধারণ দশ-পাঁচজন সংসারী মানুষ বা শিল্পীর মতো জীবনযাপন করেন না বলে এই নিস্তরঙ্গ সময়ে তিনি কিংবদন্তী মূলক। চিরকুমার, সর্বদা গ্রামবাসী, প্রথম জীবনে সারাবিশ্ব ঘুরে বেড়িয়েছেন, নিজস্বধারার পোষাকে অবয়বে ও পরিচর্যায় পরিচালিত, রাধাপ্রেমী, জীবজগত অর্থাৎ কাক-সাপ, খরগোস, কুকুর, বিড়াল, ছাগল, হাঁস-মুরগী, পাখিপ্রেমিক, উদ্যানসেবী, শিশুপ্রেমিক, ভাসমান নৌকোয় ছবি আঁকার বিদ্যালয়—এরকম বহু বিষয়ে তিনি উল্লেখযোগ্য তাই সহজেই আকর্ষণীয় এই গার্হস্থ্য জীবন যাপনপ্রিয় মনুষ্যসমাজে যা সত্যিকার অর্থে শিল্পী-সুলভ অতি পূর্ণ ও প্রকৃত।

শিল্পী সুলতান সম্ভবত এই দেশে সবচেয়ে বৃহদাকার ক্যানভাসে ছবি এঁকেছেন তেল মাধ্যমে। ছবিটি মতিঝিলের শিল্প ব্যাংক ভবনের লাউঞ্জে প্রদর্শিত। ১০ ফুট প্রস্থে এবং ২০ ফুট দৈর্ঘ্যে মোট দুশো বর্গফুট জুড়ে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তাঁর সনাতনী রীতি কৌশলে তৈলচিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। জানা গেছে, শিল্পী প্রথমে ছবিটির নামকরণ করতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭০ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের একটি বাক্য - "তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়" দিয়ে। কিন্তু পরে সেই নাম পরিবর্তন করে "সচল সবাক ইতিহাস" রেখেছেন। শিল্পীর চিরাচরিত বৈশিষ্ট্যরীতির পেশীবহুল মানুষদের নিয়ে মোটা আঁচড়ের ছবিটিতে দুইদিকের যাত্রা ও গতি দেখা যায় কৌণিকভাবে। একদিক থেকে মানুষ গ্রাম ছেড়ে দলে দলে পালিয়ে যাচ্ছে ছেলেমেয়ে, বউবাচ্চা, বুড়ো মা-বাবা, কুকুর-মুরগী, হাঁস-গোরু, মহিষ, ঘটি-বাটি, বিছনাপত্তর নিয়ে শত্রুদের অত্যাচারে, আর অন্যদিক থেকে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে তেড়ে আসছে সেই গ্রামেরই

অসীম সাহসী পেশীবহুল দশাসই চেহারার বীরপুরুষগণ বল্লম, সড়কি, ঢাল, তলোয়ার হাতে নিয়ে, মালকোচা মেরে, মাথায় গামছা বেঁধে। মোটামুটি এই প্রতীকী বিষয়। তামাটে রং, দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ, আগুন-লাগা লাল গ্রাম, আকাশ, মেঘ, গাছ-গাছালি -এসব নিয়েই শিল্পীর আধা-অসম্পূর্ণ বাস্তবরীতির চিত্রকর্ম। স্বাধীনতা যুদ্ধে এই দৃশ্য খুব সাধারণ ছিল। পাকিস্তানী শত্রুবাহিনীর আধুনিক স্বয়ংক্রিয় যুদ্ধাস্ত্রের বিরুদ্ধে গ্রামের সহজসরল মানুষ উদ্দীপ্ত দেশপ্রেমে বলীয়ান হয়ে সাধারণ বল্লম, সড়কি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলা। এই বোকামী, সরলতা বা আদিমতা যাই বলি না কেনো, সুলতানের ছবিতেও তেমন এক আদিম-নাঈভতা খুঁজে পাওয়া যায় যা তাঁর শিল্পকৌশলের একান্ত এক নিজস্বরীতি-প্রকরণে ও ব্যক্তিগত কৌশলে দাঁড়িয়ে গেছে। আর এই শিল্পভঙ্গী ও উপায় নিয়েই আমাদের শিল্পজগতে ব্যতিক্রমী নিষ্ঠাবান শিল্পীর অনন্য লৌকিক-ঐতিহ্যশালী অতীতাগ্র যাত্রা।



মাছ ধরা তেল রং ১৯৭৬



সুলতান : তাঁর জীবন, কথা ও কাজ

মতলুব আলী

এক

'আল্লার কসম খেয়ে আমি ওয়াদা করছি, কখনও নিমকহারামি করবো না'—মীরজাফররূপী এস.এম. সুলতান মঞ্চে দাঁড়িয়ে খুব জোর গলায় এজাতীয় বাক্য দর্শকদের উদ্দেশে ছুড়ে মারছেন এমন দৃশ্য নিশ্চয়ই কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্য যে এমনটি ঘটেছিলো।

১৯৫১ সালের শেষের দিকে, শীত জাঁকিয়ে বসেনি তখনও, তৎকালীন পাকিস্তানের রাজধানী করাচীর কাট্‌রাক হল-এ বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী দর্শক-সমাগমে পরপর দু'রাত মীরজাফর সেজেছিলেন সুলতান 'সিরাজুদ্দৌলা' নাটকে। এ তথ্য জেনেছি রেডিও বাংলাদেশের ভূতপূর্ব ডিডিজি (নিউজ) আফতাব উদ্দীন আহাম্মদের কাছে। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে আফতাব উদ্দীন সাহেব করাচী রেডিওতে বাংলা সংবাদ পাঠকের পদে নিয়োজিত ছিলেন। আর ওই সময়েই ভারত ঘুরে পেশোয়ার-লাহোর হয়ে এস.এম. সুলতান এসে পৌঁছেছেন করাচীতে—উঠেছেন তাঁরই বাসায়। আজকের চলচ্চিত্র, সঙ্গীত ও নাট্য ব্যক্তিত্ব খান আতাউর রহমানও সেখানেই অবস্থান করছিলেন। বাংলাদেশের গণসঙ্গীতের দুই পুরোধা সুরস্রষ্টা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আলতাফ মাহমুদ ও শেখ লুৎফর রহমানও তখন করাচীতে। বাঙ্গালী আরও যাঁরা ছিলেন সবাই মিলে ঠিক করেছিলেন 'সিরাজুদ্দৌলা' নাটক মঞ্চস্থ করবেন। পরিচালক খান আতাউর রহমান; নাটকের নাম ভূমিকাতেও ছিলেন তিনি। সব ঠিক্ ঠাক্, কিন্তু

মীরজাফরের ভূমিকাটি জমছিলোনা। রিহার্সেল প্রায় দু'মাস হয়ে গেলো। মীরজাফর চরিত্রটি নিয়েই বেঁধে গেলো যতো সমস্যা। কে করবে অভিনয়?

সুলতানের তখন লম্বা সূঁচালো দাড়ি, মাথায় লম্বা বাবরী চুল—পাদ্‌রি সাহেবদের মতো পরে থাকতেন কখনো কালো ও কখনো খয়েরি রঙের জোব্বা। পায়ে থাকতো 'শু'। তাঁর বাংলা উচ্চারণ খুব ভালো ছিলোনা সে সময়, এমনকি অনেক শব্দ ভুলেও গেছেন এমন অবস্থা তখন—বলতেন চমৎকার উর্দু। ইংরেজী বলার অভ্যাসও ছিল, তার গলার সুরটা চমৎকার আর বেশ ভারি। ঠিক এ ধরনের লম্বা চওড়া চেহারা, ওইরকম চলাফেরার ভঙ্গি ও যাত্রার ঢঙ-এর জোরগলার চরিত্রটির জন্যে সর্বসম্মতিতে নির্বাচিত হলেন সুলতান। প্রস্তাবটি শুনে প্রথমে গররাজি, কিন্তু পরে খুশীমনে গ্রহণ করলেন দায়িত্বভার। বললেন : ঠিক আছে আমিতো বাঙ্গালীই, উচ্চারণ একটু প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে। রিহার্সেল হলো প্রায় তিনমাস। রিহার্সেল-স্থানের গৃহকর্তা আফতাব সাহেব নিজেও মোহনলাল ও অন্য আরেকটি চরিত্রে দ্বৈতাভিনয় করেছিলেন সে নাটকে।

নিজের অরিজিনাল পোশাক সেই কালো জোব্বা, আর নেচারাল দাড়ি ও লম্বা চুল—এ সবের সঙ্গে কোমরে একটা সোনালী জরির বেল্ট বেঁধে মাথায় পাগড়ী পরে মঞ্চে নামলেন সুলতান। ভালো রিহার্সেল হওয়াতে বাংলা উচ্চারণ ঘসে-মেজে ঠিক হয়ে গেছে ততোদিনে—মঞ্চে তাঁর মুভমেন্ট কমিয়ে দিয়েছিলেন পরিচালক, কারণ ওই জোব্বা-জাব্বা নিয়ে চলাফেরার সীমাবদ্ধতা। কিন্তু সব মিলিয়ে ভালোই উৎরেছিলেন সুলতান তাঁর সেই প্রথম মঞ্চাভিনয়ে। নাট্যশিল্পী সুলতানের এই হলো ইতিবৃত্ত।

ওই সময়কালেই এস.এম.সুলতান পূর্বাঞ্চলের মানুষ হয়েও চারুশিল্পী হিসেবে তৎকালীন পাকিস্তানের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন—সেখানে ইংরেজীতে পেপার উপস্থাপন করেছিলেন তিনি।

প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার আগে আফতাব সাহেবের কাছে শোনা আরেকটি চমৎকার তথ্য বলি : খান আতাউর রহমান বসেছেন হারমোনিয়ম নিয়ে। আর একটা সাধারণ মাপের কাগজে লাল কলম দিয়ে সুলতান প্রতিকৃতি আঁকছিলেন আফতাবের। প্রতিকৃতির কাজ প্রায় শেষ, আঁকতে আঁকতে হঠাৎ শুরু করলেন গুন গুন করে গান—গলা মেলাতে চেষ্টা করলেন হারমোনিয়মের সুরের সঙ্গে, আর অনেকটা আকস্মিকভাবেই পাশ থেকে 'স্প্যাচুলা'টি তুলে নিয়ে রঙ ঘসে ঘসে উচুঁ-নীচু ফর্ম সৃষ্টি করতে শুরু করলেন সেই প্রতিকৃতির মধ্যে।

অবশ্যই আতঙ্কিত হবার মতোই পরিস্থিতি, যার ছবি আঁকা হচ্ছে তার জন্যে। কিন্তু ব্যাখ্যা মিললো সুলতানের কাছে—এক কথায় বুঝিয়ে বললেন : 'এ হচ্ছে সংগীতের সুর।'

অর্থাৎ ছবি আঁকতে গিয়ে গানের সুর ভাজ্‌তে ভাজ্‌তে তিনি এমনই আত্ম-নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে সুরের/স্বরগ্রামের রূপ দিতে শুরু করেছিলেন চিত্রপটে। প্রতিকৃতির বিষয়টি উঠে গিয়েছিলো তখন তাঁর চিন্তা থেকে।

আসলে সুলতান ছিলেন জাতশিল্পী। শিল্পের নানা শাখাই ছিলো তার বিচরণক্ষেত্র। সঙ্গীতের সাধনাতো তিনি করেছেনই—বাঁশের বাঁশী তখনই তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলো, জোব্বার ঢোলা পকেটে গুঁজে রাখতেন সব সময়। পরবর্তীকালেও চিত্রা নদীর তীরে ঘরে বা বাইরে বসে বাঁশীতে তিনি সুর তুলতেন। নিজের হাতে বানানো বাঁশের বাঁশী—প্রকৃতি মেতে উঠতো স্তব্ধ হতো সেই সুরের মূর্চ্ছনায়।

দুই

'আমি আমার বিশ্বাসের কথা বলছি। আমার সকল চিন্তা, সবটুকু মেধা, সব কিছু শ্রম দিয়ে যা কিছু নির্মাণ করি তা কেবল মানুষের জন্য, জীবনের জন্য, সুন্দর থেকে সুন্দরতম অবস্থায় এগিয়ে যাবার জন্য।' একথা সেই ছবিপ্রাণ মানুষটির—এস.এম. সুলতানের। তাঁর শিল্প-চেতনায় স্বদেশ-ঐতিহ্যের প্রকৃতি ও পরিবেশগত দিক থেকে এতদঞ্চলের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রাম প্রাধান্য পেয়েছে।

সুলতানের চিত্রপট যেনো চিত্রের নিজস্ব স্বতঃস্ফূর্ত গতিতে রচিত। চিত্রই যেনো প্রয়োজনমতো শিল্পীকে সৃষ্টির এবং বিশেষ বিশেষ কর্ম-সম্পাদনের তাগিদ দিয়েছে। এই বক্তব্যের সঙ্গে শিল্পস্রষ্টা পাবলো পিকাসো'র একটি বিখ্যাত উক্তির সমর্থন রয়েছে, ঠিক যেক্ষেত্রে আপন কর্মভুবন তথা বৈচিত্র্যমণ্ডিত শিল্প-সম্ভার সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে এভাবেই ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেছিলেন যে, তাঁর ছবিই তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছে, ছবির অন্তর্তাগিদেই সৃষ্টি হয়েছে এই বিচিত্রতা। তাই একই প্রেক্ষিতে বলতে চাই যে, সৃজনশিল্পী সুলতানকে পেছনে ফেলে তাঁর কাজগুলো প্রাণময় হয়ে ওঠে, সৃষ্টি করে ভিন্ন দ্যোতনা, এক নবতর মাত্রা। মানুষ যে শক্তিময়তার দিক থেকেও অনেক বড়—এ সত্যের পরিচয় যেনো এস.এম.সুলতানের সমগ্র সৃজন-সাধনায় পরিব্যাপ্ত। কারণ তাঁর ছবিতে কখনও কৃশকায় মানুষ দেখা যায় না, বরং পেশীবহুল স্বাস্থ্যবান অবয়ব রচনার প্রতি সুলতানের বিস্তর নজীর চোখে পড়ে—এমন কি শুধু নরের ক্ষেত্রেই নয় রমণীদেরও তিনি সদা স্বাস্থ্যবতী, কর্মঠ,

সুঠাম দেহবল্লরী-বৈশিষ্ট্যেই তাঁর ছবিতে উপস্থাপন করেছেন।

এসব প্রসঙ্গে শিল্পীর নিজের ব্যাখ্যাও বড় পরিষ্কার। তিনি বলেছেন : 'আমার ছবির মানুষেরা, এরাতো মাটির মানুষ—মাটির সঙ্গে 'স্ট্রাগল' করেই এরা বেঁচে থাকে। এদের শরীর যদি শুকনো থাকে, মনটা রোগা হয়, তাহলে এই যে কোটি কোটি টন—মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তু-সকল আসে কোত্থেকে? ওদের হাতেইতো এসবের জন্ম। শুকনো—শক্তিহীন শরীর হলে মাটির নীচে লাঙ্গলটাই দাবেনা এক ইঞ্চি। আসল, মূল ব্যাপারটা হচ্ছে এনার্জি, সেইটাইতো দরকার। ঐ যে কৃষক, ওদের শরীরের এ্যানাটমী আর আমাদের ফিগার-এর এ্যানাটমী, দুটো দুই রকম। ওদের মাস্‌ল যদি অতো শক্তিশালী না হয় তাহলে দেশটা দাঁড়িয়ে আছে কার উপর?' আবার আরও বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের প্রেক্ষিতে বলেছেন : 'ওই পেশীর উপরেইতো আজকের টোট্যাল সভ্যতা।'

বড় সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে মিষ্টি ক'রে কথা বলতে পারতেন সুলতান। কি বাংলায় কি উর্দু কি ইংরেজীতে—অনর্গল ইংরেজীতে তাঁর সুমধুর ভঙ্গিমার বাচন একবার যিনি শুনেছেন তাঁর পক্ষে তা ভুলে যেতে পারা কঠিন। কথা আর কাজে সমান জোরের এমন বলিষ্ঠ উদাহরণ, বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে তার স্বল্পতা আমরা সব সময়ই স্বীকার করি। এদিক থেকে সুলতানের ব্যতিক্রমী স্বভাব-আচরণের স্মৃতি পৃথক-সত্তায় উদ্ভাসিত।

তিন

স্বকীয়তা ও গুণমান সমৃদ্ধ শিল্পস্রষ্টা এস.এম. সুলতানের জন্মস্থান বৃহত্তর যশোরের নড়াইল থানার মাসুমদিয়া গ্রাম। ১৯২৩ সালের ১০ আগস্ট সেখানকার এক দরিদ্র পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাবা শেখ মেসের আলী ছিলেন একজন রাজমিস্ত্রী। বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান হওয়া সত্ত্বেও অভাব-অনটনের কারণে সুলতানের সাধারণ লেখাপড়া মাত্র পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছিলো। আর ওই প্রাইমারী লেভেলের বিদ্যাকে পুঁজি ক'রে ওই বয়স থেকেই তাঁকে ভাবতে হয়েছিলো সংসারের জন্যে রোজগারের কথা। বাবার সঙ্গে যোগালীর কাজে হাতে খড়ি তখন থেকেই। মনে হয় পরবর্তীকালে তিনি যে মানুষকে শক্তিমান মহীয়ান হিসেবে চিত্রিত করেছিলেন সেই প্রেরণার উৎসও তাঁর সেই শিশুকাল। কারণ সম্ভবত তখনই ওই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি রেখাপাত করে তার মনে যে যতো বড় ইমারত দালান-কোঠাই আমরা দেখিনা কেনো তার পেছনে অবদান রয়েছে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের। আর গাঁয়ের সাধারণ কৃষক-পরিবার বা একজন দিনমজুর ক্ষেতমজুর

এদের যে কী ভূমিকা মানুষের গোটা সমাজ পরিবেশটাকে মনের মতো ক'রে সাজাতে, বৃহত্তর মানব-সমাজের সামগ্রিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে তাতো তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন আমরণ। আর আমাদের অজানা নয় যে সুলতানের শিল্প-রাজ্যের প্রায় সমগ্র পরিসর জুড়েই রয়েছে তাঁর এই বাস্তব-চেতনা ও অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর।

শিশুকাল থেকেই সুলতানের ঝোঁক ছবি আঁকার দিকে। আর তারই পরিণতি হলো—১৯ বছর বয়সে তিনি কাউকে না জানিয়ে কোলকাতা আর্ট স্কুলে পড়ার উদগ্র বাসনায় বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়লেন।

ভর্তি তিনি হয়েছিলেন সেখানে, নানা বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে—আর তাঁকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিলেন অধ্যাপক ডি.এন.রায় ও অধ্যাপক হাসান শাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রমুখ। আরেকটি বিষয় আজ সর্বজনবিদিত যে, তৎকালীন খ্যাতনামা জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ রায় সুলতানের আর্ট স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। যদিও মাত্র তিনটি বছর সেখানে অতিবাহিত ক'রে, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত চারুকলার শিক্ষাকোর্স সম্পূর্ণ না করেই তিনি পুনর্বার অজানার সন্ধানে পাড়ি জমিয়েছিলেন। শোনা যায় শিক্ষা জীবনের প্রথম থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক-প্রথাসিদ্ধ শিক্ষাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি সুলতান। কারণ শিল্প-শিক্ষার বাঁধাধরা আইন-কানুন রীতি-নীতিগুলোকে পছন্দ করতে পারতেন না তিনি। তাই চূড়ান্ত পরীক্ষা দেয়ার আগেভাগেই হঠাৎ ক'রে উধাও হয়ে যাওয়াতে তেমন বিস্মিত হতে দেখা যায়নি কাউকে। কিন্তু বিস্ময়ের কারণ অবশ্যই পরে ঘটেছিলো।

বেশ কিছুদিন পেরিয়ে একদিন হঠাৎ দেখা গেলো সুলতান একরাশ ছবির বান্ডিল টানতে টানতে সেই কোলকাতা আর্ট স্কুলে উপস্থিত হলেন—মাথায় লম্বা চুল, আগের থেকে আরও কালো হয়েছেন দেখতে, সর্বাঙ্গে গৈরিক বসন তাঁর। সুতরাং এবার সবার বিস্মিত হবার পালা। পরে জানা গেছে ভাবুক শিল্পী শিল্প-সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ এস.এম. সুলতান সেই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভ্রমণ করেছেন ভারতের নানা স্থানে, ছবি এঁকেছেন বিস্তর আপন খেয়াল খুশীমতো —আর প্রদর্শনীও করেছেন একাধিক স্থানে। পরবর্তীকালেও এই ভ্রমণ পিপাসা তাঁর মধ্যে অক্ষুণ্ণ থাকে—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন স্থানে গিয়েছেন তিনি, ছবি এঁকেছেন, জুটিয়েছেন দেশ-বিদেশের নানা বন্ধু—সব স্থানের সব জাতের মানুষকে তিনি ভালোবেসেছেন, ছবিতে জয়গান গেয়েছেন মানুষের। এভাবেই তিনি মানবপ্রেমিক, মানবতাবাদী সৃজনশিল্পী।

এস.এম. সুলতান ছিলেন চিরকুমার। একাকী সাধক জীবনই ছিলো তাঁর পছন্দ। প্রবীণ বয়সে অবস্থান করেছেন জন্মভূমির মাটিতেই। স্বদেশভূমিতে বাংলাদেশ

সরকার প্রদত্ত একটি পুরানো বাড়িতে 'রেসিডেন্ট আর্টিস্ট' হিসেবে গাছ-গাছড়া ও প্রিয় পশু-পাখি পরিবেষ্টিত সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবনের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করেছেন, চিত্রা নদীর কোল ঘেঁষে নড়াইলে তাঁর নিজ বাসভূমে।

সুদীর্ঘ জীবনের প্রথম পর্যায়ে তিনি শিক্ষকতা করেছেন অনেকদিন, তবে অধিকাংশ সময়েই তিনি ছিলেন ফ্রি-ল্যান্সার, আর বড় বড় আকৃতির অসংখ্য চিত্র-রচনা ছাড়াও প্রতিষ্ঠা করেছেন ছোটদের জন্যে একাধিক চারুকলা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। শিশুদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসার নজির হিসেবে জীবনসায়াহ্নে এসে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'শিশু স্বর্গ'।

দেশে-বিদেশে আর্ট গ্যালারী, যাদুঘর ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে তাঁর ছবি রয়েছে বিস্তর। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের গানের মতো হারিয়ে গেছে, নিশ্চিহ্নও হয়েছে শিল্পীর বহু কাজ। এ এক চিরন্তন ট্রাজেডী এ-মাটির কৃতী সন্তানদের—বিশেষ ক'রে যাঁরা প্রচার-বিমুখ এবং প্রতিভার ফসলকে আপনার ধন ক'রে কখনও নিজের মধ্যে আগলে রাখার চিন্তা করেন নি। সুলতান নিজেও সেরকম মানুষইতো ছিলেন।

অসংখ্য একক প্রদর্শনী ছাড়াও বহু গোষ্ঠীভিত্তিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বিচারকমন্ডলীর সদস্য হিসেবেও একাধিকবার নিয়োজিত হয়েছেন স্বদেশে, এবং দেশের বাইরেও।

চার

এস.এম. সুলতানের বিষয়বস্তুভিত্তিক, বাস্তববাদী-রঙের হাল্‌কা আস্তরণের কাজে রেখার ব্যবহার তাঁর ছবির অন্যতম প্রধান গুণ-বৈশিষ্ট্য। গঠন-নির্মাণে স্বকীয়তা এবং বিশাল ক্ষেত্র-নির্মাণে সাহসী পদক্ষেপের মাধ্যমে সুলতান তাঁর নিজস্ব শিল্প-দৃষ্টিভঙ্গি ও একনিষ্ঠতার স্বাক্ষর রেখেছেন। আর তিনি মাধ্যম-উপকরণ হিসেবে প্রধানত ব্যবহার করেছেন দেশী গুড়ো রঙ, গাবের আঁঠা ও তিষির তেল প্রভৃতি—এছাড়া তেলরঙের কাজ করেছেন। তাঁর মাধ্যম-প্রকরণ নির্বাচন এবং প্রকাশ-আঙ্গিক--সর্বক্ষেত্রেই স্বাদেশিকতার বোধ এবং স্বকীয়তার গুণ লক্ষ্য করবার মতো।

এতদঞ্চলের ঐতিহাসিক বিষয়াদি ও ঐতিহ্যমন্ডিত ঘটনাবলী সহ শ্রমিক-কৃষকের জীবন-সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ, গ্রাম-বাংলার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ প্রভৃতি বারংবার বিষয়-উপজীব্য হয়ে ধরা দিয়েছে সুলতানের চিত্রপটে। এছাড়াও কিছু রূপকধর্মী ছবি তিনি এঁকেছেন—তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি ছবি 'প্রথম বৃক্ষরোপণ'।

শেষ বয়সেও শারীরিক অসুস্থতা এবং নানান সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তাঁর শিল্প-কর্মকান্ডের প্রকাশ-শৈলী ও প্রয়োগ-আঙ্গিকে কোনোরূপ ব্যত্যয় তিনি ঘটতে দেননি। শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ অক্ষম হওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁর তুলি নিশ্চল হয়নি।

পাঁচ

এস.এম. সুলতানের কাজে আধুনিক ঐতিহ্যের চেয়ে প্রাচীন শিল্প ঐতিহ্যের ছাপ বেশী। আবহমান বাংলার চিরচেনা দৃশ্যাবলী, বিষয়বস্তুভিত্তিক বাস্তববাদিতার চিহ্ন বুকে ধ'রেই সুলতানের ক্যানভাস রঞ্জিত।

উত্তর-রেনেসাঁস শিল্পধারার প্রভাব-প্রতিফলন সুলতান-শিল্পভান্ডার অবলোকনে দৃষ্টি কাড়ে। মহান শিল্পী গগ্যাঁর প্রিমিটিভিজমের আদর্শ পরোক্ষভাবে এবং অত্যন্ত সরাসরিভাবে প্রকাশবাদী শিল্পধারার অগ্রদূত মহান শিল্পস্রষ্টা প্রতিচ্ছায়াবাদী ভ্যানগঘের প্রাণ-প্রাচুর্যের ছোঁয়া এমনকি তাঁর শিল্পাদর্শের ছাপ অনেকাংশেই সুলতানকে সৃজনশিল্পের সাবলীল মনোভঙ্গী জুগিয়েছে।

সুলতানের কাজে গ্রাম-বাংলার কৃষিজীবী মানুষের জীবন-সংগ্রাম মুখ্যত প্রভাবশীল। মানুষ, গবাদী পশু ও প্রাকৃতিক-সামাজিক পরিবেশ মূল উপজীব্য। মানুষ প্রকৃতির অংশ, আর মানুষই যে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এই ভাবটি সর্বদা বড় হয়ে দেখা দেয় —সেই সঙ্গে মানুষের মাহাত্ম্য এবং তার বিশালতার চেতনায় সমৃদ্ধ সুলতানের চিত্রপট। এ সমস্ত দিক অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাঁর ছবির ভুবনে উদ্ভাসিত।

এছাড়াও তাঁর কাছে একটি চিন্তাশীল জগতের আস্বাদও অনুভব করা যায়। 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নাই কিছু মহীয়ান' নজরুলের এই অমর বাণী খুব বেশী করে মনে প'ড়ে যায় সুলতান -শিল্পের মুখোমুখি হ'লে। ফলে একদিকে স্বদেশের মানুষ--বিশেষত-কর্মী মানুষ/নারী-পুরুষ ছাড়াও বিশালাকায় মানবগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে তার (মানুষের) মানবীয় রূপ বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে উঠে আসে। এজন্যে শুধুমাত্র স্বদেশ-প্রকৃতি ও চিরচেনা আবহমান বাঙলা বা শাশ্বত বাঙলার যে রূপ-বৈভব, তারই সঙ্গে গোটা মানবজাতির কল্যাণকামী প্রতিরূপ সুলতানের কর্মকান্ডে ধরা পড়ে। বাংলার রূপ-চিন্তন চিত্রপটে ধারণের চেয়ে বিস্তৃত পরিসরে গোটা জগতের মঙ্গলচিন্তা তাঁর মধ্যে বেশী কাজ করেছে। এজন্যেই হয়তো সুলতানের মানুষী অবয়বগুলো কখনই সরাসরি অতি পরিচিত দৈহিক গড়ন বা গঠনের পরিচয় ফুটিয়ে তোলে না। পেশীবহুল শক্ত কন্ট্যুর কাঠামোয় বিন্যস্ত—একটা ইচ্ছাকৃত অতিরঞ্জিত ভাব আরোপিত যার সর্বাঙ্গে। আর চেহারা-আকৃতিতেও তারা যেন ঠিক স্বাভাবিক রূপের

প্রতিরূপ নয়। সাবলীলতায় অভিষিক্ত অতিরিক্ত প্রায়োগিক জোর-প্রদত্ত, অঙ্কন-রেখা ও রেখা-শৈলীর বাহুল্যে সম্পাদিত তাঁর কর্ম-সম্পদসমূহ প্রকৃতপক্ষে চিরচেনা প্রকৃতি ও সমাজ-পরিবেশকে ছাপিয়ে একটি ভিন্ন জগতকে উদ্ভাসিত করে। ওই জগতটি বাস্তবতার প্রতিফলন বা স্বাভাবিকতার পরিপূরক হয়েও তাই মানবজগতের সমৃদ্ধির প্রতি সম্ভাবনার ঈঙ্গিত প্রদান করলেও মূলতঃ একটি শিল্পের জগতই সৃজিত হয়েছে। আর ওই শিল্পজগতটিই হচ্ছে স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য-বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সুলতানের নিজস্ব শিল্পের জগত।

ভারতীয় চিত্ররীতির ছায়া প্রকাশভঙ্গীতে ও প্রয়োগশৈলীতে থাকলেও, আগেই বলেছি গগ্যাঁর আদিমতাবাদ খুব বেশী রকম প্রভাব ফেলেছে সুলতানের ওপর—বিষয়বস্তুর কাঠামো গঠনে এটা ধরা পড়ে—নরনারীর উপজীব্য- তাৎপর্যের দিক থেকে এটা সুস্পষ্ট। আর প্রয়োগশৈলী তথা তুলি রেখার চলমানতার দিক থেকে প্রয়োগশৈলীর প্রেক্ষিতে ভ্যানগগের চিত্রশিল্পধারার প্রভাবও সুলতানে রয়েছে। তবুও বলবো—জোর দিয়েই বলবো যে, এস.এম. সুলতানের কাজে তাঁর স্বকীয়তার দিকগুলোই অতিমাত্রায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ড্রইং-এর ক্ষেত্রে সুলতান ছিলেন চরমভাবে প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধাচারী। তাঁর শিল্পিত উচ্চারণে ব্যাকরণের স্থান সর্বনিম্নে। আপাতভাবে মনে হ'তে পারে তাঁর ড্রইং দুর্বল—কিংবা যথার্থতা নেই কন্টুর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ও তার Perspective সুস্থাপিত নয়। কিন্তু সুলতানের কর্মসম্ভারের প্রতি দৃকপাত করলে একটি বিষয়ে বেশ ভালোভাবেই নিশ্চিত হওয়া যায় যে, শেখ মোহাম্মদ সুলতান শক্তিমান শিল্প-স্রষ্টার মেজাজে বলিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে একজন সাধক-শিল্পীর সামগ্রিক-চেতনার বৈভব সম্বল করেছেন তাঁর সৃজন-অন্বেষায়।

সুলতানের কোনো কোনো ছবি দেখে হঠাৎই মনে হতে পারে যে তাঁর চিত্রকর্মের প্রকাশ-আঙ্গিক ও প্রয়োগশৈলীতে খুব সাধারণ ও স্বাভাবিক অর্থে মুনশীয়ানার আপাতঃস্বরূপ অবহেলিত। এমন আলোচনা আমি আমাদের শিল্পী পরিবেশে বিশেষত অগ্রবর্তী সারির শিল্পীদের মধ্যে নানা সময়ে হতে দেখেছি। আমার এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ দ্বি-মত। আসলে পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সুলতান একাডেমিক নন-আর দ্বিতীয়ত এমন একটি স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বচ্ছন্দ কর্ম-প্রক্রিয়া ও শৈলী-বিন্যাস শিল্পী অনুসরণ করেছেন যার মধ্যে আধুনিক শিল্প-ঐশ্বর্য তেমন রেখাপাত করেনি বটে, কিন্তু প্রতিষ্ঠান-নিরপেক্ষ একটা বনেদি ঘরানা হয়েছে তার অনুষঙ্গ। আর ওই বনেদি ঘরানার ঐতিহ্যে তারই সঙ্গে একাত্মতা জাহির ক'রে সেখানে প্রতিষ্ঠা

পেয়েছে চিরন্তন জীবন-প্রবাহের অমিয়ধারা। জীবন থেমে থাকে না, তারই উত্তরাধিকার নিয়ে এগিয়ে চলে মানুষের বাঁচার সংগ্রাম। সুলতান সেই চিরঞ্জীব মানব-সন্তানের ছবি এঁকেছেন, স্বপ্ন দেখেছেন আবার একদিন মানুষ তাঁর স্বাস্থ্য-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পাবে—আর তাই তাঁর চিত্রপটজুড়ে এই স্বপ্নের বীজ বোনা। এ চিন্তাটি নিঃসন্দেহে আধুনিক।

ছয়

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের পর এস.এম. সুলতানই পূর্ববঙ্গের অন্যতম প্রধান স্বদেশী চারুশিল্পী, যিনি কোলকাতায় সরকারী আর্ট কলেজে ভর্তি হন (১৯৪১)। ইতিপূর্বে এই এলাকার বহু চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর শিল্প-শিক্ষা অর্জনের জন্যে কোলকাতায় অথবা ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাড়ি জমিয়েছিলেন, কিন্তু পূর্বাঞ্চলে আর প্রত্যাবর্তন করেননি। বরং কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ, আনোয়ারুল হক এবং মোহাম্মদ কিবরিয়া প্রমুখের মতো গুণী সৃজনশিল্পীরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে দেশবিভাগের পর এখানে এসেছিলেন। সেদিক থেকে জয়নুলের মতো সুলতানও ব্যতিক্রম—কারণ তাঁরা উভয়েই জন্মভূমির মাটির সঙ্গে ওতপ্রোত সম্পর্ক রেখেছেন চিরকাল। জয়নুল আবেদিন তবু ময়মনসিংহ ছেড়ে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে এসেছিলেন—সুলতান কিন্তু তাঁর জন্মাঞ্চলেই রয়ে গেলেন, যশোরের নড়াইল—সেই চিত্রা নদীর তীরে অতিবাহিত করলেন জীবনের সত্তরটি বছরের অনেকখানি, বিশেষ ক'রে শেষ বয়সের গুরুত্বপূর্ণ কর্মময় দিনগুলো। সুলতান গ'ড়ে তুলেছেন সংগঠন, চারুকলা বিদ্যাপিঠ, 'শিশু তীর্থ'। তিনি সংসারী হননি দার পরিগ্রহ ক'রে, তবে তিনি একা থাকেননি কখনো—শিশুদের সঙ্গী করেছেন আজীবন, পশু-পাখী ভালো বেসেছেন, প্রকৃতির সঙ্গে গড়েছেন সখ্য ; আর সবচেয়ে বড় কথা কখনো কখনো কাজে বিরতি ঘটলেও শিল্প-সৃষ্টির সঙ্গে কখনো কোনো অবসরেই মানসিক দূরত্ব রচিত হয়নি সুলতানের। ছবি আঁকার নেশাটা তাঁর শিশুকালের শুরু থেকে শেষাবধি একই রকম অনুসন্ধিৎসু মেজাজের, একই রকম গভীরতর সৃজন-অন্বেষার। আর তাঁর অব্যাহত যাত্রার বিরামহীন গতির প্রমাণ জীবন সায়াহ্নে প্রবীণ বয়সেও তিনি রেখেছেন।

সাত

সুলতানের কর্ম-সম্ভারের সমাবেশ উপভোগ করবার সুযোগ হয়েছে আমার অনেকবার। তাঁর জীবদ্দশায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী 'আধুনিক ঐতিহ্যের নয় শিল্পী' শীর্ষক যে প্রদর্শনীর আয়োজন করে ১৯৯৩ সালের জুন-জুলাই মাসে তাতে

সুলতানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সেখানে শিল্পীর আটটি সংগৃহীত কাজ নতুন ক'রে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিলো আমাদের। ছবিগুলো ছিলো বহুল আলোচিত 'প্রথম বৃক্ষরোপণ' (ক্যানভাসে তেলরঙ, বলিষ্ঠ থীমের কাজ; খানিকটা ইলাস্ট্রেটিভ রূপ-চারিত্রের। একাজে সবুজ নেই-ই বলতে গেলে অথচ অদ্ভূত ব্যাপারটি হলো এই যে, তার মধ্য দিয়েই জীবন-সংগীত বেজে উঠেছে; অনবদ্য কম্পোজিশন। একজন বিশালদেহী মানব, যিনি প্রবীণ অথচ শক্ত-সমর্থ তারুণ্যে উদ্ভাসিত পেশীবহুল দেহাবয়ব—চাউনিতে আশাবাদী প্রত্যয়। এছাড়া দু'জন দেবদূতের অস্তিত্ব সেই ছবিতে ঠিক রেনেসাঁস বা তার সমসাময়িক কালের চিত্র-ঐতিহ্যের প্রতিফলন); 'গ্রাম্য জীবন' (চট-ক্যানভাসে আঁকা তেলরঙ, ১৯৮৬-সাধারণ গ্রাম্য দৃশ্য, মূলতঃ কাল্‌চে ড্রইং ছায়ে সম্পাদিত); 'ড্রইং' (সামান্য টানটোনে দূরের একাংশে একটি ফিগর-- হাল্‌কা পিগমেন্ট আস্তরণের কাজ); 'গ্রাম্য জীবন' (চটের ওপর ভরাট রঙের কাজ, ১৯৮৯—এ ছবিতে রয়েছে কাঁচা বর্ণবিভার ব্যবহার); ৪র্থ ছবিটি ছিলো ১৯৫৭- এ আঁকা হার্ডবোর্ডের উল্টোদিকে 'ব্রাউন' প্রাধান্যের তেলচিত্র, শিল্পীর নিজের তৈরী করা রঙ হতে পারে—শিল্পিত রূপবন্ধ, চিত্রপট কোথাও কোথাও অস্পর্শিত ; 'মাছধরা' ছবিটি ক্যানভাসে তেলরঙ—১৯৯১-এর ; 'গ্রাম্য জীবন' ক্যানভাসে তেলরঙ-১৯৯০-এর , চষা ভূমিতে ডিটেইল মাটির ঢেলা, কর্ম-প্রক্রিয়া বা প্রকাশভঙ্গিতে উঁকি দেয় ভ্যানগগ-শিল্পসত্তা, সংহত রূপ-বৈশিষ্ট্যে বেশ জোরের ছবি ; 'গরুর গাড়ী'—১৯৮৬তে আঁকা ক্যানভাসে তেলরঙ, অনেকটা নক্‌শী-ধাঁচ পাশের ক্ষেত্রভূমিতে; শেষ ছবিটি ছিলো 'আদিম সমাজ' চটের তৈরী ক্যানভাসে ১৯৮৬'র, এই ছবিটিতে গগ্যাঁর শিল্পাদর্শের পরোক্ষ ছাপ পরিলক্ষিত—যদিও একাজে সুলতানের স্বকীয়তা ও গভীরতাসম্পন্ন থীম-মেজাজ দৃষ্টি এড়ায়না।

শিল্পকলা একাডেমীতে প্রদর্শনীকেন্দ্রে রাখা উপর্যুক্ত আটটি ছবির উল্লেখ করলাম এই কারণে যে এ থেকে সুলতানের কর্মকাণ্ডের বৈচিত্র সন্ধান করা যাবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে নিতান্তই 'স্টিরিওটাইপ' মনোভঙ্গীতে একঘেয়ে কর্ম-স্বাক্ষর রেখে গেছেন তিনি, আসলে সুলতান তাঁর শিল্প-সাধনায় যে রূপরচনার বহিরাঙ্গন অর্থাৎ চিত্রতল আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন—প্রকৃতপক্ষে তার Essence কিন্তু অনেকখানি গভীর প্রদেশ সঞ্চারি, অর্থাৎ সাদামাটা ছবির আটপৌঢ়ে মাত্রা ছাড়িয়ে শিল্প-স্বরূপের সন্ধান তার মধ্যে বেশ ভালোভাবেই ভিত্তি পেয়েছে। প্রতিকৃতি অঙ্কনের মধ্য দিয়ে যাঁর শিল্পী জীবনের সূচনা— তিনি খেলার মতো ক'রে, উপস্থিত জনের সঙ্গে গল্প করতে করতে যেনো অনায়াসে ছবি আঁকতেন। কোত্থেকে, চিত্রপটের উপর থেকে না নীচে থেকে নাকি ডানে বা বামে শুরু করবেন

এর কোনো নির্ধারিত নিয়ম তিনি মেনে চলেননি—কোথায় গিয়ে স্থির হবেন তারও কোনো ভাব বোঝা যেতো না তাঁর কাজ করবার ভঙ্গিতে। অনেক ক্ষেত্রেই আচম্‌কা শুরু আবার আচম্‌কাই শেষ। পূর্ব পরিকল্পনা কখনো হয়তো থাকতো, কখনো থাকতো না। আর ক্যানভাসের অনেক জায়গা খালিও রাখতেন ছবির প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে। তাঁর কাজের মেজাজটি ছিলো 'দাপুটে'—এইজন্যে শুধু যে মানুষের শক্তিমত্তার অতীত-ভবিষ্যতের রূপ-ছায়ায় রঞ্জিত করেছেন চিত্রপট, সেখানেই তার পরিসমাপ্তি নয়—প্রকৃত অর্থে, সদর্থে সুলতান বিশাল বিশাল ক্যানভাস সম্পাদন ক'রে তাঁর নিজের মন-মানসের দৃঢ়তা ও শিল্পী-সত্তা তথা সৃজন-হস্তের 'কব্জির জোরের' পরিচয়টাও স্থাপন ক'রে গেছেন। পেশল দেহাবয়ব আঁকতে গিয়ে আপনার বেপরোয়া ইস্পাত-দৃঢ় মানবপ্রেমিক চরিত্রের প্রতিফলন রেখেছেন, আবার তারই পাশাপাশি নিজের স্বদেশপ্রেমিক মনের দেশজ প্রকৃতি-পরিবেশ ও সমাজ-ঐতিহ্য প্রেমিক চেতনাবোধকেও চিত্রকর্মের বাহন করেছেন। এভাবেই তাঁর ব্যক্তি ও শিল্পী জীবন এমন কি যদি বলি শিল্পকর্মাদি ও ব্যক্তি-সুলতানের পরিচয় একাকার হয়ে যায় আমাদের কাছে। তাই 'ছবির-সুলতান' আর 'সুলতানের ছবি' একই বোধের এপিঠ ওপিঠ—এক্ষেত্রে শিল্প আর শিল্পী দু'য়ে মিলে একই সত্তার প্রতিভূ ; তাইতো অনায়াসে বলা যাবে তাঁর রেখে যাওয়া শিল্প-সম্ভারে সুলতানের সমগ্রতা ঠিক যেনো তাঁর আত্ম-জীবনীর স্বরূপেই চিরঞ্জীব হয়ে আছে। আমাদের পরিচিত পরিবেশে এ জাতীয় উদাহরণ বিরল না হলেও এ এক অনন্যসাধারণ উপমা।

আট

প্রসঙ্গত এবার আসছি সুলতানের জীবদ্দশায় তাঁর সর্বশেষ প্রদর্শনীটি প্রসঙ্গে। তাঁর মূল্যায়নে এই প্রদর্শনী খুবই গুরুত্বের দাবি রাখে। শেষ বেলার এই প্রদর্শনীতে এই কর্মিষ্ঠ সৃজনশিল্পীর যে প্রতিকৃতি আমরা দেখি তা' হয়তোবা তাঁর শক্তিমত্তার পূর্ণাঙ্গতা নিয়ে উপস্থাপিত হয়নি—কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে সুলতানের প্রতিনিধিত্বের তেমন কিছুই এখানে অবশিষ্ট থাকেনি। কারণ এখানে তাঁর মানুষ-মানুষী স্ব-রূপে অর্থাৎ যথার্থ 'সুলতানী' তাৎপর্যে উপস্থাপিত—এখানে বাংলার প্রকৃতি ও পরিবেশ, গ্রামীণ জীবন এবং দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহের সঙ্গে ওতপ্রোত কৃষিজীবী মানবকূলের পরিচয়ে এস. এম. সুলতানের চিত্রপট জীবনবাদী স্বরূপে উদ্ভাসিত। এ প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা ছিলো ধানমন্ডী ১নং রোডের গ্যালারী টোন—তিরানব্বই সালের শেষাংশে আঁকা এ আয়োজনের ড্রইং-স্কেচ ও জলচিত্রগুলো দেখে এযে সুলতানেরই কাজ তা' প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝে নিতে অসুবিধে হয়নি। স্বাক্ষর-প্রমাণের জন্যে অপেক্ষা

করতে হয়নি। আমার তো মনে হয় সারা জীবনে শিল্পী এস.এম. সুলতানের সবচেয়ে বড় যে অর্জন তা' হচ্ছে তাঁর ছবিতে এই স্বকীয়তার গুণ স্থাপনের সাফল্যের দিক। ছবি দেখে সুলতানকে চিনে নিতে যে অসুবিধে হয়না সেটাই বড় কথা।

প্রবীণ শিল্পী এস.এম. সুলতান তখন সত্তর অতিক্রম করেছেন। বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত তাঁর শরীর—খানিকটা কষ্ট হয়তো হয়েছে ছবি আঁকতে। দৃষ্টি-শক্তিও স্বচ্ছ ছিলোনা স্বল্পকাল আগের মতো। অথচ বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে তখনও তাঁর শিল্পী মন ছিলো তরতাজা—তখনও তাই তাঁর কৃষ্ণবর্ণ রেখাবিন্যাস গ'ড়ে তোলে প্রত্যয়ী, খাটুরে মরণজয়ী জীবনের প্রতিচ্ছবি। হাত কেঁপেছে, ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করবার মতো অবসর থাকলেও অবসন্নতা এসেছে—রচনাশৈলীতে প্রয়োগজনিত সাবলীলতা হয়তো তাই সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়নি প্রদর্শনীতে রাখা সব ছবিতে। অস্তাচলের সূর্য যেমন ক'রে দিগন্তে আনে রক্তিম আভাস, আলোকচ্ছটায় হয়তো ততোটা তীব্রতা থাকেনা—কিন্তু জীবনের অস্তিত্বের ছোঁয়া এঁকে যায় দিগন্তে, পথে-প্রান্তরে, ফসলের মাঠ ও বন-বনান্তে—সর্বোপরি মানুষের মনে। সুলতানের শেষ বয়সের কাজে তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্তদের জন্যে তিনি রচনা করেছেন সেই অনির্বচনীয় শিল্প-সম্পদ, যা প্রতিরূপ সৃষ্টি করেছে প্রকৃতি ও মানবীয় রূপ-স্বরূপের, জীবন-প্রতিমার।

প্রসঙ্গত একটি বহুবার বলা ও শোনা কথার পুনরাবৃত্তি করতে চাই। এস.এম. সুলতান একাডেমিক শিল্প-দীক্ষাকে কখনোই খুব একটা আমল দেননি—তাই তাঁর কাজে কোনো অবস্থাতেই জীবনবাদী শিল্পধারা বাস্তবতার আলোকচিত্র সদৃশ শিল্প-রূপ অনুশীলনীর ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে গ'ড়ে ওঠেনি। বরং এক স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত গতিধারায় নিজস্ব ভঙ্গিমা এবং কল্পনার পথ ধ'রে আবর্তিত ও পরিকল্পিত ছান্দিক-সুষমা তথা মুক্ত-শিথিল গড়নে একেকটা প্রতীকী রূপ পেয়েছে তাঁর বিষয়বস্তুর অন্তর্বর্তী প্রতিটি চরিত্র। বাস্তবরূপটির হুবহু প্রতিরূপ না হয়ে যা সর্বতোভাবেই পেয়েছে রূপক বা প্রতীকের বৈশিষ্ট্য—হয়েছে গভীর ব্যঞ্জনাময় শিল্পরূপ-চারিত্র্যের প্রতিভূ। আর একই কারণে যা' শিল্পীর গড়ন-কাঠামোয় স্থাপন করেছে শিল্পী-সুলভ ব্যাকরণ নিরপেক্ষ স্বাচ্ছন্দ্য। এভাবেই সুলতানের ছবি যদিও কখনোবা দুরত্ব রচনা করেছে অত্যন্ত পরিমার্জিত ও পরিশীলিত তুখোর একাডেমিক দৃষ্টির কাজের সঙ্গে, সুলতানের ছবিতে এমন কিছু উপাদানের সজোর উপস্থিতিও লক্ষণীয় যা তাঁকে সাধারণ সমঝদার দর্শক আবার একইভাবে বোদ্ধা শিল্পরুচিবান দর্শকের দৃষ্টিতেও বিশিষ্ট করে তুলেছে। এরকম রীতিমতো বিপরীত মনোভাবের বা বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গির

দর্শককে একইভাবে আকর্ষিত করবার মতো ক্ষমতা সব শিল্পস্রষ্টার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয়না।

প্রদর্শনীটিতে রাখা হয়েছিলো সর্বমোট ৩০টি চিত্র। সাদা কাগজে আঁকা প্রায় সবগুলোই 'মার্কার' অথবা মোটা কোমল-নিবের কাজ [স্কেচ/ড্রইং]-আর সামান্য কয়েকটি মাত্র জলরঙ। ওই জলরঙ সাতটির পৃথক পৃথক শিরোনাম থাকলেও ড্রইংসমূহের সিরিজ-নামকরণ করা হয়েছে 'প্রকৃতি ও জীবন'। সামান্য কয়েকটি ছবি বিরানব্বই সালের, বাদবাকী সব তেরানব্বই-এর আঁকা। মনে হয় ওই প্রদর্শনীকে লক্ষ্যে রেখেও সম্পন্ন করা হয়েছিলো কিছু কাজ।

প্রথিতযশা, বর্ষীয়ান শিল্পীর সেই একরাশ কাজের সামনে দাঁড়িয়ে সেদিন আমার নিজের সবচেয়ে বড় যে অনুভূতিটি হচ্ছিলো তা' হচ্ছে, বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এসে বিশ্বজুড়ে সৃজনশিল্পীরা শিল্পকলাকে যেভাবে বিচিত্রমুখী ক'রে তুলেছেন--আঙ্গিক, করণ-কৌশল বা প্রয়োগশৈলী ও উপকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বত্র যে বৈচিত্র্যের ঢল নেমেছে সুলতানের ওই প্রদর্শনীতে সেই অগ্রগামিতার পরিচয় নেই। কিন্তু একটি জিনিস ছিলো, তা' হচ্ছে ঐতিহ্যপূর্ণ বাংলাদেশের ছবি এবং এমন একজন শিল্পীর কাজ যিনি প্রকৃতিকে ভালোবেসেছেন, প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত মানুষকে ভালোবেসেছেন এবং জনজীবন ও পরিবেশ, শ্রমজীবী-কৃষিজীবী মানুষের কাজ ও তাদের দৈনন্দিন কর্ম-প্রক্রিয়া তাদের জীবন-সংগ্রাম প্রভৃতি বিষয়গুলো যিনি সব সময় অন্তরে লালন করেছেন—চর্চা করেছেন, সে রকম একজন শিল্পীর যেনো তাঁর কাজের মাধ্যমে সেখানে সশরীরেই উপস্থিতি ঘটেছে। কোনো জড়তা নেই, প্রকাশভঙ্গি অথবা শিল্পকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিজস্ব রুচি-বিন্যাসের প্রতি সম্পূর্ণ আত্ম-নির্ভর ও শ্রদ্ধাশীল এস.এম. সুলতান সৃজনশিল্পের সঙ্গে শিল্পীদের যুগ-যুগের আত্মীয়তার বন্ধন, অকৃত্রিম অনুরাগের দিকটিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

শিল্পী এস.এম. সুলতান ড্রইং-এ বিশেষ কয়েকটি ঢং ব্যবহার করেছেন—যেমন সুললিত ছন্দের টানা বক্ররেখার গড়ন, কখনো ভাঙ্গা রেখা বা 'ব্রোকেন-লাইন'-এর ব্যবহার, আর কখনো অবারিত ক্রস-লাইন স্ট্রোকের সন্নিবেশ। চমৎকার শৈল্পিক পরিবেশ-আবহ সৃষ্টি করে এভাবে তাঁর সাদা পটভূমির ড্রইং চিত্রপট। আর জলরঙের ক্ষেত্রেও এই জাতীয় প্রয়োগ-প্রবণতা তাঁর সব সময়েই ছিলো। তবে বর্ণবিভা ও মাধ্যমগত স্বচ্ছতার দিকগুলো তিনি তাঁর জলচিত্রে যথেষ্ট আন্তরিকতার মধ্য দিয়েই সুস্পষ্টভাবে স্থাপন করেছেন। এসব কিছুরই প্রমাণ রেখেছিলো তাঁর জীবদ্দশায় অনুষ্ঠিত সর্বশেষ প্রদর্শনী।

শিল্পীর বিষয়-আঙ্গিক সম্পর্কে আরেকটি দিকের আলোকপাত করা এখানে প্রয়োজন। শেষোক্ত প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে যে বিষয়টি আবার নতুন ক'রে আমাদের অন্তরে দোলা দিয়ে গিয়েছিলো। বিষয়টি হলো, প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত আবার তার উপর কর্তৃত্বশীল মানুষজাতির শক্তিমত্তার দিক—যাকে সুলতান জীবনভর তাঁর শিল্পকর্মের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষ মহীয়ান, শ্রম-নিয়োজিত মানুষের বলিষ্ঠ সচেতন কর্মময় ভূমিকার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে এই জগৎ-সংসার। শিল্প-সৃষ্টিতে এই সত্যের প্রতিষ্ঠায় এস.এম. সুলতান নিমগ্ন ছিলেন আজীবন—জীবনের যা সত্য শিল্পেও তারই সোচ্চার উপস্থিতি ঘটেছে তাঁর সমগ্র শিল্প-ভান্ডারে। জীবদ্দশায় অনুষ্ঠিত সর্বশেষ প্রদর্শনীটিও ছিলো নিঃসন্দেহে সেই শিল্প-চেতনারই অনুরণন।

নয়

খুব কাছের থেকে সুলতানের সঙ্গে আমার শেষ দেখা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পরিবেশে শিল্পকলা একাডেমীতে—সুবীর চৌধুরীর কক্ষে। সেই ষষ্ঠ এশীয় চারুকলা দ্বি-বার্ষিক প্রদর্শনীর মরসুমে, ১৯৯৩ সালের নভেম্বরে। সে প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একটুখানি বিলম্ব হয়ে যাওয়াতে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হওয়া সত্ত্বেও ওসমানী মিলনায়তনের সদর ফটক পেরোতে পারেননি তিনি।

আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী, দেশের প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করছেন—উর্ধ্বতন সরকারী অফিসার, কূটনীতিক থেকে শুরু ক'রে দেশ-বিদেশ থেকে অতিথি-অভ্যাগতের আগমনে মিলনায়তনের পরিবেশ পেয়েছে ভিন্ন মাত্রা, গমগম করছে বর্ণাঢ্য অভ্যন্তর। কিন্তু খুব স্বাভাবিক এবং বলাবাহুল্য অনিবার্য কারণেই কড়া নিরাপত্তার অংশ হিসেবে বাইরের প্রধান ফটক ছিলো রুদ্ধ। যারা ইতোমধ্যেই ভেতরে প্রবেশ করেছেন তাদের বাইরে অন্তত: আনুষ্ঠানিক কর্মাদি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তথা একটা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার আগে পর্যন্ত নতুন আর কারুরই ভেতরে প্রবেশের সুযোগ ছিলো না। আর আমাদের সবার জন্যেই বিষয়টি পীড়াদায়ক যে ঠিক সেই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এস.এম. সুলতান নীরবে তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মুখোমুখি হয়েছেন বাইরে। তাঁর কাছে আমন্ত্রণপত্র ছিলো—তাঁর নাম পরিচয়ও বলা হলো। কিন্তু তবু মিললো না প্রবেশাধিকার। সুলতান শেষ পর্যন্ত ঢুকতে পারলেন না মিলনায়তনে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।

ওই ঘটনাটি ঠিক সেই পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রদর্শনী কেন্দ্রের ভেতরেই প্রশস্ত

গ্যালারী চত্বরে ঘুরে ঘুরে উপস্থিত শিল্পীদের একাংশ সুলতানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে খন্ড মিছিল ক'রে। শ্লোগানের মাধ্যমে ওই অপ্রীতিকর ঘটনাটির প্রতিবাদ জানায় তাঁরা, এমন একজন প্রবীণ শিল্পীকে অপমান করা হয়েছে—ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয়নি যে তার বিচার দাবি ক'রে, তার জন্যে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি চেয়ে। আর শেষ পর্যন্ত অনেকদূর গড়ায় তার জের। যাহোক, ওইদিনই পরে কোনো এক ফাঁকে সুলতানের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছিলো একাডেমীতে।

উপরে যে বর্ণনাটি উপস্থাপন করলাম তার পেছনে কারণ একটাই যে, সেদিন এই বর্ষীয়ান শিল্পী বিষয়টিকে কিভাবে নিয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার পটভূমি রচনা করা—এবং তারই সূত্র ধ'রে আমার এক প্রশ্নের জবাবে সুলতান যে অমূল্য কথাটি বলেছিলেন পাঠকের কাছে তা' তুলে ধরার উদ্দেশে। আর সেদিন তাঁর ওই বক্তব্যে সেই মহৎপ্রাণ শিশুর মতো সরল জীবন্ত-কিংবদন্তী সাত্ত্বিক শিল্প-সাধকের প্রকৃত পরিচয়টিই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছিলো। আমার বারবার মনে হচ্ছিলো এই পার্থিব জগতের তাবৎ স্থূল আড়ম্বর হিংসা কালিমা বিদ্বেষ হানাহানি সব কিছুর অনেক উর্ধ্বে অবস্থান ক'রে সকল বিরোধ-বৈষম্যের অবসান কামনা ক'রে পরম পরিতৃপ্তিতে উদারায় সুর বেঁধে তিনি উচ্চারণ করছিলেন : 'না আমাকেতো ওরা বাধা দেয়নি—ওরাতো বলেনি যে, আপনি ঢুকতে পারবেন না...আপনাকে ঢুকতে দেয়া হবে না--আসলে দরোজাই যে বন্ধ ছিলো, ওরা আর কি করবে... ওদেরতো কোনো দোষ নেই!'



ধান ঝাড়া তেল রং ১৯৭৬



মহামনীষী সুলতান

আব্দুস সাত্তার

'শিল্পী' শব্দটি আকৃতিতে ক্ষুদ্র হলেও এর ব্যাপ্তি বিশাল। চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সাহিত্য, চলচ্চিত্র, নাটক, সঙ্গীত এমন কি সংবাদপত্রও এই 'শিল্পী' পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ থেকেই শিল্পী শব্দটির গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। 'শিল্পী' শব্দটি যেমন তেমনি শিল্পীরাও গুরুত্বের দিক থেকে সমাজের সকল স্তরের মানুষের উর্ধ্বে। সম্মানজনক দিক থেকে একজন শিল্পীর অবস্থা পিরামিডের শীর্ষস্থানে। কিন্তু আমাদের সমাজের অহংকারী মানুষরা যেমন অজ্ঞ এ বিষয়ে তেমনি অজ্ঞ শিল্পী নিজেরাও। ক'জন জানেন ষোল শতকের মধ্যভাগে পাশ্চাত্য জগতে আইনগতভাবে স্বীকৃত হয়েছে যে, একজন সৃজনশীল (পেশাদার নয়) শিল্পীর স্থান হবে সমাজের সর্বোচ্চ শিখরে। শিল্পী হবেন সমাজের গণ্যমান্য ও শীর্ষস্থানীয় সকল মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনটির অধিকারী। কিন্তু শিল্পী নামধারী হলেই কেউ যে এই সম্মানিত আসনটির অধিকারী হবেন তা কিন্তু নয়। এই সম্মানিত আসনটির অধিকারী হতে হলে শিল্পীকে অবশ্যই নিরহংকার, নির্লোভ, নিষ্কলুস, নির্দলীয়, নিরপেক্ষ, উদার, পবিত্র আত্মার অধিকারী এবং সর্বোপরি সকলের কাছে গ্রহণীয় হতে হবে। এমন শিল্পীর সংখ্যা আমাদের দেশে হাতে গোনা দু'একজন হলেও সুলতান তাঁদের মধ্যে একজন অন্যতম প্রধান শিল্পী। সকল বয়সের সকল স্তরের প্রতিটি মানুষের অতি প্রিয় এস.এম. সুলতান তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সর্বক্ষেত্রে, সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন স্বাধীন। আক্ষরিক অর্থেই স্বাধীন। স্বাধীন স্বভাব এবং স্বাধীন সত্তাই ছিল সুলতানের

জীবনীশক্তি। যে শক্তি 'বামন হয়ে চাঁদে হাত' এই প্রবাদকে পর্যন্ত মিথ্যে প্রমাণ করেছে। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করেছে। তিনি অখ্যাত দরিদ্র বাংলাদেশের ততোধিক অখ্যাত নড়াইলের মাছিমদিয়া গ্রামের দরিদ্র রাজমিস্ত্রির সন্তান হয়েও বিশ্ব জয় করেছেন। সকলের চির আকাঙক্ষার, শিল্পসাহিত্যের সুন্দর উপমা সেই চাঁদকেও জয় করেছেন। যে চাঁদের আলোয় আলোকিত হয়ে বিশ্ব শিল্পাঙ্গনকেও করেছেন উদ্ভাসিত। বঙ্গমাতার আশীবাদপুষ্ট স্বভাব শিল্পী সুলতান তাঁর বাল্যকালেই ঐশ্বরিক আলোয় আলোকিত হন। যে আলোর তরঙ্গময় ধারায় অবগাহন করে পুলকিত হন নড়াইলের জমিদার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রফেসর শাহেদ সোহরাওয়ার্দী, কর্পোরিতোলার মহারাজা, ফিরোজ খান নূন, মিস ফাতেমা জিন্নাহ সহ আরও মহানুভব ব্যক্তিবর্গ। সকলের স্নেহধন্য বাবার দেয়া নাম আদরের 'লাল মিয়া' এক সময় 'সুলতান' নামে পরিচিত হন। কথাবার্তায়, আচার-আচরণে, চাল-চলনে, মেজাজ-মর্জিতে একেবারে ভিন্ন স্বভাবের সুলতান। বিচিত্র জীবনকাহিনীসমৃদ্ধ কিংবদন্তীর এক মহানায়ক। মহামনীষী।

স্কুলের প্রথাবদ্ধ শিক্ষা সুলতানকে আকৃষ্ট না করলেও স্কুলের পাঠ্যপুস্তক আকৃষ্ট করেছিলো তাঁকে। পুস্তকে লিপিবদ্ধ কালো কালো অক্ষর নয়, তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল পুস্তকে অংকিত চিত্রসমগ্র। এই চিত্রই সুলতানকে ঘরছাড়া, এমনকি নড়াইল ছাড়া করল। তিনি হলেন কলকাতা প্রবাসী। উদার হৃদয় প্রফেসর শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর সক্রিয় সহযোগিতায় ভর্তি হলেন কলকাতা আর্ট কলেজে। সোহরাওয়াদীর স্নেহে তাঁরই বাড়িতে সুলতানের দীর্ঘ অবস্থান। কিন্তু স্বাধীন সুলতান অস্থির হলেন আবারও। জয়নুল আবেদিন, সহপাঠী কামরুল হাসান, তাঁর প্রিয় শিল্প শিক্ষার প্রতিষ্ঠান এমনকি সোহরাওয়াদী পরিবারের স্নেহ-মমতাকে উপেক্ষা করে শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই দীর্ঘ চার বছর পর কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন স্বপ্নের ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরে। এরপর কাশ্মীর থেকে সিমলা (১৯৪৬)। সিমলা থেকে লাহোর, করাচী। সেখান থেকে একেবারে আলো ঝলমল স্বপ্নপুরী আমেরিকায়। চিত্রশিল্পীদের আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদানই তাঁর আমেরিকা গমনের উদ্দেশ্য (১৯৫০)। প্রদর্শনী করেন নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, শিকাগো, বোস্টন। এরপর লণ্ডন। লণ্ডনে পিকাসো, সালভাদর দালি, ব্রাক, পল ক্লী প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের সাথে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ শেষে সরাসরি নিজ বাসভূমে। শহর থেকে বহুদূরে সেই নড়াইলের ছায়াঢাকা পাখিডাকা চিত্রা নদীর ধারে। তাঁর সম্পর্কে কবি শামসুর রাহমান বলেছেন, 'শ্রান্তিহীন এই পথিক এখন নড়াইলে বসত গেড়েছেন, পাগল করা জনারণ্যের চাপ থেকে অনেক দূরে। সেখানে প্রকৃতি আপন মহিমায়

অভিষিক্ত।' বলেছেন— 'ঘন শ্যামলিমা, পাখির কাকলী, চারুলতা আর ক্ষেতভরা ফসলের সৌন্দর্য, পুরুষ আর নারীর ধড়-মূর্তি বৈভবে আর প্রাঞ্জলতায় নিবিড় কৃষিনির্ভর সভ্যতার এক ঐকান্তিক রূপদান করেছেন। তাঁর লাঙল চাষীর-টাইটান দানবের মত বিপুল ও পেশীবহুল অবয়ব আমাদের (য়ুরোপীয়) রেনেসাঁর চিত্রকরদের কথা মনে করিয়ে দেয়।' (*আধুনিক ঐতিহ্যের নয় শিল্পী*, বা.শি.এ. বি.টি.সি)।

কবির ভাষায় 'চিত্রিত সুলতানের সৃষ্ট মানব-মানবীর অবয়ব টাইটান-দানবের মত বিপুল ও পেশীবহুল হলেও, রেনেসাঁসের চিত্রকে স্মরণ করিয়ে দিলেও সুলতানের ভাষায় তারা বাংলার খেটেখাওয়া সাধারণ কৃষক, জেলে, যাদেরকে শোষণ করে রুগ্ন রাখা হয়েছে' (*বাংলাবাজার পত্রিকা*, ১১/১০/৯৪)। কৃষিনির্ভর বাংলার খেটেখাওয়া মানুষের পেশীবহুল শক্তিশালী হবারইতো কথা। কিন্তু তা হয়নি। হয়নি কারণ তারা আজীবন শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। শাসক ও শোষকদের দ্বারা শোষিত। কিন্তু তাই বলে ঘৃণিত শোষকদের সৃষ্ট মৃতপ্রায় হাড় জিরজিরে কৃষক, জেলে, কামার, কুমোরের স্বপ্ন একজন শিল্পী দেখতে পারেন না। অবশ্য কেউ কেউ ভিন্ন মতও পোষণ করতে পারেন। কারণ শোষকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে কেউ কেউ তা করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে দুঃখ আর বেদনায় গোটা জাতি হবে ভারাক্রান্ত। কিন্তু সুলতান তা চাননি। তিনি শোষিত গোটা জাতিকে, বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। বাঙালি জাতিকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করতে চেয়েছেন। আর সেজন্যই তিনি তাঁর কল্পনার মানুষদেরকে তুলির রংয়ে পেশীময় করে রাঙিয়ে তুলেছেন। তিনি তাঁর চিত্রের মাধ্যমে গোটা জাতিকে অনাবিল প্রশান্তি আর সুখের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। নিজ বিচারবুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুখ-সমৃদ্ধি, শান্তি ও অগ্রগতির পথ দেখিয়েছেন। রাজনৈতিক সংঘাত, সন্ত্রাস, অসততা, জাতিগত ও ধর্মগত বিভেদ, বর্ণবিভেদ, বিশৃঙ্খলা ও জাতীয় যে কোনো দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে স্বাধীনভাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলায় জাতিকে সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন। এসবই করেছেন তাঁর চিত্রের সৃজনশীল চিন্তা-চেতনা, মুক্তবুদ্ধি, নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন সত্তার মাধ্যমে। কারও রক্তচক্ষু, কোনো প্রকার লোভ-লালসা, কোনো মহলের প্ররোচনায় কোনো দলীয় প্রলোভনই তাঁকে নিজ বিশ্বাস ও আদর্শ থেকে বিচ্যুৎ করতে পারেনি। তিনি কারও বিরূপ সমালোচনা ও আক্রমণে ভীত হননি। কারণ তিনি যথার্থই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট স্বাধীন ও নির্ভীক স্রষ্টা ছিলেন। তাঁর সৃষ্টিতে চেনাজানা জগতের বিষয়গুলি নবরূপে আবির্ভূত হয়েছে, যা শুধু দেশের নয় বিশ্বজগতের শিল্পরসিক, সমঝদার ও গুণি ব্যক্তিদেরকেও মুগ্ধ করেছে। কবি আল

মাহমুদও এ বিষয়ে শিল্পসম্মত সচেতন অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন- 'তাঁর আঁকা সব নরনারীই বাস্তবের নরনারীর চেয়ে একটু সুন্দর, পেশীবহুল, নিখুঁত ও কর্মপরায়ণ। ফিগারগুলো বাস্তবের চেয়ে একটু বিস্তৃততর। এই বাহুল্যই সুলতানের প্রতিটি রচনাকে মহিমা দিয়েছে' (*আধুনিক ঐতিহ্যের নয় শিল্পী*)। কবি তাঁর বক্তব্যে যাকে 'বাহুল্য' বলে উল্লেখ করেছেন সেই বাহুল্যই হচ্ছে প্রকৃত অর্থে শিল্পের নন্দনতত্ত্বের রসসিক্ত স্বরূপ, যার সার্থক প্রয়োগে, যার কল্যাণে তাঁর প্রতিটি চিত্রই নান্দনিক রসে সমৃদ্ধ ও সজীব।

সুলতান তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ সময়ে বিচিত্ররূপী মানুষের সাহচর্যে এসেছেন। খোলামেলা উদার মন নিয়ে তাদের সঙ্গে মিশেছেন। জয় করেছেন তাদের মন। সুলতানের বিনয়ী ব্যবহার ও সম্ভাষণে মুগ্ধ হয়েছে তারা। তাঁর অলৌকিক শক্তিবলে তারা মুহূর্তেই বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও এতে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নেই। তিনি বন্যপ্রাণীর হৃদয়ানুভূতি যেমন অনুভব করতেন, তাদের কথা বুঝতেন, তেমনি আবার তারাও সুলতানের কথা স্পষ্টভাবেই অনুধাবণ করতে সক্ষম ছিল। সুলতানের খাবার সময় হলেই তাঁর সাথে তারা আহারে শরীক হতো। মেহমানদের মতই স্বস্নেহে খাবার টেবিলে তাদেরকে বসিয়ে এক সঙ্গে আহার করতেন। তাঁর কিছু কুকুর ছিল, যারা অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ, সচেতন অতন্দ্র প্রহরীর মত তাকে ঘিরেই অবস্থান করতো, সুলতানের প্রতি যাদের আস্থা, বিশ্বস্ততা এবং কৃতজ্ঞতাবোধ অনেক মানুষকেও হার মানায়। সুলতানের যে কোনো ইঙ্গিত বা নির্দেশ নিমেষেই তারা পালন করতো। কোনো কুকুরের আচরণে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাকে সারা রাত বাইরে অবস্থান করতে বললে সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীর মত তাঁর নির্দেশ পালন করতো। কখনও কখনও জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে করুণ সুরে কাকুতি মিনতি করতো।

প্রাণীপ্রেমী সুলতানের আর একটি ঘটনার কথা জানা যায় যখন তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে তখন। আমরা তাঁকে দেখতে গিয়েছি। শিল্পকলা একাডেমীর সুবীর চৌধুরীও সেখানে উপস্থিত। মেজর অপারেশনের জন্য অপেক্ষমান অসুস্থ সুলতান সুবীরকে বললেন — নড়াইলের বাড়ীতে পশু-পাখির খাবার সম্ভবত শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং কালই যেনো তাদের জন্য পাঁচ হাজার টাকার একটি চেক পাঠানো হয়। অন্যথায় তারা অভুক্ত থাকবে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তিনি পশু-পাখির জন্য টাকা পাঠাতে বলছেন অথচ তার অপারেশন এবং চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং অষুধ পত্র তখনও যোগাড় হয়নি। তিনি ভুল করেও সে কথা উচ্চারণ করলেন না। এ থেকেই প্রমাণিত হয় কতটা প্রাণীপ্রেমী হলে

একজন গুরুতর অসুস্থ রুগী নিজের কথা না ভেবে বনের পশু পাখির কথা ভাবতে পারেন। 'জীবে দয়া করে যেই জন সে জন সেবিছে ঈশ্বর' এই প্রবাদটি বোধ হয় সুলতানের ক্ষেত্রেই যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যায়। প্রাণীপ্রেমী সুলতানের পরোপকার এবং উদারতা প্রকৃতির উদারতাকেও যেন হার মানায়। স্বভাবশিল্পী চিরকুমার সুলতান বিড়াল, কুকুর, সাপ, বেজী, বানর প্রভৃতি প্রাণীকূলকে নিয়ে জীবনযাপন করলেও তাঁর চিত্রে এদের উপস্থিতি নেই মোটেও। কৃষক, কৃষাণী, বধূ, গ্রাম, গরু, প্রকৃতি এসবই তাঁর বিষয়। বিষয়ের সরল উপস্থাপনা তাঁর চিত্রকে দিয়েছে শিশুর সারল্য। মানুষের শরীরী গঠন কৌশল সুলতানকে দিয়েছে স্বতন্ত্র মর্যাদা। পেশীবহুল মানব সম্প্রদায়ের স্রষ্টা সুলতান তাঁর সৃষ্টির জন্যে বিশেষভাবে গৌরবের অধিকারী। সুলতান বাংলার সাধারণ মানুষকে, স্বাভাবিক মানুষকে, আপন মনোজগতের মাধুরী মিশিয়ে অস্বাভাবিক শক্তিমত্তায় অসাধারণ ব্যঞ্জনায় মূর্ত করেছেন। তাঁর চিত্রকর্ম ব্যাকরণের শুদ্ধ দৃষ্টিবহির্ভূত জগতের অন্তর্ভুক্ত ব্যতিক্রমী এক সুবিশাল রত্নভাণ্ডার।

পরোপকারী সুলতানের ভূমিকা অবিশ্বাস্য। অতুলনীয়। তাঁর আত্মত্যাগের মহিমা ও প্রশংসা প্রচারযোগ্য যথার্থ শব্দচয়ন সুকঠিন কাজ। তাঁর জীবনে অর্জিত সমস্ত অর্থসম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন পরের তরে। তাঁর মূল্যবান শিল্পের বিনিময়ে অর্জিত লক্ষ লক্ষ টাকা নিমেষেই নিঃশেষ করেছেন পরোপকারে। অফুরন্ত অর্থের অধিকারী হয়েও সর্বক্ষণ নিঃস্ব ছিলেন তিনি। আর দশজনের মত গাড়ি-বাড়ির কথা স্বপ্নেও ভাবেননি কখনও। অথচ গাড়ি-বাড়িসহ সহজেই যাপন করতে পারতেন বিলাসী জীবন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'নন্দনকানন প্রাইমারী স্কুল', 'নন্দনকানন হাইস্কুল', 'নন্দনকানন চারুকলা স্কুল', 'কুড়িগ্রাম ফাইন আর্ট স্কুল', যশোর শহরের 'একাডেমী অব ফাইন আর্টস' বর্তমানে 'চারুপীঠ', 'শিশুস্বর্গ' এসবই তাঁর হৃদয় নিংড়ানো প্রাণের প্রতিষ্ঠান। মানবতার সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রতিষ্ঠান। মানবপ্রেমী, শিশুপ্রেমী, প্রাণীপ্রেমী সুলতানের রক্তে গড়া প্রতিষ্ঠান। এই সমস্ত অগণিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান। ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত 'ম্যান অব এশিয়া'র সুলতান, বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত সম্মান 'আর্টিস্ট ইন রেসিডেন্স'-এর সুলতান, একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত সুলতান, বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস.এম. সুলতান, যিনি রাজধানীর চাকচিক্য ও জৌলুসকে অগ্রাহ্য করে নড়াইলের নিভৃতে শিল্পচর্চায় নিমগ্ন ছিলেন। সেই সুলতান আর আমাদের মাঝে নেই। ১০ই অক্টোবর '৯৪ বিকেল ৪টা ৩৫ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মহামনীষীর মহাপ্রয়াণ ঘটলো। জাতি হলো অপরিসীম ক্ষতির সম্মুখীন। হলো বন্ধুহীন। তবু তিনি বেঁচে রইলেন আমাদের মাঝে, জাতির জন্যে রেখে যাওয়া তাঁর অগণিত মূল্যবান কাজে।



চিত্রার চিত্রকর লাল মিয়া

কাজী মতিউর রহমান

১৯৬৯ সাল। আমার কর্মক্ষেত্র কোহিনুর শিল্প গোষ্ঠীর চাকুরী ছেড়ে আমি চাকুরী নিলাম আইডিয়াল লাইফ ইন্সুরেন্সে। এজেন্সী ম্যানেজার, সি. এণ্ড. বিতে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর ঠিকাদারের লাইসেন্স আর কিছু নগদ টাকা ও একটি ভেসপা মোটর সাইকেল নিয়ে নিজ মহকুমা নড়াইলে পৌঁছি। রাজনীতি করবো, ব্যবসা করবো, ইন্সুরেন্সের চাকরী করবো, সমাজ সেবা করবো ইত্যাদি চিন্তা মাথায়। কিন্তু ভাবাবেগে বুঝতে পারিনি যে মহকুমায় আমার থাকার কোনো জায়গা নেই। পরিবার পরিজন নিয়ে শ্বশুর বাড়ীতে উঠলাম। কিন্তু ব্যাংক থেকে তোলা ৬০ হাজার টাকা যে ৬ মাসে শেষ হয়ে যাবে সেটা বুঝিনি। রাজকীয়ভাবে মহকুমার চৌরাস্তায় দু'টি রুম ভাড়া নিলাম। অফিস করলাম। ছেলে মেয়েদের শ্বশুর বাড়ী রেখে শুরু হলো আমার নড়াইলের জীবন। সারা শহরে আমিই একটা ভেসপা চালাই। সমাজের সকল ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ডানে বামে পয়সা খরচ করে অল্প দিনে স্থান করে নিয়েছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, রাজনীতিতে। আমাকে একটা কেউকেটা ব্যক্তি হিসাবে ভাবতে শুরু করে নড়াইলের মানুষ।

এক শীতের বিকেলে নড়াইল ভিকটোরিয়া কলেজের ছাত্র ও প্রিন্সিপালের মধ্যে একটি মতবিরোধ নিরসনকল্পে একটি সভা হয়। সভায় তদানীন্তন এমপি পরবর্তীকালের বীর মুক্তিযোদ্ধা নড়াইলের কৃতী সন্তান মরহুম লেফটেনান্ট মতিউর রহমান আসেন। সেখানে বক্তব্য রাখি, শিক্ষক ও ছাত্র সমাজে পরিচিত হই। ফেরার

পথে রূপগঞ্জ বাজারের মুখে এক ঘোষের দোকানের সামনে দেখি গোলমাল। অনেক লোকের ভীড়। রাস্তা বন্ধ। বারবার হর্ণ বাজানোর পরও কেউ রাস্তা ছাড়ছে না। তখন অগত্যা ভেসপা থামিয়ে সামনে এগিয়ে দেখি কয়েকজন যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ভীষণ উত্তেজিত, লম্বা কালো পোশাক পরিহিত এক দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক যাকে সবার মাথার উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল ইংরেজী ভাষায় গালাগালি করছেন। হাতে একটা বাঁশের বাঁশী যা ভেংগে ফেটে চৌচির হয়ে ঝাড়ুর মত হয়ে গেছে। একজন চুপচাপ দাঁড়ানো দোকানীকে জিজ্ঞাসা করলাম উনি কে? বললেন উনি লাল মিয়া, শিল্পী। আসলে গাঁজাখোর। দোকানে চা মিষ্টি খায়। তাও আবার বাকিতে। তাই ছাত্ররা তাঁকে জোর করে বের করে দিয়েছে। তার জন্য দেখেন না কয়টি ছেলেকে মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। প্রথম দর্শনে আমি তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়ে পড়ি। তাঁর অনেক গল্প শুনেছি। সাপ নিয়ে খেলা করেন, শাড়ি পরে ঘেটুর দলে নাচেন, বাঁশী বাজান, যার ফলে কিছুটা ঘৃণা বোধও ছিল। মুহূর্তে সেই ঘৃণাবোধ কোথায় উবে গেল জানি না। আমি ক্ষিপ্ত হয়ে জিজ্ঞেস করি কে তাঁর কাছে টাকা পাবে, কত টাকা পাবে। তখন দেখা গেল আস্তে আস্তে একজন একজন করে সবাই স্থান ত্যাগ করতে থাকে। দোকানদাররা যারা এতক্ষণ উসকানি দিচ্ছিল, তারা সরে পড়তে থাকে। এই পর্যায়ে আমিও কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলি। হঠাৎ ঘোষকে একটা ঘুষি মেরে বসি ও মানিব্যাগ তার মুখে ছুড়ে মেরে বলি কত টাকা পাবি নে। আর শিল্পীর অপমানের খেসারত তোকে দিতে হবে। মাত্র ৭০ টাকা। ঘোষ ভয়ে ভয়ে টাকাটা নিল। আমি সুলতানকে আমার ভেসপায় উঠতে বলি। এতক্ষণ নির্বাক হয়ে সুলতান দেখছিলেন। এবার বলতে শুরু করলেন। আপনাকে আমি চিনি না। আমি তো কুলিদের সাথে শিব মন্দিরে থাকি। এক প্রকার জোর করে তাঁকে ভেসপায় উঠিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে মহকুমায় আমার সেন্টারে নিয়ে আসি। খাটের ওপর মাথায় হাত রেখে বিপর্যস্ত অবস্থায় তিনি বসে থাকেন। আমার খাটের নিচে রাখা মাটি দিয়ে তড়ি ঘড়ি করে ঐ অবস্থায় একটা মূর্তি বানিয়ে টেবিলে তাঁর সামনে রেখে বলি আমিও একজন ছোট শিল্পী। তাই শিল্পীর অপমান আমার খুব লেগেছে। আজ থেকে আর চায়ের দোকানে গাঁজা খাবেন না। এখানে থাকবেন, নিচের হোটেলে খাবেন। এই নিন এক পোয়া গাঁজা যত খুশি খাবেন। সুলতান বললেন এটা আপনার অফিস, আপনার ছেলে মেয়ে আছে। আমার কেউ নেই। আমাকে নিয়ে এত কষ্ট করার কি প্রয়োজন। আমিতো একলা গাঁজা খুব বেশী খাইনা। যাদের সাথে খাই তারা ভয়ে আপনার এখানে আসবে না। আমিতো একলা নই, আমার অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব। আমি জিজ্ঞাস করি, তারা কারা। তিনি বলেন হসপিটালের মরাকাটা ডোম রাম গোপাল একজন,

এমনি অসংখ্য বন্ধু আমার। আমি তাঁকে বলি সবাই এখানে খাবে, আমার কোন জাত বিচার বা বাছ বিচার নাই। এভাবে বেশ কয়েকদিন তাকে আটকে রাখার পর তিনি বুঝতে পারেন, আমি তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই। এই পর্যায়ে তিনি বলেন আমি আঠারো বৎসর ভাত খাই না। কোথাও স্থায়ীভাবে থাকি না, শিব-মন্দির আমার আশ্রম আর মুটে মেথর, কুলি আমার সাথী। তখন আমি বলি এইসব লোকের দলে যদি আমি দাঁড়াই, তা'হলে কেমন হয়? সুলতান অত্যন্ত খুশি হলেন। শিব-মন্দিরে যাচ্ছে আর একটা নতুন লোক। মেশা যাবে কথা বলা যাবে। এর মধ্যে বাজি হলো একুশ দিন না খেয়ে থাকতে হবে। একুশ দিন আমি তাঁর সাথে শিব মন্দিরে থাকবো। শুরু হলো সুলতানের সাথে পাগলামির জীবন। তাও শ্বশুর বাড়িতে ছেলে মেয়ে বউ রেখে একই শহরে। গাঁজাখোর ঘোষিত হলাম। বদনামে চতুর্দিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। গনি মুন্সির জামাই সুলতানের সাথে গাঁজায় যোগদান করে পাগল হয়ে গেছে। আঠারো দিনের সময় সুলতান তাঁর প্যাট্রোন তথা নড়াইলের না খেয়ে থাকা গরীবের বন্ধু সাইদুরকে গিয়ে বললেন, সাইদুর, আমাকে পাগলে ধরেছে, আমি আঠারো দিন ভাত খাইনি। আমাকে কিছু টাকা দাও। সাইদুর পাঁচ টাকা দিলে লঞ্চ ঘাটে সোনার্গাঁর হোটেলে রাত এগারোটার সময় পান্তাভাত ও ইলিশ ভাজা খেয়ে জ্বর উঠলে সুলতান শিব মন্দিরে চলে যান। রাত বারোটা পর্যন্ত তাঁর অপেক্ষায় আমি বসে আছি। একজন রিকসাওয়ালাকে দিয়ে আমাকে খবর দেন শিব-মন্দিরে যাবার জন্য। আমি গিয়েই দেখি সুলতান জ্বরে কাঁপছেন। ঢুকতেই বলেন আমি ওয়াদা রাখতে পারিনি। আমি চুরি করে ভাত খেয়ে ফেলেছি। আপনিও খেয়ে আসেন। আমি বলি না এখনো তিন দিন বাকী। তারপর তিন দিন পার হলো। আমার আট পাউণ্ড ওজন কমেছে। রাস্তায় গাঁজাখোর ও পাগল নাম হয়েছে। সামনা-সামনি না বল্লেও ভেসপাটা পার হলেই বলে এই সেই নতুন গাঁজাখোর গনি মুন্সির জামাই। সারা শহরের ভদ্রলোকের কাছে আমি হেয় প্রতিপন্ন হলাম। কোথায় আইডিয়াল লাইফ ইন্সুরেন্স, কোথায় ঠিকাদারী লাইসেন্স, কোথায় রাজনীতি, সব শেষ। ব্যাংকের টাকাও প্রায় শেষ। এই সময় রাতে জমিদার বাড়ীর বাঁধা ঘাটে লাল পদ্ম ও সুলতানের বাঁশী আর খাদ্য হিসাবে সাইদুরের দান করা আটা, ময়দা, চাল হলো আমাদের একমাত্র উপজীব্য। জ্যোৎস্না রাতে বাঁশী বাজাতেন সুলতান। সেই বাঁশীর সাথে নাচতে দেখেছি দীঘির জলের লাল শাপলা ফুলকে। অবিশ্বাস্য হলেও আমি দেখেছি, পাগল হওয়ার অনেক কিছু ছিল। একদিন দেখলাম একটি স্যাপ সুলতানকে কামড় দিয়ে মরে আছে। ভয়ে আমি শিব-মন্দির ছাড়লাম। আরো অনেক কিছু দেখেছি আমি। এভাবে দিন যেতে যেতে আস্তে আস্তে নিঃস্ব হয়ে আসছি। সেই সময় জিজ্ঞাসা করলাম আপনার তো

অনেক প্যাট্রোন ছিল, তার মধ্যে নাম মনে পড়লে চলেন সেইখানে যাই। আপনি শিল্পী। আপনার পরিচয় ছবি আঁকা। শেয়াল, বেজি পালা আর গল্প করা আপনাকে মানায় না। সেদিনও ছিল পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্না। অনেকক্ষণ বাঁশী বাজালেন, তবুও ঘুম আসছে না। কেবল রাত ১২টার দিকে একটু শুয়ে পড়েছি। তন্দ্রার মত লাগছে। সুলতান উঠে বললেন, আমাকে রং তুলি আর কাগজ দেন। আমি ছবি আঁকবো। রাত পৌনে একটা বাজে। সমস্ত এলাকার মানুষ ঘুম-ঘোরে। কোথায় পাবো রং তুলি। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এলো। হরিপদ দাসের দোকানে সিগারেটের প্যাকিংয়ের কাগজ আছে। ছুটলাম ভেসপা নিয়ে। গিয়ে হৈ চৈ করে হরিপদ দাসকে উঠতে বল্লাম। কিছু প্যাকিংয়ের কাগজ দেন। রাতে থতমত খেয়ে বললো জামাই আপনি পাগল হয়ে গেছেন? এই রাতে লাল মিয়া ছবি আঁকবে আর আপনি এসেছেন কাগজ নিতে। অগত্যা বেচারা কয়েক শিট কাগজ দিল। খেজুরের শুকনো ডাল চিবিয়ে তুলি বানানো হলো। শিব-মন্দিরে এক পাগলা সাধুর পরিত্যক্ত একটি হলুদ রংয়ের কৌটার মধ্যে কুপির তেল ঢেলে রং প্রস্তুত হলো। আঁকা হলো ১'×৯'' একটি ছবি যাতে কিছুই বুঝা যাচ্ছিল না। খুলনা প্রদর্শনীতে ঐ ছবিটার নামকরণ করা হয়েছিল "দি ড্রিম্‌স"।

এনাম আহমেদ চৌধুরী তখন যশোরের ডিসি। শওকত আলী নড়াইলের এসডিও। সুলতান এনাম চৌধুরী ও সুলতানুজ্জামান খান সমন্ধে অনেক গল্প করেছেন আমার কাছে। তাই চৌধুরী সাহেবের কাছে সুলতান সাহেবকে নিয়ে গেলাম, তিনি মহাখুশি শুনে যে সুলতান ছবি আঁকছেন। তার একটা আখড়া বানানোর অভিপ্রায় জানানোর সাথে সাথে তিনি বললেন, 'ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্ট, নড়াইল' নাম দিয়ে একটা সাদা কাগজে দরখাস্ত জমা দিন। আমি দরখাস্ত দিলাম। প্রস্তাবিত আর্ট কলেজের নামকরণ করা হলো। সুলতান থাকবেন তার ডাইরেক্টর এবং প্রিন্সিপাল। আর আমাকে বলা হলো আপনি সেক্রেটারী হিসাবে ও ভাইস প্রিন্সিপাল হিসাবেও কাজ করবেন। কারণ সুলতান ভাইতো কোন অফিসিয়াল ফর্মালিটি জানেন না। তাই সরকারের কাছ থেকে কিছু পেতে হলে তার আইন কানুন মত কাজ করতে হবে। ডিসি অফিসে বসেই দুটি দরখাস্ত করা হলো। একটা ছবির প্রদর্শনী করার জন্য আর্থিক সাহায্য এবং একটা পরিত্যক্ত বাড়ীর জন্য। স্ট্যানো দিয়ে ডিসি সাহেব দরখাস্ত দু'টি টাইপ করে সই করালেন। জেলা পরিষদ থেকে প্রস্তাবিত আর্ট কলেজের নামে চার হাজার টাকার একটা অনুদান ও একটা পুরনো দালান বরাদ্দ করলেন ডিসি সাহেব। 'কুড়িগ্রাম' নামে রূপগঞ্জের কাছে শৈলেন ঘোষের দুতলা বাড়ী। শুরু হলো ছবি আঁকা আর বাড়ী মেরামত ও ফুলের বাগানের কাজ। ৫/৭ জন লোক

লাগিয়ে দেওয়া হলো বাগানের কাজে।

সুলতানের সাথে বসবাস কালে এক বছরে তাঁর যে সব আত্নীয়দের দেখেছি তাদের মধ্যে নুরুমামু চুন বিক্রি করতেন। তাকে সুলতানের অমতে আর্ট কলেজে স্থান দিই এবং অনেক আর্থিক সাহায্য দিই। সুলতানের এক সৎ ভাই যিনি সামরিক বাহিনী ছেড়ে দিয়েছিলেন, তিনিও অনেক বার এসেছেন আর্ট কলেজে। যিনি সুলতানকে দেবতার তুল্য মনে করতেন এবং বাড়ীতে স্থান দিতেন তিনি ছিলেন নন্দের বাপ ইন্দু বাবু। আমাদের পুরুলিয়া ইউনিয়নের কেরানী, যার বাড়ীর বউ ছেলে মেয়ে সবাই ছিল শিল্পী, কেউ গান গায়, কেউ ছবি আঁকে। আঠারো বছর পর সুলতানের প্রথম প্রদর্শনী হয় খুলনা ক্লাবে ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯, ৩৪টি ছবি নিয়ে।

ইতিমধ্যে এনাম সাহেব বদলী হলেন ডিসি হিসাবে খুলনায়। কাজে যোগ দিয়েই তিনি গাড়ী পাঠিয়ে সুলতানকে খুলনায় নিয়ে যেতে বললেন। গেলাম খুলনায়, প্রস্তাব হলো খুলনা ক্লাবে এক রাতের জন্য সুলতানের প্রদর্শনী হবে। দিন ধার্য্য হলো। এক মাস হাতে রেখে কাজ শুরু হলো। সমস্ত ম্যাটেরিয়াল দেশী মোটা মার্কিন কাপড়, এলা মাটি, ভুসো কালি, পিউরী, পাউডার, আর আসল হার্ডবোর্ড।

বড় বড় হার্ডবোর্ড ও ক্যানভাসের ট্রিটমেন্ট করা হলো সাবুদানা জ্বালিয়ে ব্যাক কোটিং দিয়ে এক সাথে। কয়লা দিয়ে ড্রইং করা হলো ২০/২৫টা ক্যানভাস ও বোর্ডে। তুলি দিয়ে চলছে অয়েল পেইনটিং, স্প্যাচুলা দিয়ে চলছে অয়েল, আর ড্রইং বোর্ডে চলছে ওয়াটার কালার। মনে হচ্ছে একজন শিল্পী বোধহয় কোন এজমালি প্রদর্শনীর কাজ করছেন। সে এক অভাবনীয় শক্তির বহিঃপ্রকাশ। দেখতে দেখতে প্রদর্শনী এসে গেল। আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। পরিবর্তন হয়েছে মহকুমা প্রশাসক শওকত সাহেবের। এডিসি হয়ে তিনি গেলেন খুলনায়। রওশন জামির এসডিও হয়ে আসছেন নড়াইলে। সুলতানুজ্জামান সাহেব বদলী হয়ে গেছেন। কমিশনার হয়ে আসছেন কফিল উদ্দিন মাহামুদ সাহেব। সুলতান ধীরে ধীরে অসাড় হয়ে আসছেন। ইতিপূর্বে তিনি বলেছেন আমার সাথে আপনি একসাথে গ্রুপ শো করবেন। আপনি একটা মডেল বানালে আপনাকে আমি চারটি ছবি দেবো। তাকে উৎসাহিত করার জন্য আমি মাটি ও কাঠের কিছু কাজ শুরু করলাম। যার সংখ্যা প্রায় ২৫/৩০টা। দিন যত কাছে আসছে এনাম সাহেব তত বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। বারবার টেলিফোন আসছে মতিউর রহমান কাজ কতদূর অগ্রসর হলো? ও দিকে ক্লাব মেম্বাররা ক্লাব বন্ধ থাকায় সুলতান ছবি আঁকা ভুলে গেছে একথা বলে ডিসি কমিশনারের কান ভারী করছে। তাদের বক্তব্য ছিলো প্রদর্শনী হবে না। অহেতুক ক্লাব বন্ধ রেখে সদস্যদের কষ্ট দেয়া

হচ্ছে। এনাম সাহেব তাৎক্ষণিকভাবে এডিসি শওকত সাহেবকে গাড়ী দিয়ে পাঠালেন ছবি নেয়ার জন্য। শওকত সাহেবকে দেখে এবং ছবির জন্য তাগিদ দেয়ায় সুলতান বিগড়ে গেলেন। কাজ বন্ধ করে বসে থাকলেন। অগত্যা ডিসি খবর পাঠালেন ছবির কাজ খুলনায় বসে করা হবে। কাঁচা রং করা সমাপ্ত অথবা আধা সমাপ্ত ছবি পিকআপে করে কয়েক ট্রিপে খুলনা ক্লাবের টিনসেড অডিটোরিয়ামে পৌছানো হলো। সবাই সন্দেহ করছে এত ছবি কবে শেষ হবে। খুলনায় ডিসি কমিশনার এডিসি ও একজন ম্যাজিস্ট্রেট সবাই এসে সঙ্গ দিচ্ছিলেন। ঔষধ পত্র চাহিবা মাত্র ক্লাবে হাজির হচ্ছে। সুলতানের কাজের গতি হঠাৎ করে বেড়ে যায়। মেশিনের মত দ্রুত গতিতে মাত্র দুই দিনে সকল ছবি আঁকা শেষ হলো কিন্তু রং কাঁচা।

সবাইকে তাক লাগিয়ে অডিটোরিয়ামে উদ্বোধনী সভা হ'ল। বক্তৃতা রাখলাম আমি, ডিসি ও কমিশনার সাহেব। এই প্রদর্শনীতে প্রায় ৩০/৩৫ হাজার টাকার ছবি বিক্রি হয়। সমস্ত টাকা খুলনা ক্লাবের মাধ্যমে উপস্থিত নড়াইলের মহকুমা প্রশাসক জনাব কামাল সিদ্দিকী ও ইউনাইটেড ব্যাংকের ম্যানেজার, নড়াইল-এর মাধ্যমে ব্যাংকে একাউন্ট খুলে আর্ট ইন্সটিটিউটের নামে রাখা হয়। প্রদর্শনী শেষে ডিসি সাহেবের মেহমান হিসাবে আমরা হোটেল শাহীন-এ এক সপ্তাহ অবস্থান করি। কালেকশনের কিছু নগদ টাকা দিয়ে এনাম চৌধুরী সাহেব প্রায় ৮/১০ হাজার টাকার আর্ট ম্যাটেরিয়েল কিনে দেন। সমস্ত জিনিস নিয়ে আমরা নড়াইল শৈলেন ঘোষের বাড়ীতে ফিরে আসি। ইতিমধ্যে চারদিকে জানাজানি হয় যে, লাল সাহেব লক্ষ লক্ষ টাকার ছবি বিক্রি করেছেন। ভক্তবৃন্দ, সাধু-সন্ন্যাসী, ফকির, পাগল দলে দলে আর্ট কলেজে আসতে আরম্ভ করল। সুলতান সাহেব ও এসডিও সাহেবের যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালিত হত। সাধু সন্ন্যাসীদের টাকা পয়সা দেওয়ার জন্য তিনি এসডিও সাহেবের সই আনতেন এবং ব্যাংক হতে টাকা পয়সা তুলে সাধু সন্ন্যাসী গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে এসডিও সাহেব বলেন যে, এসব আর্ট কলেজের টাকা, এভাবে যথেচ্ছা বিলানোর জন্য নয়। তখন ১৫/২০ জন সাধু সন্ন্যাসীসহ সুলতান এসডিও-এর বাংলোয় গিয়ে উচ্চস্বরে চিৎকার করতে থাকলে এসডিও সাহেব চেক বইতে সই দিয়ে দোতলা থেকে নীচে ফেলে দেন। এরপর সুলতান এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত টাকা উঠিয়ে সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। এভাবেই প্রস্তাবিত আর্ট কলেজের অপমৃত্যু ঘটে এবং সুলতানের না খেয়ে থাকা জীবন আবার আরম্ভ হয়।

১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলো। দেশ স্বাধীন হলো। সর্বস্বান্ত হয়ে ছেলে মেয়ে নিয়ে কি করবো ভেবে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। খুলনায় অবস্থান করছি। ছোট ভাই ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলমের সঙ্গে কিছু একটা করবো চিন্তাভাবনা করছি। কামাল সিদ্দিকী সাহেব খুলনায় ডিসি হয়ে এসেছেন। কাজ নাই, তাই নাজমুল আলমের সাথে ডিসি অফিস যাই। সদ্য স্বাধীন দেশে সমস্যার সীমা নেই। একদিন ডিসি'র চেম্বারে বসে আছি। এরমধ্যে কোহিনুর শিল্পগোষ্ঠির ফরহাদ নামে একজন কর্মকর্তা খুলনাস্থ কোহিনুরের গুদামের তালা খোলার জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করার জন্য একটা দরখাস্ত এবং তার সাথে একটি ভিজিটিং কার্ড ডিসি সাহেবের কাছে দিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট বলতে তখন খুলনায় একজনই আছেন। কোন ম্যাজিস্ট্রেট দেওয়া সম্ভব নয় বলে ডিসি সাহেব দুঃখ প্রকাশ করে যখন কাগজগুলো ফেরত দিচ্ছিলেন তখন কার্ডটা নিয়ে দেখলাম ফরহাদের এবং কোহিনুর শিল্পগোষ্ঠির নাম। তখন তাকে ডাকানো হলো। তিনি বললেন, কোহিনুর শিল্পগোষ্ঠী সরকারের অধীনে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। সাত্তার সাহেব প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছেন। প্রাক্তন সকল কর্মচারী কর্মকর্তাদের কাজে যোগদান করার আহবান জানানো হয়েছে। তিনি বললেন, আপনি ঢাকায় চলে আসেন। ফেব্রুয়ারির দু'তারিখ ঢাকায় পৌছে গেলাম। ১৪ই ফেব্রুয়ারি আবার নতুন করে কোহিনুর শিল্পগোষ্ঠিতে কাজে যোগদান করলাম। একদিন অফিসে গিয়ে একটা চিঠি পেলাম। সুলতান ভাই লিখেছেন 'প্রিয় মতি ভাই, আমার না খেয়ে থাকার জীবন শুরু হয়েছে। তাই আপনার কথা মনে পড়লো। আপনার শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে জানতে পারলাম আপনি ভাল চাকুরী পেয়েছেন, সুখে আছেন। কষ্ট করে আপনার ঠিকানা যোগাড় করে চিঠি লিখছি। আশাকরি আমাকে ভুলে যান নি।' চিঠির বিষয়বস্তু ছিল অত্যন্ত করুণ।

সুলতান ভাইয়ের অবস্থা জেনে খুবই খারাপ লাগলো। ভাল আছি তাই নড়াইলের ব্যথা, দুঃখ কষ্ট ও ক্ষতি সব ভুলে চিঠি দিলাম ও টাকা পাঠালাম। ঢাকায় চলে আসার জন্য অনুরোধ জানালাম। এই সময় আমি বাসা পাল্টে নাখাল পাড়ায় বাসা নিয়েছি। সুলতান ঢাকায় এলেন সঙ্গী ঝড়ুকুণ্ডুকে নিয়ে। শুরু হলো আবার সেই পুরানো প্রচেষ্টা। ভরসা তখন এনাম সাহেব, সুলতানুজ্জামান খান ও বিগ্রেডিয়ার মশুরুল হক, যিনি তখন ঢাকায়। এনাম সাহেব তখন এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরোর ভাইস প্রেসিডেন্ট। সুলতানুজ্জামান সাহেব ওয়াটার ও পাওয়ারের সচিব। বিগ্রেডিয়ার মশুরুল হক তখন চিফ অব প্রোটকল। ভাবলাম সুলতান ভাইয়ের ছবি দিয়ে ঢাকায় একটি প্রদর্শনী করতে হবে, কারণ খুলনা ক্লাবের প্রদর্শনী ১৮ বৎসর পরে হলেও তেমন কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে নি। সুলতান বেঁচে আছেন এবং ছবি আঁকছেন এই খবর

ঢাকায় শিল্পীদের তথা বাংলাদেশের সকল শিল্পীদের জানানোর জন্য শিল্পকলা একাডেমীতে প্রদর্শনীর সিদ্ধান্ত নিলাম।

এই সময় আমি নিজে একটা বোল্ডার কাটার এক্সপেরিমেন্ট শুরু করেছি। শেরে বাংলা নগরে থাকাকালীন প্রচুর বোল্ডার যোগাড় করে কাটা শুরু করেছিলাম। ১০/১২টি কাজ তখন শেষ করেছি। নাখাল পাড়ার বাসায় টিনের ঘরে থাকতাম। একদিকে বিদ্যুৎ ছিল না, অন্য দিকে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। সুলতান ভাইয়ের বন্ধুরা লাইন লাগিয়ে ঢাকায় আসতে শুরু করেছে। তখন আবার বাসা পাল্টে চলে এলাম মগবাজার ওয়ারলেস রোডে লণ্ডন হোটেলের পেছনে একটি চার কামরার একতলা বাড়ীতে। এখানে একটা বড় হল রুম ছিল। সেইটিতে আমার কাজ ও সুলতান ভাইয়ের থাকার ব্যবস্থা করা হলো। ২/৪ জন মেহমান আসলেও অসুবিধা হচ্ছিল না। ইতিমধ্যে মাটি, কাঠ, বোল্ডার, সিমেন্ট ও পোড়া কাঠ মিলিয়ে ২০/৩০টা কাজ আমার হয়ে গেছে। আমার বোল্ডার কাটার গল্প শুনে শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিন সেগুলো দেখার জন্য আমার বাসায় আসলেন, এবং আর্ট কলেজে একটা প্রদর্শনী করার অনুরোধ করলেন। আমি প্রদর্শনীর জন্য জোর কাজ করছি। সুলতান ভাইও বেশ কয়েকটি ছবি আমার এই বাসায় বসে করলেন। ভাবলাম আমি প্রথমে প্রদর্শনী করে কিছু টাকা আয় করে পরে সুলতান ভাইয়ের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবো। এই সময় আমার বাসায় সুলতান ভাইকে প্রচুর ম্যাটেরিয়াল কিনে দিয়েছি। সুলতান ভাই জোরেশোরে ছবি আঁকছেন। মাধ্যম হলো হার্ডবোর্ড, দেশি ক্যানভাস, এলামাটি, ভুসো কালি, পিউরী, হ্যাভক তুলি ও স্পেচুলা। আমার ভাস্কর্য ও সুলতান ভাইয়ের স্পেচুলা ওয়ার্ক, ওয়াটার কালার ও ক্যানভাসে কয়লা দিয়ে চলছে ড্রইং।

আমি প্রদর্শনী করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কোহিনুর শিল্পগোষ্ঠী থেকে ক্রসিয়ারে বিজ্ঞাপনের অগ্রিম হিসাবে প্রায় ২০/২৫ হাজার টাকা যোগাড় করেছি। নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে দু'জন কাজ করে চলেছি।

আমার প্রদর্শনীর স্থান নির্ধারণ হলো ঢাকা আর্ট কলেজে। ইতিমধ্যে পচাত্তর সালে শিল্পকলা একাডেমীতে প্রথম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে ২টি বোল্ডার জমা দিলাম। সুলতান ভাইয়ের একটি ছোট ছবি জমা দিই। আমার প্রদর্শনীর দিন আবেদিন সাহেব ধার্য করলেন ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে। প্রধান অতিথি হিসাবে আবেদিন সাহেব টেলিফোনে আওয়ামী লীগের তথ্যমন্ত্রী কোরবান আলীকে সম্মত করান। প্রেসে ক্রসিয়ার ছাপতে দেওয়া হলো। সভাপতিত্ব করবেন আবেদিন সাহেব নিজে। কয়েক দিনের মধ্যে কোরবান আলী সাহেবের মন্ত্রীত্ব চলে গেল। প্রেসে

ছাপার কাজ বন্ধ করে আবার প্রধান অতিথির জন্য আবেদিন সাহেবকে বললাম। তিনি উপদেশ দিলেন পর্যটনের চেয়ারম্যানকে প্রধান অতিথি করার জন্য। গেলাম আমার প্রাক্তন শিক্ষক চেয়ারম্যান রফিকুল চৌধুরীর কাছে। তিনি সব শুনে সাগ্রহে সম্মতি দিলেন। আবার প্রেসে ছাপার কাজ শুরু হলো। মাত্র এক মাস আছে। দু' দিন পর কাগজে পড়লাম রফিকুল চৌধুরী ওএসডি হয়ে গেছেন। আবার বাতিল হলো প্রধান অতিথি। সভাপতিও ঠিক থাকলো না। ইতিমধ্যে আবেদিন ভাইয়ের ক্যান্সার ধরা পড়েছে। তিনি চিকিৎসার জন্য বিদেশে চলে যাচ্ছেন। ভাবলাম আর বোধহয় আমার প্রদর্শনী হবে না। এরপর নতুন করে গেলাম কবি আবুল ফজল সাহেবের কাছে। কবি হিসাবে আমার পরিচিতি ছিল। তিনি যখন শুনলেন আমি ভাস্কর্যের কাজ করি এবং প্রদর্শনী করবো তখন খুব খুশী হলেন ও প্রধান অতিথি হবার সম্মতি দিলেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে ঠিক করা হল শিল্পকলা একাডেমীর মহা পরিচালক ড. সিরাজুল ইসলামকে। সভাপতিত্ব করবেন আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল সৈয়দ সফিকুল হোসেন। স্বাধীন বাংলায় আমার প্রথম প্রদর্শনী শুরু হলো আর্ট কলেজ গ্যালারিতে। প্রদর্শনী সকাল ১০টা থেকে রাত ১০ পর্যন্ত চলতো। একদিন বিকেলে আমি সুলতান ভাইকে সাথে নিয়ে প্রদর্শনীর অভ্যর্থনায় বসে আছি। এমন সময় একজন বিদেশী শিল্পী মাহমুদের সঙ্গে অভ্যর্থনার দিকে এগিয়ে আসলেন। মাহমুদ ভাই সুলতানকে দেখিয়ে বললেন ঐ শিল্পীর নাম এস. এম. সুলতান। তিনি ভাস্কর মতিউর রহমান সাহেবের বাসায় থাকেন, যার প্রদর্শনী এখানে হচ্ছে। এ বিদেশীর নাম সুলতানী। সুলতানীকে সুলতান ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। সুলতানী কিছুক্ষণ আলাপেই মুগ্ধ হয়ে পড়েন। সুলতানী ছিলেন ঢাকার ইরানী দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী। তিনি বললেন আমি তাঁর কিছু ছবি দেখতে চাই। বাসায় নিয়ে এলাম। সুলতানী তাঁর কাজ দেখে এবং একজন ফ্রিল্যান্সার বাঙ্গালী শিল্পী কাজ করছে দেখে খুবই খুশী হন। তাকে বললাম সুলতানের একক প্রদর্শনী হবে শিল্পকলা একাডেমীতে তাই কাজ চলছে। সুলতানী আমাকে বললেন আপনি এগিয়ে যান। এই ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করবো। এর পর পর সুলতানী আমার মগবাজার বাসায় এসে সুলতান ভাইয়ের সাথে সময় কাটাতেন। একদিন এমন হলো যে, সুলতান ভাই যে জিনিসের তালিকা দিয়েছেন তাতে ৫/৬ হাজার টাকা লাগবে। আমি অর্ধেক টাকা যোগাড় করেছি, তা দিয়ে অর্ধেক ম্যাটেরিয়াল কিনবো ঠিক করেছি। এগারটা ৪'-১০' ফুট চাইনিজ বোর্ড কিনেছি, এতেই আমার টাকা শেষ হয়ে যায়। এরমধ্যে বড় বোর্ড পেয়ে সুলতান ভাই স্প্যাচুলারে কাজ শুরু করবেন, প্রচুর হ্যাভক দরকার। সুলতানী আমাকে বললেন, চলেন বাজারে যাই। তাকে নিয়ে

নবাবপুর রং বিতানে গেলাম। মালিক হাজী সাহেব আগের পাওনা টাকা চাইলেন। তখন সুলতানী বললেন ফর্দের অর্ধেক জিনিস আমি কিনে দেব। সেই মতে দুই হন্দর হ্যাভক সহ আড়াই হাজার টাকার মাল কেনা হলো। টাকাটা সুলতানী দিলেন। এই হলো আমার বাইরের দাতাদের কাছ থেকে প্রথম সাহায্য। ইতিমধ্যে ৪/৫ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। কেউ একটি পয়সা সাহায্য করেনি। এই সেই সুলতানী যার আড়াই হাজার টাকা দানে সুলতান ভাইয়ের প্রদর্শনী হয়েছে বলে এক বরেণ্য কথা শিল্পীর বইয়ে স্থান পেয়েছে। সুলতানী খুব একটা স্বচ্ছল অফিসার ছিলেন না। তার একটি ভাই ও একটি বোন ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। যেহেতু তিনি চ্যান্সেরীর দায়িত্বে ছিলেন, তাই সাংস্কৃতিক তহবিলটি তার অধীনে ছিল। বরেণ্য শিল্পীদের ২/৩টা রিসেপশান দেখিয়ে কিছু টাকা বের করে শিল্পীদের ছবি কিনে বাঙ্গালী শিল্পীদের সাহায্য করেন। যাহোক, আমার প্রদর্শনী শেষ হলে বেশ কিছু টাকা পাই। মায়ের নির্দেশ মূর্তি বেঁচা টাকা পয়সা যেন সন্তানদেরকে না খাওয়াই, তাই পুরো টাকাটা সুলতান ভাইয়ের খাতে লাগাতে পারবো ভাবলাম। পূর্ণোদ্যমে চলছে ছবি আঁকা। আমি ছুটি শেষে কাজে যোগদান করায় সারাদিন সুলতানকে সঙ্গ দিতে পারি না। তাই একটা কাজের ছেলে নিয়োগ করলাম। সুলতান আড্ডা না হলে ছবি আঁকেন না। তাই কয়েকজন শিল্পীকে অনুরোধ করলাম আমার বাসায় আসার জন্য ও সুলতান ভাইকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য। এরমধ্যে সবাই প্রায় তরুণ। ঢাকা আর্ট কলেজ থেকে পাস করা। সার্বক্ষণিকভাবে ক্যানভাস ট্রিটম্যান্ট ও রং বানানোর কাজে সাহায্যের জন্য শিল্পী মেরাজ, সায়মন, নাদভি এগিয়ে এলো। মাঝে মাঝে খালেদ ভাই এবং সুবীর চৌধুরীও যোগ দিত। খুব জমজমাট অবস্থা প্রতিদিন প্রায় ৫০০/৭০০ টাকার ম্যাটেরিয়াল লাগত।

এমনি অবস্থায় বেশিদিন টিকে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। শিল্পকলা একাডেমীতে দরখাস্ত করে প্রদর্শনীর দিন ধার্য্য করি। গ্যালারির অনুমতি পাই ১৫ দিনের জন্য। ৫০/৬০টা ছবি আঁকা হয়। এছাড়া আরো ৩০/৪০টি ছবি কয়লা দিয়ে ড্রইং করা। সাবু দানা দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা আরো প্রায় ৩০/৪০টি ছবি। কাজের চাপে সুলতান ক্লান্ত হয়ে পড়েন। কাজে অনীহা প্রকাশ করতে শুরু করেন। একদিন রেগে চলে গেলেন নড়াইল, না বলে। আর আসেন না। চারিদিকে গুজব সুলতানের প্রদর্শনী হবে না, সে পালিয়েছে। বিপদ এবার অন্যরকম। ভাগনে মেজর কুদ্দুসের স্মরণাপন্ন হলাম। সে ধরে এনে দিল সুলতানকে আমার বাসায়। আবার শুরু হলো ছবি আঁকা।

ঢাকায় এবার এলে প্রতিদিন বিকেলে গাড়ী করে ঘুরতে ও আড্ডা দিতে যাই তাঁর প্রাক্তন প্যাট্রনদের কাছে। আড্ডা চলে আবেদিনের, কবি জসিম উদ্দিনের, বাউল

মনসুর উদ্দিনের, এনাম চৌধুরী, সুলতানুজ্জামান ও মশুরুল হকের বাসায়। সবাই বাহবা দেয় প্রদর্শনী করার জন্য। আমার কথামতো কাজ করার জন্য তাঁকে উপদেশ দেন। যথেষ্ট চা নাস্তা খাওয়ান সবাই। আমার অবস্থা খুবই খারাপ যাচ্ছে। তবে কোনো রকমে কাজ বন্ধ করা যাবে না। তখন ডানে বামে ধারকর্য শুরু করলাম। তবুও সুলতানকে জানতে দিইনি যে আমি আর পারছি না। এ প্রদর্শনীর দিন যত কাছে আসছে আমি ততই আর্থিকভাবে দুর্বল হচ্ছি। সুলতানও শারীরিকভাবে কাজের চাপে দুর্বল হয়ে আসছেন। আবার একদিন না বলে হঠাৎ পলাতক। প্রদর্শনীর মাত্র ২০/২৫ দিন বাকী। বনের পাখী আবার বনে, ঝাঁকের পাখী আবার ঝাঁকে, অর্থাৎ নড়াইলে পালিয়ে যান। বিপদ দেখে এবার স্মরণাপন্ন হলাম বিগ্রেডিয়ার মশুরুল হক সাহেবের। তিনি টেলিফোনে জিওসি যশোরকে সব ঘটনা বলেন এবং যেভাবে হোক সুলতানকে ধরে ঢাকায় আমার বাসায় পৌছে দিতে অনুরোধ জানালেন। আর্মি কায়দায় একদল অফিসার জীপ নিয়ে নড়াইলে সুলতানের পুরানো আস্তানায় গিয়ে তাকে না পেয়ে শহরের দিকে যেতেই পরিচিত গাইড সুলতানকে দেখে। সুলতান ভ্যান যোগে যাচ্ছেন। জীপ ভ্যানের গতিরোধ করে ও সুলতানকে জীপে উঠিয়ে যশোর ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে পরে বিনা টিকেটে বিমানের ককপিটে উঠিয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে মেসেজ দেওয়া হয় যেন তারা তাঁকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করে এবং বিগ্রেডিয়ার মশুরুল হক সাহেবের বাসায় নিয়ে যায়। তাই করা হলো। বিকেলে মশুরুল ভাই শিল্পীকে নিয়ে হাজির হয়ে বললেন এই যে মতি তোমার চিড়িয়া ধরে এনেছি। স্বভাবসুলভ কায়দায় সুলতান বললেন মাফ করবেন মতি ভাই। নড়াইলের বন্ধুদের কথা মনে পড়ায় ও একটু মুক্ত আলো বাতাস খেতে পালিয়ে গিয়েছিলাম। এই আর্মি সাহেব আমাকে সেখান থেকে ধরে নিয়ে এসেছেন। আবার নতুন করে কাজ শুরু হলো। এবার নতুন সমস্যা। উসিলা বের করলেন ভিস্যুয়াল ডিস্টান্স পাচ্ছিনা। এত ছোট স্পেসে এত বড় ছবি আঁকা সম্ভব নয়। এদিকে বাড়ী ওয়ালা বাড়ী ছাড়ার নোটিশ দিচ্ছে। একই সময়ে সুলতান ভাইয়ের ব্রেকডাউন ঘটলো। বাড়ী ছাড়তে হলো। নতুন বাসা নিলাম খিলগাঁও মসজিদের পিছনে। ইমাম সাহেব এককালে আমার বাসায় থাকতেন। তিনি আশেপাশের লোকজনকে বললেন মসজিদের পাশে দু'জন হিন্দু বাসা নিয়েছে। একজন লম্বা চুলওয়ালা সাধু গাঁজা খায়। আরেকজন হিন্দু মূর্তি বানায়। মাত্র কয়েক সপ্তাহ হয় নতুন বাসায় এসেছি। এক শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর ইমাম সাহেব কয়েকজন কিশোর ও যুবক নামাজিকে বলেন ঐ টিনের ঘরে সাধু সন্ন্যাসীরা আড্ডা জমিয়েছে। মূর্তি বানাচ্ছে। গাঁজা মদ চলছে। অতএব পাথর মেরে তাদের উড়িয়ে দিতে হবে। এই সময় সুলতান ভাই আমার ছোট

মেয়েটিকে কোলে নিয়ে চেয়ারে বসেছিলেন বাইরে খোলা জায়গায়, যেখানে আমি একটা কাঁঠাল গাছ দিয়ে মূর্তি বানাচ্ছিলাম। হাতে আমার চাইনিজ কুড়াল। হঠাৎ ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে বৃষ্টির মতো ইট পাথর মারতে শুরু করলো যুবকরা। সুলতান ভাই আমার মেয়েটিকে নিয়ে দ্রুত ঘরের ভিতর চলে গেলেন। আমি চাইনিজ কুড়াল নিয়ে তাড়া করে দেখি পাগড়ী ওয়ালা ইমাম সাহেব হুকুম দিচ্ছেন আর ছেলেরা ইট পাথর মারছে। টিনের ঘর। বিকট আওয়াজে মানুষ চারদিকে ছুটে গেল। আমার বাসার সমস্ত লোক ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরের ভিতরেই অবস্থান করছিল। ইমাম সাহেব আমার হাতে কুড়াল এবং আমার রাগন্বিত অবস্থা দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কাজী সাহেব আপনি কি এই বাসায় থাকেন? আমাকে বলা হয়েছে এই বাসায় একজন ইণ্ডিয়ান গাঁজাখোর সাধু আরেকজন হিন্দু মূর্তি বানানোর কারখানা খুলেছে। আমি ইমাম সাহেবকে বললাম, না দেখে না শুনে এই একশান নেওয়ার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে? ইমাম সাহেব ক্ষমা চাইলেন।

প্রদর্শনীর দিন এসে গেল। প্রধান অতিথি কাজী আনোয়ারুল হক। সভাপতিত্ব করলেন শিক্ষা উপদেষ্টা কবি আবুল ফজল। সুলতান ভাইকে নতুন জামা কাপড়ে সাজানো হলো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে শিল্পকলার প্রশাসন বিল্ডিংয়ের হল ঘরে। সুলতান ভাই সকালেই অনুরোধ করলেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমাকে কিছু বলতে হলে আমার বিগ মেডিসিন লাগবে। বিকেল ৫টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হবে। প্রধান অতিথি সভাপতি এসে গেছেন। কিন্তু বিগ মেডিসিন আসেনি। দর্শক সমাগম হয়েছে প্রচুর। হল ঘরটা ভরে গেছে। বাইরেও অনেক দর্শক অপেক্ষমান। সুলতান ভাইকে বার বার অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো, তিনি জানিয়ে দিলেন বিগ মেডিসিন না আসা পর্যন্ত আমি ওখানে যেতে পারব না। বসে আছেন চারুকলা বিভাগের রুমে। বিগ মেডিসিন আনার দায়িত্ব দেওয়া ছিল ভাগনে মেজর কুদ্দুসের উপরে। সে আধা ঘন্টা লেটে আসলো। জিজ্ঞাস করলাম এনেছ। উত্তর দেওয়ার আগেই সাফারীর দুই পকেট থেকে দুটি শিশি আমার হাতে ধরিয়ে দিল। প্রশান্ত হাসি মুখে সুলতান ভাই ডক ডক করে দুই শিশি খেয়ে ফেললেন। এরপর দাঁড়িয়ে বললেন চলেন এখন কোথায় যেতে হবে। হলে একটু সামান্য উঁচু একটি ডায়াসে সবাই বসে আছেন। সুলতান ভাইকে সভাপতির পাশের সিট দেওয়া হল। কিছুক্ষণের মধ্যে সভাপতি সাহেব বুঝতে পারলেন ঘটনাটা। তিনি একটু সরে বসতে চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে ডিজি সাহেব উদ্বোধনী ঘোষণা করলেন ও শিল্পীকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করলেন। সুলতান ভাই দাঁড়িয়ে সবাইকে দেখলেন। সামনের সারিতে বসে আছি আমরা, এনাম আহমেদ, সুলতানুজ্জামান ও মশুরুল হক। শুরু করলেন

সুন্দরভাবে বাংলায়। মুহূর্তে সুইচ অন হল ইংরেজীতে।

প্রদর্শনী ১৫ দিন চলে। শিল্পকলায় এ রকম প্রদর্শনী কোন দিন হয়নি। সবকিছু ভালভাবে চললো। চারিদিকে লোক লাগিয়ে করপোরেশন ও কিছু সংস্থায় কিছু ছবি বিক্রির মটিভেশান চলছে। দুঃখজনক হলেও সত্য হার্ডবোর্ড ও লোকাল ম্যাটেরিয়ালের বলে বড় ছবিগুলোর কাছে কেউ ভিড়লো না। মাত্র ২৭ হাজার টাকার ছবি প্রদর্শনীতে বিক্রি হলো। যা খরচের কাছাকাছিও নয়। এভাবে প্রদর্শনী শেষ হলো।



১৯৭৬ সালে শিল্পী সুলতানের প্রদর্শনী উদ্বোধনের পর প্রদর্শনী গ্যালারীতে শিল্পীর সংগে প্রধান অতিথি কাজী আনোয়ারুল হক এবং অধ্যাপক আবুল ফজল



এস.এম. সুলতান : সৃজনশীলতা ও প্রান্তিক মানসের দায়

আবুল মনসুর

এক

সুলতানের শিল্পকর্ম বিবেচনায় সামনে এসে দাঁড়ায় তাঁর জীবনচর্যার ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য। বস্তুতপক্ষে তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার পেছনে তাঁর শিল্পকর্মের ভূমিকা যতখানি তার চেয়ে সম্ভবত অধিক জীবনাচারের ভিন্নতার আকর্ষণ। এটি অস্বাভাবিকও নয়। একই প্রকার বিড়ম্বনার দুর্বিপাক শিল্প ইতিহাসে আরো শিল্পীর ক্ষেত্রে ঘটেছে—ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ্ এবং পল গগ্যাঁ দু'টি খুব চটজলদি উদাহরণ। একে নিছক দুর্ভাগ্যও হয়তো বলা যাবেনা, কারণ এরকম পরিস্থিতি শিল্পীর জন্য এনে দেয় ব্যাপক পরিচিতি ও আবেগঘন লোকপ্রিয়তা—হোকনা তা বেঠিক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে। সে যেমনই হোক, সভ্য সমাজের প্রচলিত নিয়ম কাঠামোর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এ ধরনের সৃজনশীল মানুষের প্রতি আমাদের এ পক্ষপাত এক ধরনের কৌতুহলোদ্দীপক বৈপরীত্য বটে। সমাজ-নির্ধারিত জীবনচর্যার বিপরীতে অবস্থান গ্রহণকারী মানুষের প্রতি আমাদের সাধারণ মনোভাব হলো বিতৃষ্ণার, অবহেলার, নিন্দার ও করুণার। তাঁকে আমরা মনে করি জীবনে অসফল, ব্যর্থ, অধঃপতিত, এমন কি কখনো কখনো বিপদজনক। তবে এমন ব্যক্তি যদি সৃজনশীল কোনো কর্মকাণ্ডের দ্বারা লাভ করেন সাফল্য ও পরিচিতি, সঙ্গে সঙ্গে তিনি হয়ে ওঠেন ব্যাপকভাবে বন্দিত ও নন্দিত। তাঁকে ঘিরে তৈরী হয় 'মিথ্', 'কাল্ট্', 'কারিসমা'। তাঁর জীবনের বৈপরীত্যসমূহ অতিরঞ্জিত ও বর্ণারোপিত হয়ে গড়ে ওঠে তাঁর বৈশিষ্ট্য

ও জনপ্রিয়তা। শিল্পী এস.এম. সুলতানের ক্ষেত্রে কমবেশী এ ব্যাপারটা ঘটেছে। সমাজের মূলস্রোতের বাইরে বা বিপরীতে অবস্থান গ্রহণের প্রবণতাসম্পন্ন চিত্তবৃত্তিকে আমরা আখ্যায়িত করতে পারি 'প্রান্তিক' মানসিকতা হিসেবে। সুলতানের শিল্পভাবনা বিবেচনায় তাঁর এ প্রান্তিক মানসের ওপর আলোকপাত জরুরী হয়ে উঠতে পারে এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্তিকতা বিষয়ে যৎসামান্য উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না আশা করা যায়।

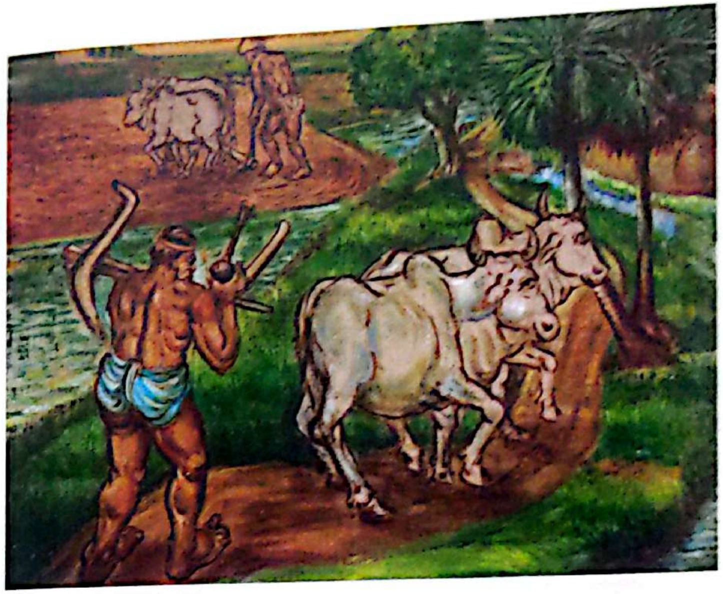
প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ক্লোদ লেভি স্ট্রাস তাঁর সুবিখ্যাত *দ্যা সেভেজ মাইন্ড* গ্রন্থে সর্বতোভাবে সভ্যতার বাইরে অবস্থানকারী আদিম সমাজের পর্যালোচনা করে জোরের সঙ্গে দাবী করেন যে তথাকথিত সভ্য সমাজের মূল্যবোধের সঙ্গে সব সময় সঙ্গতিপূর্ণ না হলেও আদিম মানুষের মনন ও মূল্যবোধ কোনো অবস্থাতেই হীনতর নয়। বরং ক্ষেত্র বিশেষে তা উন্নততর। রুচি ও বিচারের পার্থক্যের কারণে অনেক সময় তা আমরা উপলব্ধি করতে পারিনা। নৃতত্ত্ববিদ ভ্যান গেনেপ্ আফ্রিকায় উপজাতিদের মধ্যে এক ধরনের লোকাচার লক্ষ করেছেন যাকে তিনি নামকরণ করেছেন Rites of Passage। এর তিনটি স্তরের একটি হলো গতানুগতিক জীবন থেকে পৃথক হয়ে একটি প্রান্তিক অবস্থান গ্রহণ। ভ্যান গেনেপ একে বলেছেন Liminal stage বা Liminality। এই দ্বিতীয় স্তরে ব্যক্তির দৈনন্দিন সামাজিক নিয়ম ও রীতিনীতি সবই মুলতবী থাকে। এর সঙ্গে তুলনা করা হয় মৃত্যুর বা জন্মের পূর্বেকার অবস্থার। তৃতীয় স্তরে অংশগ্রহণকারীরা পুনঃপ্রবেশ করে সমাজে, তবে নতুনরূপে নতুন অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে। নৃতত্ত্ববিদ ভিক্টর টার্নার পরবর্তীতে ভ্যান গেনেপের প্রান্তিকতার ধারণাটিকে আরো প্রসারিত করেন এবং একে সমসাময়িক সমাজ ও শিল্প সমালোচনার বিভিন্ন বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। টার্নার দেখিয়েছেন যে শুধু উপজাতীয় বা আদিম সমাজেই নয়, সব সমাজেই সর্বকালে কিছু মানুষ থাকেন যাঁরা স্বেচ্ছায় এ ধরনের প্রান্তিকতায় অবস্থান গ্রহণ করেন। এ প্রান্তিকতা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে পারে। স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যবরণ, ভবঘুরে স্বভাব, স্বেচ্ছাচারী আচরণ, প্রচলিত মূল্যবোধের বিরোধিতা, এমনকি সমাজের সাথে সংঘর্ষেও এর প্রকাশ ঘটতে পারে। সমাজের চোখে এঁরা অসফল, অনৈতিক। কিন্তু এঁরা হয়তো পালন করেন ভিন্নতর, এমনকি হয়তো উর্ধ্বতর, কোনো নৈতিকতা। সভ্যসমাজের প্রান্তিকতা প্রায়শ ব্যক্তিক, তবে কখনো কখনো তা গোষ্ঠিবদ্ধও হতে দেখা যায়। আমাদের দেশে বৈষ্ণব, সুফী বা বাউলের মধ্যে এ ধরনের গোষ্ঠিবদ্ধ প্রান্তিক প্রবণতা

লক্ষ করা যেতে পারে।

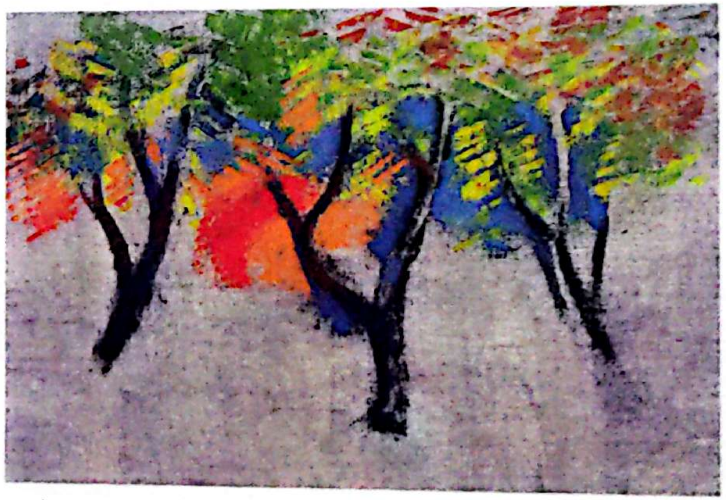
প্রান্তিক মানসসম্পন্ন ব্যক্তি সাধারণত সমাজের প্রচলিত ধর্ম, সংস্কার, মূল্যবোধ ও নিয়মনীতিতে আস্থা স্থাপন করেন না। তিনি এর অন্তর্নিহিত অনৈতিকতা ও স্ববিরোধিতার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং নির্মম সমালোচনায় বা উপহাসে এর বিরুদ্ধাচরণ করেন। সমাজের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কখনো উন্নাসিকের, কখনো উদাসীনের, কখনো বিদ্রোহীর। সমাজ তাঁকে গ্রহণ বা সহ্য করতে চায় না। অথচ প্রায়শ দেখা যায় প্রান্তিক ব্যক্তি বিশ্বাস করেন এক শ্রেণী-বিভক্তিহীন সাম্যভিত্তিক সমাজে, বিসর্জন দেন সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জনের মোহ ও উপায়, বরণ করে নেন দারিদ্র্য ও বঞ্চনা, পার্থিব সহায় সম্পদের প্রতি থাকেন নির্লোভ। তার মধ্যে বিরাজ করে এক ধরনের সমতাভিত্তিক মানসিকতা ও মৈত্রীবোধ। বৈষয়িক ও সামাজিক উন্নতির সোপান বেয়ে ওঠার চাতুর্যময় কর্মকান্ডে অভ্যস্ত আমাদের মানসে এসব প্রান্তিক মানুষ অবহেলা ও করুণারই পাত্র। কিন্তু তেমন একজন যখন সৃজনশীল প্রতিভায় আমাদের মনোযোগ ও স্বীকৃতি দাবী করে বসেন তখন আমাদের প্রতিক্রিয়া দ্রুত বিপরীতমুখী গতি লাভ করে। ইতিহাসে এর সাক্ষ্য রয়েছে।

বলা যেতে পারে সৃজনশীলতার সাথে প্রান্তিকতার বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-চলচ্চিত্র ইত্যাদির ইতিহাসের পাতা ওল্টালে অনেক নজীরই পাওয়া যাবে। পুরোপুরি প্রান্তিক না হলেও প্রান্তিকতার ছিটেফোঁটা অনেক সৃজনশীল ব্যক্তির মধ্যেই লক্ষ করা যেতে পারে। বস্তুতপক্ষে সৃজনশীলতাও কিছুটা পরিমাণে প্রান্তিকতার জন্ম দেয়। সমাজে প্রচলিত আচার-সংস্কার, আপোষকামিতা, পার্থিব উন্নতির প্রতি আসক্তি—সাধারণভাবে সৃজনশীল মানুষ এসবের প্রতি উদাসীন ও বৈরী হয়ে থাকেন। বিশ্বশিল্পের ইতিহাসে লিওনার্দো-মিকেলএঞ্জেলো থেকে পিকাসো পর্যন্ত অনেকেই কমবেশী প্রান্তিক মানসিকতা-সম্পন্নই ছিলেন। ভ্যানগঘ-গগ্যাঁর কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। শিল্পকলায় গোষ্ঠিবদ্ধ প্রান্তিক বিশ্বাস ও আচরণও চর্চিত হয়েছে—ডাডা, ফিউচারিজম প্রভৃতি দলবদ্ধ প্রান্তিকতার উদাহরণ। বাংলা শিল্প-সাহিত্যের পরিধির মধ্যে খুঁজলেও এমন উদাহরণ পেতে বেশী দূর যেতে হয় না। সাম্প্রতিক অতীতের মাইকেল মধুসূদন ও কাজী নজরুল-এর প্রোজ্জল উদাহরণ। আমাদের অনতিদীর্ঘ আধুনিক শিল্পের ইতিহাসেও এমন নজীর দুর্লভ নয়— নভেরা আহমদ এবং এস.এম. সুলতান প্রান্তিক শিল্প-মানসের সাম্প্রতিক উদাহরণ। পার্শ্ববর্তী ভারতেও রামকিঙ্কর বেজ বা এম. এফ. হুসেনের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে।

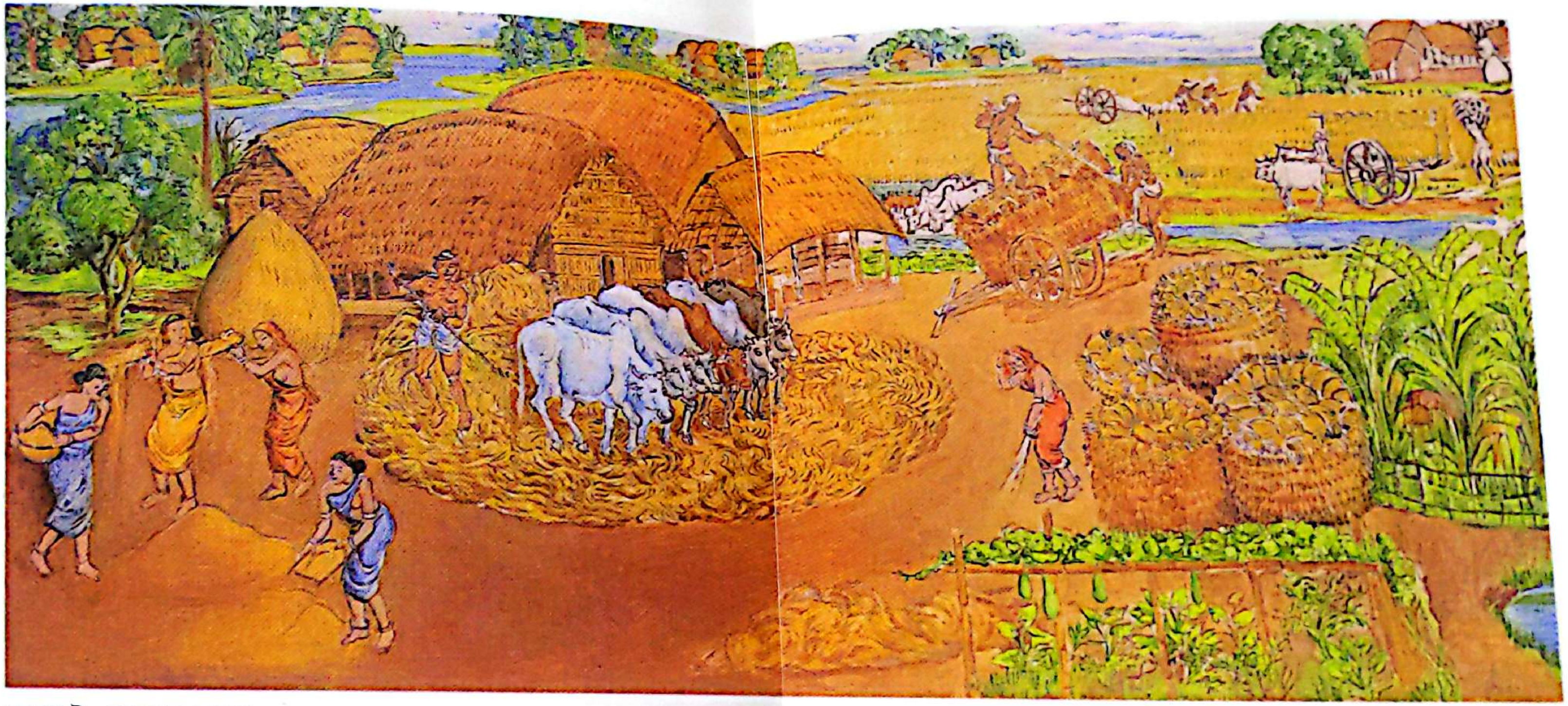
সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র—যেখানে কাল্পনিক চরিত্র নির্মাণ সম্ভব, সেখানেও প্রান্তিক



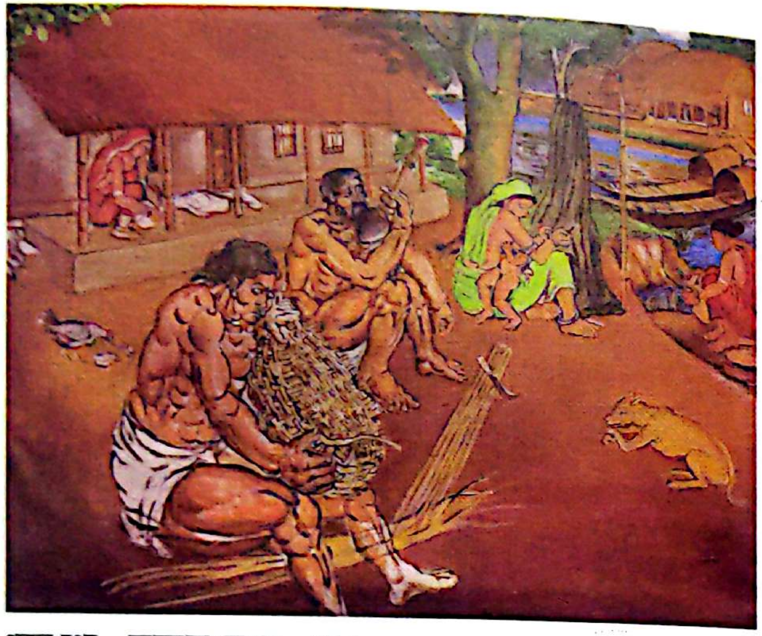
জমি কর্ষণে যাত্রা-৩ ক্যানভাসে তেল রং ১৯৯২



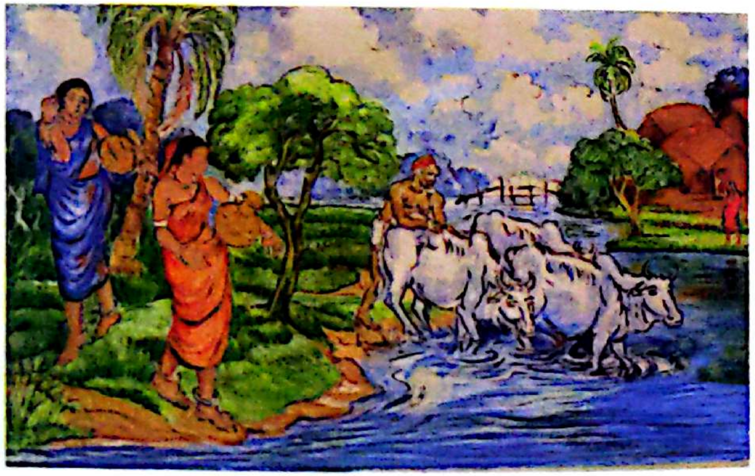
বন (অসমাপ্ত) ক্যানভাসে তেল রং ১৯৮৭



ধান মাড়াই ক্যানভাসে তেল রং ১৯৮৭



গ্রামের দুপুর ক্যানভাসে তেল রং ১৯৮৭



নদী পারাপার ক্যানভাসে তেল রং ১৯৮৭

নায়কের অজস্র উদাহরণ পাওয়া যাবে এবং তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতিরও মোটেই কমতি নেই। লোককথা ও ধর্মকথায়ও এ ধরনের চরিত্র প্রায়শঃই পাওয়া যায়। টার্নার নিজেই বাইবেলের 'গুড সামারিটান' ও ডস্টয়ভস্কির *ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্টের* সোনিয়া চরিত্রের উদাহরণ দিয়েছেন। আলবেয়্যার কাম্যুর *আউটসাইডার* ও গদার-এর *পিয়ের লা ফু*-এর নায়কদের কথা চট করে মনে পড়তে পারে। বাংলা সাহিত্যের দিকে যদি তাকাই তবে দুটি কালজয়ী প্রান্তিক চরিত্রের কথা স্মরণ না করে পারা যাবে না—শ্রীকান্ত ও অপু। চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায় প্রায়শই সভ্যতার অনৈতিক নিয়মনীতির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন তাঁর প্রান্তিক নায়কদের, তাঁদের মুখ দিয়েই উচ্চারণ করিয়েছেন তাঁর নিজের ধিক্কারধ্বনি, 'শাখা প্রশাখা'র প্রশান্ত ও 'আগন্তুক'-এর মনোমোহন মিত্র এ ধরনের দু'টি চরিত্র।

দুই

তবে সাহিত্যে-নাটকে-চলচ্চিত্রে যত অবলীলায় প্রান্তিক মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বাস্তবে পুরোপুরি প্রান্তিক মানুষ কিন্তু তত সহজলভ্য নয়। এর কারণও স্পষ্ট। কিছুটা খ্যাপামী, কিছু উদাসীনতা, জীবনের কিছু পর্যায়ে বাউন্ডুলেপনা—এসব, অর্থাৎ প্রান্তিকতার কিছু কিছু আলামত, ভিন্ন স্বভাবের অনেক মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। তবে সমাজ-সংসার-সভ্যতাকে অস্বীকার করে বা এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জীবনব্যাপি প্রান্তিক অবস্থানে অনড় থাকতে বুকের পাটা দরকার। শুধু তাই নয়, আরো দরকার বিশ্বাস ও আদর্শের আসুরিক শক্তি, অমিত সাহস ও মনোবল, প্রাত্যহিক স্পৃহা ও প্রলোভনের উর্ধ্বে এক উন্নততর বোধের জগতে স্থিতি। বলাবাহুল্য, অসাধারণের পক্ষেই কেবল এ পর্যায়ে উত্তরণ সম্ভব।

পুরোপুরি প্রান্তিক মানুষকে সমাজ সহানুভূতির চোখে দেখে না। তাকে মনে করা হয় দায়িত্বজ্ঞানহীন, অযোগ্য, অসফল ও ধিক্কারযোগ্য বোঝা হিসেবে। প্রাত্যহিক সাংসারিক ও সামাজিক দায়দায়িত্বে সাধারণতঃ সে ব্যক্তি ব্যর্থতারই পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু অনেক সময়ই তার মধ্যে শিল্প-সাহিত্য দর্শনের সৃজনশীল স্ফূরণ দেখা যায়। এগুলো প্রায়শই কোন পরিণতি অর্জন করে না, প্রতিভার ক্ষণিক দ্যূতি হয়ে মিলিয়ে যায়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে পূর্ণ প্রান্তিক মানসের কোনো ব্যক্তি অসাধারণ সৃজনীশক্তির পরিচয় দিয়ে থাকেন এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার অভাব থাকলেও এক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল উত্তরণের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর পরিচিতি স্থানিক গন্ডি ছেড়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ব্যপ্ত হয়ে যেতে পারে। একটি বিশেষ মাত্রা অর্জনের পর সমাজ তাঁকে স্বীকৃতি না দিয়ে পারে

না, যদিও অধিক ক্ষেত্রে এটি মৃত্যু-পরবর্তীকালেই ঘটে থাকে। সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রকদের স্বীকৃতি অর্জনের পর তাঁর সম্পর্কে সৃষ্টি হয় ব্যাপক আগ্রহ, এবং এক্ষেত্রে তাঁর প্রান্তিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর একটি জাঁকালো ভাবমূর্তি তৈরী করতে সাহায্য করে।

ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ্ প্রান্তিক মানসের সুসংবদ্ধ সৃজনশীলতার একটি মোক্ষম উদাহরণ। ভ্যান গঘের জীবন চরম স্বেচ্ছাচারিতা, নিদারুণ উচ্ছৃঙ্খলতা, খ্যাপামী, উদ্ভট আচরণ এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মনীতির সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষময় এক করুণ পরিণতির চিত্র উপস্থাপিত করে। তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রই এত অবিন্যস্ত ও দিকনির্দেশনাহীন ছিল যে চিন্তায় ও মননে তাঁর পক্ষে কোনো শৃঙ্খলা সম্ভব বলে বিশ্বাস করা শক্ত। তাঁর সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্যের উন্মোচন ও আবেগের প্রশমনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সৃজনশীলতাকে এক বিক্ষিপ্ত ও বিচূর্ণিত মানসের খন্ড খন্ড স্বতস্ফূর্ত বিচ্ছুরণ বলেই মনে করা হতো। ভ্যান গঘের মৃত্যুর অনেক পরে ১৯২৭ এবং ১৯২৯ সালে অনুজ থিওকে লেখা তাঁর পত্রগুচ্ছের দু'টি সংকলন প্রকাশিত হয়। এগুলি ১৮২৭ থেকে তাঁর মৃত্যুর বছর ১৮৯০ সালের মধ্যে লেখা যখন দারিদ্র্য, শারীরিক পীড়া, মনোবিকলন তথা উন্মাদগস্ততার এক চরম সঙ্কটের মধ্যে চলেছে তাঁর জীবন। অথচ এক পরিশীলিত ও সুশৃঙ্খল শিল্পী-মানসের এক অপূর্ব উদঘাটন এ পত্রগুলি, বিশ্বের পত্রসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। পত্রগুচ্ছ প্রকাশিত হওয়ার পরই জানা গেল ভ্যান গঘ মোটেই ছিলেন না অশিক্ষিত ও অসম্পূর্ণ মানসিকতাসম্পন্ন কিংবা চিন্তা ও পরিকল্পনাবিহীন স্বতস্ফূর্ত প্রতিভামাত্র। বরং তাঁর জীবন ও কর্মধারা সম্পর্কে তিনি ছিলেন পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী, এমন কি নিজের অসুস্থতাকেও তিনি অনুধাবন ও অতিক্রম করার প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যপাঠ ছিল যথেষ্ট গভীর । শিল্পকলা জগতের প্রাচীন ইতিহাস ও সমসাময়িক শিল্পজগত সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল পরিপূর্ণ। হেন বিষয় নেই যার অবতারণা এ পত্রগুচ্ছে ভ্যান গঘ করেননি। তাঁর দৈনন্দিন দিনযাপন, অসুস্থতা, অর্থাভাব, ক্ষোভ, গ্লানি, অভিমান ইত্যাদি বার বার ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু তারই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে জীবন ও জগতের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ, তীব্র মানবপ্রীতি ও অন্ত্যজ মানুষের প্রতি সহমর্মিতা। সেই সঙ্গে প্রচুর আলোচনা রয়েছে শিল্পকলার প্রতি তাঁর অনুরাগ ও ভাবনা বিষয়ে -- শিল্পের নানা সমসাময়িক সমস্যা এবং ভবিষ্যতের শিল্পকলা বিষয়ে তাঁর ভাবনা ও মতামত।

ভ্যান গঘের শিল্পকলাকেও এক সময় মনে করা হতো এ কেবলই এক উন্মাতাল ও আবেগআপ্লুত অসাধারণ প্রতিভাধর শিল্পীর তাৎক্ষণিক উদ্দীপনার বিস্ফোরণ। এর পেছনে চিন্তা ও পরিকল্পনাও কাজ করেছে এমন মনে করা হতোনা। পত্রগুচ্ছ এ ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছে। আধুনিক শিল্পবিচারে ভ্যান গঘের শিল্পকর্মে স্বতস্ফূর্ততা ছাড়াও নির্মাণ ও সংগঠনের অসাধারণ সুসামঞ্জস্য গুরুত্বপূর্ণভাবে উঠে এসেছে। প্রায় অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় আঁকা হলেও তাঁর প্রতিটি চিত্র গঠনসৌকর্যে শুধু নিটোল নয়, অভিনবও বটে। ইমপ্রেশনিজমের আলোর উদ্ভাসকে ভ্যান গঘ পৌছে দিয়েছেন বর্ণের এক নবতর অর্থময়তার জগতে। বর্ণের স্বাধীন অন্তরানুভূতি প্রকাশের শক্তি প্রথম তাঁর ছবিতেই প্রখরভাবে প্রতিভাত। তাঁর শিল্প একটি উদ্বেলিত প্রান্তিক মানসের পারিপার্শ্বিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শিল্প যেমন, তেমনই তা সময়ের চেয়ে অগ্রবর্তী শৈল্পিক ধারণাসম্পন্ন এক অসাধারণ শিল্পমানসেরও স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর শিল্পের মধ্যেই তিনি ধারণ করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর সকল শিল্পভাবনার নির্যাস, তাকে রূপান্তরিত করে রূপায়িত করেছেন বিংশ শতাব্দীর শিল্প সম্ভাবনার দিকনির্দেশনা। মৃত্যুর একশত বছর পরেও তিনি এখনও অনেক শিল্পীরই প্রণোদনার উৎস।

তাহলে জীবনযাপনে শৃঙ্খলা ও পরিকল্পনাহীন হয়ে কিংবা সামাজিক আচরণকে প্রত্যাখান করেও সৃজনশীলতায় উত্তরণশীল সুনির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশে অভিযাত্রা সম্ভব। সম্ভব সৃজনশীলতার ক্ষেত্রটিতে আধুনিক, সমসাময়িক ও পরিজ্ঞাত থাকা এবং বর্তমানকে অতিক্রম করে আগামীর দিকনির্দেশনা অনুধাবনের দৃষ্টিশক্তি অর্জন। তেমন সৃজনশীল প্রান্তিক হয়তো থাকেন সমকাল থেকে অগ্রবর্তী, জীবৎকালে হয়তো থাকেন অপরিজ্ঞাত ও উপেক্ষিত। কিন্তু তাঁর বিশিষ্টতা উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পর সৃজনশীলতার চেয়েও প্রান্তিকতার নানান চটকদার অনুষঙ্গই তাঁকে করে তোলে অধিক লোকপ্রিয়—এমন প্রায়শই ঘটে থাকে। প্রান্তিক অথচ সৃজনশীলকে বিচারের ক্ষেত্রে এ টানাপোড়েন প্রশ্রয় দিতে পারে বিভ্রান্তির, জন্ম দিতে পারে ভ্রান্ত মূল্যায়নের। শিল্পস্রষ্টা হিসেবে এস.এম. সুলতানকে বিবেচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রান্তিক মানসের গুরুত্বের দিকটি যেমন বিস্মৃত হওয়া যাবেনা তেমনই তা যেন তাঁর শিল্পকর্ম বিচারের ওপর ছায়াপাত না করে সে সতর্কতাটুকুও অবলম্বন করা প্রয়োজন।

তিন

এদেশে সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিত্রশিল্পী সুলতানের অবস্থানই বোধ হয় সবচেয়ে প্রান্তিকতায়। জীবনের একেবারে গঠনমূলক পর্যায়েই তিনি গতানুগতিকতার গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে এসেছেন এবং স্থিত হয়েছেন প্রান্তিকতায়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আপোষহীনভাবে রক্ষা করেছেন সে অবস্থান, কোনো পিছুটান, মনোবাঞ্ছা, প্রলোভন কিংবা সামাজিক প্রতিপত্তির প্রত্যাশা তাঁকে টলাতে পারেনি তাঁর অধিষ্ঠান থেকে। প্রান্তিকতার বিভিন্ন অনুষঙ্গ জীবনের কোনো কোনো পর্যায়ে ধারণ করা এক ধরনের বিলাসিতা বা ফ্যাশন হিসেবেও চলে। সলুতানের ক্ষেত্রে এটি মোটেই তা নয়, এ ব্যাপারে তাঁর সততা ও একনিষ্ঠতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশের কোনো অবকাশই নেই।

সুলতান প্রথমতঃ প্রত্যাখান করেছেন নগরজীবনের উপর পালিশ দেওয়া চাকচিক্যময় জীবন। সেই সঙ্গে এই জীবনের ভোগবাদিতা, সম্পদ-সম্পত্তি অর্জনের প্রতিযোগিতাকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তথাকথিত সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের প্রচলিত ভব্যতা ও মূল্যবোধের ভণ্ডামিকেও তিনি পরিত্যাগ করেন। বিনিময়ে তিনি আস্থা স্থাপন করেন বিজ্ঞান ও সভ্যতার কলঙ্কস্পর্শহীন গ্রামজীবনে। সে গ্রাম হয়তো বা শতবর্ষ আগের স্বাবলম্বী পল্লীসমাজ, বাইরের কোন হস্তক্ষেপ ছাড়াই যা আপন অন্তর্নিহিত শক্তিতে চলিষ্ণু ও স্বনির্ভর। এখানে তিনি প্রযুক্তি বা আধুনিকতার কোনো চিহ্নকেই বরদাস্ত করতে চাননা। সুলতানের অমিত আস্থা গ্রামীণ কৃষিজীবী মানব মানবীর প্রতি। এদের উৎপাদনশীল, শ্রমশীল, মৃত্তিকা-আবদ্ধ জীবনপ্রবাহে তিনি প্রত্যক্ষ করেন জীবনের সকল অর্থময়তা। এরা আদিম ভূমিপুত্র, মৃত্তিকা থেকে উৎসারিত, মৃত্তিকা কর্ষণে শস্য উৎপাদনের প্রাচীন পেশার প্রতিভূ। অতএব মৃত্তিকারও একমাত্র ন্যায্য অধিকারী। এদের মহিমাকে বিস্তৃত বিস্ফারিত করা তাঁর কর্তব্য, এদের সংগ্রামে সহায়ক উদ্দীপনামন্ত্র সংযোজন তাঁর দায়িত্ব—এভাবেই সুলতান নির্ধারণ করেন তাঁর জীবন ও শিল্পের অঙ্গীকার।

এখানে আবারও স্মরণ করে নেওয়া ভালো নাগরিক ভোগবিলাস, সহায়সম্পত্তি ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জন সুলতানের জন্য দুরূহ ছিলনা। এই মোহটুকু ত্যাগ করতে পারার মনোবৃত্তিটাই অসামান্য একটি ঘটনা। এই ত্যাগটুকুর মূল্যই অপরিসীম। যাঁরা সুলতানের প্রান্তিকতাকে সন্দেহের চোখে দেখেন এবং সেই সুবাদে তাঁর শিল্পকর্মের প্রতিও প্রদর্শন করেন উন্নাসিক বৈরিতা তাঁদের সাথে একমত হওয়ার কোনো কারণ নেই। সুলতান শুধু বৈষয়িক প্রাপ্তিকেই প্রত্যাখান করেননি সেই সঙ্গে অস্বীকার করেছেন নাগরিক সমাজের ভণ্ডামিকে, তার ঘুনে ধরা মূল্যবোধকে। নিজের মধ্যে

তিনি সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছেন এক ধরনের নিজস্ব বিশ্বজনীনতা, মানবিকতাবোধ, ধর্মীয় সমন্বয়চেতনা ও অধ্যাত্মবোধ। অন্ত্যজ ও অবহেলিত মানুষের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা ও মমত্ববোধেও কোনো খাদ নেই। তাঁর শিল্পবিশ্বাসেও ধ্বনিত হয় মানবের অজেয় সত্তার জয়ধ্বনি। যে কোনো হীন উপায়ে আপন স্বার্থসিদ্ধির প্রতিযোগিতামূলক এই সমকালে বাস করেও এসবের উর্ধ্বে নিজকে স্থাপন করতে পারাটাই একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত।

সুলতানের প্রান্তিক অবস্থানে প্রত্যাখানটিই মুখ্য। বিপরীতে এর বিকল্প হিসেবে তাঁর জীবনাদর্শ খুব পরিষ্কার নয়। তাঁর জীবন-ভাবনায় আধ্যাত্মিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে হয়। এই ভাবনার মূল সম্ভবত প্রেম—ঈশ্বরপ্রেম, মানবপ্রেম। এর ফলেই সম্ভবত তিনি তাড়িত হয়েছেন সুফী, বৈষ্ণব, বাউল, সহজিয়া ইত্যাকার প্রেমমুখী প্রান্তিক জীবনাদর্শে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সম্প্রদায়বোধকে অতিক্রম করে পেরেছেন একটি বিশ্বজনীন মানবিক চেতনা অর্জন করতে। তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বে এসবের প্রকাশ দেখা যায়। তবে তাঁর মানবিকতার সঙ্গে আধুনিক ইহজাগতিক মানবিক চেতনার কিছু পার্থক্য থাকে। কারণ সুলতান নিজেকে সমকালীন করে তোলার ব্যাপারে খুব চেষ্টিত নন। ফলে বর্তমান যুগের মানবিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে তাঁর তেমন আগ্রহ জাগ্রত হয় না অথবা এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যও থাকে ধোঁয়াটে। গ্রামজীবনের স্বয়ম্ভর ও পরিপূর্ণ যে চিত্রটি তাঁর আদর্শ বাস্তবের সঙ্গে তাকে তিনি বিতর্কে টানেন না, এক দূরাচারী স্বপ্নের মত তাকে বহন করেন মাত্র।

তার মানে এ নয় যে সুলতানের প্রান্তিকতার কোনো ইতিবাচক গুরুত্ব নেই। তাঁর প্রত্যাখ্যানের বিকল্প কোনো সমাধান উদ্ভাবন তাঁকে করতে হবে এমনও কোনো কথা নেই। দৈনন্দিন জীবনযাপনে এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে এর কিছু উদাহরণ হয়তো তিনি সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু একটি সৃজনশীল মানস তার বিকল্প চিন্তাকে প্রধানতঃ প্রকাশ করবে তার সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে। সুলতানের ক্ষেত্রে এটি চিত্রকলা। পল গগ্যাঁ সুলতানের মতই নাগরিক সভ্যতাকে প্রত্যাখ্যান করে আশ্রয় নিয়েছিলেন পলিনেশীয় দ্বীপের আদিবাসীদের মধ্যে। সেখানে অনুপ্রবেশকারী ইউরোপীয়দের দ্বারা আদিবাসীদের ওপর নিপীড়নের বিরুদ্ধে গগ্যাঁ উদ্ধতভাবে সরব ছিলেন, কিন্তু সেটি তাঁর প্রান্তিক অবস্থানের ইতিবাচকতার অতি সামান্য অংশ মাত্র। যে সহমর্মিতা ও উপলব্ধি মিশ্রিত করে ঐ দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের জীবন, বিশ্বাস ও ভাবনাকে তিনি রূপায়িত করেছেন তাঁর চিত্রকলায়, তাদের আদিম শিল্পশৈলীকে যেভাবে তিনি সংমিশ্রিত করেছেন আধুনিক শিল্পধারার সঙ্গে, এবং এভাবে আধুনিক শিল্পের

যাত্রাপথে তিনি যেভাবে সংযোজন করেছেন নবতর বোধ—সেটিই গগ্যাঁর প্রান্তিকতা থেকে বড় প্রাপ্তি। সুলতানের ক্ষেত্রেও এটিই বিবেচ্য হওয়া উচিত, তাঁর প্রান্তিকতা সৃজনশীল উদ্ভাবনে আমাদের তেমন কোনো নবতর বোধের জগতে উন্নীত করতে সমর্থ কিনা।

সৃজনশীলতার বাইরে সুলতানের প্রান্তিক মানসের অন্যান্য দিকগুলি খতিয়ে দেখা যেতে পারে। সামাজিক শৃঙ্খলতার সকল বন্ধনকে তিনি অস্বীকার করেছেন-- প্রত্যাখান করেছেন ভূ-সম্পত্তি ও জাগতিক প্রতিপত্তি অর্জনের মোহ, সংসারের বন্ধন ও সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে আপন অধিকারের সীমানা নির্ধারণ কিংবা পদক-পুরস্কারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা অর্জনের কুট-কৌশল অবলম্বনের আকর্ষণ। এক বিশ্বজনীন মানবিক বোধ এবং স্বদেশপ্রেম তাঁকে তাড়িত করেছে বরাবর যার ফলে ভবঘুরে বাউন্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন ভারতবর্ষের পথেপ্রান্তরে। মাটি এবং মানুষের মধ্যে স্বদেশের আত্মাকে আবিষ্কারের প্রণোদনাও তাঁকে করেছে ঘরছাড়া। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে আধ্যাত্মিক আকুতি— পরমাত্মা বা সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার বৈরাগ্যবোধ। পরমকে প্রাপ্তির এষণা শেষ পর্যন্ত প্রেম নামক অনুভূতিতে স্থিত হয়েছে—মানবের প্রতি প্রেম, জীবজগতের প্রতি প্রেম, অকলঙ্ক প্রকৃতির প্রতি প্রেম। তাঁর মানব অবশ্য নয় আধুনিক সভ্যতা সৃষ্ট চতুর পরজীবী ভোগবিলাসী মানব, তাঁর প্রেম শুধুমাত্র সে মানবের প্রতি যে মানব আদিম প্রাচীন ভূমি উৎসারিত উৎপাদনশীল পল্লীবাসী কৃষিজীবী। তাঁর চিত্রকলায় তিনি বিধৃত করেছেন ভূমিপুত্র মানবের প্রতি তাঁর আস্থা ও স্বপ্নের বয়ান। নাগরিক সমস্ত সুযোগ প্রত্যাখান করে শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেকে স্থায়ীভাবে স্থিত করেছেন পল্লীজীবনে। এখানে তাঁর অন্য দু'টি আকর্ষণ শিশু ও প্রাণীজগৎ। এটি খুব স্বাভাবিক যে শিশুকালকেই তিনি মানবিক উৎকর্ষ রোপণের প্রকৃষ্ট সময় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং প্রকৃতি, প্রাণী ও শিল্পকলার স্পর্শের মধ্যে তাদের বিকাশকে তিনি আদর্শতম বলে মনে করেছেন। সামাজিক কর্মকাণ্ড বলতে সুলতান যা করেছেন সেটুকু শিশুদেরকে ঘিরেই। শিশুর শিক্ষা কার্যক্রমে সংযুক্ত করতে চেয়েছেন নান্দনিক অনুশীলন, 'শিশুস্বর্গ' নামক স্বপ্নে ছিল যার সম্পূর্ণতা প্রাপ্তির পরিকল্পনা। জীবজগতের প্রতি প্রেমকেও তিনি দিতে চেয়েছেন গভীরতর সংবেদনশীলতা, যাতে শিশু এবং বয়স্ক সকলের মধ্যেই সঞ্চারিত হবে কিছু মৌল মানবিক গুণ। চিত্রকলার বাইরে এসব তাঁর প্রান্তিক ইতিবাচকতা।

কিন্তু তবু প্রশ্ন থাকে। ১৯৫৩ সালে নড়াইলের নিভৃত নির্বাসনে যাবার পর ১৯৭৬-এ

ঢাকায় তাঁর প্রদর্শনীর মাঝখানে ২৩ বছর তিনি ঠিক কি করেছেন? তাঁর নিজের বয়ানেই জানা যায় যে, এসময় তিনি ছবি বলতে গেলে আঁকেনইনি। বলা যেতে পারে যে এ সময় তাঁর গর্ভযন্ত্রণাকাল, যথার্থ শিল্পভাষা অনুসন্ধানের ও আত্ম-আবিষ্কারের রক্তাক্ত সাধনার কাল। কিন্তু তা মনে হয় না। দীর্ঘ তেইশ বছর তাঁর অনুশীলন বা অনুসন্ধানের কোনো রেখাচিত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। শিল্পের মাধ্যমেই যিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন তাঁর জীবনসত্য ও শিল্পসৃষ্টির মধ্যেই যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন জীবনযাপনের সার্থকতা তাঁর দীর্ঘ তেইশ বছরের নীরবতার কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আমরা জানতে পারিনা। পল্লীজীবন ও ভূমিআশ্রিত প্রাচীন উৎপাদন প্রথাসমূহের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার সত্ত্বেও তিনি নিজে সে জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত হন না। একটি রহস্যের আবরণে নিজেকে এক সন্ত, দরবেশ বা খ্যাপাটে বিবাগীর মত উপস্থাপিত করেন তিনি। ফলে গ্রামে বাস করেও তিনি থাকেন আউটসাইডার। পল্লীসমাজের মানুষ তাঁর প্রতি হয়তো জানায় রহস্যমিশ্রিত শ্রদ্ধা, বিরক্তিমিশ্রিত ঔদাসিন্য কিংবা বিস্ময়মিশ্রিত কৌতূহল। কিন্তু কখনোই সম্পূর্ণভাবে তাদেরই একজন মনে করেনা। এখানে তাঁর বিশ্বাস ও ভালোবাসার ক্ষেত্রটির সঙ্গে তিনি কিছুটা দূরত্বের সম্পর্ক আপনিই রচনা করেন। ফলে সুলতান কিছুটা হলেও অগ্রহণযোগ্য থাকেন তাঁর পরিপার্শ্বের গ্রামীণ পরিমণ্ডলের কাছে। নগর এবং গ্রাম উভয়ের সঙ্গেই তাঁর থেকে যায় একটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক।

চার

চিত্রশিল্পী হিসেবে এস.এম.সুলতান তাঁর জীবিতাবস্থাতেই ব্যাপক স্বীকৃতি ও সাধুবাদ লাভ করেছেন। তাঁর চিত্রকলা সম্পর্কে শিল্পরসিক মহলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা লিখেছেন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আলোচনা-সমালোচনা। তাঁর প্রদর্শনীসমূহ দর্শক মহলে যে পরিমাণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তেমন খুব কম শিল্পীর বেলায়ই দেখা গেছে। তাঁর জীবন নিয়ে রচিত হয়েছে উপন্যাস, নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্র। সাম্প্রতিককালে তাঁর মৃত্যুর পর কাগজপত্রে সাময়িকীতে তাঁকে নিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে প্রচুর উচ্ছ্বাস। বলাবাহুল্য সুলতান স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই অর্জন করেছেন এমনতর সম্বর্ধনা।

তবু তাঁর সম্পর্কে লিখিত আলোচনাসমূহের অধিকাংশই মনে হয় সুলতানের শিল্পের নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ নয়। এগুলির সিংহভাগই গভীর কোনো পর্যালোচনাবিহীন আপ্লুত প্রশংসাবাক্যে আকীর্ণ অথবা শুধুমাত্র উপরতল স্পর্শকারী দায়সারা বয়ান। মাত্র দু'টি রচনাই উল্লেখযোগ্যরূপে চিহ্নিত হওয়ার দাবি রাখে—এর একটি আহমদ ছফা

রচিত সুদীর্ঘ নিবন্ধ 'বাংলার চিত্র ঐতিহ্য : সুলতানের সাধনা', অপরটি শাহাদুজ্জামান-এর সঙ্গে শিল্পীর বিস্তৃত আলাপচারিতা। এ দু'টি রচনায় সুলতানের জীবনাদর্শ ও শিল্পসাধনার মর্মমূলটি উদঘাটনের পরিশ্রমী প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

এখানে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে সুলতান সম্পর্কে অধিকাংশ রচনায় তাঁকে লোকজ ধারার শিল্পী হিসেবে যে বয়ানটি উপস্থাপিত করা হয় সেটি সঠিক নয়। সুলতানের শিল্পকর্মের সঙ্গে আমাদের লোকশিল্প-ঐতিহ্যের সম্পর্ক সামান্যই। একমাত্র বর্ণচয়নে শুদ্ধতার প্রতি পক্ষপাত ও বিষয়ের পৌনঃপুনিকতার মধ্যে লোকশিল্পের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য লক্ষ করা যেতে পারে। তাঁর শিল্পের অন্য সব কিছুই নাগরিক প্রশিক্ষণ ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রাপ্ত। লোকজ বিষয় নিয়ে ছবি আঁকলেই কেউ লোকধারার শিল্পী হয়ে যান না। যে অর্থে জয়নুল আবেদিন লোকধারার শিল্পী নন, সে অর্থে সুলতানও তা নন মোটেই।

সুলতানের সৃজনপ্রয়াসের কোনো বিবর্তনমূলক ধারাবাহিক চিত্র পাওয়া যায় না। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত প্রথম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের পূর্বে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে তাঁর আঁকা কোনো মূল ছবির হদিস পাওয়া যায় না। আমরা শুধু এটুকু জানতে পারি যে পঞ্চাশের দশকে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানকালে তিনি শিল্পী হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। প্রধানত নিসর্গদৃশ্যের রূপকার হলেও তিনি ইমপ্রেশনিস্ট এবং এক্সপ্রেশানিস্ট ধরনের শৈলীর কাজ করেছেন, এমন কি নির্বস্তুক চিত্র রচনারও প্রয়াস চালিয়েছেন। তৎকালে অর্জিত খ্যাতির পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা যায় যে এসব চিত্র শিল্পগুণে নেহাৎ ফেলনা ছিল না। তবুও দৃষ্টিসম্মুখে কোনো উদাহরণবিহীন চিত্রশিল্প সম্পর্কে আলোচনা সম্ভব নয়। তাই ১৯৭৫ থেকে তাঁর সাম্প্রতিক সৃজনপর্ব সম্পর্কেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হয়।

সুলতানের চিত্রকলা দৃষ্টিসম্মুখে প্রথম যে অভিঘাতটি তৈরী করে তা হলো একটি বিস্ফোরণোন্মুখ শক্তির প্রকাশ ও মন্যুমেন্টালিটি বা সমুন্নতভাব। দর্শককে উদাসীনভাবে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে দেয়না, আকৃষ্ট ও কৌতুহলী করে তোলে ; আবিষ্টও করে। বিস্তীর্ণ গ্রামীণ পটভূমি নিয়ে আঁকা হলেও তাঁর ছবির মূল থীম মানুষ, প্রকৃতি এসেছে নেহাত পটভূমি বা অনুষঙ্গ হিসেবে। শাহাদুজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎকারে সুলতান আক্ষেপ করেছেন এদেশে একজনও ল্যাণ্ডস্কেপ পেইন্টার হলো না বলে, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজেও কিন্তু তা হবার চেষ্টা করেননি। তাঁর ছবির পটভূমি জুড়ে গ্রামীণ নিসর্গের যে রূপায়ণ তা নেহায়েতই একটি সাজেশন মাত্র, কদাচিৎ তা

হয়ে ওঠে ল্যাণ্ডস্কেপ, খুব কম সময়েই তা আকৃষ্ট করে তাঁর মনোযোগ। এটি বাঙালি গ্রামের একটি আর্কিটাইপ, বিশেষ স্থানিক নিসর্গের রূপায়ন নয়।

অবশ্য নিসর্গের রূপায়ণ সুলতানের উদ্দেশ্যও নয়। প্রকৃতির পটভূমিতে নেহাত ক্ষুদ্র মানুষকে প্রকৃতির চেয়েও বড় গগনচুম্বী শক্তিধর করে দেখানোই তাঁর কাজ। ফলে অনুপাতটি এখানে উল্টে যায়—মানুষ হয়ে ওঠে বৃহৎ ও শক্তিধর, প্রকৃতি দূরে সরে যায় অকিঞ্চিতকর হয়ে। এখানে অনেকটাই তিনি জয়নুল আবেদিনের সগোত্র। তবে দু'জনের অমিলও লক্ষ্যযোগ্য। জয়নুলের ছবিতে প্রকৃতি জঙ্গম ও বিপুলা, মানুষ সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে টিকে থাকার প্রাণান্ত সংগ্রামে লিপ্ত ; সুলতানের চিত্রে প্রকৃতির ওপর মানুষের দাপট প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে না, প্রকৃতিকে শাসন করে।

মানব শরীরের রূপায়ণেরই সুলতান হয়ে ওঠেন বৈশিষ্ট্যময় ও স্বকীয়। তাঁর ছবিগুলি থেকে মানবমানবীমূর্তিসমূহ তুলে নিলে যা অবশিষ্ট থাকে তা শিল্পের বিচারে নেহায়েতই সাধারণ মাপের বলে বিবেচিত হওয়ারই সম্ভাবনা। তাঁর স্ফীতদেহ পেশীবহুল পুরুষমূর্তিগুলিই বস্তুতপক্ষে তাঁর চিত্রে রচনা করেছে একটি ভিন্নতর দ্যোতনা, প্রাত্যহিকতার সামান্যতা ফুঁড়ে তারা তাঁর চিত্রকে উত্তীর্ণ করে দেয় নান্দনিক বোধের উর্ধ্বলোকে। তারাই এসকল চিত্রকে রক্ষা করে পল্লীদৃশ্যের সস্তা ভাবালুতা থেকে, এতে সঞ্চারিত করে চিরায়তের দোলা। যে আদিম ভূমিপুত্র আদমসন্তান পৃথিবীর বুক চিরে প্রথম তুলে এনেছিল শস্যের মঞ্জরী তারই উত্তরাধিকারী গ্রামবাংলার কর্মিষ্ঠ কৃষককূলের দিনযাপনের এক পাঁচালী যেন রচনা করেন সুলতান। তাদের প্রাত্যহিক জীবনক্রিয়ার পরিচিত দৃশ্যই তিনি আঁকেন, কিন্তু পটভূমিজুড়ে মানবমূর্তির বিস্ফোরণোন্মুখ শারীরিক সামর্থের রূপায়ণে তা সাধারণের সীমাকে অতিক্রম করে যায়। এভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অপূর্ণতাকে সুলতান অতিক্রম করেন মানবশরীরের নিজস্ব অতিরঞ্জন দ্বারা, স্বভাব শিল্পীর 'নাইভ' বা অপটু সৌন্দর্যের আকর্ষণ দ্বারা এবং বিষয়বস্তুর একরৈখিক পৌনঃপুনিকতায় তাঁর বিশ্বাসের অনড় রূপায়ণের মাধ্যমে। তাঁর বিরাটাকার ক্যানভাসগুলি কোনো বাস্তব দৃশ্যের হুবহু প্রতিরূপ নয়, এ যেন স্মৃতি ও স্বপ্নের ঘোর লাগা এক মানুষের অন্তর্গত বিশ্বাসের প্রতিবিম্ব। এভাবেই প্রথম জীবনের জলরং ও তেলরঙে নিসর্গদৃশ্যের কুশলী রূপকার থেকে সুলতানের উত্তরণ ঘটে বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে চিরায়ত অজেয় মানবসত্তার ভাষ্যকার হিসেবে। একই সঙ্গে তাঁর চিত্রমালা বর্তমানের বাঙালির সাথে যোগসূত্র রচনা করে তার পূর্বপুরুষ আদিপিতা কিষাণের, হাজার হাজার বছর ধরে এ

মৃত্তিকার বুকে যার পদচারণা।

সুলতানের মানবমূর্তিগুলি অস্থিসংস্থানের বাস্তব নিয়ম মেনে চলে না। পুরুষমূর্তিগুলির সমস্ত শরীরে আলোড়িত পেশীপুঞ্জ যেন কোন অন্তর্গত শক্তিতে বিস্ফোরিত হবে এখনি। সমস্ত পট জুড়ে তাদের তেজীয়ান উপস্থিতি—এক আদিম, উদ্ধত, অসংস্কৃত শরীরী শক্তির প্রতিভূ যেন বা। কায়িক শ্রমের এমন গরীয়ান রূপায়ণ সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। তুলনামূলকভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর নারী যেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষিত শিল্পের আওতা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে কুণ্ঠিত। এমনকি কখনো কখনো তারা বেঙ্গল স্কুলের ভাবালুতায়ও আক্রান্ত—নরম, বর্তুল, ফেনায়িত। মৃত্তিকা-সম্পৃক্ত কর্মিষ্ঠ পুরুষমূর্তির পাশে তাদের কখনো কখনো গতানুগতিক ও অকিঞ্চিতকর মনে হয়। এটি লক্ষণীয় যে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যত্যয় ছাড়া যখনই সুলতান শুধুমাত্র গ্রামীণ নারীচরিত্র রূপায়ণ করেছেন তার প্রাত্যহিক কর্তব্যে রত অবস্থায় তখন প্রায়শই সেগুলি মামুলীয়ানার উর্ধ্বে সেরকম কোন দ্যোতনা সৃষ্টিতে সমর্থ হয় না। মানুষ ছাড়া অন্য যে প্রাণীটির উপস্থিতি সুলতানের ছবিতে প্রবলভাবে দৃশ্যগোচর সেটি স্বাভাবিকভাবেই গরু—কৃষিজীবনের সাথে যার ওতপ্রোত সম্পর্ক। কিন্তু এখানেও লক্ষ করি সুলতান একটি আর্কিটাইপ নির্মাণ করে নেন এবং ক্লান্তিহীনভাবে এঁকে যান গরুর প্রায় একই ভঙ্গীমার বৈচিত্র্যহীন রূপ। এখানে হয়তো লোকচিত্রের তুলনাটি হাজির করবেন কেউ। লোকচিত্রীও মানুষ ও প্রাণী আঁকবার একটি বিশেষ ভঙ্গি আয়ত্ত করেন এবং পরবর্তীতে ঐটিরই পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। সুলতানের ক্ষেত্রেও এটিকে লৌকিক বৈশিষ্ট্য বলা যাবে না কেন? লোকচিত্রে মানুষ ও প্রাণীর যে আর্কিটাইপটি উদ্ভাবিত হয় দেখা যাবে বাস্তব থেকে সরে গেলেও তা ঐ বাস্তবতার একটি শক্তিশালী প্রতিরূপ নির্মাণ করে, যার নান্দনিক উৎকর্ষ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সুলতানের গরুর আর্কিটাইপটি বাংলাদেশেরই বটে তবে নান্দনিক বিবেচনায় তাকে খুব উর্ধ্বে স্থান দেওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়। মনে হয় একটি যথার্থ প্রতিরূপ উদ্ভাবনের ব্যাপারে এ ক্ষেত্রে তিনি ততটা মনোযোগ স্থাপন করেননি, যতটা করেছেন মানবমূর্তিতে। একই কথা বলা চলে তাঁর দৃশ্যপট রূপায়ণের ক্ষেত্রেও। আধুনিক প্রযুক্তির স্পর্শবিহীন তাঁর মানসলোকে প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ একটি পটভূমি পুনরাবৃত্ত হয় তাঁর ছবিতে। এটিও তাঁর বিশ্বাস ও স্বপ্নকে একটি একরৈখিক যথার্থতা দান করে বটে, কিন্তু মানবমূর্তির মত বাস্তব-অতিক্রমী চিরকালীনতার দ্যোতনা তারাও জাগাতে সমর্থ হয় না। এখানেও প্রত্যাশার একটি অপূর্ণতা থেকে যায়, মনে হয় শিল্পী পটভূমির নিসর্গ ও অন্যান্য বস্তুসমূহের প্রতি সমান একাগ্রতায় তুলি স্পর্শ করেননি।

সুলতানের চিত্রকর্মের মূল প্রাণশক্তি তার রেখা। প্রধানতঃ মানব ও প্রাণীমূর্তিতেই তাঁর রেখার স্বকীয়তা পরিদৃশ্যমান। এ রেখা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ও বর্তুলাকার, কোমল ও প্রবহমান নয়। ঠিক বাস্তবধর্মী নয়, অথচ প্রাতিষ্ঠানিক অনুশীলনের আভাস লেগে থাকে এর গায়ে। জয়নুল আবেদিনের মত একাডেমিক রেখাঙ্কনের অতটা ধার ঘেঁষে নয় এ রেখা, নন্দলালের মত ঐতিহ্যিক দরবারী রেখার অনুষঙ্গও এতে নেই, আবার যামিনী রায়, কামরুল হাসানের লোকাশ্রয়ী রেখা এ নয়। বরং একে বলা চলে শহুরে 'নাইভ' শিল্পের কাছাকাছি কিছু, আমাদের রিক্সা পেইন্টিং-এ যে ধরনটি দেখা যায়। সুলতানের অতিরঞ্জিত মানবশরীরগুলি তুলে নিলে বাকি যেটুকু থাকে তার সঙ্গে এই শহুরে নাইভ আর্টের তুলনা বোধ হয় চলতে পারে। তাঁর ঘরবাড়ী, গাছপালা, আকাশপ্রান্তর একটু খুঁটিয়ে লক্ষ করলে এ ধারণাটির সমর্থন মিলতেও পারে। সুলতান সচেতনভাবে এটি করেছেন বলে জানা নেই, তবে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অপূর্ণতা ও বিশ্বাসের একমুখীনতা যুক্ত হয়ে এমনটি ঘটতে পারে। এই আকাশপ্রান্তর বৃক্ষরাজি ও লোকালয়সমূহ চিরঅচঞ্চল 'আবহমান' বাংলাদেশের একটি ধারণা বটে, তবে মানবমূর্তিগুলির পাশাপাশি পটজুড়ে তারা সমান গুরুত্ব নিয়ে দাঁড়ায় না, কেবল ভরাট করে পরিসর। তাঁর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রেখার ব্যবহার এখানে নেই বললেই চলে।

তাঁর পুরুষমূর্তিগুলি মাইকেলএঞ্জেলোকে মনে করিয়ে দেয়। রেনেসাঁস যে মানবমাহাত্ম্যকে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিল তার একটি অন্যতম চেতনা ছিল বিজ্ঞানভিত্তি। মানব শরীরের সৌন্দর্যকে অস্থিসংস্থানবিদ্যার আলোকে গরীয়ানভাবে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন রেনেসাঁস শিল্পী, মাইকেলএঞ্জেলোতে যার পরম প্রকাশ। এখানে বাস্তবতা শিল্পের অন্যতম উপাদান। মানবশরীরের স্পর্শযোগ্য ত্রিমাত্রিকতা শিল্পীর অন্যতম উদ্দেশ্য। সুলতানের উদ্দেশ্য ভিন্ন। মানবাত্মার জয়ধ্বনি ঘোষণার প্রেরণাটি তিনি হয়তো অর্জন করেছেন রেনেসাঁস শিল্প থেকেই, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য বাস্তবতা নয়, বরং কর্মিষ্ঠ ভূমিসম্পৃক্ত আদি মানবের একটি প্রতীক অর্জন যা পরিপার্শ্বের ওপর ঘোষণা করবে তার সরব আবিষ্কার। তার এদেশীয় ভিত্তিটিও প্রকাশমান হবে জোরালোভাবে। তাঁর পুরুষ মূর্তিগুলি রেনেসাঁসের মত পরিশীলিত আদর্শ মানবশরীর নয়, তারা উদ্যত অসংস্কৃত ভূমিপুত্রের স্বদেশী চিরায়ত রূপ। এমনকি তাঁর নারীরাও কখনো কখনো অর্জন করে সে মাহাত্ম্য। তাদের ভঙ্গিমা ও চলনে ফুটে ওঠে আদিম স্থূলভাব। এসব ক্ষেত্রে সুলতানের সাফল্য অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

সুলতানের চিত্রকলার শক্তি ও ঘাটতিকে তবু তাঁর প্রান্তিকতার আলোকে ভেবে দেখা

যেতে পারে। শাহাদুজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎকারে তাঁর প্রান্তিক মানসের আনাচ কানাচ মোটামুটিভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর মানবপ্রেম, অন্ত্যজ মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, সেকুল্যার মানসিকতা বা আধ্যাত্মিক আকুতির পাশাপাশি শিল্পকলা, রাজনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য, রবীন্দ্র-নজরুল, হিন্দু-মুসলিম, পশুপাখি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে তিনি কথা বলেছেন। জীবন সম্পর্কে তাঁর মত বৈচিত্র্যময় সরাসরি অভিজ্ঞতা কম মানুষেরই আছে, জীবনের উত্তাল স্রোতে আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে তিনি শিখেছেন এর সূত্র। স্বাভাবিকভাবেই সব কিছু সম্পর্কে তৈরী হয়েছে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা ও মতামত। এগুলো চমৎকৃত করে, কৌতূহল উস্‌কে দেয়, ভাবায়ও বটে। রাজনীতি, ইতিহাস, ধর্মচেতনা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর মতামত এক সংবেদনশীল শিল্পীর নিজস্ব অনুভব হিসেবে মূল্যবান, মতপার্থক্য থাকলেও এখানে তাঁর সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু শিল্পকলা, যা তাঁর বিচরণক্ষেত্র, সেখানে তাঁর মতামতকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হয়। এক্ষেত্রে তাঁর মতামতের চমৎকারিত্ব বা নিজস্বতা সত্ত্বেও এটিও প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে এসব বিষয়ে তিনি ঠিক 'কন্টেম্পোরারী' নন। তিনি অনেক সত্য কথা নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করেছেন যা সমাজাশ্রিত কেউ অমন অকুণ্ঠভাবে বলবে না, কিন্তু তাঁর অনেক বক্তব্যই অতি-সরলীকরণ বা তথ্যের দীনতা থেকে উদ্ভূত। এক্ষেত্রে ভ্যান গঘের সাথে তাঁর একটি প্রতিতুলনা খাড়া করা যেতে পারে। সুলতানের মতই ভ্যান গঘ প্রধানত কাজ করেছেন গ্রামীণ অন্ত্যজ মানুষ ও পরিপার্শ্বকে নিয়ে, একই রকম সহানুভূতি ও সহমর্মিতা নিয়ে। জীবনাচারে চরম প্রান্তিক অবস্থান সত্ত্বেও ভ্যান গঘ সৃষ্টিশীলতার মাহেন্দ্র ক্ষণগুলিতে পরিচয় দিয়েছেন সর্বোচ্চ সংহতির। চরম মানসিক বৈকল্যের সময়ও তাঁর অঙ্কিত চিত্রগুলি উচ্চকিত আবেগের পাশাপাশি গঠন ও বিন্যাসেরও সর্বোচ্চ সংহতি বজায় রেখেছে। চিত্রের প্রতিটি অংশ সার্বিক কাঠামোর সমান অংশীদার, বর্ণচয়ন ও বর্ণলেপন নবতর বোধের ইঙ্গিতবহ এবং নির্মাণশৈলী সমকালীন চিত্ররীতিকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের দিকে চালিত। এটি সম্ভব হয়েছে সমকালের শিল্পকলা ও তার সমস্যা সম্পর্কে ভ্যান গঘের 'কন্টেম্পোরারী' জ্ঞান ও স্বচ্ছ ভাবনা দ্বারা। তাঁর পত্রগুচ্ছই এর সাক্ষাৎ প্রমাণ। পল গগ্যাঁ বা এমনকি রামকিঙ্করও যখন সমসাময়িক শিল্পকলা বিষয়ে কথা বলেন তখন তাঁদের বিশৃঙ্খল জীবনের আড়ালেও বিষয় সম্পর্কে তাঁদের সমসাময়িকতা ও স্পষ্ট ধারণার ইঙ্গিত মেলে। এক্ষেত্রে সুলতান কিছুটা থেকে যান ধোঁয়াটে ও অস্পষ্ট। ভ্যান গঘ-গগ্যাঁ-রামকিঙ্করের শিল্পসাধনার যে নিরবচ্ছিন্ন ধারা-বাহিকতা দেখা যায়, শত প্রতিকূলতার মধ্যেও যেভাবে তাঁরা সৃজনকর্মে সক্রিয় থাকেন সুলতানের মধ্যে তার

কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। জীবনের একটি পর্বে, প্রায় দু'যুগ সে পর্ব, তিনি কেন কোনো ছবি আঁকেননি বা আঁকার তাগিদ অনুভব করেননি তা পরিষ্কার নয়। আঁকতেই হবে এমন কথা নেই, তবে ঐ সময় তাঁর সৃজনবেদনার কোনো কষ্টকর অনুসন্ধানপর্বেরও প্রমাণ পাওয়া যায় না। জনৈক বিদেশীর প্রেরণা ও তাগাদায় তিনি আবার আঁকতে শুরু করেন, তাঁরই বয়ান এটি। এ দীর্ঘ বিচ্ছেদ হয়তো তাঁর ক্ষমতার মৃত্যু ঘটায়নি, কিন্তু সমসাময়িক শিল্পের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে ছিন্ন করেছে তাঁর যোগাযোগ। ফলে অসাধারণ ক্ষমতা ও স্বকীয়তা সত্ত্বেও তাঁর চিত্রকর্ম সাময়িক নির্মাণে কিছু অপূর্ণতার মধ্যে আটকে যায়। আরো একটি কারণ মনে হয় সমগ্র চিত্রপটকে সংহত করে সার্বিক ঐক্য নির্মাণে তাঁর মনোযোগের অভাব। মনুষ্যমূর্তিগুলিকে তিনি যে অভিনিবেশ ও অঙ্গীকার দিয়ে রূপায়িত করেন পটভূমির অন্যান্য কিছুর বেলায় তার প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করেননা। স্বতস্ফূর্ত আবেগ তাঁকে যতটুকু নিয়ে যায় ততটুকু অভিনিবেশই তিনি দেন, বাকিটুকু রূপায়িত করেন অভ্যাসের সাহায্যে। এর ফলে তারতম্যটুকু ঘটে যায়। আরো একটি কথা। মহৎ স্রষ্টা মাত্রই আপনাকে আপনি অতিক্রম করার একটি লড়াইয়ে প্রবৃত্ত থাকেন, সর্বদাই নিজের সৃষ্টিকর্মকে উত্তরিত করতে চান নবতর স্তরে। কেউ কেউ অবশ্য বাঁধা পড়ে যান আত্মতৃপ্তির কিংবা বাণিজ্যিক সাফল্যের মোহে। যেমনটি ঘটেছিল যামিনী রায়ের ক্ষেত্রে। এতে শিল্পীর গৌরবও বাঁধা পড়ে ক্ষুদ্র গন্ডির সীমানায়। ১৯৭৬ সালে সুলতানের একক প্রদর্শনী দারুণভাবে সফল হয়েছিল। সেখানে তিনি যা এঁকেছিলেন পরবর্তী দু'যুগে তা থেকে উত্তরণের কোনো তীব্র প্রয়াস তাঁর মধ্যে দেখা গেছে বলে মনে হয় না। তাঁর পরবর্তী অনেক চিত্রই পুনরাবৃত্তিতে মলিন। এখানে তাঁর প্রান্তিকতা ও সৃজনশীলতার মধ্যে সংহতির ক্ষেত্রে কোথাও কোনো ফাটল বোধহয় রয়ে যায়।

পাঁচ

চিত্রশিল্পী এস. এম. সুলতানের কাছ থেকে প্রাপ্তিকে তবু শেষ বিচারে কোনক্রমেই খাটো করে দেখা যাবে না। ইতিহাসের তুলাদণ্ড তাঁকে শিল্পকলার ইতিহাস-অট্টালিকার কোন কুঠুরিতে স্থান দেবে তা এখনই নিঃসংশয়ে বলা সম্ভব নয়। তবে এটুকু বোধ হয় নিশ্চিতভাবে উচ্চারণ করা সম্ভব যে বাংলাদেশের শিল্প-ইতিহাস সুলতানকে বাদ দিয়ে রচিত হবে না। বাঙালির ইতিহাস ও মৃত্তিকাগন্ধময় ঐতিহ্যের মর্মমূল চিত্রশিল্পে তাঁর মত দীপ্রভাষায় রূপায়িত করেছেন কম শিল্পীই। যুগযুগান্তরের ঘাম-শ্রমের গন্ধমাখা কর্মিষ্ঠ বাঙালি কিষাণের প্রাণভোমরাকে আবিষ্কার করেছেন তিনি, বহুকালপ্রবাহী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অস্তিত্বের নীরবতা ভেঙে তাদের

প্রাণশক্তি ও অধিকারের সরব জয়ধ্বনি তিনি ঘোষণা করেছেন। এই সততা, এই সহমর্মিতা, এই মানবতাবোধ, এই প্রাণের টান, এই আপন মৃত্তিকায় প্রোথিত জীবন-বিশ্বাস আমাদের সমীহ আদায় করবেই। আমাদের শিল্পকলা যখন জীবন ও মানবভূমি পরিত্যাগ করে কৃৎকৌশল ও হৃদগগণের অলীকলোকে উন্মার্গগামী হবার প্রলোভনে টলটলায়মান তখন সুলতানের শিল্পকর্ম তাকে টেনে রাখে শেকড়ের দিকে, উপড়ে ভেসে যেতে দেয় না। তাঁর এই গুরুত্ব হয়তো ভবিষ্যতে কখনো অনুভূত হবে।

আরো কিছু শেষ কথা তবু বাকি থাকে। সুলতানের প্রান্তিকতাই তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত করেছে ব্যতিক্রমী প্রত্যয় ও শিল্পধারা, এ যেমন সত্য, তেমনি সত্য বোধ হয় এও যে এ প্রান্তিক বিচ্ছিন্নতার শৃঙ্খলাবিহীনতার মধ্যে বাস করেও ভ্যান গঘ, গগ্যাঁ বা রামকিঙ্কর শিল্পের যে সংহতি, উত্তরণ ও সমকালচেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন সুলতানের শিল্পকলায় তাঁর কিছু ঊনতা থেকে যায়। মহত্তম শিল্পে যে পরিপূর্ণতা ও সমগ্রতার ঐকতান নির্মিত হয়, কালের নির্দিষ্টতা অতিক্রম করে চিরায়তের যে ঘণ্টাধ্বনি বেজে ওঠে, তাঁর চিত্রমালা সাধারণের উর্ধ্বে বিপুল সম্ভাবনার প্রত্যয় সঞ্চারিত করেও সে সম্পূর্ণতায় সংহতি লাভ করে না। তাঁর প্রান্তিকতাই তাঁর শক্তি যেমন একদিকে, তাঁর অপূর্ণতারও কারণ বোধ হয় সেটিই।

তবে কি এস. এম. সুলতান কক্ষচ্যুত নক্ষত্র এক? তাঁর শিল্প কি কালোত্তীর্ণের প্রবেশদ্বারে কড়া নাড়তে গিয়ে থমকে গেল শেষে? যে প্রান্তিকতা তাঁকে জীবনের প্রাত্যহিকতা থেকে উপড়ে ফেলে স্থাপন করেছে বিশ্বমানবের মর্মলোকে সে প্রান্তিকতাই কি তাঁকে বঞ্চিত করেছে শিল্পের অনুপুঙ্খ জ্যামিতি ও সমকাল-মানসের স্পর্শ থেকে? এসবের সরাসরি জবাব দেবার সময় এখনো আসেনি, মহাকালের কষ্টিপাথরে নির্ণিত হবে তাঁর স্থায়ীত্বের পরিমাপ। যে নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব ও নিরাসক্তি এর জন্য প্রয়োজন তার নিমিত্তে হয়তো অপেক্ষা করতে হবে আরো।



সুলতানের স্মৃতি

রফিকুল আলম

কিংবদন্তীর নায়ক ছিলেন সুলতান। তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী শুনেছিলাম ১৯৬৫-এর দিকে, যখন চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হই। নিজের চোখে তাঁকে দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। স্বপ্নের চোখে অনেক কিছুই কল্পনা করে নিতাম। সুলতানকে সেই রেনেসাঁস আমলের কোনো মহান শিল্পীর মত ভেবে নিতাম। অধ্যয়ন কালেও বিভিন্ন সময়ে আর্ট কলেজে তাঁর সম্বন্ধে বহু গল্প-কাহিনী শুনেছি। এর মধ্যে কিছু কিছু হয়তো অতিরঞ্জন ছিল। আমাদের বছর তিনেকের সিনিয়ার শিল্পী যশোরের রফিউদ্দিন আহমেদ-এর কাছ থেকেও শুনেছি অনেক কাহিনী। রফিউদ্দিন ভাই ছিলেন একজন স্মার্ট ও ফিটফাট ছাত্র। পড়তেন গ্রাফিক ডিজাইনে। বাবা ডাক্তার, আর্থিক টানাপোড়েন ছিল না। অধিকন্তু সেই আমলে যখন ছাত্ররা পার্টটাইম কমার্শিয়াল কাজ প্রায় পেতই না, তখন তিনি কলেজ ছুটির পর চলে যেতেন একটা ফার্মে। ফিরতেন রাত নটা দশটা নাগাদ। হোস্টেলে আমি থাকতাম দশ নম্বর কক্ষে। তাঁরটা ছিল ন'নম্বর। এসেই সোজা ঢুকে পড়তেন আমাদের ঘরে। সিগারেট ধরিয়ে করতেন নানা গল্প। আমাদের কক্ষে তাঁর আসার অন্যতম আকর্ষণ ছিল তাঁর সহপাঠী বন্ধু মুন্সী মহিউদ্দিন। দুজনের বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়।

রফি ভাই-এর কাছে শুনেছি যে সুলতান সাহেব তাঁদের বাসায় ছিলেন এক সময়ে। একটা ছবি আঁকার স্কুলও করেছিলেন তাঁদের বাড়ীতে। ছোট ছেলেমেয়েদের ছবি

আঁকা শেখাতেন। রফি ভাই-এর ছবি আঁকার হাতে খড়িও তাঁর কাছে। শুনেছি ছবি আঁকা শেখাতে গিয়ে রেখা, রঙ আর ছন্দের ব্যাখ্যা দিতে দিতে নিজেই নাচতে শুরু করতেন। অর্থাৎ শিল্পের প্রতিটি শাখার মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য আছে তাকে ব্যাখ্যা করতেন। আর সে অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। এ প্রসঙ্গে *বিষ্ণুধর্মোত্তর* গ্রন্থে বলা হয়েছে শিল্পকলা জীবনের উদ্দেশ্যকে পূর্ণতা দানে সহায়তা করে আর সে জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মোক্ষলাভ। এক রাজা ও সন্ন্যাসীর মধ্যকার কথোপকথনের মাধ্যমে এখানে শিল্পকলার উদ্দেশ্যে ও সংজ্ঞা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া যাবে। এক রাজা শিল্পের অর্থ জানতে গেলেন এক সন্ন্যাসীর কাছে। সন্ন্যাসী তাঁকে (রাজাকে) প্রথমে নাচের সূত্রসমূহ জানতে নির্দেশ করলেন। রাজা এতে রাজী হয়ে নৃত্যকলা শিখতে শুরু করলেন। রাজা বুঝলেন নৃত্যের সাথে শিল্পকলার অন্যান্য শাখাসমূহের সাদৃশ্য বিদ্যমান। নাচ শেখার পর তিনি আবার সন্ন্যাসীর কাছে গেলেন। তিনি তখন সংগীত ও চিত্রকলা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের উপদেশ দিলেন। কারণ, শিল্পকলার সমস্ত শাখা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ না করলে স্থান-কালের সম্পর্ক (Time-Space Relation) অনুধাবন করা যাবে না এবং জীবনের পরম উদ্দেশ্য মোক্ষলাভও সম্ভবপর হবে না। সুলতান সেই মোক্ষলাভে ব্রতী ছিলেন।

রফি ভাই সুলতানের আঁকা একটা রাফ্ স্কেচ দেখিয়েছিলেন। মাউন্ট বোর্ডের খস্খসে পিঠে 6-B পেন্সিলে আঁকা। প্রথম বর্ষে পড়ার সময় তিনি সুলতান সাহেবকে পার্সপেকটিভ সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিতে বলায় তিনি স্কেচটি এঁকে দেখিয়েছিলেন। পার্সপেকটিভ হচ্ছে শিল্পকলা শিক্ষার একটি অপরিহার্য বিষয় এবং বিষয়টি নিরসও বটে। কাছের ও দূরের জিনিষকে কিভাবে আঁকতে হয় তারই নিয়ম কানুন। ওপর থেকে দেখা একটি গ্রামের দৃশ্যকে এঁকেছেন সুলতান। গাঢ় কালো পেন্সিলে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে আঁকা ছবিটি। এত বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী যে পেন্সিলের চাপে মোটা বোর্ডটি গর্ত হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। কাছ থেকে দেখলে বেশ শক্ত (hard) লাগে। অথচ কিছুটা দূর থেকে দেখলে অদ্ভুত সুন্দর। প্রায় তিরিশ বছর আগে দেখা সুলতানের সেই স্কেচটি আজও আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভাসে। রফি ভাই অতি যত্ন করে সেটি তাঁর স্টিলের ট্রাঙ্কে একেবারে তলায় রাখতেন।

আমার ধারণা সুলতানের যৌবন বয়সে আঁকা ছবিগুলোর অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। সেই সময়কার ছবিগুলো সত্যিই ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। তাঁর গ্রামে বসবাসের কারণে সাধারণ মুদির দোকানদার, চায়ের বা ময়রার দোকানে বসে আঁকা স্কেচগুলোর হদিস আজকে পাওয়া সত্যিই মুশকিল। আজীবন দারিদ্র্যের মধ্যে কেটে যাওয়া তাঁর যৌবন

ও প্রৌঢ় জীবনে এক আধ পেটা খাবারের বিনিময়েও ছবি এঁকে দিয়েছেন সাধারণ হোটেলওয়ালা বা দোকানীকে।

সুলতান সাহেবকে প্রথম দেখবার সুযোগ হয় আমার ১৯৭৬ সালে। আমি তখন খুলনা শিক্ষক-প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের চারুকলার প্রভাষক। নতুন চাকরি। শিল্পকলা একাডেমী সেবার ঢাকার বাইরে অবস্থানরত শিল্পীদের ঢাকায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রদর্শনী উপলক্ষে। আমিও এসেছিলাম। সেমিনার একটি ছিল। তাতে শিল্পীদের পরিচয় পর্বও ছিল। সেই অনুষ্ঠানে সামনের সারিতে বাবরি চুলওয়ালা কালো আলখাল্লাধারী এক ভদ্রলোককে বসে থাকতে দেখলাম চুপচাপ। এক মনে পাইপ টেনে চলেছেন। শিল্পী কামরুল হাসান পরিচয় করিয়ে দিলেন শিল্পী সুলতানকে। সেই আমার প্রথম দেখা সুলতান। তখন শীত শেষ হয়ে এসেছে মনে পড়ে। বসন্তকাল, আমাদের কারও গায়ে গরম কাপড় নেই। কিন্তু লক্ষ্য করলাম সুলতানের গায়ে ফুলহাতা সোয়েটারের ওপর গরম কাপড়ের ওভারকোট সদৃশ আলখাল্লা, পায়ে জুতো ও পশমী মোজা। তার গরম লাগছিল বলে মনে হয় নি আমার। খুব সাচ্ছন্দেই ঘোরাফিরা করছিলেন। এটা দেখে একটা কথাই মনে হল আর তা হল সুফি দার্শনিকদের কথা। তাঁরা 'সুফ' বা কম্বল গায়ে দিতেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহের শক্তি বা এনার্জিকে ধরে রাখা। আমাদের দেহের অভ্যন্তরে যে তাপ উৎপাদিত হয় তা বাইরে বেরিয়ে যায়। এ জাতীয় কাপড় পরে তাপ বা এনার্জি সংরক্ষণ করা এবং তাপ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা এবং সম্ভব হলে উপবাস করা। তিব্বতে প্রচন্ড শীতে লামা সন্ন্যাসীরা প্রাণায়ামের মাধ্যমে অধিক অক্সিজেন গ্রহণ করে শরীরকে শীত থেকে রক্ষা করেন। কারণ সেখানে শরীরকে উষ্ণ রাখার মত পর্যাপ্ত খাদ্যের বড়ই অভাব। তাই এই সন্ন্যাসীরা শুধুমাত্র অক্সিজেন গ্রহণ করেই শরীরের তাপ রক্ষা করে থাকেন।

সুলতানের জীবন বড়ই বিচিত্র। বহু দেশ-বিদেশ তিনি ঘুরেছেন সন্ন্যাসীর বেশে। প্রকৃতি আর মানুষকে দেখেছেন অত্যন্ত কাছ থেকে। হিন্দু ও বৌদ্ধদের তান্ত্রিক সাধনা তিনি করেছেন বলে জানা যায়। এ ব্যাপারে আমি একটু বলতে চাই : আমারও যোগ সাধনায় আগ্রহ ছিল। ছাত্র জীবন থেকেই জ্যোতিষশাস্ত্র ও যোগ নিয়ে কিছু পড়াশুনা করেছি। একবার সুলতান চারুকলা ইনস্টিটিউটে আসেন। ঢাকায় 'কারুকৃৎ'-এর স্বত্বাধিকারী শিল্পী রশীদ আহমেদ (প্রয়াত)-এর দেয়া মধ্যাহ্ন ভোজটি হল চারুকলা ইনস্টিটিউটের তখনকার নতুন ভবন—এখনকার গ্রাফিক ডিজাইন ভবনে। সুলতান সাহেবের আগমন আমাকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছিল। প্রথম থেকেই লক্ষ্য

করছিলাম তাঁর চলাফেরা খাওয়া-দাওয়া। কক্ষের এক পাশে অত্যন্ত অল্প পরিমাণ খাবার খুব আস্তে আস্তে খাচ্ছিলেন। অত্যন্ত সংযমী খাওয়া। বেশ গরম পড়ে গিয়েছিল। তার মধ্যেও তাকে পশমী কাপড় আর আলখাল্লায় একটুও ঘামতে দেখি নি। খাওয়া দাওয়ার পর ভবনের উত্তর পাশে গাছতলায় এলেন এবং একটি চেয়ারে বসলেন। আমিই প্রথম কথা বলার সুযোগ খুঁজছিলাম। প্রথমেই প্রশ্ন করলাম 'আপনি কি যোগসাধনা করেন?' উত্তরটা হুবহু উদ্ধৃত করতে পারছি না। তবে, উত্তরটা অনেকটা এরকম। 'ওসব করে এখন শিব হয়ে বসে আছি।' তাঁর এই 'শিব' হয়ে বসে থাকা'র অর্থ কি তা আর জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় নি। তবে একটা কথা আমার মনে দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে মনে যে তিনি এক সময়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন এবং সম্ভবতঃ সেই পথে তাঁর কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসে নি। বিফল হয়ে ফিরে এসেছিলেন সাধারণের মাঝে। জীবনের গভীরতম অন্তরালে তাঁর পদচারণা নিসন্দেহে ছিল, তা না হলে একজন মানুষ এত প্রচন্ড শক্তি নিয়ে তুলি ধরতে পারেন না। পারেন না পার্থিব লোভ-লালসা থেকে নিরাসক্ত থাকতে ; খ্যাতি, বিত্ত অর্থ থেকে সব সময়ই নির্লিপ্ত ও নিস্পৃহ থাকতে।

খুলনা আর্ট কলেজটির আমিই ছিলাম প্রথম অধ্যক্ষ। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের প্রথম প্রদর্শনীতে তাঁকে প্রধান অতিথি করে এনেছিলাম। একটা ছবি এঁকে উদ্বোধন করলেন। তাঁকে আনতে পারায় আমি অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছিলাম। তাঁর দাঁত প্রায় সব ক'টিই পড়ে গিয়েছিল। আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম মাংস প্রেশার কুকারে খুব নরম করে রাঁধতে। প্রথমে আমার বাসায় খাওয়া দাওয়া করে কলেজে আসবেন। 'সব দাঁত পড়ে গেল?' জিজ্ঞেস করতে একজনের কথা বললেন যে তিনি তাঁর দাঁতগুলো বাঁধিয়ে দেবেন বলে ভালো দাঁতগুলোও উঠিয়ে ফেলেছিলেন ডেন্টিস্টের কাছে নিয়ে। কিন্তু বাঁধিয়ে আর দেন নি। বাকী জীবনটা তাঁর দাঁতবিহীন অবস্থাতেই কাটাতে হয়েছিল। এগুলো বলতে তাঁকে একটুও কষ্ট পেতে দেখি নি।

প্রদর্শনী শেষে সার্কিট হাউসে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু সেখানে থাকতে চাইলেন না। চলে গেলেন কমার্স কলেজের ইংরেজির শিক্ষক অসিত বরণ ঘোষের বাসায়। অসিত বাবু বিজ্ঞজন। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে বরাবরই জড়িত। তাঁর স্ত্রী ভারতী ঘোষ খুলনার সঙ্গীত জগতে সুপরিচিত। আমার পরিচয় তাঁদের সাথে সঙ্গীতের কারণে। অসিত বাবুর সাথে সুলতান সাহেবের পরিচয় বহু দিনের। বেশ সকালে অসিত বাবুর বাসায় গেলাম নাস্তা করে। কিন্তু আবারও নাস্তা করতে হল তাঁদের সাথে। অসিত বাবু সুলতানের বহু আগে আঁকা কিছু ছবি বের করলেন তাঁর

সংগ্রহ থেকে। খুব যত্ন করে রেখেছিলেন ওগুলো। সুলতান সাহেবের উপস্থিতিতেই অসিত বাবু তাঁর (সুলতানের) অনেক গুণগান করছিলেন। এতে সুলতান সাহেব কিছুটা লজ্জা পাচ্ছিলেন। অসিত বাবুর কাছে আবারো জানলাম সুলতান কত ভালো নাচতে পারতেন। একবার তিনি নাচ অভ্যেস করবেন বলে তাঁকে ঘরে ডেকে দরোজা-জানালা বন্ধ করে হারমনিয়াম বাজাতে বললেন। হারমনিয়াম বাজতে থাকলো আর সুলতান নাচতে শুরু করলেন। অসিত বললেন তিনি যে এত ভালো নাচতে জানেন তা কিন্তু সবাই জানে না। সুলতানের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো।

আর একটি স্মৃতি আমার হয়তো সারাজীবন মনে থাকবে। নড়াইল গেলাম খুলনা থেকে। আমার সহকর্মী খুলনা আর্ট কলেজের প্রভাষক বিমানেশ বিশ্বাসের বাড়ীও নড়াইল। প্রতি বৃহস্পতিবার বাড়ী যায়। শনিবার এসে কলেজ করে। পরিবার পরিজন থাকে দেশের বাড়ীতে। ছোটবেলা থেকেই সুলতান সাহেবের প্রিয়ভাজন শিষ্য। সুলতানের কাছেই তার ভিত্তি শিক্ষা। বিমানেশ তার কথামত যথাস্থানে ছিল। নড়াইলে সেটা আমার প্রথম যাওয়া। এরপর আর সময় সুযোগ ঘটেনি যাবার জন্য। আমার আর এক ছাত্র আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের বড় ভাই সেখানে মুন্সেফ। সেও মাঝে মাঝে সেখানে যায়, তার বাড়ি অবশ্য কুষ্টিয়ায়। তারও আমন্ত্রণ ছিল যাবার জন্য। আমার উদ্দেশ্য কিন্তু সুলতান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করা। রাত্রিটা মামুনদের বাসায় ছিলাম। অনেক যত্ন পেয়েছিলাম। আমার টেপ-রেকর্ডারটি নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁর কথাবার্তা রেকর্ড করবো বলে। যাইহোক যাবার পর যথারীতি নাস্তা এবং দুপুরের খাওয়া। গোপনে তাঁর কথা রেকর্ড করা শুরু করলাম। কিন্তু টের পেয়ে কিছুটা সচেতন হয়ে পড়লেন। টেপটি এখনও আছে। কিন্তু শব্দ উদ্ধার করা কঠিন।

চিত্রা নদীর তীরে জমিদারবাড়ি সংলগ্ন জায়গায় সরকারের করে দেওয়া ছোটখাট বাগান আর শ্যামলিমায় ঘেরা তাঁর বাসস্থান। খুব ভালো লাগলো। ফুলের বাগান করেছেন। সেখানে এক চিলতে রাস্তা এবং তারপর শান বাঁধানো বসার জায়গা। শান বাঁধানোটি তাঁর পছন্দ হয় নি। বললেন সুরকি দিয়ে এটি করলে আরো ভালো হত, মাটির সাথে সামঞ্জস্য থাকতো, সবুজ বাগানে সুরকির রঙ বড়ই মানানসই হত। আর গরমও কম লাগতো।

তিন কামরার বাড়ী। বেশ বড় শয়নকক্ষটি পোষ্যদের থাকার। খাবার ঘরে টেবিল পাতা, ক'খানা চেয়ার। বই-এর আলমারি, তাতে বেশ মোটামোটা আর্টের বই। বেশীর ভাগই মনে হল ইউরোপীয় বই এবং ইংরেজীতে লেখা। ছোট্ট বসার ঘরটিতে একটি সিঙ্গল খাট। একটি সোফাসেট। এ ঘরেই তিনি ঘুমোন। সামনে বারান্দা। বিরাট

একটি টুল বারান্দায় রাখা। শেকল দিয়ে বাঁধা হনুমান। নাম সম্ভবত মন্টু। তার সাথে কথা বলেন। বেড়াল, মুরগি, খরগোশ, কুকুরসহ বহু জীবজন্তু। এদেরকে তিনি তাঁর সন্তান বলতেন।

মজার ব্যাপারটি ঘটলো দুপুরে খাবার সময়। ভাত, মাছ, ডাল, শবজির নানা তরকারী। মাছ ভাজা ছিল মনে হয়। খাবার আগে বললেন 'ওদের' কিছু না খাইয়ে আমি কখনো খেতে বসি না। 'ওদের' দেখার জন্য তাঁর পিছু নিলাম। পেছনের খোলা উঠোনে চলে গেলেন। হাতে ভাতের থালা। 'আয় আয়' বলে ডাকতেই অসংখ্য কাক ও পাখি এসে তাঁর চারদিকে ভিড় করে ডাকাডাকি করতে লাগলো। কয়েকটি তার পিঠে মাথায় বসলো। হাত দিয়ে সরিয়ে দিলেন। বললেন 'যা যা'। খাবার ছিটালেন। পাখিরা ভাত খাওয়া শুরু করে দিল। তারপর হনুমানকে খাওয়াতে বললেন। ঝকঝকে কাঁসার বাটিতে দেয়া হল খাবার। অবশেষে আমরা খেতে বসলাম। সাথে বিমানেশও ছিল। খেতে খেতে অনেক কথা হল। আমার কৌতূহল থেকে দু' একটা প্রশ্ন করলাম। খেতে খেতে উত্তর দিলেন।

প্রশ্ন ছিল শিল্পকলা, ধর্ম আর আধ্যাত্মিকতা নিয়ে। নানা কথার মাঝে স্বীকার করলেন যে তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা না থাকলেও মরমীবাদ (Mysticism) আছে। আগে অনেক কাহিনী শুনেছি, তিনি সাপ নিয়ে বসবাস করেন। এটি স্বয়ং রফি ভাইও বলেছিলেন। সে কথায় পরে আসছি। জিজ্ঞেস করলাম সাপের মন্ত্র জানেন? সরাসরি উত্তর 'সাপের কোন মন্ত্র নেই'। তা হলে কি করে সাপকে পোষ মানান? হেসে বললেন যে 'সবটাই কনফিডেন্স'। আরো বললেন যে সাপ মানুষকে ভয় পায়। তারও অনুভূতি আছে, বুদ্ধি আছে। সে যদি মনে করে আপনি তাকে মারবেন না, তাহলে সেও আপনাকে কামড়াবে না। সুলতান সাপকে সেই অভয় দেবার ক্ষমতা রাখতেন। পশুপাখি সরীসৃপের কথা বুঝতে পারতেন, তাই তারাও অসীম নির্ভরতায় তাঁর কোলে বসে থাকতে পারতো। অনেকের কাছেই শুনেছি যে তিনি রাস্তা থেকে মৃতপ্রায় কুকুর বা বেড়ালের ছানা কুড়িয়ে আনতেন। পরম যত্নে আদরে বাঁচিয়ে তুলতেন সেই সব অবহেলিত প্রাণীদের। বন্য প্রাণীর প্রতি অসীম ক্ষমতা ছিল তাঁর বিরল চরিত্রের অন্যতম আকর্ষণ।

বেনারসে গবেষণা করতে গিয়েছিলাম ১৯৭৯ সালে সরকারী বৃত্তি নিয়ে। সোনারগাঁ যাদুঘরের গবেষণা অফিসার সাইফুদ্দিন চৌধুরী এলেন বেনারসে। এখন তিনি ডক্টর সাইফুদ্দিন চৌধুরী। রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়ামের পরিচালক। আমার সাথে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল।

এক সময় সুলতান সাহেব সোনারগাঁতে ছিলেন। সরকার তাঁকে নাকি একটা বাড়ি দিয়েছিল থাকার জন্য। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি থাকেন নি। অনেক গোলমাল এবং শেষ পর্যন্ত মামলা-মোকদ্দমাও নাকি হয়। আবার ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় জন্মভূমি নড়াইলের মাটিতে। প্রচন্ড ভালবাসতেন তিনি নড়াইলকে। দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো এই বোহেমিয়ান শিল্পী শেষ পর্যন্ত তাঁর মাতৃক্রোড়েই আশ্রয় নিয়ে জীবনের শেষ বছরগুলো কাটিয়ে গিয়েছেন সেটা আমরা সবাই জানি।

ড. সাইফুদ্দিন সুলতানের একটি গল্প বললেন আমাকে। তাঁর বয়ানেই সেটি শোনা যাক : "একদিন সুলতান বললেন চলুন মাছ ধরতে যাই। সাইফুদ্দিন সাথে গেলেন। সোনারগাঁয়ে অনেক পুকুর। জাল ফেলা হল। মাছ শেষ পর্যন্ত মিলল না, মিলল একটি কচ্ছপের বাচ্চা। ওটাকে নিয়ে আসলেন বাসায়। আদরযত্ন শুরু হল তাঁর চিরকালের অভ্যাস মত। একদিন গভীর রাতে সাইফুদ্দিনের ঘুম ভেঙে গেল কে যেন দরোজার কড়া নাড়ছে। মৃদু অথচ ভরাট গম্ভীর গলায় আওয়াজ : সাইফুদ্দিন একটু উঠুন। সাইফুদ্দিন বুঝলেন সুলতান সাহেব। এত রাতে! কোন বিপদ হয় নি তো? কোলে সেই কচ্ছপের বাচ্চাটি। বললেন, 'চলুন ওকে ওর মায়ের কাছে দিয়ে আসি। ওর মা ওর জন্যে কাঁদছে'। ড. সাইফুদ্দিনকে সেই গভীর রাতে বনবাদাড় ডিঙিয়ে যেতে হল সেই নির্দিষ্ট পুকুরের পাড়ে যেখান থেকে কচ্ছপের বাচ্চাটি আনা হয়েছিল। ওটাকে পানিতে ছেড়ে দিলেন সুলতান। দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। এ ঘটনা থেকে একটা জিনিষই প্রতীয়মান হয় যে তার মধ্যে এক ধরনের খ্যাপামি ছিল, খেয়ালিপনা ছিল। আবার এটাও মনে হয়, অশ্রুত কান্না বা শব্দ শোনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ও নিশ্চয়ই ছিল।"

যশোরের রফি ভাই-এর কাছ থেকে আর একটা মজার গল্প শুনেছিলাম। যশোর কলেজের একজন অধ্যাপক ছিলেন কাশেম সাহেব। অকৃতদার এই অধ্যাপক ছিলেন সুলতান সাহেবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন। মাঝে মাঝে সুলতান কাশেম সাহেবের বাড়িতে থাকতেন।

এক পূর্ণিমার রাতে কাশেম সাহেব এবং সুলতান এক বিছানায় শুয়ে আছেন। হঠাৎ কাশেম সাহেবের ঘুম ভেঙে যায়। যা দেখলেন তাতে প্রচন্ড ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠলেন। দেখেন পাশে শায়িত সুলতানের বুকের ওপর একটি গোখরো সাপ। হাত দিয়ে আদর করছেন। জানালা দিয়ে আসা জ্যোৎস্নার আলোয় সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। চিৎকার করে উঠাতে সুলতান অভয় দিলেন, কোন ভয় নেই।

আমি তখন খুলনা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ। আর্থিক অনটন আর অনিশ্চয়তার মধ্যে

দিয়ে একটি কলেজকে প্রতিষ্ঠা করছি তখন। সাহায্য সহযোগিতাও যেমন পেয়েছি, বাধা-বিপত্তি এবং নিজের আর্থিক অনটনকে সঙ্গী করে টিকে থাকার চেষ্টা করছি। একটি পর্যায়ে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ি। অত্যন্ত স্বল্প বেতনের চাকুরি। গিন্নি মাস্টারি করে সাহায্য করে। তবুও চলে না। বাড়ীর সম্পত্তি বিক্রি করে করে বাড়তি খরচের সামাল দিই। এটা তো কেউ জানে না। ঠিক করলাম চলে যাব। এত ত্যাগ স্বীকার করে কি হবে? স্বীকৃতিটাও হয়তো শেষ পর্যন্ত পাব না। অবশ্য জেলা ও বিভাগীয় প্রশাসনের পুরো সহযোগিতা ও নিরাপত্তা ছিল। কারণ আমার প্রতি তাঁদের সবার ছিল অগাধ বিশ্বাস আর ওটাই ছিল আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া। তবুও চলে যাব ঠিক করলাম। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই সিদ্ধান্তটি আমার স্ত্রী ছাড়া কাউকে বলি নি। কিন্তু একটি ঘটনা আমাকে চমকে দিয়েছিল। সেটাই এখন বলব।

শরীরটা অত ভালো ছিল না ঐদিন। তারিখটাও সঠিক মনে করা মুশকিল। কলেজে যাই নি। বাসাতেই বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। বেলা চারটা নাগাদ আমার ছাত্র হাবিব এসে খবর দিল সুলতান সাহেব এসেছেন কলেজে। আপনি আসুন। ছাত্র যেতে না বললেও যেতাম। কারণ এই বৃদ্ধ মানুষটি বিনা নোটিসে হঠাৎ খুলনায়। প্রতি সপ্তাহেই নড়াইল থেকে কলেজের শিক্ষক বিমানেশ আসে, ছাত্র আসে। খবর তো দিতে পারতেন। একটা রিক্সা নিয়ে প্রচন্ড এক আকর্ষণে ছুটলাম কলেজের দিকে। সুলতান সাহেব এসেছেন এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া। আমি তখন দোলখোলা বাজারের কাছে একটা ছোট্ট বাসায় থাকি। পরিবারও ছোট। এক পুত্র তখন। গল্লামারিতে কলেজ। এখন যেখানে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। আমি চলে আসার পর কলেজকে স্থানান্তরিত করে দেয়া হয়েছে। এর আগে উল্লেখ করেছি যে কলেজের প্রথম বার্ষিক প্রদর্শনীতে তাঁকে প্রধান অতিথি করে এনেছিলাম। জায়গাটি তাঁর খুব ভাল লেগেছিল বোধহয়, তাই চলে এলেন হঠাৎ। শিল্পী কামরুল হাসানও জায়গাটা খুব পছন্দ করেছিলেন। আমিনুল ইসলাম সহ অনেক গুণিজনই গিয়েছিলেন।

কলেজের কাছাকাছি যেতেই দেখি কালো আলখাল্লা আর কালো প্যান্ট, জুতো, মোজা পায়ে ঋজু ভঙ্গিতে তিনি আসছেন। তখন কলেজ ছুটির সময়। পেছনে ছাত্র-শিক্ষকের মিছিল মনে হল তাঁকে, হ্যামিলনের সেই বংশীবাদক। পেছনে সব শিল্পী শিক্ষক আর ছাত্রছাত্রী। গেটের কাছে ততক্ষণ চলে এসেছি। রিক্সা কাছে আসতেই নেমে শুভেচ্ছা বিনিময়। আমার শারীরিক অবস্থার কথা জানলেন। হাত দিয়ে আমার মুখের ওপর পড়া একটা কুটো নিজের হাতে তুলে নিলেন। বললাম, 'রিক্সায় উঠুন। বাসায় চলুন।' বেশ কয়েক কিলোমিটারের পথ আমার বাসা। কথা বলতে বলতে

চলেছি। হঠাৎ আস্তে করে বলে উঠলেন, 'এখন যেয়েন না'। আমি চমকে উঠলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায়?' তিনি বললেন, 'যেখানে মনস্থির করেছেন, সেখানে'। আমি যে 'মনস্থির' করেছি চলে যাব, তা আমি ও আমার স্ত্রী এবং অন্তর্যামী ছাড়া তো কেউ জানে না। কারণ, কলেজের গভর্ণিং বডি আমাকে ছাড়বে না আমি জানি। তাই ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি হলে পদত্যাগ করবো। তারা তো আটকাতে পারবেন না। কারণ, আমি কোন বণ্ড সই করে চাকুরিতে ঢুকিনি। এখনও আমাকে সেদিনের সেই স্মৃতি ভাবায়। অবাক করে। কি করে তিনি জানলেন। আরো বললেন, 'আরো কিছুদিন থাকুন, আরো একটু গড়ে দিয়ে যান।' তাঁর কথাই শেষ পর্যন্ত ফলেছিল। আরো অনেকদিন ছিলাম। সেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমার ইন্টারভিউ লেটারে বিঃ দ্রঃ দিয়ে লিখলো নিয়োগকৃত কর্মকর্তার অনুমোদন নিয়ে ইন্টারভিউ দিতে হবে। সেটা তো না নিয়েই উপাচার্যের সাথে কথা বলে দরখাস্ত করেছিলাম। আর যাওয়া হয় নি। পরে ওখানকার এক বন্ধু খুব রাগ করে আমাকে ফোন করলো। কেন আসলে না? কারণটি বললাম কর্তৃপক্ষের চিঠির কথা। উত্তরে বলল ওটার জন্য আটকাতো না। যাইহোক, যাওয়া হয় নি সেটাই সত্যি। তাঁর কথা মত 'আরো কিছুদিন থাকুন'-ই শেষ পর্যন্ত সত্যি হল। তার পরেও অনেকদিন ছিলাম। কয়েক বছর পর ঢাকায় চলে আসি।

খুলনা মহেশ্বর পাশা আর্ট স্কুলের উপর ভিত্তি করেই আর্ট কলেজ-টি গড়ে ওঠে। ১৯০৪ সালে রায় বাহাদুর শশীভূষণ পাল এটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে বর্তমান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে সেখানে স্থানান্তরিত হয়। আর্ট স্কুলের জনাব আলাউদ্দিন আহমদ ছিলেন অধ্যক্ষ। বন্ধ হয়ে যাওয়া আর্ট স্কুলটিকে তিনি প্রচণ্ড মায়ায় আগলে রেখেছিলেন। ১৯৬৪ বা '৬৫-তে তৎকালীন অধ্যক্ষ সুরেন পালের দেশ ত্যাগের সময় তাঁকে (তার ছাত্র) দেখাশোনার ভার দিয়ে ভারতে চলে যান।

আর্ট কলেজ করার সময় খুলনায় আমার থাকবার সমস্যা হয়। আলাউদ্দিন সাহেব তাঁর বাড়ীতে থাকার আহবান জানালেন। রাজি হলাম তাঁর আন্তরিকতায়। সাধ্যমত খাতির যত্ন করতেন তিনি ও তাঁর পরিবারের সবাই। অনেকটা পেয়িং গেস্টের মতই ক' মাস থাকতে হয়েছিল। তারপর মহেশ্বর পাশাতে ছোট্ট বাসা নিয়ে চলে আসি। আলাউদ্দিন সাহেব সম্বন্ধে এত বলতে হল এই জন্য যে শিল্পী সুলতান তাঁর খুব ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। বহুবার খুলনার এই আর্ট স্কুলে এসেছেন। তাঁর কাছে থেকেছেন পরম আত্মীয়ের মত।

আলাউদ্দিন সাহেবের বয়ান : সুলতান সাহেব নড়াইল থেকে খুলনা এসেছেন।

আলাউদ্দিন সাহেবের বাড়িতে অতিথি। রাত্রি যাপন শেষে খুলনার জেলা প্রশাসকের কাছে যাবার এপয়েন্টমেন্ট পরদিন সকালে। আলাউদ্দিন সাহেব তাঁকে তাগাদা দিচ্ছেন তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন। তিনি বের হতে চাইলেন না। বললেন, 'ভালো লাগছে না। একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি রাতে।' আলাউদ্দিন বিরক্ত হলেন। বললেন, 'স্বপ্ন দেখেছেন তো কি হয়েছে? চলুন।' সুলতান কিছুতেই যেতে চাইলেন না। 'সব গুঁড়িয়ে ভেঙে দিচ্ছে, ... মানুষ মরবে ... খুব খারাপ সময় ...' ইত্যাদি বলেছেন। কিছুক্ষণ পর খবর হল রাষ্ট্রপতি জিয়া নিহত হয়েছেন চট্টগ্রামে। দেশে এক থমথমে অবস্থা। ডিসি সাহেবের কাছে তখন যাবার তো প্রশ্নই আসে না। এই ধরনের অলৌকিকতা নিয়ে আরো অনেক গল্প কাহিনী ছড়িয়ে আছে নড়াইল-যশোর, খুলনা-কুষ্টিয়া অঞ্চলে। আর একটি কথা বলেই এ প্রসঙ্গটি শেষ করতে চাই। কাহিনীটি বলেছিল আর্ট কলেজের শিক্ষক বিমানেশ বিশ্বাস। আগেই উল্লেখ করেছি সে সুলতান সাহেবের খুব ঘনিষ্ঠ স্নেহভাজন শিষ্য। সে তো তাকে "ওস্তাদ" বলেই সম্বোধন করত। বিমানেশের বিবরণ :

একবার যশোর থেকে নড়াইল যাবেন সুলতান। রাত হয়ে গেছে। শেষ বাস। তাই যাত্রীর ভিড় খুব বেশী। সবাই বাসে জায়গা করার জন্য ধাক্কাধাক্কি করছে। বিভিন্ন বাসযাত্রী টানার প্রতযোগিতায় ব্যস্ত। বসার জায়গা পাবার আশ্বাস পেয়ে সুলতান সাহেব উঠলেন। সাথে বিমানেশ। তাঁকে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসতে দিল তারা। বাস ছাড়বার আগ মুহূর্তে তাঁকে আবার উঠতে বলা হল। কারণ একজন মহিলা যাত্রী উঠেছে। তাই সীট ছাড়তে হবে। কণ্ডাকটর বলল, 'এই বুড়ো ওঠো।' সুলতান ক্ষেপে গেলেন এবং খ্যাপাই স্বাভাবিক। কারণ তারাই তাঁকে সিট দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঐ নির্দিষ্ট আসনে বসতে দেয়। বলে রাখি যে বৃহত্তর যশোর এবং আশেপাশের জেলাগুলোতে সুলতান সাহেবকে বহু লোক চেনে। কণ্ডাকটর তাকে চিনতো না। তাই একজন সাধারণ লোক ভেবে এ রকমটি করছিল। কিন্তু সুলতান ক্ষিপ্ত হলেন যে একজন বৃদ্ধের সাথে সে এ ব্যবহার করছে। যাইহোক, বাসের মধ্যে হৈ চৈ। সুলতানের সাথে এ রকম আচরণ যাত্রীরা সহ্য করবে না। অনেকেই কণ্ডাকটরকে মারতে উদ্যোত হল। সুলতান বাধা দিলেন। বিমানেশকে বললেন চল, দেখি অন্য বাসে জায়গা পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু তাঁরা নেমে দেখলেন পরের বাসটিতেও জায়গা নেই। কারণ শেষ বাসে ভীড় হয় অত্যন্ত বেশী। শেষে অনেক বেশী খরচ করে তাঁরা বেবী ট্যাক্সি দিয়ে নড়াইল যাত্রা করলেন। বাসের অনেক আগেই তাঁরা নড়াইল পৌছুলেন। বিমানেশ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়েছিল, নেমেই স্থানীয় তরুণদের ঘটনা বলতেই সবাই সেই বাসটিকে ধরার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

ওস্তাদের সাথে বেয়াদবি এবং এ ধরনের আচরণ তারা কেউই সহ্য করবে না। কণ্ডাকটরকে মারবে তারা। সুলতান অনেক নিষেধ করলেন। কিন্তু সেই স্থানের এক রেস্তোরাঁয় তাঁকে বসে থাকতে হল। শীতের রাত ক্রমেই ঠাণ্ডা বাড়ছে। রাস্তার লোক চলাচল কমে আসছে। সুলতান বারবার তাদের বললেন, 'বাড়ী যা, এ সব দরকার নেই।' তরুণরা নাছোড়বান্দা। বিমানেশও কিছু করতে পারছে না। মারমুখী তরুণের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। বিমানেশকেও থাকতে হবে। কারণ বাস ও কণ্ডাকটরকে চেনাতে হবে। বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকলো সবাই। বাস আর আসে না। অবশেষে সুলতান বললেন, 'ঐ বাস আর কোনদিনই আসবে না, তোরা বাড়ি যা।' পরে খবর আসলো গাড়িটি আসবার পথে একটি গাছের সাথে ধাক্কা খেয়েছে এবং সুলতান যে সিটে বসেছিলেন (এবং তাঁকে উঠিয়ে দেওয়া হয়) সেই অংশ ভেঙে উড়ে গেছে। এই ঘটনাকে কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু সুলতান ভক্তদের বিশ্বাস অন্য রকম। এটাকে তারা সুলতানের অভিশাপ বলেই বিশ্বাস করেন। কারণ, যখন তাকে নেমে যেতে বলা হচ্ছিল তখন তিনি অত্যন্ত কষ্ট পান এবং ক্ষেপে যান। যেটা সচরাচর দেখা যেত না। আর একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হল তিনি যে সিটটিতে বসেছিলেন সেটি বাসের পিছনের দিকের এক পাশে ছিল (মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত) সেই অংশটিই গুঁড়িয়ে যায়। চলন্ত গাড়িটি সামনে ধাক্কা খায় রাস্তার পাশের গাছের সাথে আর ভাঙে পেছনের অংশ।

সুলতানের সাথে বাঁশীর সম্পর্ক ছিল বড় নিবিড়। বাঁশী বাজাতে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। তাঁর আলখাল্লার ভিতরে রাখা অনেক পকেটের ভেতর সাপ ও বাঁশী পাশপাশি থাকত বলে শোনা গেছে। গভীর রাতে আপন মনে যখন তিনি বাঁশী বাজাতেন, যারা (শুনেছে তাদের মতে) তখন সুর, প্রকৃতি এবং পরিবেশ একাকার হয়ে যেত। সে আর এক সম্মোহনী বাঁশী।

প্রকৃতির সন্তান ছিলেন সুলতান। প্রকৃতি আর আবহাওয়াকে অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে শিল্পী রফিকুন নবীর বলা তাঁর ছাত্রজীবনের একটি ঘটনা তিনি আমাদের বলেছিলেন আমাদের ছাত্র অবস্থায়। তখন তিনি আমাদের তরুণ শিক্ষক। সুলতান সম্বন্ধে তাঁর বলা বিবরণ :

তিনি তখন আর্ট কলেজে পড়েন। ভালো জলরঙ করেন। সুলতানও ভালো জলরঙ আঁকিয়ে হিসেবে খ্যাত। একদিন সুলতানের সাথে কলেজের গেটে দেখা। কলেজ ছুটি হয়ে গেছে। নবী স্যারের হাতে সদ্য আঁকা একটি জলরঙ ছবি। সুলতান দেখতে চাইলেন ; তিনি দেখালেন। কাজটা সুলতানের খুব ভালো লাগলো বলেই তাঁর (নবী

স্যারের) মনে হয়েছিল। পাবলিক লাইব্রেরীর (বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী) দিকে হাঁটতে হাঁটতে কথা হচ্ছিল। সুলতান বলে উঠলেন, 'এখুনি বৃষ্টি নামবে'। এই বলে ছবিটি গোল করে পেঁচিয়ে পরম যত্নে তাঁর আলখাল্লার মধ্যে আড়াল করলেন। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আর্ট কলেজের গেট থেকে লাইব্রেরীর দূরত্ব মাত্র কয়েকশ' গজ। এত তাড়াতাড়ি বৃষ্টি আসবে নবী স্যার বুঝতে পারেন নি সেদিন। তিনি বলেছিলেন সুলতান আকাশ, মেঘ আর বৃষ্টি এত স্টাডি করেছেন যে হঠাৎ বৃষ্টির আগমন বার্তা তিনি এত সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন।

আর্ট কলেজে পড়ার সময় আমাদের লাইব্রেরীতে একটা বই পেয়েছিলাম *Art in Pakistan* নামের। লেখক প্রকাশক কারোরই নাম মনে নেই। তবে বইটি করাচি কিংবা লাহোর থেকে পঞ্চাশের দশকের দিকে প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে পড়ে। তাতে একটা মজার জিনিষ মনে পড়ে। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পীদের জীবন ও পরিচিতি দেওয়া আছে। তাতে জয়নুল আবেদিন প্রমুখের নাম পূর্ব পাকিস্তান অংশে আছে আর সুলতানকে পশ্চিম পাকিস্তানের অংশে পশ্চিম পাকিস্তানী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পড়ার পর বুঝলাম ইনি আমাদেরই সুলতান। তাতে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর আঁকা কিছু ছবি। তার মধ্যে বিখ্যাত 'কাশ্মীরে শরৎকাল' (Autumn in Kashmir) অন্যতম। লেখক সুলতানের আলোচনার শুরুতে যা লিখেছিলেন তা তিরিশ বছর পরে এখনও আমার মনে আছে — Perhaps the most promising artist in Pakistan is Sultan. পশ্চিম পাকিস্তানীরা সুলতানকে তাঁদের নিজেদের শিল্পী বলে গর্ব করতো। সুলতান বহুদিন পাকিস্তানে (পশ্চিম) ছিলেন। সেখানকার প্রখ্যাত চিত্রকার সাদেকাইন তাঁর শিষ্য। আমি বেনারসে থাকতে (১৯৭৯-'৮২) সাদেকাইন সেখানে এসেছিলেন এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘর ভারত কলাভবনে তাঁর প্রদর্শনী হয়েছিল। প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেছিলেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও বেনারসের রাজা মহোদয়। ২০'×১০'-এর একটি বিশাল তেল-রং ছবিতে আমি একই সাথে সুলতান ও পিকাসোর প্রভাব লক্ষ্য করেছিলাম। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় এই দু' শিল্পীকে যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন।

এটা অনেকেই জানেন যে সুলতান নামটি শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর দেওয়া। তাঁর আসল নাম হচ্ছে লাল মিয়া। তাঁর শিল্পী হওয়া এবং একজন রুচিশীল শিক্ষিত মানুষ হবার পেছনে শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর অবদান সবচেয়ে বেশী। তিনিই তাঁকে কলকাতা গভঃ আর্ট কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ীতে থেকেই

সুলতানের চারুপাঠ শুরু। সোহরাওয়ার্দীর মূল্যবান গ্রন্থাগারে ছিল সুলতানের অবাধ প্রবেশাধিকার যা সুলতানকে নিয়ে গিয়েছিল জ্ঞান ভাণ্ডারের বেশ গভীর তলদেশে। এ ছাড়া তাঁর অমায়িক ইউরোপীয় আচরণ, ইংরেজী, উর্দু-হিন্দুস্থানীসহ আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর জ্ঞান, শীতল অথচ বুদ্ধিদীপ্ত সম্মোহনী বক্তৃতা সবই সেখান থেকে পাওয়া। দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এই জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে আরো দৃঢ়মূল করেছিল।

আধুনিক যুগের একজন মানুষ হয়েও সুলতান গ্রাম বাংলার মোহকে কখনই ছাড়তে পারেন নি। গ্রামের অতি সাধারণ কৃষক, জেলে, কামার-কুমার, তাঁতী এদের সাথেই ছিল তাঁর প্রাণের সখ্য। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই ছিল তাঁর পরম আত্মীয়জন। দেখেছি অনেক সাধারণ হিন্দু তাঁকে 'গোসাঁই' বলে সম্বোধন করছে। সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমান তাঁকে একজন 'দরবেশ' বা পীরের মতই ভাবতো। কিন্তু, কোনো ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে পালন করতেন কিনা আমার জানা নেই। অত্যন্ত উদার ও সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন একজন 'সেক্যুলার' ব্যক্তি। আবার ধর্মের মূলতত্ত্ব তাঁর অজানা ছিল না যা একটি ঘটনা দ্বারা বুঝতে পারা যায়। ঘটনাটি বিমানেশ আমাকে বলেছিল :

একদিন এক ধর্মপ্রাণ (?) ব্যক্তি তাঁর কাছে এলেন হেদায়েত করতে। ভদ্রলোক দেশের একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। বললেন, 'সুলতান ভাই বয়স তো অনেক হল, এখন একটু নামাজ কালাম করেন' ইত্যাদি। সুলতান তাঁকে প্রশ্ন করলেন 'নামাজ কয় ওক্ত?' ভদ্রলোক উত্তর দিলেন পাঁচ ওয়াক্ত। সুলতান আবার প্রশ্ন করলেন, আর কোনো 'ওক্ত' নেই? ভদ্রলোক আরো ২/৩টি ওয়াক্তের কথা বললেন। সুলতান আরও প্রশ্ন করলেন, 'আর নেই'? ভদ্রলোক বললেন 'জানি না।' সুলতান রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'যার চব্বিশ ঘন্টাই ওক্ত তাকে ওক্ত শিখাতে এসো না।' আগে 'ওক্ত' কটি জেনে এসো। ভদ্রলোক পালিয়ে বাঁচলেন।

নড়াইলে আমার প্রথম ও শেষ ভ্রমণের অবস্থান ছিল দু' দিনের। প্রথম দিন সারাটা সময় কেটেছে তাঁর সান্নিধ্যে। আমাকে নিয়ে 'বিনা নদী' পার হয়ে ওপারের গাঁয়ে নিয়ে গেলেন। অনভ্যাস এবং পায়ের অসুস্থতার জন্য আমি উঁচু পাড় দিয়ে উঠতে পারছিলাম না। তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে তুললেন। তাঁর হাতের স্পর্শে ধন্য হলাম। গ্রামের বিভিন্ন বাড়ির আঙিনা দিয়ে যেতে থাকলাম। সবার সাথেই কুশল বিনিময়। এক কৃষক পরিবারে বসতে হল। বড় আদর যত্ন করলো তারা। গাছ থেকে ডাব পেড়ে খাওয়ালো। কোনো একটা পূজা হচ্ছিল। পূজা-মণ্ডপগুলোও ঘুরে দেখা হল। ছোট ছোট শিশুদের তিনি আদর করছিলেন। শিশুদের প্রতি তাঁর ছিল অসীম

ভালবাসা। নিজের কোনো সন্তান তাঁর ছিল না। তাই সব সন্তানদেরকেই তিনি নিজের সন্তানের মত দেখতেন এবং তাদের জন্য কিছু একটা করার কথা ভাবতেন। শিশুদের জন্যেই সুলতান বোধ হয় সবচেয়ে বেশী উকণ্ঠিত ছিলেন। কারণ, তিনি বলতেন এরাই দেশের ভবিষ্যৎ বংশধর। এরাই ভবিষ্যতের শিল্পী। তাই ছোটবেলা থেকেই এদের মধ্যে সৌন্দর্য চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে, তবেই এরা ভবিষ্যতে সৎ, সুন্দর এবং নান্দনিক জীবনের অধিকারী হবে। তিনি আরো বললেন শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে আর তাদের স্কুলে আনার জন্য দুপুরে একটু খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ, এরা খেতে পায় না। খাবারের লোভ দিয়ে স্কুলে আনতে হবে। একই সাথে চলবে সাধারণ শিক্ষা ও ছবি আঁকা। স্বতঃস্ফূর্ত আঁকাজোঁকার মধ্যে দিয়ে তাদের মাঝে গড়ে উঠবে সৃজনশীলতা তা সে যে-কোন ক্ষেত্রেই হোক। একজন শিশু সে স্থপতি, ভাস্কর, প্রকৌশলী, ডাক্তার, প্রশাসক বা শিল্পী যাই হোক না কেন শিল্পকলার শিক্ষা তাকে একজন সৃষ্টিশীল, রুচিবান এবং কল্পনাশক্তির অধিকারী করে তৈরী করবে। ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের মত দেশে শিল্প শিক্ষা বাধ্যতামূলক বলে সেখানকার মানুষেরা সবাই মোটামুটি রুচিশীল ও সৃষ্টিশীল হয়ে গড়ে উঠে সারা বিশ্বে অবদান রেখেছে। আমাদেরকেও সেই পথে এগুতে হবে। এই স্বপ্নকে সামনে রেখে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর প্রাণপ্রিয় 'শিশু স্বর্গ'। আমাকেও বলেছিলেন খুলনা আর্ট কলেজের সাথে এ ধরনের কিছু একটা করতে। আমি সেটা করে আসতে পারি নি। এটা আমার ব্যর্থতা। সুলতান সাহেবের জীবনে আর একটা স্বপ্ন ছিল যা তিনি আমার নড়াইলে অবস্থানকালে বলেছিলেন। একটা বিশাল নৌকা তৈরী করাবেন। তাতে শিল্পীদের (শতাধিক) নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে সফর করা হবে। শিল্পীরা নিজের হাতে দাঁড় বাইবে। নদীর খোলা বাতাস আর দাঁড় বাওয়াতে তাদের শরীরও ভালো হবে। যেহেতু বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই নদী বা তার শাখা প্রশাখা আছে তাই দেশের প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাওয়া সম্ভব হবে। নৌকার মধ্যে সবার বসবাস, স্নান, আহার, বিশ্রাম সবই চলবে। চলবে আলোচনা, গান, আবৃত্তি আর শিল্প সমালোচনা। স্থানে স্থানে নৌকা ভিড়বে। শিল্পীরা ছবি আঁকতে বেরিয়ে পড়বেন। কয়েকদিন অবস্থান করে আবার নতুন গন্তব্যে যাত্রা। দেশকে ভালো করে দেখা এবং সবাই একটি বিশাল পরিবারের মত হয়ে শিল্পচর্চার এক অদ্ভুত স্বপ্ন তিনি লালন করেছেন আমৃত্যু।

সুলতানের শিল্পকর্ম সম্বন্ধে এখানে বিশেষ আলোচনা করতে চাই না। কারণটা শুরুতেই বলেছি। তবে, তাঁর সমগ্র কাজের মধ্যে বাংলাদেশের আপামর কৃষক সমাজ প্রতিফলিত। তাঁর শিল্পকলায় এদেশের মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। কারণ, 'মাটির' খুব

কাছকাছি ছিল তাঁর অবস্থান। জয়নুল এদেশের দুর্ভিক্ষ আর বুভুক্ষু মানুষকে উপস্থাপন করেছেন। কামরুল বাংলার আবহমান লোক-ঐতিহ্যকে লালন ও ধারণ করেছেন আর সুলতান বাংলার বুভুক্ষু মানুষের কাছে এক অনাগত সম্পদশালী শক্তিমান জাতির স্বপ্ন রচনা করেছেন।

এ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে সারা পৃথিবী যখন পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে উদ্বিগ্ন, তখন আমাদের সামনে ভেসে ওঠে তাঁর বিখ্যাত ছবি 'প্রথম রোপন' (The First Plantation) আদম মাটির পৃথিবীতে এসে প্রথম বৃক্ষ রোপণ করছেন। বাদামি শরীরের প্রচণ্ড শক্তিশালী এক মানুষ। তার দেহ এই মাটির সাথে দৃঢ়বদ্ধ। মাটি আর দেহের রঙ একাকার। ওপরে 'কিউপিড', যা রেনেসাঁস চিত্রকলায় আমরা দেখেছি। আদমের চোখে এক সম্মোহনী দৃষ্টি। কী দেখছেন আদম? অনেক কথা কিন্তু এই ঈষৎ বাঁকা চোখে! সুলতান এ চিত্রের মাধ্যমে তাঁর সারা জীবনের অনুভব, মাটি ও দেশ আত্মস্থ করে ধর্ম ও ইতিহাস মিশ্রিত করে নির্মাণ করেছেন অত্যন্ত আবেদনময়ী এই শক্তিশালী চিত্র।



মৎস্য শিকার তেল রং ১৯৭৬



শিল্পী সুলতান এশিয়ার কণ্ঠস্বর

হাসান হাফিজ

'আমাদের এখন জীবনকে ভালোবাসা দরকার। জীবনকে ভালোবাসতে গিয়ে যদি কৃষকের ছবি না আঁকতে চাই, কোনো অসুবিধা নেই। সিটি, এরাউন্ড ঢাকাকে কেন্দ্র করে অনেক কিছু আঁকা যেতে পারে। তা না করে যদি আমি শুধু হরাইজন্টাল, ভার্টিকাল, সার্কল এগুলো দিয়ে স্পেসকে ব্যালান্স করতে থাকি, তাহলে তা ডিজাইন ছাড়া বেশী কিছু হবে না। অনেকের আবার টেকনিক্যাল মাস্টারি নাই বলে এসব করে। এসব কম্পোজিশন এমন কোনো বড় ব্যাপার নয়। এসব পেইন্টিং-এর সাথে জীবনের মহৎ কোনো আদর্শের সম্পর্ক নেই। আমি বোধহয় এরকম ছবি প্রতিদিনই অনেকগুলো আঁকতে পারি। আমাদের সাধারণ মানুষের সাথেও এ ধরনের ছবির কোনো সম্পর্ক নাই। তারা এসব ছবির কিছুই বুঝতে পারে না। তাদের মধ্যে কোনো ফিলিং সৃষ্টি করে না। শিল্পীদের যদি জিজ্ঞাসা করেন, এটা কী এঁকেছেন, একটু বুঝিয়ে দেন তো ভাই। তো তারা বলবে, না ভাই এ তো বোঝানো সম্ভব না। ওটা আমার স্বপ্নের মধ্যে আসে, একটা ভাব হয়, ঐ ভাবের মধ্যে আমি আঁকি। বোঝাতে পারে না, পারবে না তো। কারণ, ওটার সাথে তার মনের কোনো সম্পর্ক নেই, বানানো।'

কথাগুলো শিল্পী এস. এম. সুলতানের। জীবনমন্থন করে বিচিত্র ও বহুমুখী অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়েছিল তাঁর শিল্পীমানস। প্রকৃতি ও মানুষ ছিল শিল্পের বিষয়।

জীবনাচরণেও তিনি ছিলেন মৃত্তিকা ও মানবের সঙ্গে লগ্ন, অচ্ছেদ্য সেই বন্ধন। বড়ো মাপের শিল্পী সুলতান মানুষ হিসাবেও ছিলেন বড়ো মাপের। ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ মনের মানুষের দাপটে বর্তমানের সমাজ সংসার ক্লান্ত, বিব্রত সেখানে সুলতানের মত মহৎ হৃদয় কমিটেড শিল্পীর কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে বার বার। সে যাওয়া উৎসের কাছেই ফিরে যাওয়া। ঐতিহ্যের শেকড় সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন সুলতান, নিছক শিল্পচর্চা করেই জীবন কাটিয়ে দেননি। কঠিন এক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়, সে দায়িত্ব ভবিষ্যতের সুন্দর নাগরিক গড়ে তোলার। তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন 'শিশু স্বর্গ' শিশুদের শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এরকম সাংগঠনিক গুরুভার বর্তমান বাংলাদেশের অন্য কোনো শিল্পীই কাঁধে তুলে নেননি।

আশ্চর্য এক স্বাপ্নিক ছিলেন শিল্পী এস.এম. সুলতান—দেশ বিদেশে বহু ভ্রমণ, নানা ধর্ম-বর্ণ ও ভাষার মানুষের সংস্পর্শে আসার অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্পচৈতন্যে ছিল সর্বদা জাগরুক। অকৃতদার সুলতান উপলব্ধি করেছিলেন আপন মৃত্তিকা ও মানুষই মূল ঠিকানা, মূল উদ্দিষ্ট। নাগরিক খ্যাতি, যশ, প্রাপ্তি-প্রতিষ্ঠা অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি থিতু হয়েছিলেন নড়াইলের গন্ডগ্রামে। কঠিন সংকল্প না থাকলে এমনটি করা সম্ভব নয়। সারল্য ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। এর বিশ্বস্ত প্রতিফলন ও উদ্ভাস তাঁর শিল্পকর্মেও আমরা দেখতে পাই।

তাঁর ছবিতে সহজ সাচ্ছন্দে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে ওঠে মহিমান্বিত কৃষক, মুটে মজুর, জেলে, গ্রামীণ রমণী। রূপবতী লাবণ্যময় প্রকৃতি তার রঙ, রূপ, সুষমা ও দৃষ্টিনন্দন দীপ্তি নিয়ে উদ্ভাসিত। ছবির বিষয়ের জন্য সুলতানকে বাইরে হাত পাততে হয়নি। শাশ্বত বাংলাদেশের সনাতন জীবনপ্রবাহকে তিনি মূর্ত করে তুলেছেন রঙ রেখা বিন্যাস ও উপস্থাপনাশৈলীর আশ্চর্য দক্ষতায়। ছবিতে বিশালদেহী পেশল মানুষের সপ্রাণ উপস্থিতি প্রসঙ্গে শিল্পীর নিজস্ব বক্তব্য অত্যন্ত জোরালো। তাঁর নিজের ভাষায় '... মানুষকে আমি খুব বড় করে এঁকেছি, কর্মী হিসাবে, কাজের মানুষ হিসাবে এঁকেছি। আমি সেসব মানুষ এঁকেছি যারা অনবরত busy after work. ১৯৭৬-এর ছবিগুলোতে হয়তো নতুন অনেক ব্যাপার এসেছে। তবে আমি সব সময় কৃষকদের এঁকেছি, কৃষকরা যুগ যুগ ধরে অমানবিক পরিশ্রম করে চলেছে। ওদের উপজীব্য করেই সমাজটা গড়ে উঠেছে। কিন্তু ওদের চিরকালই betray করা হয়েছে। বৃটিশরা করেছে, পাকিস্তানীরা করেছে। '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের অনেক আশা দেয়া হয়েছিল কিন্তু they were betrayed. এই যে একটা exploitation process আমার ছবিগুলো তার প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ। শোষণ কর,

কোনো মশা এদের খেয়ে শেষ করতে পারবে না, বৃটিশরা করেছে, পাকিস্তানীরা লুটেপুটে খেয়েছে। এখনও চলছে। কিন্তু ওরা অমিতশক্তিধর। কৃষককে ওরা কখনো শেষ করতে পারবে না, আমার কৃষক এ রকম।'

শিল্পী সুলতানের ৭০তম জন্মবার্ষিকীতে (১০ আগস্ট ১৯৯৪) ঢাকার নড়াইল যুব পরিষদ একটি স্মরণিকা বের করে। সেখানে প্রকাশিত শাহাদুজ্জামানের লেখা 'সুলতানের সাথে আলাপ'- এ শিল্পীর অনেক ভাবনা বক্তব্য সম্পর্কে জানা যায়। ইউরোপ, আমেরিকা ঘুরেছেন শিল্পী সুলতান। সেসব জায়গায় তাঁর প্রতিভা স্বীকৃত, সম্মানিত হয়েছে যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও ভিনদেশের মাটি ও মানুষ সুলতানকে আকৃষ্ট করেনি। তিনি ফিরে এসেছেন নিজের মাটিতে, আপনজনদের পরিসরে। শাহাদুজ্জামানকে সুলতান বলেছেন, '....হ্যাঁ, আমি ভেবেচিন্তেই ফিরে এলাম। ফিরে যে আসব সে চিন্তা আমার সব সময়ই ছিল। ওখানে থাকবার ইচ্ছা আমার কখনোই ছিল না। ওটা তো আমার কাজের জায়গা না। বাচ্চাদের স্কুল নিয়ে আমার নানা রকম চিন্তা ছিল। বাচ্চাদের এবং গ্রামের সাধারণ মানুষদের মধ্যে সৌন্দর্য চেতনা গড়ে উঠবে এ রকম একটা ভিন্ন ধরনের ইনস্টিটিউশন করার ইচ্ছা আমার ছিল। আমাদের সাধারণ মানুষকে বৃটিশ শোষণ করেছে, পাকিস্তান শোষণ করেছে এখন বাংলাদেশের লোকেরা করছে, কিন্তু ঐ মানুষগুলোর দিকে কেউ কখনোই নজর দেয়নি। ওরা হাই লিভিং করতে না পারুক ডিসেন্ট লিভিং করতে শিখুক। থাইল্যান্ডে দেখেছি, ইন্দোনেশিয়াতেও দেখা যায় যত গরীব ঘরই হোক, বাড়িতে আর কিছু না থাকুক, ফুল বাগান আছে। এসব ব্যাপার আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি, তাদের এ্যাসথেটিক সেন্স যেমন দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তেমনি নষ্ট করে দেয়াও হচ্ছে। এসব নানা রকম ভাবনা থেকে দেশে চলে এলাম। দেখুন এদেশের চারণ কবিরা কোনো ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা করেনি, স্কুল কলেজে যায়নি, অথচ এরাই কত চমৎকার সাহিত্যের জন্ম দিয়েছে। পরবর্তীকালে মানুষ শিক্ষিত হয়েছে, সেসব সাহিত্যের ধারাবাহিকতাতেই আরো উন্নত, শিল্পসম্মত সাহিত্য সৃষ্টি করেছে।

বাঙালী জাতি তার অভিব্যক্তির জন্য উন্নত ভাষা খুঁজে পেয়েছে। তাই যদি হয় বাঙালী তবে তার রেখা খুঁজে পাবে না কেন? বাঙালীর মনে স্বতঃস্ফূর্ত যে রেখা রয়েছে, তাকে উদ্ধার করতে হবে। সেটাকে ধারাবাহিকভাবে ডেভেলপ করতে হবে। তাছাড়া পেইন্টিং ব্যবসায়ীদের হাতে জিম্মি হয়ে আছে, ড্রয়িং রুম ডেকোরেট করছে, এ থেকে পেইন্টিংকে মুক্ত করতে হবে। সাধারণ মানুষ তাদের প্রয়োজনে তাদের মতো করে ছবি আঁকবে।

এইসব ভাবনা নিয়ে আমি নড়াইল চলে আসি। আমার নিজের গ্রাম থেকে কাজ শুরু করার চিন্তা করি। এখানে এসে প্রথমে একটা প্রাইমারী স্কুল করি, পাশে নন্দনকানন নামে ফাইন আর্টসের স্কুল খুলি। সেখানে সাধারণ গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরা পড়তে আসত, পরবর্তীতে সেটাকে হাইস্কুলে পরিণত করেছিলাম। এরপর যশোরে "একাডেমী অব ফাইন আর্টস" করলাম, আরো পরে সোনারগাঁওতে করেছিলাম।'

জন্মবার্ষিকী সংকলনে পুনর্মুদ্রিত আহমদ ছফার লেখাটির নাম 'সুলতানের সাধনা'। আহমদ ছফা লিখেছেন '... সুলতানকে বাংলার প্রকৃতিতে বাংলার ইতিহাসে এবং বাংলার মানুষের শ্রম, ঘাম, সংঘাতের ভেতরে সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করার জন্য পাড়ি দিতে হয়েছে দুস্তর পথ। পেরিয়ে আসতে হয়েছে সাধনার অনেকগুলো স্তর এবং শিল্পী জীবনের সমান্তরাল যে অগ্রগতি তাও কম বিস্ময়কর নয়। আপন অন্তরস্থিত সৌন্দর্যবোধ, নিসর্গ, ইতিহাস এবং জীবন শ্রমশীল মানুষের মধ্যে চারিয়ে দিয়ে ক্যানভাসে সবকিছু মূর্ত করে তোলা—এর সবটুকু তাঁর একক শৈল্পিক প্রয়াসের ফলশ্রুতি নয়। তার জন্য এই সুপ্রাচীন দেশটিকে সাম্প্রতিককালে একটি রক্তক্ষয়ী



গ্রামের খাল তেল রং ১৯৭৬

জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে ঘোষণা করতে হয়েছে। একটি উদ্ভিদ সমতুল ঘুমন্ত জাতির প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে, প্রতিটি সামাজিক স্তরের মানব সাধারণের ভেতর বন্দুকের আওয়াজে, কামানের হুঙ্কারে যে জাগরণ এসেছে, যা তাদের সম্মিলিত সৃষ্টিশক্তির তেজ উপলব্ধি করিয়ে ছেড়েছে, তার প্রয়োজন অপরিহার্য ছিল। ইনকুবেটর যন্ত্রের তাপে ডিমের খোলস ফেটে যেমন করে মুরগীর বাচ্চা প্রাণ পেয়ে বেরিয়ে আসে, তেমনিভাবে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের উত্তাপে শিল্পীর অন্তর চিরে এ সকল ছবি বেরিয়ে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের সবটুকু আবেগ, সবটুকু জীবনোল্লাস, সবটুকু স্পর্ধা এবং দুঃসাহস এই ছবিগুলো ধরে রেখেছে। এ রকম একটি প্রলয়ংকরী ঘটনা না ঘটলে সুলতানের তুলি কস্মিনকালেও এ রকম আশ্চর্য ছবি প্রসব করতে সক্ষম হতো না। যতো প্রতিভাই তাঁর থাকুক, কিষাণ-জীবনের প্রতি তাঁর অনুরাগ-মমতা যতই নিবিড় গভীর হোক না কেন, বাঙালী জাতির ঐতিহাসিক সংগ্রামের একেবারে অন্তস্থল থেকেই এ সকল চিত্রের উদ্ভব। এ কারণে এ ছবিগুলো দর্শকের মনেও প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসবোধ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম। হয়তো দর্শক সচেতনভাবে অনুভব করতে পারেন না, কিন্তু অন্তরালে এই বোধ ক্রিয়াশীল থাকে ঠিকই...'।

নিজের দেশ বাংলাদেশে যশস্বী শিল্পী এস.এম. সুলতানের চিত্র প্রদর্শনী হয়েছে অল্পই। ১৯৮৭ সালে তাঁর একটি প্রদর্শনীর প্রধান উদ্যোক্তা ছিল ঢাকার গ্যেটে ইনস্টিটিউট (জার্মান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান)। ইনস্টিটিউটের তৎকালীন কর্মাধ্যক্ষ পিটার সেভিৎজ লিখেছেন, 'এই উপমহাদেশের গুটিকয়েক অসামান্য শিল্পীর মধ্যে সবচেয়ে জাঁকালো শিল্পী সুলতান। তিনি এশিয়ার কণ্ঠস্বর। সুলতানের শক্তির উৎস তাঁর টিকে থাকার ক্ষমতায়। যেসব মানবমূর্তি তিনি রচনা করছেন, সেসব জীবনযুদ্ধে মানুষের টিকে থাকার বার্তাবহ। বাংলাদেশ আর বাংলাদেশীদের টিকে থাকার ক্ষমতা ছাড়া তেমন কিছু নেই। তাই সেসব ছবিতে এ জাতির স্বকীয়তার প্রতীক শনাক্ত করা যায়।'



শিল্পী সুলতানকে যেমন দেখেছি

কে. এম. এ. কাইয়ুম

বেশ কিছুদিন থেকে তাঁর অসুস্থতার কথা সংবাদ মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম। গত কয়েক বছর ধরেই তাঁর বহুদিনের সাথী এজমায় ভুগছিলেন তিনি। যার কথা লিখছি তিনি এদেশের তথা এই উপমহাদেশের শিল্পাঙ্গনের শ্রদ্ধেয় ও বরেণ্য শিল্পী এস.এম. সুলতান—পুরো নাম শেখ মোহাম্মদ সুলতান। তাঁর আবাসস্থল যশোরের নড়াইল অঞ্চলে। তিনি লাল মিয়া নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন।

কারও কাছে তিনি কাকু, তাঁর সৃষ্ট 'শিশু স্বর্গের' শিশুদের কাছে তিনি দাদু আর এদেশের অনেক শিল্পীর কাছেই তিনি ছিলেন সুলতান ভাই হিসাবে পরিচিত। ১০ই অক্টোবর, ১৯৯৪, প্রকৃতি ও মানবপ্রেমী এই মানুষটি চলে গেলেন এই সুন্দর পৃথিবী থেকে। তাঁর ভাষায় তাঁর এক সময়ের সৃষ্ট 'এঞ্জেলরাই' যেন তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে গেল এই ধরাধাম থেকে।

বহুদিনের শিল্পী জীবন থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসনের পর হঠাৎ করেই যেন তাঁর আবির্ভাব ঘটে আমাদের আজকের আধুনিক শিল্পকলার জগতে '৭০ দশকের মাঝামাঝি। মনে পড়ে '৬০ দশকের শেষদিকে আমরা যারা মফস্বল এলাকা থেকে ঢাকা চারুকলা কলেজে ভর্তি হলাম তারা অনেকেই জয়নুল আবেদিন ও তাঁর সমসাময়িক কয়েকজন শিল্পীর নাম ও তাঁদের কাজ সম্পর্কে কিছু ভাসা-ভাসা জ্ঞান ছাড়া আর কিছু জানতাম না। কলেজে ভর্তির কিছুদিন পরই আর একজন শিল্পীর

নাম আমরা শুনলাম, যার নাম এস.এম. সুলতান। যার আদি নিবাস নড়াইল, যিনি বোহেমিয়ান জীবন যাপন করেন বৃহত্তর খুলনা ও যশোর অঞ্চলে। আমাদের আরও আকৃষ্ট করল তাঁর বাহ্যিক বেশভূষা ও আচার আচরণ। সাপ, বেজি, বিড়াল, কুকুর এমনকি কাকও যার সহ-অবস্থানে বসবাস করে। এ সবই শোনা কথা। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমাদের অনেকেরই হয়ে ওঠেনি। আমরা আরও জানলাম শিল্পীর জীবনে শিল্পানুরাগী নড়াইলের জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের সাহচর্য এবং পরে তাঁর পৃষ্ঠপোষক হিসাবে সোহরাওয়াদী পরিবারের অবদান। তাঁদেরই সহযোগিতায় কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। তৃতীয় বর্ষের কোর্স শেষ না হতেই তাঁর বোহেমিয়ান জীবনের শুরু। বছরের পর বছর তিনি ঘুরেছেন প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় সমগ্র ভারতবর্ষ। সেই সঙ্গে চালিয়ে গেছেন তাঁর শিল্পচর্চা। আমরা জেনেছি শিল্পী সুলতানই একমাত্র এশীয় শিল্পী যাঁর ছবি প্রদর্শিত হয়েছে বিশ্ববরেণ্য শিল্পী পাবলো পিকাসো, সালভাদর দালি এবং মাতিসের মতো শিল্পীদের সাথে লণ্ডনে। এই সব গল্প তখন শুনেছি তাঁর এলাকা থেকে আসা আমাদের সমসাময়িক শিল্প শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যারা সেই সময়ে শিল্পী সুলতানের আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিল কিংবা তাঁর কাছাকাছি আসার সুযোগ পেয়েছিল। তখন শিল্পীর এই জীবনাচার আমাদের কাছে গল্পের মতোই মনে হতো। এই সব গল্প পরে শিল্পীর নিজের কাছ থেকেও শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের অনেকের।

সম্ভবত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতেই তাঁকে প্রথম দেখি। তাঁর কাজের প্রদর্শনীর জন্য তিনি এসেছিলেন। একাডেমীতেই আর্ট গ্যালারির নিচের গোল ঘরে তাঁর থাকার ও আঁকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বড় বড় ক্যানভাসে গ্রামীণ জীবন, কৃষিকাজ এরকম আটপৌঢ়ে ঘটনাবলী নিয়েই তাঁর ছবির বিষয়বস্তু! এর সাথে এসেছে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিকে নিয়ে কিছু বিশাল আকারের ছবি। ছবির বিষয়বস্তুর উপস্থাপন, ড্রইং ও রং-এর ব্যবহার আদিম শিল্পকলার সাথেই যোগসূত্র তৈরি করে দেয়। যেহেতু শিল্পীর সামগ্রিক কাজ, তাঁর জীবনযাপন, পারিপার্শ্বিক অবস্থান এবং তাঁর কাজের ফিলসফি সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না সেই জন্য তাঁর এই সব কাজের নান্দনিক সৌন্দর্য উপলব্ধি করার যোগ্যতা সেই সময় অন্তত আমার হয়ে ওঠেনি। এ ছাড়া সত্তর দশকের প্রথম দিকে আমাদের অগ্রজ শিল্পীদের কাজ এবং ইউরোপীয় শিল্পকলার আধুনিকতা আমাদের শিল্পধারার মাঝে দারুণ প্রভাব ফেলে। বলা যায় এ সময়টা ছিল আমাদের শিল্প আন্দোলনে একটা বিরাট পরিবর্তনের সময়। সুলতানের প্রত্যাবর্তন আমাদের শিল্পাঙ্গনে একটা দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল শিল্পবোদ্ধা ও শিল্পানুরাগীদের

মধ্যে। মানুষ, জনবসতি ও জীবন সংগ্রামের চলমান এই চালচিত্র দর্শকদের নতুন করে ভাবার সুযোগ এনে দেয়। বলছিলাম শিল্পকলা একাডেমীতেই তাঁকে প্রথম দেখি। কালো আলখাল্লায় ঢাকা ছিল তাঁর দেহ। টিকালো নাক, পিঠ অব্দি ছড়ানো কালো কোঁকড়া চুল; পাশে হয়তো বসা তাঁর পোষা বিড়াল। মৃদু উচ্চারণে কথা বলেন, অত্যন্ত বিনয়ী, সব মিলিয়ে এক ধরনের আকর্ষণ করার মতো ব্যক্তিত্ব। এরই মাঝে কোনো একদিন আমার আঁকা ছবি দেখাবার সুযোগ হয় শিল্পীকে। সেই তার সাথে সরাসরি কথা বলার প্রথম সুযোগ। আমার ছবির বিষয়বস্তু ছিল স্বপ্নবিষয়ক। তিনি আমার ছবির প্রশংসা করেছিলেন, যদিও তাঁর শিল্পধারার সাথে আমার ছবির কোনো মিলই ছিল না। বলেছিলেন তাঁর ছবির বিষয়বস্তুও স্বপ্নেরই ফসল তাই তাঁর ছবির মানুষজন সব বলিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও কর্মঠ। এর মধ্য দিয়েই আমাদের এই গরিব দেশের খেটে খাওয়া মানুষদের আশাবাদী হিসাবে দেখতে চান তিনি। হয়ত সেই কারণেই স্বপ্নের বিষয়বস্তু নিয়ে আমার আঁকা ছবি তাঁর ভাল লেগেছিল। সেই থেকে তাঁর সাথে আমার পরিচয়। যদিও অবস্থানের দূরত্বের জন্য অনেকদিন পরপরই দেখা হতো কিন্তু তার কাছ থেকে স্নেহের পরশ অনুভব করতাম বরাবর।

তাঁর এই স্নেহের ফসল হিসাবেই ১৯৯১-এর জানুয়ারির শেষ ও ফেব্রুয়ারির প্রথম কয়েকদিনের জন্য চট্টগ্রাম সরকারী চারুকলা কলেজের বার্ষিক প্রদর্শনীর প্রধান অতিথি হিসাবে তাঁকে আরও কাছে পাবার সুযোগ পাই। সেই সময়ও তিনি বেশ অসুস্থ, কিন্তু তাঁর স্বভাবসুলভ বিনয়ের কারণে শিক্ষার্থী ও আমাদের আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করতে পারেননি। আমি লক্ষ করেছি শিল্পী ও শিল্প-শিক্ষার্থীদের সাহচর্যে তিনি অসুস্থতার মধ্যেও স্বাচ্ছন্দ অনুভব করতেন। সেই সময় এক দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছিল শিল্পী সুলতানের পোর্ট্রেট করার। শিল্পীর অন্যদের সাথে আলাপচারিতার সময় দু'তিন সিটিং-এ আমাকে শেষ করতে হয়েছিল অনেকটা স্কেচধর্মী এক পোর্ট্রেট। বিরল সুযোগ হলো, আমার অনুরোধে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও এই পোর্ট্রেটের ব্যাকগ্রাউণ্ড এঁকেছিলেন তাঁর প্রিয় বিষয়বস্তু 'অ্যাঞ্জেল'। নীল আকাশে মেঘের ভেলায় ভেসে আসছে তিনটি দেবশিশু। আর প্রায় দন্তহীন মুখে স্মিত হেসে বলেছিলেন, অ্যাঞ্জেলরা বলছে 'তোমার সময় হয়ে গেছে, তোমাকে নিতে এসেছি'। শিল্পীর সাথে এই যৌথ কাজ আমার জন্য একটা বিরাট ঘটনা বলে মনে করি।

শিল্পী সুলতানকে নিয়ে ঐ সময় রাঙ্গামাটি যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। রাঙ্গামাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে দারুণভাবে আপ্লুত করেছিল। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও চট্টগ্রামে ফিরেই রাঙ্গামাটির স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য জলরং মাধ্যমে আঁকার প্রয়াস

আমাদের বিমোহিত করেছিল।

ঐ সময় শিশুদের নিয়ে তাঁর নানা পরিকল্পনার কথা আমাদের বলেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট 'শিশু স্বর্গে'র শিশুদের জন্য তৈরি করেছিলেন এক বিশাল নৌকা, যাকে নিয়ে তাঁর অনেক স্বপ্ন ছিল।

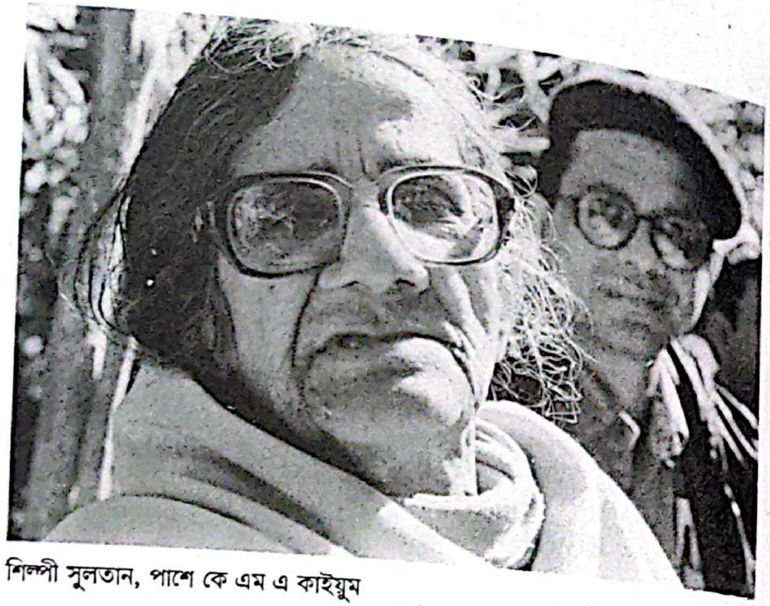
নড়াইলে যাওয়ার জন্য তাঁর তরফ থেকে আমন্ত্রণ ছিল অনেক দিনের। যতবারই দেখা হতো ততবারই তাঁর আমন্ত্রণের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যাওয়া হয়ে ওঠেনি আমাদের। এবার হঠাৎ করেই একটা আমন্ত্রণ পেলাম বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী থেকে। নড়াইলে শিল্পী সুলতানের তত্ত্বাবধানে আর্টিস্ট ক্যাম্প হবে দশ দিনব্যাপী। সুযোগ হাতছাড়া করলাম না এবার। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনার পনেরো জন শিল্পী ও শিল্পশিক্ষার্থী ৯ ফেব্রুয়ারি রাতে আমাদের শিল্প সামগ্রীর লটবহর নিয়ে নড়াইলের কুড়িগ্রামে শিল্পী সুলতানের আবাস স্থলে পৌছলাম। তখনও রাত থাকাতে তাঁকে আর জাগানো হলো না। শুনলাম তিনি অসুস্থ। তাই আমাদের মালপত্র রেখে পূর্বনির্ধারিত হোটেলে চলে গেলাম। সেখানে বিশ্রামের পর সকাল সাড়ে সাতটার দিকে যখন শিল্পীর বাড়িতে গেলাম দেখলাম পুরো বাড়িটা দেয়াল ঘেরা একটা বাগান বাড়ি। গেট দিয়ে ঢুকেই ডান দিকে শিল্পীর স্টুডিও, আঙ্গিনার মাঝামাঝি জায়গায় তার আবাসস্থল। চারদিকে নানারকম ফুল ও পাতাবাহার জাতীয় গাছের সমারোহ। বাড়ির পূর্ব-দক্ষিণ দিক জুড়ে তার প্রিয় পশুপাখির থাকার ব্যবস্থা। বাগানের ফাঁকে ফাঁকে স্বাভাবিকের চেয়ে লম্বা ও ভারী টেবিল এবং বেঞ্চ পাতা। স্টুডিওর সামনে শিল্পীর ব্যবহারের জন্য বিশাল আকৃতির অনেক ইজেল। যেহেতু তিনি বড় আকৃতির ছবি আঁকতেন তাই এই ব্যবস্থা।

অবাক লাগলো নড়াইলের মতো মফস্বল শহরের এক প্রান্তে কুড়িগ্রামের মতো জায়গায় আড়াই শ' থেকে তিন শ' শিশু নিয়ে শিল্পী অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য। আমাকে দেখেই তাঁর চিরাচরিত স্মিত হাসির মাঝে বিনয়ী সম্বোধন, 'শেষ পর্যন্ত আপনি আসলেন। আমার খুব খুশি লাগছে', বলেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি বললাম, 'সুলতান ভাই, এই অসুস্থ শরীরে আপনি বাইরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন'। তিনি বললেন, 'আপনাদের পেয়ে আমি সুস্থবোধ করছি। আর শিশুদের মাঝে আমি সব সময় স্বাচ্ছন্দ বোধ করি'। অবাক হয়ে দেখলাম সংসারী না হয়েও শিল্পী সুলতান একটা বিরাট সংসারের মাঝে জড়িয়ে আছেন। তাঁর এই পশুপাখি, মানুষজনের বিরাট সংসারের আহার যোগানোর জন্যই দেখেছি অসুস্থতা ও ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়েও আমাদের সাথে তাল মিলিয়ে ছবি এঁকে গেছেন — কখনও তেল

রং, কখনও বা জলরং-এর মাধ্যমে। আমরা অবাক হয়েছি তাঁর এই মনোবল দেখে। বলছিলেন, শীতটা পড়ে গেলেই তিনি আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন, তাঁর অনেক কাজ পড়ে আছে। শিশু স্বর্গের অনেক কাজ অসমাপ্ত। কি করে শেষ করবেন, কোথা থেকে টাকা আসবে এই ছিল তার সমস্ত চিন্তা-চেতনা জুড়ে। শিশু স্বর্গের শিশুদের মাঝেই খুঁজতেন আগামী দিনের প্রকৃত সুন্দর মানবপ্রেমী মানুষদের।

তাঁর এখানে যেসব শিশু আসে তাঁরা প্রায় সবাই নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ে। তাঁর জানা মতে শিশুদের অনেকের সকালের নাস্তাটুকু করে আসার সামর্থ নেই। এই ব্যাপারটা তাঁকে দারুণভাবে কষ্ট দিত। তাই তাঁর পরিকল্পনা ছিল পশুখামার করবেন, সেখানে গরু-মহিষ পালা হবে— তার দুধ ও বাড়তি আয় থেকে ছেলেমেয়েদের ভাল খাবারের ব্যবস্থা করা হবে।

এর মাঝেই একদিন চিত্রা নদীতে ভাসমান তাঁর নৌকায় (যদিও অনেকটা লঞ্চের আদলে তৈরি এবং ইঞ্জিন চালিত) আমাদের নিয়ে গেলেন নড়াইল থেকে প্রায় বিশ মাইল ভাটিতে যাদবপুর এলাকায়। তাঁর নির্বাসিত জীবনের একটা বিরাট সময় এই এলাকায় তিনি কাটিয়েছিলেন। চিত্রা নদীর দুই তীরের দৃশ্যাবলী অবলোকন করলে বোঝা যায় শিল্পীর প্রায় সমস্ত শিল্পকর্মের দৃশ্যপট যেন এখান থেকেই উৎসারিত। নদীর ঘাটে গ্রাম্য বধূদের কলসি কাঁখে পানি নেয়া থেকে শুরু করে দুই পাড়ের কুঁড়ে ঘর, তালবীথি এই সব দৃশ্যাবলী যেন সরাসরি শিল্পীর ক্যানভাসে এসে জায়গা করে নিয়েছে। এমনকি এই সব অঞ্চলের মানুষজনের চেহারা, প্রশস্ত কপাল, উঁচু গণ্ডদেশ, চেপ্টা বলিষ্ঠ গড়ন, বাবরী চুল তাঁর শিল্পকর্মে প্রতিফলিত হতে দেখি। আমার মনে হয়, একজন দরদী শিল্পী না হলে তিনি তাঁর আপনজন ও কাছের মানুষদের এমন বলিষ্ঠভাবে আমাদের এই আধুনিক শিল্পধারার সাথে পরিচিত করাতে পারতেন না। যাদবপুরের যে বাড়ির ঘাটে আমাদের নৌকা বাঁধা হলো এবং সুলতান সাহেবকে নৌকা থেকে নামানো থেকে শুরু করে তার প্রতি মানুষের ভালবাসার যে অভূতপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করেছিলাম তার স্মৃতি আমাকে ও আমার সাথীদের অনেকদিন আলোড়িত করবে। জানি না তিনি শিল্পী সুলতান হিসাবে তাদের কাছে কতটুকু পরিচিত। কিন্তু সুলতান যে মানুষ হিসাবে জাতি-ধর্মের উর্ধ্বে এক বিশাল ব্যক্তিত্ব, একজন ভালবাসার মানুষ, তা স্বচক্ষে না দেখলে আমার অভিজ্ঞতার পাতায় একটা বিরাট শূন্যস্থান থেকে যেত।



ছবি : নাসির আহমেদ নাসিরী

শিল্পী সুলতান, পাশে কে এম এ কাইয়ুম



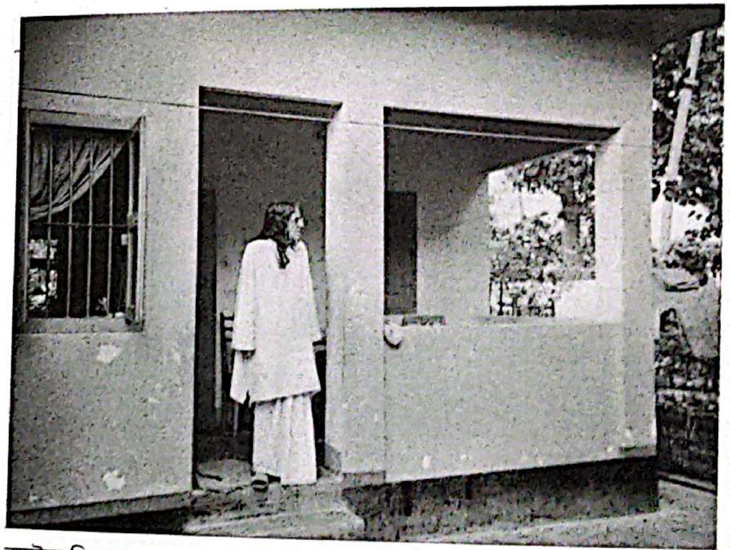
ছবি : নাসির আহমেদ নাসিরী

শোবার ঘরে বিছানায় উপবিষ্ট সুলতান (১৯৯৪)



ছবি : সাইফুল ইসলাম চৌধুরী

শোবার ঘরে ছবি আঁকছেন সুলতান। পাশে উপবিষ্ট নীহার বালা, তিনি গত দু'দশকের বেশী সময় শিল্পীর দেখাশোনার ভার নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন (১৯৯৩)



ছবি : নাসির আহমেদ নাসিরী

নড়াইলে নিজ ঘরের বারান্দায় সুলতান (১৯৯৪)



ছবি : নাসির আলী মামুন

নৌকায় নির্জনে চিন্তামগ্ন সুলতান (১৯৯৪)



ছবি : মাহবুব আলম

মাছিমদিয়া গ্রামে নিজ জন্মভিটায় সুলতান (১৯৯৪)



ছবি : নাসির আলী মামুন

শিল্পকলা একাডেমীর চারুকলা বিভাগের পরিচালকের কক্ষে শিল্পী সুলতান। সঙ্গে রয়েছেন শিল্পী আমিনুল ইসলাম ও শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী। মৃত্যুর পূর্বে এটাই শিল্পী সুলতানের শিল্পকলা একাডেমীতে শেষ আগমন (১৫ই জুন, ১৯৯৪)



ছবি : সাইফুল ইসলাম চৌধুরী

শিল্পকলা একাডেমীতে জয়নুল আবেদিনের ৭২তম জন্ম-বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তরুণ শিল্পীদের মাঝে সুলতান (১৯৮৬)



এস এম সুলতান

আশীষ-উর-রহমান শুভ

লাল মিয়ার গোটা জীবনটাই বড় অদ্ভুত। যেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে কোনো গল্পের জীবন। সত্য-মিথ্যায় মাখামাখি হয়ে সন্ধ্যার আলো-আঁধারীর মতো বহু কাহিনী কিংবদন্তী হয়ে ছড়িয়ে গেছে মানুষের মুখে মুখে তাকে নিয়ে। অনেকের বিশ্বাস, লম্বা একহারা গেরুয়াপরা সেই মানুষটি গলায় জ্যান্ত শঙ্খচূড় সাপ পেচিয়ে রুক্ষ বাবরি চুল হাওয়ায় উড়িয়ে পাড়াগাঁর জঙ্গলে জঙ্গলে রাত-বিরেতে ঘুরে বেড়ান একাকী। শ্যাওলা পড়া, জঙ্গলে ঢাকা পোড়ো বাড়িতে হিংস্র সব বুনো জন্তুদের সঙ্গে রাত কাটান তিনি। অমল-ধবল জ্যোৎস্না নিঃশব্দে যখন তার সমস্ত কিরণ ঢেলে দেয় ঘুমন্ত গ্রামে, জঙ্গলের মধ্যে জেগে ওঠে ঝিঁঝি পোকার দল, গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসে দু'একটি শেয়াল, লক্ষ্মী পেঁচা হিজলের ডাল থেকে 'পাখায় জ্যোৎস্না মেখে উড়ে যায় শিকার করতে, গাছের গাঢ় কালচে সবুজ পাতা আর শান্ত নদীর বুক ঝিকমিক করে ওঠে স্বপ্ন দৃশ্যের মতো, অদ্ভুত সব ছায়া পড়ে সবুজ মাটির বুকে, কি যেন বলতে চেয়ে ভাষাহীন শব্দহীন স্তব্ধতায় ব্যাকুল-আকুল হয়ে ওঠে দিগন্ত চরাচর।' ঠিক তখন চাঁদের আলোয় হিম হিম বাতাসে কোন সুদূর থেকে যেন ভেসে আসে বাঁশির সুর। প্রকৃতির সেই না বলা বাণী, সুখ-দুঃখের অতীত কোনো এক অনির্বচনীয় বোধ, গাছের পাতার মতো দুলে দুলে কখনও সূর্য কিরণের মতো নির্ভীক সাবলীলতায়, কখনও দুষ্টু মেয়ের চটুল-চলনের মতো এঁকেবেঁকে, কখনও মনউচাটন করা উদাস অভিমানে হুহু বাতাসের সঙ্গী হয়ে বয়ে যায়। মাঝ রাতে যাদের ঘুম ভেঙ্গে যায় আচমকা— কান পেতে তারা হৃদয়ের মধ্যে সেই শুশ্রূষার মতো সুর পুরে নিতে নিতে

বিড় বিড় করে ওঠে 'পাগলা লাল মিয়ায় বাঁশি বাজায়।' মুখে না বললেও তাদের অনেকের গোপন ধারণা, লাল মিয়ার সঙ্গে জীন-পরীর আছর আছে- না হলে রাত-দুপুরে গহীন জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, ভাঙ্গা মন্দিরে ঘুমায় কেমন করে? গ্রামের নিরক্ষর দেহাতী মানুষদের এই বিস্ময় জাগানিয়া প্রশ্নের মতো শহুরে শিক্ষিত আলোক প্রাপ্তদেরও বিস্ময় একইভাবে প্রকাশিত হয়, কেমন করে লাল মিয়া তাঁর জীবন কাটাচ্ছেন। কিসের শক্তিতে। আধ্যাত্মিকতায়, পরম মোক্ষ লাভে বিশ্বাস নেই লাল মিয়ার- তাহলে কিসের শক্তিতে তিনি জীবিতকালেই নিজের জীবনকে কিংবদন্তীর অমরাবতীতে পৌঁছে দিলেন? খোদ লাল মিয়াকেই যদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তবে তিনি স্মিত হাসবেন তাঁর চোখে ঝিকিয়ে উঠবে নিঃশব্দ বিদ্যুৎ, তোবড়ানো গালে পড়বে পরিচিত মায়া মমতার স্নিগ্ধ ভাঁজ। তারপর বলবেন, কই আমি তো কোনো বিস্ময়কর জীবন কাটাই না। এখানেই আমার জন্ম, এখানেই আছি। ঐ যে লোকজন বলে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর গল্প, সে অনেক দিন আগের কথা সব তার সত্যিও নয়। এখানে পুরনো এক ভাঙ্গা জমিদার বাড়ি ছিল। মন্দিরও ছিল। সাপখোপ এসব পুরনো ইটের পাঁজায় হরহামেশাই দেখা যায়। আমি চেষ্টা করেছিলাম বাড়িটাকে মেরামত করে একটা স্কুল করার। সে সব পঞ্চাশ দশকের কথা। এখন তো আর ইচ্ছা হলেও বন-বাদাড়ে ঘুরতে পারি না। বাঁশিও ছেড়ে দিয়েছি বহুদিন হয়। আগে লোকজন আসত রাতভর তাদের বাঁশি বাজিয়ে শোনাতাম। এখন ছোটছোট ছেলে-মেয়েরা আসে আঁকা শিখতে। বেশ ভালইতো আছি। কোনো অসুবিধে হয় না। এখানকার মানুষরা আমাকে খুব ভালবাসে। বাইরে থেকে এসে দেখেন বলে আপনাদের অদ্ভুত মনে হয়। গ্রামের জীবনই তো আসলে আমাদের দেশের মানুষের স্বাভাবিক জীবন। আমার জীবনও তাই। 'অদ্ভুত' 'অস্বাভাবিক' বলে কিছু নেই এতে।

লাল মিয়া কিন্তু এই কথাগুলো এক সঙ্গে একটানা বলেননি। থেমে থেমে, দম নিয়ে ভাঙ্গা ক্ষীণ খস্‌খসে শব্দে কথা বলেন এখন তিনি। সত্তরটি 'ষড়ঋতু' পার হয়ে গেছে তার শরীরের ওপর দিয়ে। এককালের পিঠের মাঝ অবধি নেমে আসা রেশমী কালো ঢেউ এখন চৈত্র মাসের ক্ষীণ মরা স্তব্ধ নদীর মতোই। সেখানে সাদা-কালোর জটিল দ্বন্দ্ব। নাকে চেপে বসা কালো ফ্রেমে বাঁধা মোটা ঘোলাটে লেন্সের ভিতর দিয়ে তাকালে স্পষ্টই তাঁর চোখে দেখা যাবে বেলা শেষের কমলা রোদের আভা। সামনের দু'পাটির দাঁতগুলো তাদের জন্মস্থান ফেলে মহাকালের জিম্মায় চলে গেছে অনেক দিন হয়। মাড়িতেও নেই তারা অনেকেই। লম্বাটে ধাচের মুখটি তাই দু'গালের পাশে বেশ তুবড়ে গেছে। দুই ভ্রু'র মাঝখানে, কপালে আর ঐ তোবড়ানো গালে জবরদস্ত করছে সব ব্যাকরণহীন রেখার দাগ। কাঁচা ফলের মতো নেই আর ত্বক। খস্‌খসে

যেন ধুলো মাটির দাগ লেগে গেছে তাতে। বাংলার এক অজপাড়াগার হতদরিদ্র কৃষকের ঘরে তার জন্ম। কৃষকের ঘরে তো আর রাজপুত্র জন্মে না, রাজার চেহারাটি পাননি তিনি। কিন্তু রাজার আসন পেয়েছেন। সে আসন পাতা আছে বাঙালীর বুকের মণিকোঠায়। লাল মিয়া সুলতান হয়ে সেই আসনে বসে আছেন যার মতো আর কেউ নেই আমাদের।

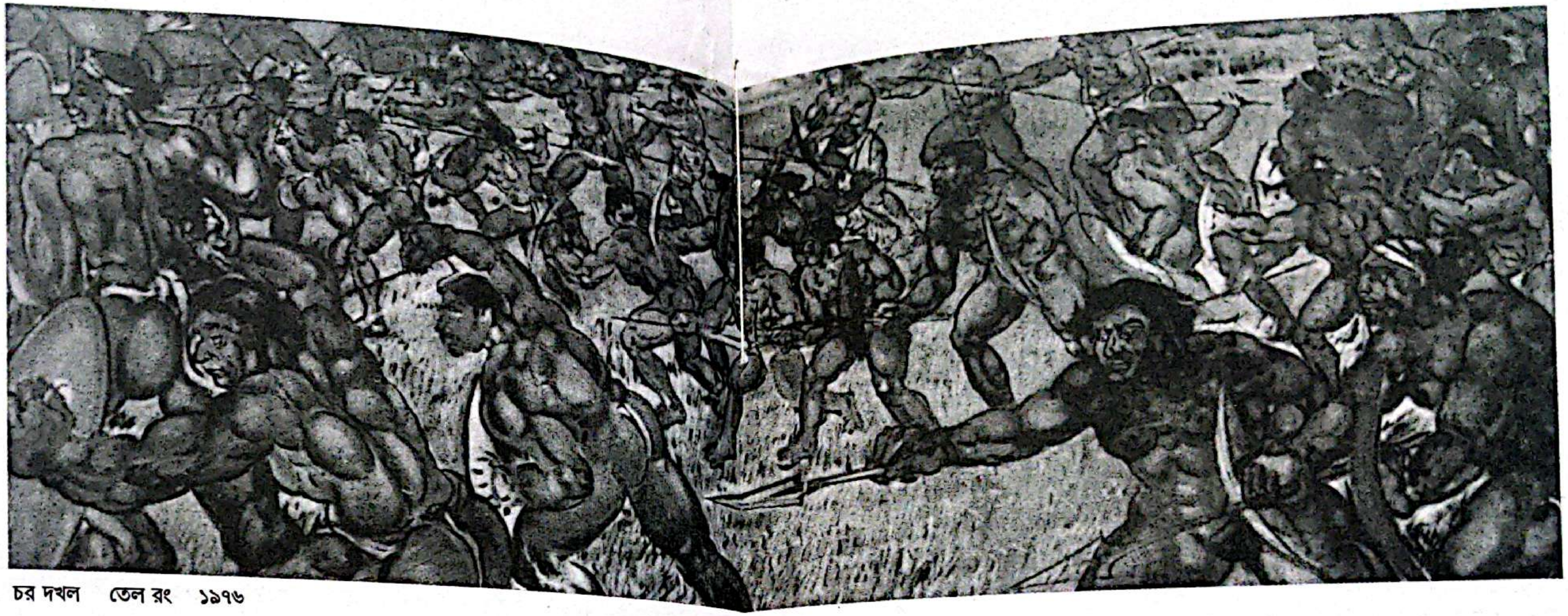
লাল মিয়া কেমন করে সুলতান হয়ে গেলেন আমাদের হৃদয়ের এবং জাতিরও সেটা জানতে হলে একটা গল্পের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে আমাদের। সুলতানের জীবনটা আমাদের কাছে এ জন্য গল্পের মতো মনে হবে যে, আমরা নিজেদের জন্য বাস্তবে এ রকম জীবন আশা করব না কখনও। অনেকটা দেবদাসের জীবনের মতো তাঁকে ভালবাসব, কাঁদবও তাঁর জন্য কিন্তু কিছুতেই চাইব না দেবদাসের মতো হোক নিজের জীবনটি। সুলতানের নিজের জন্য বাস্তব এবং আমাদের জন্য গল্পের মতো, তাঁর জীবনটি শুরু হয়েছিল ১৯২৩ সালের আগস্ট তৎকালীন নড়াইল মহকুমার মাছিমদিয়া গ্রামে। পিতা শেখ মেছের আলী ছিলেন প্রান্তিক কৃষক। টুকটাক রাজমিস্ত্রীর কাজও করতেন। সব পিতার মতো তারও স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া শিখে ছেলে 'মানুষ' হোক। তাই স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন ছেলেকে। লাল মিয়া কিন্তু স্কুল পালালেন, 'মানুষ' হওয়ার প্রথাবদ্ধ পথ ফেলে চলে গেলেন সুলতান হয়ে ওঠার পথে।

'বই পুস্তকের ছাপা অক্ষরের চেয়ে ছবিগুলো আমার ভাল লাগত বেশি' এরকম করে বলেছিলেন তিনি। ছবি দেখতে দেখতে ইচ্ছা হয় আঁকার। রং পেন্সিল কিনে দেয়ার টাকা ছিল না পিতার। লাল মিয়া কাঠকয়লা দিয়ে ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন, পাকা পুঁই বিচির রস, কাঁচা হলুদের রস দিয়ে রাঙাতেন সেই সব ছবি। প্রকৃতি একেবারে নির্গুণ করে কোন মানুষকেই পাঠায় না পৃথিবীতে। নিজের সেই প্রকৃতিদত্ত উপহারটি খুঁজে বের করে সেই গুণকে কাজে লাগানোই মানুষের সত্যিকারের কাজ। সুলতান খুব শৈশবেই খুঁজে পেয়েছিলেন প্রকৃতি কোন গুণটি দিয়ে দিয়েছে তাঁর মধ্যে। জেনেছিলেন কোন কাজটি করার জন্য পৃথিবীতে জন্ম তাঁর। সে কাজ রং-তুলি পেন্সিলের কাজ। ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে তাই একজন শ্রমিক বলেই ভাবেন সুলতান। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই মানুষের মধ্যে সাম্যকে লক্ষ্য ও উপলব্ধি করেন তিনি। প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা দেয়ার মতো সামাজিক অঙ্গীকারের প্রয়োজন অনুভব করেন তীব্রভাবে। আমাদের সমাজ-রাষ্ট্রে এর অনুপস্থিতি নিদারুণ উদ্বিগ্ন অসুখী করে তোলে তাঁকে এই

বুড়ো বয়সেও।

নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় জীবনের মোড় পালটে যায় লাল মিয়ার। জমিদার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপধ্যায় ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শনে এলে লাল মিয়া তাঁর একটি পোর্ট্রেট এঁকে তাঁকে উপহার দেন। সেই থেকে শুরু আজ পর্যন্ত তাঁর ছবি আঁকা, যে কোনো মানুষের 'বিস্ময় আর ভাল লাগার' প্রসঙ্গ হয়ে আছে। মানুষের এই ভাল লাগা ভালবাসাকে সঙ্গে নিয়েই পঞ্চম শ্রেণীর লাল মিয়া বেড়াতে চলে এলেন কলকাতা। নড়াইলের জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ রায় থাকতেন কলকাতায়। শিল্পরসিক মানুষ ছিলেন তিনি। কলকাতায় লাল মিয়ার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হলো তাঁর চেষ্টাতেই। 'কলকাতা দেখে অবাক হওয়ার' জন্য সেখানে যাননি সুলতান। সুলতানের অবিচল লক্ষ্য আর অদম্য ইচ্ছা ছিল কলকাতা আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য। কিন্তু কাজটি মোটেই সহজ ছিল না তাঁর জন্য। তখন ন্যূনতম এন্ট্রান্স পাস করে আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার নিয়ম ছিল। আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মুকুল দে ছিলেন কড়া প্রিন্সিপল-এর মানুষ। নিয়ম বরখেলাপ করে কিছুতেই তিনি ভর্তি করিয়ে নেবেন না সুলতানকে। 'আমারও জেদ চেপে গেল ভর্তি হবই' বললেন সুলতান। শুধু প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক হিসাবেই নয়, সামাজিকভাবেও অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন শাহেদ সোহরাওয়ার্দী। তাঁকে গিয়ে আবদার জানালেন লাল মিয়া। দুটো কাজ হলো এতে। নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলেন তাকে এবং আর্ট কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে বহু কথাবার্তা বলে রাজি করালেন লাল মিয়াকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার অনুমতি দিতে। লাল মিয়ার ছবি দেখেই শাহেদ সোহরাওয়ার্দী অনুভব করেছিলেন 'পারবে এই ছেলে। অনেক বড় কিছু পারবে তার জীবনে।' মিথ্যা হলো না তাঁর বিশ্বাস। ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হলেন সুলতান। গুঁড়িয়ে গেল আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার বাধা। রাত থেকে দিন হওয়ার মতো আমুল পাল্টে গেল তাঁর জীবন। সেটা ১৯৪১ সালের ঘটনা, এর পর থেকে দীর্ঘ একটি সময় শুধুই সুলতানের সাম্রাজ্য বিজয় — সেখানে লাল মিয়াকে আর খুঁজে পাবনা আমরা।

আর্ট কলেজে টানা চার বছর আঁকা শিখলেন সুলতান। নিজের ক্ষেত্র পেয়েছেন ভাল করে। নিজের সবটুকু ঢেলে দিলেন নিষ্ঠায়– মমতায়। প্রথম বছরের পরীক্ষায় দ্বিতীয় হলেন। তার পরের দু'বছর প্রথম হলেন পরপর। ছেলের মতোন ভালবাসতেন শাহেদ সোহরাওয়ার্দী। কোন অভাব বোধ হয়নি সুলতানের কখনও। সে বাড়ির দোতলায় ছিল প্রকাণ্ড লাইব্রেরি। দুনিয়ার বিখ্যাত সব চিত্রকরদের শিল্পকর্মের প্রচুর



চর দখল তেল রং ১৯৭৬

ছবি আর সেরা সেরা সমালোচকদের বই পুস্তকে ভর্তি ছিল সে লাইব্রেরি। সুলতান হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলেন যেন 'সাতরাজার ঐশ্বর্য'। মনে ও মগজে গেঁথে নিলেন সেইসব অমূল্য·বৈভব। সে সময় আর্ট কলেজের পুরো কোর্সের মেয়াদ ছিল ছ'বছর। সুলতান হাঁফিয়ে উঠলেন চার বছরেই। স্নেহ-যত্ন, আদর-আপ্যায়ন সবই পেয়েছিলেন ভরা নদীর মতো অবারিত ধারায়। তবু সেই যে কথা বলেছেন জীবনানন্দ : 'স্বপ্ন নয়– শান্তি নয়– ভালবাসা নয়, হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়। আমি তারে পারি না এড়াতে ....।' সুলতানও পারেননি এড়িয়ে যেতে সেই বোধের আহ্বান। তাঁর মনে হয়েছিল 'সকল লোকের মতো বীজ বুনে আর স্বাদ কই !' এক বছরের সিনিয়র জয়নুল আবেদিন, সহপাঠী কামরুল হাসান, প্রিয় শিক্ষক সতীশ সিনহার ভালবাসা, সোহরাওয়ার্দী পরিবারের অপত্য স্নেহ অদূরে দাঁড়ানো সোনালী সাফল্য কিছুই বেঁধে রাখতে পারেনি সুলতানকে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। সংসারের সঙ্গে। সকলের মধ্যে থেকেও যেন 'নিজের মুদ্রাদোষে' একদিন আলাদা হয়ে গেলেন। বোধহয় সেই ১৯৪৪ সালে দুরন্ত লাল মিয়া হঠাৎ জেগে উঠেছিল সুলতানের মধ্যে। হঠাৎই একদিন আবার কলকাতা ছেড়ে ভারত দেখতে বেড়িয়ে পড়লেন সুলতান। যেমন আঁকার প্রতিভা তেমনি মানুষের প্রতি গভীর বিশ্বাস আর দায়বদ্ধতাও যেন

জন্ম থেকেই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন সুলতান। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ'। আর সুলতানের বক্তব্য হচ্ছে 'পৃথিবীর সব বড় বড় ঘটনা, মহৎ ঘটনারই জন্ম দিয়েছে মানুষ। মানুষ অনেক পেরেছে অতীতে, তাই ভবিষ্যতেও আরও অনেক কিছু পারবে। মানুষকে অবিশ্বাস করার কিছু নেই।' তাঁর কণ্ঠস্বর শরীরের দুর্বলতা ছাপিয়ে সুরের আবাহনের মতো উঠে যাচ্ছিল উচ্চগ্রামে। যেন তাঁর বিশ্বাস দিয়ে তিনি ভরিয়ে দিতে চান সময়ের শূন্যতা; যেন ব্যর্থতা, অবিশ্বাস ব্যক্তি কেন্দ্রিকতার মায়াবী জাল আর সকল নেতিবাচকতাকে আপন বিশ্বাসের আঘাতে ভেঙ্গে খান খান করে দিয়ে মহামানবের মিছিল বাধাধীন দ্বিধাহীন এগিয়ে যাবার জন্য এক দিগন্ত জোড়া পথ তৈরি করে দেবেন। এই বিশ্বাসকেই সুলতান রূপে অবয়বে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর ক্যানভাসে। তাঁর বিশ্বাসের প্রতিনিধি হয়ে তাই মানুষ বারবার এসেছে পট জুড়ে। হয়ে উঠেছে আঁকার প্রধান বিষয়। মানুষের সঙ্গে আর যা এসেছে তা প্রকৃতি। সে প্রকৃতিও অদম্য-আদিম নয়। বরং অদম্য মানুষেরাই। তারাই বশ মানিয়েছে প্রকৃতিকে। তৈরি করে নিয়েছে মানবিক পরিবেশ। সুলতানের নিসর্গ তাই প্রকৃতির আদিম রূপ ও শক্তির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামশীল মহামানবেরই জয়গান।

সুলতানের জীবনের এই অংশটিকে অনায়াসে আমরা 'প্রব্রজ্যা পর্ব' বলতে পারি। কলকাতা ছেড়ে সোজা দিল্লী রওনা হয়ে গেলেন। কলকাতা ছাড়ার আগে আরও একটি কাজ করেছিলেন সুলতান। 'মানুষ' যার বিশ্বাস আর ভালবাসার বিষয়– মানুষের কাছ থেকে তার দূরে সরে থাকা এক কথায় অসম্ভব। কলকাতাতেও তিনি আভিজাত্যের গজদন্ত মিনার থেকে ধূলোমাটিতে লেগে থাকা সংসার যাদের সেই সব মানুষের কাছে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। 'খাকসার' নামে এক বিখ্যাত আন্দোলন হয়েছিল সে সময় ভারতে। মুসলমানদের নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলনের রাজনৈতিক চেতনা তেমন তীক্ষ্ন ছিল না। সামাজিক আন্দোলনের মতো ব্যাপারটি, ধর্মীয় জাতীয়তার কথা ছিল প্রচ্ছন্নভাবে। মৃতদেহ সংকার, পথঘাট সংস্কার এ সবই করে বেড়াতেন খাকসারের সভ্যরা। ভারতের বহু অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে মানুষের বহু বিপন্ন সময়ে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন উষ্ণ করতল। ভারত তাই একেবারেই অচেনা ছিল না তার কাছে। কোথায় যাবেন তা এক রকম ঠিক করাই ছিল মনে মনে। দিল্লী থেকে লখনৌ। সেখান থেকে হিমালয়ের দুর্গম পাহাড়ী পাদদেশ। কোথায় দেরাদুন, কোথায় কন্যাকুমারীকা, কোথায় মুসৌরী—একা পায়ে হেঁটে হেঁটে সুলতান নামের এক ঝকমকে যুবক যাচ্ছে এগিয়ে – কেমন ছিল সে সময় তাঁর অবয়ব, চুল কি নেমে এসেছিল কাঁধ ছাপিয়ে, তুলিধরা হাত কেমন বিদ্যুত রেখার মতো খেলে যেত ক্যানভাসের ওপর দিয়ে – সে সব জানবার কোন উপায় নেই আমাদের। পাখিরা উড়ে উড়ে কোথায় না কোথায় চলে যায় তবু তাদের একটি লক্ষ্য থাকে – সুলতান পাখিদের চেয়েও চঞ্চল। হিমালয়ের পাদদেশে পাহাড়ী প্রকৃতির উদার সৌন্দর্য তার মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল ঐ প্রজাপতির চাঞ্চল্য। কোথাও থামতে চাননি। যেন এক বিশাল পুরুষ প্রজাপতির মতো পুরো এলাকাটিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে অনুভব-উপভোগ করে যাবার এক অদম্য বাসনা ঝর্ণার মতো ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল তাঁর মধ্যে সে সময়। উঁচু-নিচু-দুর্গম উপত্যকা টপকে তিনি এসে থমকে গেলেন কাশ্মীরে। সেখানে তখন নর্থ-ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টের মার্কিন সৈন্যদের ঘাঁটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তুমুল ডামাডোল। সুলতান সে সব গায়ে মাখলেন না। গোঁড়া সৈন্যদের পোর্ট্রেট এঁকে পয়সা কামিয়েছেন আর দু'হাতে তা উড়িয়ে দিয়েছেন কাশ্মীরী হাওয়ায়। লেপ্টে থেকেছেন কাশ্মীরী নিসর্গ শোভায়। বলা যায়, প্রায় বুঁদ হয়ে পড়েছিলেন। এই একটি সময়ে সুলতানের মতো একজন সংবেদনশীল অন্তরের, তীক্ষ্ন মেধার ও অত্যন্ত বড় মাপের স্রষ্টা মানুষটির মধ্যে সামান্য বিরোধাভাস লক্ষ্য করব। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' শ্লোগান বাতাসে উত্তাপ ছড়িয়ে দিয়েছে, তার ওপরে এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সামাজিক ধাক্কা অথচ সুলতানের মধ্যে এসবের স্পষ্ট কোন

প্রতিধ্বনি নেই। এ না থাকা যে পাপ – তা নয়। কিন্তু কেন তা নেই, তা আমাদের অনেকেরই জানতে ইচ্ছা করে।

সুলতান জানালেন, 'আমার কাজ ছবি আঁকা, এটা আমি অল্প বয়সেই বুঝেছিলাম। আর সব বাদ দিলেও রাজনীতি করতে গেলে অনেক প্রথাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে থাকতে হয়, অবাধে যাবার-আসবার ইচ্ছার স্বাধীনতাটুকু হারানোর ক্ষতিকে মেনে নিতে হয়। এই ক্ষতিটুকু মেনে নিতে ইচ্ছা হয়নি। রাজনীতি আমার কাজ না, আমি জানতাম। আমার কাজ ছবি আঁকা আর ঘুরে বেড়ানোর নেশা। আমি রাজনীতি করিনি যাকে রাজনীতি করা বলে সে রকম করে।'

সুলতান বললেন, সে রকম রাজনীতি করেননি, তিনি তবে কি রকম রাজনীতি করেছেন? এত সব টুকটাক প্রশ্নের জবাব দেয়ার শারীরিক সামর্থ্যই রাখেন না তিনি আর। অপারেশন হয়েছে তাঁর। কাটতে হয়েছে চোখ। হাঁপানি দীর্ঘদিন আগে বুকের মধ্যে এসে যেন হাঁটু ভেঙ্গে অচল হয়ে পড়ে আছে। একটানা তিনটে বাক্য বলতেও শ্বাসকষ্ট এতটাই প্রবল হয়ে ওঠে যে প্রচণ্ড পরিশ্রান্তের মতো খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিতে হয় তাকে। তাই কিছু কিছু কৌতূহলের জবাব আমাদের নিজেদেরই খুঁজে নিতে হবে তাঁর জীবন ও কর্মের মধ্যে দিয়ে। আমরা তো সবাই জানি যে 'বৃক্ষের পরিচয় তার ফলেই'। রাজনীতির অর্থ ও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে মানুষের মধ্যে মহত্ত্বকে জাগিয়ে তুলে সহমর্মিতাকে উৎসাহ দিয়ে একটি নিরিবিলি শান্তিময় মানবসমাজ নির্মাণ এবং সেখানে জীবনের অর্থ আবিষ্কারের উদ্যোগ গ্রহণ, তবে সে কাজ সমস্ত অন্তর ঢেলে দিয়েই করেছেন তিনি। মানুষের শক্তি, সৃষ্টি, আর সম্ভাবনাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর রেখায়-বর্ণে। এবং তাঁর সামনে কোনো প্রহেলিকার অস্পষ্ট মায়াবী জাল বিছিয়ে দেননি তিনি। 'কুশলী' নন তিনি। খুব সহজেই এই অভিযোগ তোলা যায় তাঁর বিরুদ্ধে। বলা যায় — বড় বেশি স্বতঃস্ফূর্ত তাঁর আঁকা, যাতে সৃজনশীলতার অমিয় লাবণ্যের চেয়ে স্বভাবগুণের গুণপনাই বেশি লক্ষণীয়। আরও বলা যায়, নিজেকে অতিক্রম করতে পারেননি তিনি। নিঃসন্দেহে তাঁর আঁকা ভাল কিন্তু আরও কোনো 'ভালতর ভালতম'র দিকে দৃষ্টি দেননি তিনি। তাই তাঁর রচনায় এখন এসেছে অভ্যস্ততার অনাকর্ষণীয় স্বাদ।

সুলতান নিজেও জানেন তাঁর সম্পর্কে এই সব অভিযোগ। কিন্তু নিজের পথটি তাঁর চেনা আছে। পরিবর্তন তিনিও চান কিন্তু চাপিয়ে দেয়া উপঢৌকনও গ্রহণ করতে সম্মত নন তিনি। ছবি নিয়ে, রং-তুলি নিয়ে বাংলার মানুষের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতায় চলে যেতে চেয়েছেন তিনি। ছবির দৃশ্যের সঙ্গে প্রতিদিনের যাপিত জীবনের ভেদ

ঘুচিয়ে দিয়ে মানুষের মধ্যকার অমোঘ শক্তি আর অনন্ত সম্ভাবনাকে মানুষেরই সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন তিনি অকপটে। 'না কোন কৌশলের অনিন্দ্য সুন্দর সুষমা তাতে ছড়াননি তিনি। আমাদের এই জনপদের প্রাণস্পন্দন জাগানিয়া মানুষেরা ভুলে গিয়েছিল তাদের নিজেদের মুখচ্ছবি, দেহাবয়ব- সুলতান যেন এক একটি আয়না মেলে ধরেছেন সেই বিস্মৃত প্রাকৃতজনদের সামনে।'

অঢেল ফল আর সুপ্রচুর ফুলেভরা দেশ কাশ্মীর। সেখানকার মানুষগুলোও পরিশ্রম করতে পারে প্রচণ্ড। পরিশ্রমী মানুষই মানুষের মধ্যে সব থেকে প্রিয় সুলতানের। দু'বছরেরও বেশি সময় থেকে গেলেন কাশ্মীরে। মার্কিন সৈন্যদের পোট্রেট আঁকার পাশাপাশি কাশ্মীরের প্রচুর 'ল্যাণ্ডস্কেপও' এঁকেছিলেন জলরং 'এ'। জলরং নিয়েই কাজ করতেন তিনি এ সময়। এ সময়ই জীবনের প্রথম একক প্রদর্শনীটি তার অনুষ্ঠিত হয় সিমলায় ১৯৪৬ সালে এক কানাডিয়ান মহিলার সাহায্য ও উদ্যোগে—এ তথ্য সবারই জানা আছে। মহিলার নাম মিসেস হাডসন। 'ল্যাণ্ডস্কেপ' আর কর্মজীবী মানুষদের নিয়ে সেই প্রদর্শনীতে সেকালের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এসেছিলেন এস. এম. সুলতান নামের এক অচেনা অখ্যাত যুবকের আঁকা দেখতে। সেই থেকে বলা যায় – সুলতান ছড়িয়ে যেতে শুরু করলেন লোকের মুখে মুখে। এখন যে ঢং-এ আঁকেন তিনি তাঁর প্রিয় মানুষের অবয়ব তার সূচনা হয়েছিল কাশ্মীরের শ্রমরত মানুষের ছবি আঁকার সময়েই। কাশ্মীর থেকে যুদ্ধের ডামাডোলে পড়ে করাচী এসে থামলেন আবার। করাচীতে তাঁর প্রথম প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন ফাতেমা জিন্নাহ্। পরে আরও কয়েকটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় তাঁর। করাচীতে এসে কাশ্মীরের ল্যাণ্ডস্কেপ ও বাঙালী নারী আর ক্ষেতের কৃষকদের ছবি এঁকেছেন প্রচুর। ছবির মধ্যে এ সকল মানুষের ঐতিহাসিক ধারা বির্বতনকে তুলে আনতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি সে সময়। কারণ শুধু আঁকার বিষয়টি নয়, কি আঁকবেন সেটাও স্পষ্ট হয়ে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে। আঁকার পাশাপাশি সে সময়কার খ্যাতিমান পাকিস্তানী শিল্পীদের সঙ্গে একত্রে গঠন করেন আর্ট কাউন্সিল যা পরে পরিণত হয় শিল্পকলা একাডেমীতে এবং করাচীতে আর্ট কলেজ গড়ে তোলেন। সুলতান ততদিনে নিজেকে হিসাবে গোনার মতো খ্যাতিমান করে তুলেছেন। একাডেমিক ডিগ্রী না থাকুক কারাচী আর্ট কলেজে পড়ানোর কাজটি ঠিকই পেয়ে গেলেন। করাচীতে ছিলেন ১৯৫০ সাল পর্যন্ত। এক শিক্ষা বিষয়ক সংগঠনের আমন্ত্রণে ১৯৫০ সালে চলে যান আমেরিকায়। সেখানে অবশ্য তাঁর কোনো শিল্পকর্মের প্রদর্শনী হয়নি। আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যের শিশুদের স্কুলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেছেন তিনি। জেনেছেন কিভাবে তাদের পড়ানো হয়, পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয় — এই সব খুঁটিনাটি বিষয়াদি।

সেমিনারে বক্তৃতা দিয়েছেন, সাক্ষাতকার দিয়েছেন ভারতীয় সভ্যতা আর সংস্কৃতি বিষয়ে। এরপর আমেরিকা থেকে সফর শেষে লণ্ডন চলে আসেন সুলতান। লণ্ডনে বেশ অনেক দিন কাটিয়েছেন তিনি। সেখান থেকে প্রায় গোটা ইউরোপ চষে বেড়িয়েছেন। কলকাতায় কৈশরে-যৌবনে শাহেদ সোহরাওয়াদীর দোতলার লাইব্রেরির স্তব্ধতায় বসে বসে বইয়ের পাতা মেলে যেসব উজ্জ্বল মানুষের নাম দেখেছেন, দেখেছেন তাদের কালজয়ী সৃষ্টির অনুকৃতি — সেই সব অনন্য শৈলীর সামনে দাঁড়িয়েছেন দৃষ্টি ও হৃদয়ের দরজা মেলে দিয়ে। শুধু দেখাইতো নয়, শিল্পের বিষয় নিয়ে, দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, কলাকৌশল নিয়ে বিস্তর আলোচনা করলেন সমকালীন শিল্পীদের সঙ্গে। ছবি আঁকাও চলছিল এর মধ্যে। লণ্ডনে বেশ কয়েকটি প্রদর্শনীও করে ফেলেছেন এর মধ্যেই। তাতেই শিল্প রসিকেরা ঠিকই চিনে নিয়েছেন তাঁর ভিতরের মহৎ প্রতিভাকে। অনন্য এক ঘটনা ঘটে গেল এ সময় তার জীবনে। লণ্ডনের লিষ্টার গ্যালারিতে সমকালীন মাষ্টার আর্টিষ্টদের এক শিল্পকর্মের প্রদর্শনীতে অংশ নেয়ার জন্য প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ আমন্ত্রণ জানালেন সুলতানকে। আমেরিকাতে আঁকা কয়েকটি ল্যাণ্ডস্কেপ জমা দিলেন তিনি প্রদর্শনীর জন্য এবং এভাবেই সুলতান এশিয়ার প্রথম শিল্পী হিসাবে পাবলো পিকাসো, সালভাদর দালি, পল ক্লী, প্রমুখ জগৎ বিখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে এক শ্রেণীতে এসে দাঁড়ালেন। এ বিরল সাফল্য ও সম্মান আমাদের আর কারও নেই।

এ রকম একটা অবস্থায় ইউরোপে শেকড় ছড়িয়ে বসা মোটেই অসুবিধার বিষয় ছিল না সুলতানের পক্ষে। কিন্তু সুলতানের জীবনে তখন পাতা মেলতে শুরু করেছে নতুন এক অধ্যায়। 'প্রবজ্যা পর্ব'র ইতিটানা হয়ে গেছে। সুলতান স্থির করে নিলেন তাঁর পরবর্তী জীবন। অকপটে নিজেকে মেলে ধরলেন নিজের কাছেই। সেখানে দেখতে পেলেন চিত্রার পাড়ে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছে বহুদিনের না দেখা এক লাল মিয়া। খেজুরের তাল-শুপারির ধনুকের মতো বাঁকা শাখাগুলো যেন জননীর মতো হাত নেড়ে নেড়ে ডাকছে ইশারায়। নির্জীব কৃষকের পাঁজরভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস কানে ভেসে এলো যেন তাঁর। ইউরোপে তিন বছর কাটিয়ে ৫৩-তে পিঠ অবধি ঢেউ খেলানো চুল আর সাদা আলখাল্লায় দীর্ঘ কৃশ শরীর ঢেকে সুলতান এক 'অন্য রকম মানুষ' হয়ে নামলেন ঢাকা বিমানবন্দরে। অল্প দিনের মধ্যেই শুধু 'অন্য রকম' নয় খ্যাপাটে মানুষ বলে পরিচিতি জুটে গেল তাঁর স্বদেশে। তার লম্বা চুল, সাদাকালো গেরুয়া আলখাল্লা, বড় তামাকের কল্কে, কুকুর-বিড়াল-জীব জানোয়ারের সঙ্গে সাবলীল আন্তরিকতা – এ সবই আলোচনার ও লক্ষ্য করার মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল সাধারণ মানুষের কাছে তো বটেই কলারসিক বোদ্ধাদের কাছেও। সুলতানের কাজের চেয়ে সুলতান নিজেই

দর্শনীয় বস্তু হয়ে পড়লেন স্বদেশীদের কাছে। যার ঘোর কাটেনি আজও পুরোপুরি। এই অবস্থাকে আরও তুঙ্গে পৌছে দিল যখন সুলতান গেরুয়া শাড়ি (থান) পরে, পায়ে নূপুর বেঁধে ঢাকার রাজপথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। মুখে না বললেও অনেকেরই মনে মিশ্রীর মতো দানা বাঁধতে শুরু করেছিল এই বিশ্বাস যে, সুলতান সত্যি সত্যি এবার পাগল হয়ে গেছেন। হাসনাত আবদুল হাই তার 'সুলতান' উপন্যাসে লিখেছেন, 'শাড়ি পরে বেরুলেই পাড়ার ছেলেরা পিছনে তাড়া করতো। ক্ষ্যাপাতো হিজড়ে, হিজড়ে করে।'

ইউরোপ যার মধ্যে আবিষ্কার করেছিল অত্যন্ত বড় মাপের সৃজনশীলতা স্বদেশীরা তার মধ্যে পাগলামি আর নষ্টামির বেশি কিছু খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়ে এক সময় উৎসাহ হারিয়ে ফেললো তাঁর প্রতি। তিনি নিজে কোন অভিযোগ করেননি যদিও, তবু শোনা যায় ঘনিষ্ঠদের মধ্যে থেকেই অনেকে সেদিন চেয়েছিলেন। গোপনে চেষ্টাও করেছিলেন যাতে সুলতান তার বিশালতাকে মেলে দিয়ে ঢাকায় মহীরুহ হয়ে দাঁড়াতে না পারেন। কার ওপর অভিমান করবেন সুলতান? কাকে দেখাবেন রাগ? যেমন একদিন আকস্মাৎ কাউকে না জানিয়ে নড়াইল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন লাল মিয়া তেমনি আবার অকস্মাৎ ফিরে এলেন একাকী নিজস্ব-নির্জনে।

ঢাকায় থাকতে প্রচুর ছবি এঁকেছিলেন। কিছু বিক্রি হয়েছিল, সেসবের কিছু চলে গেছে চতুর সন্ধানীদের সঞ্চয়ে। গ্রামে ফিরে সহসাই আর হাত দেননি আঁকায়। নড়াইল থেকে আরও নিবিড় গ্রামে গাছ-গাছালী ঢাকা প্রকৃতির মধ্যে এসে দাঁড়ালেন তিনি। এই যে তাঁর প্রত্যাবর্তন অদ্ভুত বেশভূষায়, কেন, কিসের জন্য?

— 'প্রকৃতি আমার ভালবাসার বিষয়। ভালবাসতে হলে কাছে যেতে হয়। যেতে হয় সে যেমনি তেমনি করে। তাকে উভয়েরই চিনে নেয়ার, বুঝে নেয়ার বাধাগুলো পেরিয়ে যাওয়া যায় সহজে। আমেরিকা-ইউরোপের ছাপমারা সুলতানের সঙ্গে কুড়িগ্রাম-মাছিমদিয়ার ক্ষেতের কৃষকরা অন্তরঙ্গ আলাপে সুখ-দুঃখের ভাগাভাগি করে নিতে আসবে না। আসতে পারবে না। একটা জড়তা-ভয় মনের দরজা বন্ধ করিয়ে রাখবে তাদের। আমি লাল মিয়া হয়েই তাদের সঙ্গে একই গাছের ছায়ায় বসে ভাল-মন্দের খোঁজ-খবর নিতে চেষ্টা করেছি। বিখ্যাত হওয়ার চেয়ে বাঙালি হওয়াটাই সব সময় বড় মনে হয় আমার। এখানে এখনও লাল মিয়া বলেই বেশি লোকে চেনে আমাকে।' — এইরূপ বললেন সুলতান। সুলতান আর লাল মিয়া এবার এতদিন পরে এসে শীর্ণ চিত্রার পাড়ে দাঁড়িয়ে মিলে গিয়েছিল পরস্পরে। দু'য়ে মিলে তখন এক অন্য মানুষ তিনি। রং তুলি ছেড়ে স্কুল গড়তে শুরু করলেন স্কুল পালানো লাল

মিয়ার বয়সী ছেলে-মেয়েদের জন্য। এই স্কুলের ধারণার মধ্যেও ছিল তার আপন চিন্তার মৌলিকতা। প্রচলিত ধারার পাঠশালা খোলার কোন আগ্রহ ছিল না তার। শিশুদের মনে সৌন্দর্যের নিষ্কলুষ বোধ ও চেতনা জাগিয়ে দেয়ার জন্য সচেষ্ট হলেন তিনি। 'চারুপিঠ' 'নন্দন কানন' নামের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান চালুও করেছিলেন 'অফিসের বাধা' 'সমাজের অনিচ্ছাকে' হটিয়ে দিয়ে। আশৈশব এই একগুঁয়ে ভাবটি কেমন করে যেন রয়েই গেছে তাঁর মধ্যে। যা করতে সিদ্ধান্ত নেন তা না করা পর্যন্ত নিজেকে নিয়োজিত রাখেন তিনি। জঙ্গল কাটলেন। পোড়ো জমিদার বাড়ি উপযোগী হলো বসবাসের, চালু হলো সুলতানের স্কুল একদিন। চাষী শ্রমিকের হাওরের ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে এলো সৌন্দর্যের পাঠ নিতে। ছবি আঁকতে। 'আর্ট কালচার' চাষা-ভূষার ছেলে-মেয়েদের কাছে এক নিষিদ্ধ জগৎ হয়েই ছিল এতদিন। আজও তা প্রায় তাই আছে। সুলতানই প্রথম ভেঙ্গেছিলেন সেই দেয়াল আমাদের জনপদে। সুলতান সাধারণ মানুষের অন্তরের সুলতান হওয়ার পথে এগিয়ে গেলেন এভাবেই।

নিজের ছবি সম্পর্কে তেমন কিছু আর বলতে চান না সুলতান। যেন এক শিশুতোষ অভিমান সেতারের তারের মতো কাঁপিয়ে দেয় তাঁর স্বর।

'আর কত, অনেকতো হয়েছে। এই সব ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সৌন্দর্যের চেতনা জাগিয়ে দিতে হবে। সেটাই আসল কাজ। সংসারে মানুষ এখন হানাহানি নিয়ে মেতে আছে। মানুষ অনেকদিন বাঁচে। মানুষের মতো আরও অনেক প্রাণী অনেকদিন বাঁচে। কিন্তু মানুষের বাঁচাটা তাদের চেয়ে আলাদা। আমরা জন্ম নিয়ে কয়েক বছরের মধ্যেই মানুষ হওয়ার তাড়না পাই। তার পরেই পথ হারিয়ে ফেলি। যদি এই সময়টিতে ঠিকভাবে লালন না করা যায় শিশুদের তবে তারা অন্ধকারের পথে চলে যায়। আমেরিকায় আমি দেখেছি সেখানকার শিক্ষায় শিশুদের জন্য ফাইন আর্ট বাধ্যতামূলক। এটা কেন তারা করেছে? কি এর উপকারিতা? প্রতিটি শিশুর মধ্যেই প্রতিভা থাকে। বলা যায় এই প্রতিভা বিকাশের জন্য জন্ম নেয় তারা। এই প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে আমাদের। আমার স্কুলে আমি ড্রয়িং বাধ্যতামূলক করব। এতে প্রথমে তারা প্রতিটি দৃশ্যমান বস্তুকে সঠিকভাবে দেখতে শিখবে। তারপর ভাবতে শিখবে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক। যার যে বিষয়ে প্রতিভা আছে সে সে বিষয়ে চলে যাবে। এই চিত্রশিক্ষা যে শুধু শিল্পী সৃষ্টি করবে তা নয়। এই সুন্দর বিশ্বকে সুন্দর করে দেখার জন্য শিশুদের মানস গড়ে তুলতে হবে। তাদের এই প্রতিভাবে যদি কাজে লাগান না যায় তাহলে তা নষ্ট হয়ে যায়। শিশুদের মধ্যে সৌন্দর্যের বোধ জাগিয়ে দিতে পারলেই সন্ত্রাস, হানাহানি থেকে বিরত থাকবে তারা।

আজকের দিনের ছেলে-মেয়েরা বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে জন্মেছে। তাদের সঠিক শিক্ষায় তৈরি করে নিতে হবে। দেখিয়ে দিতে হবে সঠিক পথ। এরাই তাহলে পারবে বাঙালী জাতির মুক্তি ঘটাতে। স্বপ্ন সফল করতে। এই ছেলে-মেয়েদের ছাড়া অন্যদের দিয়ে আর এই কাজ করানো যাবে না।'

সুলতান তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলে যাচ্ছিলেন অমিত সম্ভাবনাময় কচিপ্রাণদের নিয়ে তাঁর ভাবনার কথা। বলতে বলতে হঠাৎ করেই কিছুটা প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়ে আপাত সাযুজ্যহীন গভীর ইঙ্গিতময় আলাপচারিতা সুলতানের অভ্যস্ত কথনরীতি। অনেক সময়ই তাঁর আলাপের বিষয় শ্রোতাদের কাছে কিছুটা দুর্বোধ্য মনে হতে পারে কিন্তু তাঁর কথা বলার ভঙ্গিটাই এমন স্বচ্ছ ও আন্তরিক যে, তাঁর অন্তরের উপলব্ধি শ্রোতার উপলব্ধিকে অনায়াসে গভীরে স্পর্শ করে যায়। যেমন শিশুদের প্রসঙ্গেই বলছিলেন তিনি ঃ

— 'আমাদের এই বিশাল পৃথিবী। আর আছে গভীর সমুদ্র। ... তাদের নিয়ে এমন করে ভাববার আর কে আছে এই জনপদে।'

সুলতানের এখন একমাত্র ধ্যানজ্ঞানের বিষয় এই দেহাতী মানুষদের সন্তানেরা। বহু কাঠ-খড় পুড়িয়ে তাদের জন্য একটি স্কুল খুলেছেন তিনি। বোধহয় কারও জানতে বাকি নেই সেই স্কুলের নাম রেখেছেন তিনি 'শিশু স্বর্গ'। শ'দুয়েক ছেলেপুলে ভোর হতেই খাতা-পেন্সিল বগলে নিয়ে, যার নেই সে খালি হাতেই চিত্রা নদীর পাড়ে সাদা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বাড়িটির লোহার গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজা খুললেই একে একে সারি করে ভিতরে এসে ঢোকে তারা। বাড়িটির মধ্যে গেটের সঙ্গেই ফাঁকা একটা ঘর। তারমধ্যে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা ছোট-বড় বিভিন্ন সাইজের ক্যানভাস। কোনটির বুক ধবধবে সাধা। কারও বুকে পড়েছে সুলতানের দু'একটি সৃজনী চিহ্ন। কারও বুকে ফুটে আছে প্রকাণ্ড কৃষকের লাঙল চালানেরা দৃশ্য। এটাই সুলতানের স্টুডিও। তারই একপাশে টেবিল পাতা। টেবিলে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা বাচ্চাদের আঁকার সরঞ্জাম। সেসব নিয়ে তারা বাইরে চলে আসে।

স্টুডিওর সামনে দিয়ে ইংরেজি 'এল' অক্ষরের মতো খানিকটা জায়গায় টিনের ছাউনির নিচে দু'সারি করে বেঞ্চ। আঁকা শুরু করার আগেই অদূরে রান্নাঘর থেকে 'পায়েস' চলে আসে তাদের জন্য। সকালের খাবার খেয়ে আবার কাজে মগ্ন হয়ে পড়ে তারা। আঁকা ছাড়াও নাচ, আবৃতি, অভিনয়, পরিবেশ, কৃষি আর সাধারণ পাঠ বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয় তাদের। সুলতান ইঞ্জিন লাগানো প্রকাণ্ড এক কাঠের দ্বিতল নৌকা তৈরি করেছেন তাদের জন্য (বর্তমানে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এটি বিকল হয়ে

আছে। মেরামতের অর্থ নেই সুলতানের কাছে)। নৌকায় শিশুদের সঙ্গে নিয়ে চিত্রার বুকে ভাসতে ভাসতে বহুদূর ভাটির দিকে চলে যেতেন তিনি। আঙ্গুল তুলে তাদের চিনিয়ে দিতেন বাংলার সবুজ গাছ-পালা। বুঝিয়ে দিতেন রঙের বিন্যাস। দেখিয়ে দিতেন কাগজে জলমেশা রং কিভাবে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়ে বাংলার শ্যামল মুখ তাতে ফুটিয়ে তুলতে হয়।

শরীরে সামর্থ আর নেই আগের মতো সুলতানের। শিশু স্বর্গ পরিচালনায় মাস মাস যে মোটা অংকের টাকা দরকার সেটা যোগাড়ের দুশ্চিন্তা, যে বাড়িটি সরকার বরাদ্দ দিয়েছে সেটা নিয়ে চলছে মামলা মোকদ্দমা। কোর্টে পর্যন্ত হাজিরা দিতে হচ্ছে তার জন্য (তার নিজের যে পৈত্রিক সমান্য ভিটা ছিল তার সবটাই বেদখল হয়ে গেছে)। তার ওপর আছে রোগব্যাধি। আয় বলতে শিল্পকলা একাডেমীর দেয়া রেসিডেন্স আর্টিস্ট-এর মাসিক ন'হাজার টাকা ভাতা। তার জন্য আবার বছরে ছয়টি করে ছবি জমা দিতে হয়। প্রদর্শনী করার জন্য অনেকেই ছবি নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে টাকা দিতে ভুলে গেছেন। সুলতানতো তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে যাবেন না। সারাজীবনই আপন সৃষ্টি দু'হাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এসেছেন এই বয়স্ক শিশুটি। আজ কেমন করে আর পাল্টে নিবেন নিজেকে। তিনি সংবাদ সম্মেলন করে জাতির কাছে আবেদন করেছেন বহুবার 'শিশু স্বর্গ'কে সঙ্গতিসম্পন্নরা একটু সাহায্য করুন। অথবা সরকার ট্রাস্ট গঠন করে ভার নিয়ে নিক তাঁর সম্পত্তির। মামলা-মোকদ্দমায় আর যেতে পারছেন না তিনি।

স্বর্গের সৌন্দর্য দিয়েই শিশু স্বর্গকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সুলতান। বেশ বড় আয়তাকার পরিধির চারপাশ প্রাচীরঘেরা বাড়িটি ফুলের গাছে গাছে ভরিয়ে দিয়েছেন সুলতান। এক সময় নিজ হাতে পরিচর্যা করতেন গাছগুলোর। এখন আর পারেন না। জানালা দিয়ে নির্নিমেশ চোখ মেলে দেখেন সকালে-বিকালে গাছের পাতা, পাতায় রোদের স্বচ্ছ আদর। কান পেতে শোনেন পূর্ব দিক থেক ভেসে আসা গাভীর হাম্বা ডাক। সেখানে বাতাবীলেবুর গাছের নিচে গোয়াল ঘর। তার পাশ দিয়ে বড় বড় খাঁচা। তার মধ্যে সুলতানের পোষা জন্তুরা হুটোপুটি করে। দুটি মুখপোড়া হনুমান আর কয়েকটি বাঁদর অযথাই সারাদিন হুটোপুটি করে। আদুরে ঢঙে পাশের খাঁচায় নরম ঘাসের ডগা চিবোয় খরগোশের দল। গিনিপিগ আর তুলতুলে বিলাতি ইঁদুরের দল খাঁচায় অর্থহীন খড় খড় শব্দ করে চলে সারা দিন। আর লম্বা ঠোঁটের ময়ূরের গায়ের রং-এর মতো পালকঢাকা প্রকাণ্ড মদনটাকটি একাকী আনমনা হয়ে সময়ের চলে যাওয়া দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। পায়ে পায়ে সুলতান ভোরের দিকে একবার তাদের সামনে এসে দাঁড়ান। দেব দর্শনের মতো আনন্দ হয় তখন তাদের। খাঁচায় লোহার

শিকগুলোর ফাঁক গলিয়ে হাত বাড়িয়ে দেন তিনি তাদের দিকে। এক অভূতপূর্ব দৃশ্য তখন ঘটে যায় এই ব্যতিব্যস্ত জনপদের আড়ালে; বহুদূর ছায়াময় এক গৃহকোণে। ভাষা, শব্দ যার প্রকাশ ঘটাতে অক্ষম। সুলতানের হাত স্পর্শ করে অবোধ সেই সব পশুপাখিকে। ভাষাহীন বোধে জানাজানি হয়ে যায় মানুষের ও মানবেতর প্রাণীতে। সুলতান নিজে প্রচলিত পন্থায় ঈশ্বরের সেবাতো করেননি কোনদিন, কাউকে বাধাও দেননি করতে। বাড়ির দক্ষিণ অংশে দু'টি টিনের ছাপড়ার নিচে তুলসীতলা। সেখানে ছোট শীতলা প্রতিমা। প্রসন্নকান্তি নিয়ে দেবী তার উপস্য। সুলতান এইসব দেখেন আর ঘরে ফিরে বার বার নির্বোধ পশুদের সামনে, মাটি ফুঁড়ে অনিবার্য বেরিয়ে আসা বৃক্ষরাজির সামনে, প্রবহমান চিত্রার বাঁকে, তার বাঁকে বাঁকে খেটে খাওয়া, রোদে পোড়া, বৃষ্টিতে ভেজা জীর্ণ মলিন মানুষ-মানুষীর শিশুর সামনে এসে দাঁড়ান। এদেরই মধ্যে খুঁজে নেন জীবনের গভীরতম অর্থ, খুঁজে নেন স্রষ্টা বলে, ঈশ্বর বলে কোনো এক পরমের অস্তিত্ব।

সংসারের কথা কোনদিন ভাবেননি এই এলোমেলো প্রাকৃতিক মানুষটি। কিন্তু শেষ বয়সে এসে সেই সংসারের ফাঁকেই জড়িয়ে গেলেন ঘোরতরভাবে। ব্যাপারটা ঘটলো শিশুদের নিয়ে কাজ করতে গিয়েই। কোমলপ্রাণ কুঁড়িদের নিয়ে তো আর রোজ বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে পারেন না তিনি। তাই এবার সুলতানের শেকড় ছড়িয়ে বসবার প্রয়োজন। সে ঠাইতো কোন ভূখণ্ড নয়। অস্তিত্বহীনতার প্রবল অস্তিত্ব – 'সংসার' বলে থাকে লোকে। সংসারে ফিরলেন 'মুক্ত দেদার' সুলতান। ঘটনাটি ঘটলো খানিকটা আকস্মিকভাবেই। সুলতানের জীবনের এই দিকটায় আমরা লক্ষ্য করলে দেখব সেখানে 'আকস্মিকতার' যোগটি বেশ প্রবল। 'হরিপদ সা' নামে এক অন্ত্যজ হিন্দু দেহাতী মানুষের সঙ্গে নড়াইলে ফিরবার পর তাঁর আত্মার যোগসূত্র গড়ে ওঠে। লোকটির স্ত্রী নীহারবালা কাকু বলে শ্রদ্ধা জানান সুলতানকে। নীহারবালা নড়াইল হাসপাতালের স্টাফ নার্স। বাসনা ও পদ্ম দুটি মেয়ে তাদের। হরিপদ হুট করে একদিন মারা গেলেন আজ থেকে প্রায় ২৫-২৬ বছর আগে। সুলতানের যোগটি তাদের সঙ্গে প্রায় ছিন্নই হতে বসেছিল। কিন্তু নিয়তির অন্য রকম পরিকল্পনা ছিল সুলতানকে নিয়ে। বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন সুলতান একবার। চিকিৎসা করতে এলেন শেষমেশ নড়াইল হাসপাতালে। এখানে বলে রাখা যায় ডাক্তারী চিকিৎসাকে তেমন মান্য-গণ্য করেন না সুলতান নিজের ক্ষেত্রে। ওষুধে তাঁর তেমন কাজ হয় না, ওষুধ না খেলেই বরং ভাল থাকেন বলে সুলতানের ধারণা। এই সুলতান যখন হাসপাতালে ভর্তি হতে আসেন তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না সুলতানের জীবনে বার্ধক্যের দাগ লেগে গেছে, শরীরে ঘোষিত হয়েছে অসুখের সাম্রাজ্য।

নীহারবালার দাঁড়াবার আশ্রয় বলে কিছু ছিল না। স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিলেন সুলতানের পরিচর্যার ভার। চাকরি ছেড়ে দু'মেয়েকে নিয়ে দাদুর আশ্রয়ে উঠলেন তিনি। সেটা আজ থেকে প্রায় ২৫ বছর আগের কথা। বাসনা ও পদ্মকে ম্যাট্রিক পাস করিয়ে বিয়ে দিয়েছেন দাদু। তবে পদ্ম দাদুর কাছেই আছে মায়ের সঙ্গে। সেই চিঠিপত্র এলে দাদুকে পড়ে শোনায়। চিঠি পড়ার মতো চোখের শক্তি আর নেই দাদুর। 'লাল মিয়া' আর 'সুলতানের' দিন ফুরিয়ে এখন শুরু হয়েছে 'দাদুর' সময়। সারাদেশের শিশুদেরই প্রিয় দাদু এখন তিনি। প্রতিবছর তাঁর জন্মদিনে দেশের আনাচে-কানাচে থেকে শিশুদের দল নড়াইলের অজ পাড়াগায় তাদের স্বর্গে চলে আসে। সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছেন পলিত কেশ, শীর্ণদেহ মমতায় মাখা মুখ এক দাদু। যেন সেই বড়দিনের রাতে ক্রিষ্টমাস গাছে গোপনে সব মিষ্টি কেক, আর তাজা ফল ঝুলিয়ে রেখে যাওয়া এক জীবন্ত 'সান্তাক্লস বুড়ো।'

সুলতানের কথা বলতে গেলে এই 'নীহারবালা মা' নামের সেবাপরায়ণ মাতৃমূর্তির কথা মনে করতেই হবে যে কারও। আর সব বাদ দিলেও আজকের এই বিছানায় পড়ে যাওয়া সুলতানকে ভাত-পানি ওষুধ তুলে খাইয়ে শারীরিকভাবে তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই নীহারবালা মা ছাড়া অন্য কেউ আর নেই সুলতানের পাশে। তার কাছ থেকেই শোনা গেল সাম্প্রতিক সময় কিভাবে কাটছে সুলতানের। খুব সকালে ঘুম ভাঙে সুলতানের। সামান্য ঘি আর আলু ভর্তা দিয়ে সামান্য নরম ভাত খেয়ে নেন। শরীর ভাল থাকলে হাঁটতে বের হন। কোনো কোনো দিন নদীর পাশ দিয়ে অনেক দূরেও চলে যান। ইচ্ছে হলে সামান্য হেঁটে এসে আঁকতে শুরু করেন। লোকজন এলে আঁকতে আঁকতেই তাদের সঙ্গে কথাবর্তা চালিয়ে যান। খুব বেশি সময় একটানা এখন আর আকেঁন না তিনি। দুপুরে সূর্য মাথার ওপর ওঠে এলেই তাজা মাছের ঝোল দিয়ে সামান্য ভাত খেয়ে নেন। কচু শাক তাঁর খুব প্রিয়। রাতে কোনো কোনদিন ভাত খান অথবা এক বাটি স্যুপ খেয়ে দশটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েন। বড় কষ্টে চলছে সংসার। মাসে প্রায় ৩০ হাজার টাকার মতো খরচ হয়। শিল্পকলা একাডেমী থেকে পান ঐ ন' হাজার আর কিছু আসে ছবি বিক্রি করে। তাও আবার অনেকেই ছবি নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে কিন্তু টাকা দেয় না। চট্টগ্রাম থেকে একবার প্রদর্শনী করার কথা বলে ট্রাক বোঝাই করে ছবি নিয়ে গিয়ে সব বেঁচে দিয়েছে তারা—একটি পয়সাও পাননি সুলতান। কাল মারা গেলেতো কিছুই রেখে যাবেন না। তখন কি হবে নীহারবালার—তা ভাবতে পারেন না তিনি। যা তাঁর বলা স্বাভাবিক তাই বললেন: 'কি জানি কি আছে আমার কপালে? শিশু স্বর্গের ছেলেরা আছে। এরাই ভরসা।' শিশু স্বর্গের নিজেরই ভবিষ্যত যেখানে সুলতানের জীবদ্দশাতেই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে,

সেই শিশু স্বর্গ নীহারবালা মাকে কতটুকু ভরসা দিয়েছে, দিতে পেরেছে – কেমন করে তা নিশ্চিত জানা যাবে?

সুলতান তেমনই মানুষ নিজের জন্য কিছু দাবি করার লজ্জা যাদের প্রকাশ্য রাজপথে নগ্ন হওয়ার লজ্জার চেয়েও প্রবল। নিজের পরিশ্রমের মূল্যও পাননি যিনি তিনি কেমন করেই বা আর কিছু চাইতে পারেন। দিল খোলা মানুষ তিনি বড় অকপটে তাই বলে গেলেন :

'ইউরোপেও অনেকে চেনে আমাকে। এজন্য ধন্য মনে করি নিজেকে। তাদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় আমার কথা শুনেছে এটা আমার গৌরব বলতে পারেন। কিন্তু আমার নিজেরই মনে হয় – কোনো মহৎ কর্ম, কোনো ভাল কিছু হয়নি আমার দ্বারা। অসংখ্য মানুষের ভালবাসা পেয়েছি, স্নেহ পেয়েছি। আমার কাছে এটাই সব থেকে মূল্যবান। তবে ছোটদের জন্য যদি একটা গাইড লাইন দিয়ে যেতে পারতাম তাহলে ভাল কিছু হতো। তাতো হলো না।'

না পারার এই অতৃপ্তিতে এখনও বিচলিত বোধ করেন সুলতান। বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে যান : 'কিছু করার উদ্দেশ্য নিয়ে শিল্প করিনি। আমার জন্মস্থানের প্রতি একটা 'সেন্টিমেন্টাল' অনুভূতি আছে। সেখান থেকেই মনে হয়েছে গ্রামে কিছু কাজ করতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে, সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে শিল্পবোধকে আমাদের এখানে মেলানো হয়নি। এই কাজটি করতে হবে প্রথমে। আমি চাই গ্রামের মানুষদের মধ্যে থেকেই 'আর্ট ক্লাস' হোক। যেমন কবিদের মধ্যে থেকে একদিন জন্ম নিয়ে বেড়ে উঠেছে আমাদের সাহিত্য। আমাদের নিজস্ব সৌন্দর্য, রেখা রং খুঁজে নিতে হবে গ্রামের মধ্যে থেকেই। বড় একটা গ্রামইতো আমাদের দেশটা। এই গ্রামের মানুষের মধ্যে 'এ্যাসথেটিক সেন্স' ছড়িয়ে দিতে হবে। তাহলেই সাজিয়ে গুছিয়ে বাঁচতে শিখবে তারা। এই সাজানো-গোছানোর বোধ না জন্মালে সাধারণ জাগবে না কখনও। এটা না হলে তার কোনো উন্নতি হবে না কোনোদিন। অভাবের মধ্যে গোছানো-সাজানো জানলে সুন্দর করে থাকা যায়। হাজার বছরের এই শোষিত-শাসিত কৃষকদের জীবন বদলাতে হলে সৌন্দর্যের বোধ জাগাতে হবে তাদের মধ্যে। ঘরে শুধু খড় বদলে টিন চাপিয়ে দিলেই হবে না। সৌন্দর্য চিনলেই সে বুঝবে কত অসুন্দরভাবে সে বেঁচে আছে। এটা বুঝলেই সুন্দর জীবনের জন্য সংগ্রাম শুরু হবে তার। তখন নিজেই সে বদলে নিতে পারবে তার জীবন সুন্দর করে। সেই শক্তিও তাদের শরীরের মধ্যেই আছে। আমি সেই শক্তিকেই আঁকিয়ে দেখিয়েছি তাদের। এজন্যেই তাদের কাছে আসবার দরকার ছিল আমার। জয়নুলও বুঝেছিলেন এই ব্যাপারটি। চেষ্টাও

করেছিলেন। আমাকে ঢাকায় থাকতে বলেছিলেন জয়নুল-কামরুল ওরা। আমি থাকিনি। আমি তাদের বলেছিলাম আমার জীবনের লক্ষ্য আলাদা। আমি গ্রামে চলে এসেছি।'

মানুষের প্রতি দুর্নিবার ভালবাসাই তাঁর মধ্যে জন্ম দিয়েছে এক অনন্য এক দায়িত্ববোধ। 'শিল্প শিল্পেরই জন্য শুধু' এই আপ্তবাক্যটির মোহ থেকে সেই অনন্য দায়িত্ববোধই সুলতানকে দিয়ে 'শিল্পকে জীবনের সঙ্গে' মিলিয়ে দিতে অনুপ্রাণিত করেছে। 'সমাজের ভবিষ্যত নির্মাণের জন্য সবচেয়ে বড় কাজটি শিল্পীরই' – এসব বিশ্বাস করেন সুলতান। 'সমাজ থেকে দূরে নির্বাসনে যাওয়া চলে না শিল্পীদের। জয়নুলেরই কথাই ধরুন – পরের প্রজন্মের জন্য যে পথ তিনি করে দিয়ে গেলেন শিল্পচর্চার – তা না করে কেবল বসে বসে যদি ছবিই একে যেতেন তাহলে এত বড় জয়নুল হতেন না তিনি। জয়নুল যতবড় শিল্পী তার চেয়ে অনেক বড় সামাজিক। জয়নুলের আসল মহত্বই এই সামাজিক জয়নুলের মধ্যে,' বললেন তিনি।

সরাসরি রাজনীতির কথা বলতে স্বস্তি বোধ করেন না সুলতান। তিনি সবচেয়ে বেশি মূল্য দেন 'দেশপ্রেম' নামের সেই শাশ্বত সত্যের প্রতিই। এই বস্তুটি যে দুর্লভ হয়ে গেছে আমাদের জনপদে তা ভেবে ব্যথিত হন সুলতান। এরই প্রভাব পড়েছে আমাদের শিল্পে সাহিত্যে। নির্দিষ্ট করে নিজেদের চিনে নেয়ার দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসছে আমাদের শিল্পীদের। এই বর্তমান নিয়ে কোন ভবিষ্যতের দিকে যাবে আমাদের শিল্প আমাদের চারুকলা সুলতানের কাছ থেকে তা জানতে ইচ্ছে হবে আমাদের।

'কিছুকাল এরকমই চলবে। এখন 'ওয়েস্টার্ন কালচার ডোমিনেট' করছে। যখন দেশ প্রেম জেগে উঠবে তখন এই ধারা বদলে যাবে। এখনতো ঠিক দেশ প্রেম বলতে নির্দিষ্ট করে কিছু বোঝানো হচ্ছে না — নির্দিষ্ট করে দেখানো হচ্ছে না আমাদের 'কৃষি কালচার'। ম্যাণ্ডেলাকেও যেভাবে যে দৃষ্টিতে দেখছি, আমাদের দেশের নেতাদেরও সেভাবেই দেখছি। এককভাবে তো আমাদের ঐতিহ্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরছিনা আমরা। সব জায়গাতেই একটা 'হতাশা' পাতায় পাতায় ঘষা লাগার শব্দের মতো কিসমিস করছে। সবার মনেই একই কথা 'কি হবে!' সেই যে 'ওভার ফ্লুয়েন্স' মানসিকতাকে ইস্যু করে একবার সারা ভারতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হল তাইতো জ্বলছে এখনও। কিন্তু এটাই শেষ নয়। শুভ বুদ্ধি–একদিন এসে যাবে মানুষের। এলে এসব আর থাকবে না। মানুষের সত্যিকার প্রতিজ্ঞাই হোল 'মানবোচিত গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধন'। এই বোধ একদিন জাগবে মানুষের। এই প্রতিজ্ঞা একদিন করবে

তারা।'

সুলতান যখন মানুষের জন্য এক সুন্দর ভবিষ্যতের কথা বলেন, মুহূর্তের জন্য যেন অসুস্থ মনে হয় না তাকে। লম্বা লোমওয়ালা টেরিয়ার কুকুরটি এসে তার ঠাণ্ডা-ভেজা নাক দিয়ে মৃদু টুঁস দেয় বিছানার কিনার থেকে ঝুলিয়ে দেয়া পায়ের পাতায়। বহু বিড়াল ছিল এক সময় সেগুলো আর নেই। উঠান জোড়া ফুলের বাগান থেকে নিরালা কোনো অলস সময়ে দু'একটি প্রজাপতি উড়তে উড়তে জানালা নিয়ে ঘরের মধ্যে চলে আসে। প্রাত্যহিক গেরস্থালীর পরিচিত শব্দের টুকরো ভেসে আসে। নিভৃতে উঁচু আম গাছটির কোনো ডাল থেকে খসে পড়ে শুকনো পাতা। টুনটুনী পাখিগুলো গায়ে ফুলের রেণু মেখে সারাক্ষণ উড়ে উড়ে বেড়ায়। ছাদে এসে বসে পায়রার ঝাঁক। এরই মধ্যে দিয়ে মেঘে মেঘে বেলা কেটে যায় সুলতানের। বিয়ে করাটা আর হয়েই ওঠেনি এর মধ্যে। ভেবেছিলেন কি করবেন? —'না, না সে রকম গভীর চিন্তা হয়ইনি কখনও। এদিক থেকে আমি নিজেও ব্যতিক্রম মনে করি নিজেকে। এক সময় মনে হতো এ জীবন কিছু নয়। সংসার করব না। মুক্ত থাকবো। এক রকমের আধ্যাত্মিকতাও ছিল এক সময়। দায়িত্ববান মনে হয়নি নিজেকে আবার অন্য সময় দেখেছি তাও নয় ব্যাপারটা—অনেক দায়িত্ব আছে আমার। অথচ মনে হয়েছিল সংসারে জড়িয়ে গেলেই কেবল দায়িত্ব আসবে। মুক্ত থাকতে পারবো না। বেশি করে মনে হয়েছে নিজের সংসারে থাকলে মানুষ স্বার্থপর হয়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে যায়। আমি এটা পছন্দ করিনি। এসব ভাবতে ভাবতেই আর বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি।'

'প্রেম' বলতেও সমূহ মানুষের প্রেম ছাড়া অন্য কোনরূপ প্রেমের আকাঙ্খা করেননি কখনও। গৃহহীন গৃহী হয়ে যে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছেন সুলতান সে জীবন তার আঁকা মানুষগুলোর মতোই 'বিশিষ্ট', স্বতন্ত্র। তাঁর আঁকা ছবিগুলোর তুলনা যেমন তার ছবি ছাড়া আর কিছুতেই দেয়া যায় না—তাঁর জীবনও এরকমই। তাঁর ছবির প্রকাণ্ড অবয়বের পাথরে গাঁথা চেহারার মানুষদের তাদের শ্রম ও সাধনা নিয়ে, সবে মাত্র আলোচনা শুরু হয়েছে আমাদের শিল্পবোদ্ধা মহলে। দেশে ফিরে '৭৬ সালে প্রথম প্রদর্শনীতেই মাঝখানের বিস্মৃতিকে তুড়ি মেড়ে উড়িয়ে দিয়ে সমকালীন শিল্পকলার জগতে নিজের জন্য স্থায়ী আসনটি তৈরি করে নিয়েছেন তিনি। এরপরে আরো দু'টি প্রদর্শনী হয়ে গেছে তাঁর। কিছু দিন আগেই ঢাকার গ্যালারি টোন-এ হয়ে গেল তাঁর সাম্প্রতিক ড্রয়িং-আর জল রং-এর কাজের প্রদর্শনী। শিল্পকলা একাডেমীতেও দেশের শীর্ষ ন'জন সমকালীন চারুশিল্পীর সঙ্গে হয়ে গেল তার শিল্পকর্মের প্রদর্শনী। 'সুলতান' কতখানি আন্তরিকভাবেই যে একজন 'শ্রমিক' মনে করেন নিজেকে শ্রমের

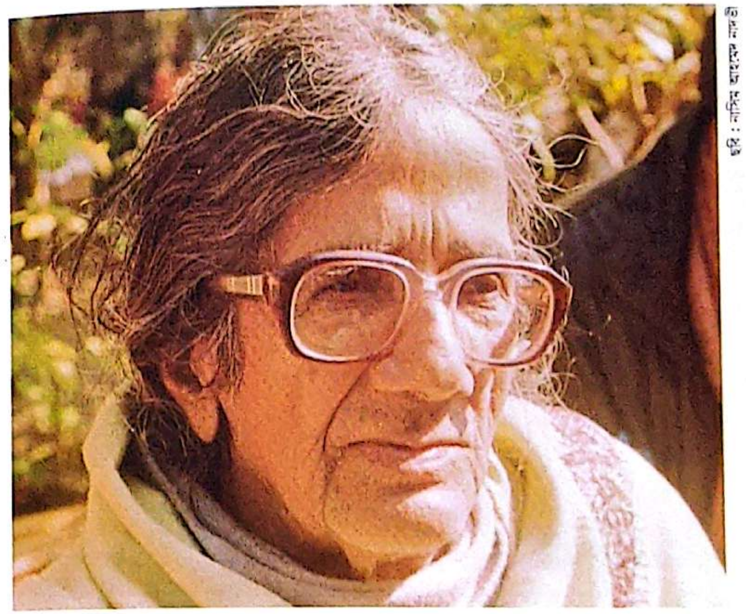
মধ্যে দিয়েই তার প্রমাণ দিয়েছেন আমাদের। শরীরে সামর্থ নেই। তবু আঁকছেন। প্রকাণ্ড এক 'স্ক্রলে' বাংলায় কৃষকদের জীবনের ধারাক্রম ফুটিয়ে তোলার দু:সাহসিক কাজে হাত দিয়েছেন এর মধ্যেই। সর্বতোভাবেই চারুকলাকে শহুরে মানুষের দামী ড্রয়িং রুমের 'শো পিস' হওয়া থেকে মুক্তি দিতে সংগ্রাম করছেন তিনি। আরও কত সহজ, স্বল্প ব্যয়ে চিত্র রচনা করা যায় তারই চেষ্টা করছেন তিনি। সাদা চটকে পেরেক ঠুকে লাগিয়ে নিচ্ছেন কাঠের ফ্রেমে। তাতে চড়িয়ে দিচ্ছেন সাদা ঘন রঙের প্রলেপ। তারপর তাতে কাল রেখার ড্রয়িং-এ ফুটিয়ে তুলছেন অবয়ব, নিসর্গ। তারপরে অধিকাংশই প্রকৃতির উপাদান থেকে তৈরি করা রং মাখিয়ে দিচ্ছেন যেখানে যতটুকু প্রয়োজন। পরে তাতে তেলের বার্নিশ দিয়ে দিচ্ছে তার 'পোক্ত সাগরেদ' নাতী-নাতনীদের কেউ কেউ। এইভাবে হয়ে যাচ্ছে সুলতানের ছবি। তারপর সেটা কোথায় যাচ্ছে তা নিয়ে বড় একটা মাথা ব্যথা নেই তার। মানুষের ঘরে যাচ্ছে এটাই বড় কথা তাঁর কাছে। আরও একটু ভাল রং দিলে, ভাল ফল হত আরও এসব কথা তাঁর কাছে খুব বেশি মূল্যবান মনে হয় না। যে শক্তির প্রতীক হিসাবে মানুষদের এঁকেছেন তিনি তাতে কেবলই বাস্তবতার ধরা ছোঁয়ার বাইরের মনোহর জিনিস, তা নয়। চাষাদের ফসল ফলানোর মধ্যে, ক্ষরা বন্যায় সংগ্রাম করার মুহূর্তে, স্বাধীনতার যুদ্ধে, স্বাধিকারের যুদ্ধে আরও বহু অতীত সংগ্রামে সেই শক্তি প্রকাশিত রূপ অন্য সবার মতো দেখেছেন তিনিও। অনেকেই স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠে পর মুহূর্তেই নিভে গিয়ে ভুলে গেছেন জ্বলে ওঠার কথা—সুলতান তা ভোলেননি। বরং চেষ্টা করেছেন সেই শক্তির স্ফুলিঙ্গকে দাবানলের মতো জ্বালিয়ে দিতে। তাই তার ছবির সামনে দাঁড়ালে ছবির সঙ্গে অন্তর মিলিয়ে নিতে দর্শকদের মোটেই চিত্র বোদ্ধা হওয়ার প্রয়োজন হয় না। প্রচণ্ড দুঃসময়ে, পায়ের নিচে যখন থর থর কেঁপে ওঠে মাটি সে সময়েও এস এম সুলতানের যে কোন ক্যানভাসের সামনে দাঁড়ালে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের মানুষের বুকে জ্বলে উঠবে সাহস আর সাবলীলতার নতুন সূর্য। প্রচণ্ড ইচ্ছে হবে বাঁচতে। ইচ্ছে হবে বদলে দিতে সবকিছু। ইচ্ছে হবে নতুন করে সাজাতে সংসার। এই 'ইচ্ছে করে', 'নতুন করে' সাজানো-একেই 'সৌন্দর্য' বলেছেন, সুলতান। সৌন্দর্য কথাটি বড় 'এ্যাবস্ট্রাক্ট'। 'কয়েকটি জিনিসকে সুন্দর করে প্লেসিং করলে সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। যেমন লেখার টেবিলে বই-খাতা-পেন্সিলগুলো সাজিয়ে রাখলে একটা সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। গোটা সংসারটাও এরকম। তাকে সাজাতে হবে।'

এই ষড় ঋতুর বৈভব ভরা দেশে বড় মাপের ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টার বেরুলোনা—এই দুঃখ, আগামীকালের প্রজন্মের জন্য সুন্দর এক দিকনির্দেশনা না দিতে পারার বেদনা নিয়ে সৌন্দর্য দিয়ে সংসার সাজাতে বসেছেন সত্তর বয়সের সুলতান। সুলতান

নিজেকে অতিক্রম করতে পারেননি কথাটি যারা বলেন সুলতানের ক্যানভাস থেকে সুলতানের জীবনের দিকে চোখ মেলে তাকাবার প্রয়োজন তাদেরই বেশি। সেখানে দেখা যাবে সেই সুলতানকে, যিনি 'মিথ' কে নয় সাধারণ প্রাকৃতিক মানুষদেরই মিথের অধিক মহিমা দিয়ে করে তুলেছেন লাবণ্যময়। সুগন্ধী রেশমী রুমালের মতো যে খ্যাতি আর প্রতিষ্ঠাকে আমরা আদরে যত্নে বুকে পকেটে রেখে দিয়েছি–ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো তাকে পথের পাশের আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিয়ে যেতে দ্বিধায় কাঁপেনি যার বুক। দেখা যাবে সেই সুলতানকে যিনি পাশ্চাত্যের ফেলে দেয়া ছেঁড়া চটি জুতো আমাদের মতো পরম সম্পদ মনে করে টেনে নেননি বুকে। সেই সুলতানকে দেখা যাবে যিনি আপন চেতনায় আয়নায় দেখেছেন আপনার মুখ এবং সেই আয়না বাড়িয়ে দিয়েছেন অন্যদের দিকে। সেই সুলতান তিনি যিনি সত্তর বয়সে এসে আবার ফিরে পেয়েছেন শৈশব। লাল মিয়া হয়ে মিশে গেছেন চিত্রা তীরের শত শত শিশুদের মাঝে। প্রবীণ বৃক্ষের মতো সারাগায়ে সময়ের রেখে যাওয়া পুরাতন রোদ, কিছু উষ্ণ করস্পর্শের স্মৃতি, না বলা অভিমান নিয়ে প্রবীণ সুলতান হারিয়ে গেছেন যেন এক নতুন লাল মিয়ার মধ্যে। যেন এক জনমেই জন্মান্তর ঘটে গেছে সুলতানের। এই জন্মের গায়ে কোনো দিন লাগবে না মৃত্যুর দাগ।



সন্ত্রস্ত
পেন্সিল
১৯৫৯



বিশেষ মুহূর্তে শিল্পী সুলতান (১৯৯৪)



নড়াইলের বাড়ির আঙ্গিনায় অংকনরত সুলতান (১৯৯৩)



ছবি : সাইফুল ইসলাম চৌধুরী

নড়াইলে নিজ বাসভবন প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত ৭০তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে শিল্পী সুলতানকে প্রতিকৃতি উপহার প্রদান করছে ক্ষুদে শিল্পী

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক মোবারক হোসেন খান শিল্পী সুলতানের হাতে রেসিডেন্ট আর্টিস্ট হিসেবে নবায়নকৃত চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের পর তুলে দিচ্ছেন। সংগে রয়েছেন চারুকলা বিভাগের পরিচালক সুবীর চৌধুরী (১৯৯৪)





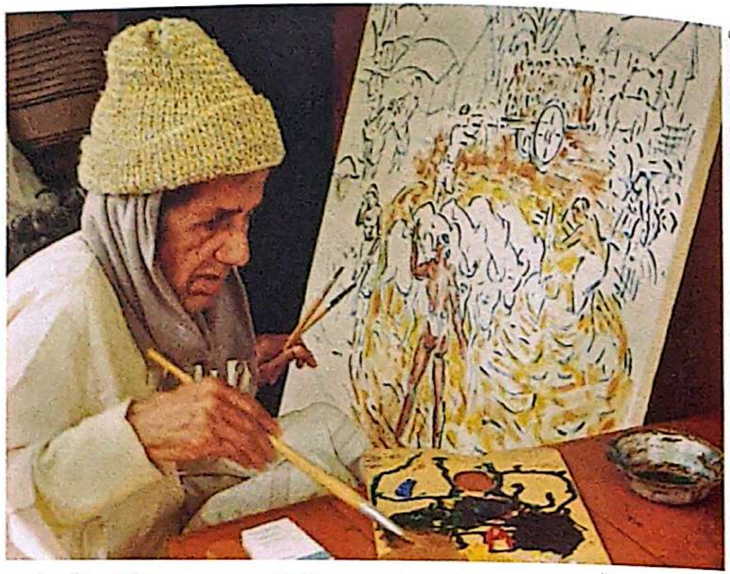
ছবি : সাইফুল ইসলাম চৌধুরী

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৭২তম জন্মবার্ষিকীতে শিল্পাচার্যের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে শিল্পী সুলতান (১৯৮৬)

শিল্পকলা একাডেমী মঞ্চে বাংলাদেশ চারুশিল্পী সংসদ আয়োজিত জয়নুল আবেদিনের জন্ম-বার্ষিকী অনুষ্ঠানে শিল্পী সুলতান (বাঁ দিক থেকে ১ম, ১৯৮৬)



ছবি : সাইফুল ইসলাম চৌধুরী



ছবি : নাসিম আহমেদ নাদভী

নড়াইলে নিজ স্টুডিওতে অংকনরত শিল্পী সুলতান (১৯৯৪)



ছবি : সাইফুল ইসলাম চৌধুরী

চিত্রা নদীর ঘাটে শিশুদের জন্য শিল্পীর তৈরী যন্ত্রচালিত দ্বিতল নৌকা (১৯৯৩)

লাল মিয়া আর চিত্রাসুন্দরী

নাসিম আহমেদ নাদভী

মূল কাহিনীতে যাওয়ার আগে দু'একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা দিয়ে শুরু করা যাক। শিল্পী এস. এম. সুলতানকে আমার ছাত্রাবস্থা থেকেই চিনতাম। কিন্তু তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হয় ১৯৭৬ সালের গোড়ার দিকে। আমরা তিন সহপাঠী সুবীর, সাইমন এবং আমি তিন জনই তখন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর চারুকলা বিভাগে কাজ করি। সৌখিন ভাস্কর কাজী মতিউর রহমান (আমাদের মতিভাই) নড়াইল থেকে শিল্পী সুলতানকে ঢাকায় এনে শুরু করলেন তাঁকে নিয়ে শিল্পকলা একাডেমীতে নিয়মিত আসা যাওয়া। এ সময়েই শিল্পীর নিজের মুখে তাঁকে ঘিরে নানা অলৌকিক ঘটনা শোনার দুর্লভ সুযোগ মেলে আমাদের। এক সময় সিদ্ধান্ত হল শিল্পীর একক প্রদর্শনী আয়োজিত হবে শিল্পকলা একাডেমীর গ্যালারীতে। এর ফলে সাইমন এবং আমার শিল্পীর সাথে আরো বেশি ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হয়। অবশেষে সেপ্টেম্বর '৭৬–এ আয়োজিত হল শিল্পী এস. এম. সুলতানের সেই সাড়া জাগানো চিত্র প্রদর্শনীটি। এই প্রদর্শনীর পর শিল্পী সুলতান হলেন সমাজের প্রভাবশালীদের অহংকারের বস্তু। কাজী মতিউর রহমান এদের কাছে তখন অচেনা মানুষ, এমনকি শিল্পীর কাছেও।

১৯৭৯ সালে আমি সরকারী বৃত্তি নিয়ে চলে যাই ভারতে। এর পরপরই সাইমন চলে যায় রাশিয়ায়। ১৯৮২ সাল, মিউজিয়লজিতে উচ্চ শিক্ষার পর আমি ফিরে এসেছি দেশে। এর মধ্যে শিল্পী এস. এম. সুলতানকে সরকার রেসিডেন্টশীপ প্রদানের

সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীকে এ বিষয়ে সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমার ওপর দায়িত্ব পড়লো শিল্পীর জন্য বাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থা করা। কেমন বাড়ি হবে সে সম্পর্কে শিল্পী কতগুলো শর্ত জুড়ে দিলেন। সেই শর্তাবলীর মধ্যে ছিল—প্রথমতঃ বাড়িটি অবশ্যই একতলা হতে হবে, দ্বিতীয়তঃ ছাদের ওপর চিলে কোঠা ছাড়া আর একটি কামরা থাকতে হবে এবং তৃতীয়তঃ বাড়ির উত্তর ধারে লেক থাকতে হবে।

বাড়ি ভাড়ার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ ছিল সে অর্থে ধানমন্ডি বা গুলশান লেকের ধারে কোনো বাড়ি পাওয়া যাবে না বিধায় খোঁজ চললো অন্যত্র। একদিন হাজির হলাম মিরপুর ১২ নং সেকশনে। রাস্তায় দেখা হল এক বন্ধু ফিরোজ সাঁই-এর সঙ্গে। তিনি জানালেন তাঁর এক আত্মীয়ের একটি বাড়ি আছে মিরপুর ঝিলের ধারে এবং নিয়ে গেলেন সেখানে। বাড়িটি দেখে আমি চমকেই উঠলাম। মনে হল শিল্পী সুলতান বোধ হয় এই বাড়িটি তাঁর তৃতীয় নয়নে দেখেই শর্তগুলো জুড়ে দিয়েছিলেন।

পরবর্তী সময়ে আমার কর্মস্থল বদল করায় ১৯৮৪-৯৩ প্রায় একদশক শিল্পকলা একাডেমীর সাথে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগে কিছুটা ভাঁটা পড়ে। ঠিক এমন এক পরিবেশে বন্ধুবর সুবীর চৌধুরী শিল্পকলা একাডেমীর পক্ষ থেকে আমায় দাওয়াত দিলেন দ্বিতীয় পেইন্টিং ওয়ার্কশপে যোগদানের জন্য। স্থান নির্ধারিত হয়েছে নড়াইল। পরিচালনা করবেন শিল্পী এস. এম. সুলতান। সময়কাল ৯-১৮ই ফেব্রুয়ারী '৯৪। বাড়তি কর্মসূচী হিসেবে সুন্দরবন ভ্রমণ এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমি জলরঙে কাজ করে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। তেলরঙে তেমনটি বোধ করি না। এ দু'য়ের দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়লাম। পরে মনে হল এত ভাবনার আছে কি? জলরঙ সাথে রাখি, আর কিছু না হোক সুন্দরবন ভ্রমণ তো আছেই বোনাস হিসেবে।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী থেকে মোট ১৫ জন শিল্পীকে নির্বাচন করা হয়েছে এই ওয়ার্কশপের জন্য। আমি ছাড়া আর সকলকে নিয়ে একটি নৈশ কোচ ৮ই ফেব্রুয়ারী '৯৪ রওনা হয়ে গেল নড়াইলের উদ্দেশে। পারিবারিক এক জরুরী কাজ থাকায় এই দলের সাথে আমার যাওয়া হল না।

১০ই ফেব্রুয়ারী সকাল ন'টায় যশোর বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে একটা মাইক্রোবাস শেয়ার করে হাজির হলাম শহরের প্রধান বাস টার্মিনালে। চট করে মিলে গেল নড়াইল গামী একটি বাস। বাসে সামনের দরজা ঘেঁষে বসার জন্য একটা জায়গাও মিলে গেল। বাস কণ্ডাক্টর আর পাশের যাত্রীকে বললাম আমার গন্তব্যস্থলের কথা। অতএব যেখানে নামলে আমার সুবিধা হবে সেখানে আমাকে নামিয়ে দেয়ার অনুরোধ

করলাম। পাক্কা সোয়া ঘন্টা চলার পর বাস এসে থামলো নড়াইলের রূপগঞ্জ বাজারে। আমার পাশের যাত্রী বললেন আপনি এখানে নেমে যে কোনো রিকশা বা ভ্যানওয়ালাকে বলুন আপনি লাল মিয়ার বাড়ি যাবেন। ভাড়া নেবে তিন টাকা। এ অঞ্চলে শিল্পী এস. এম. সুলতান লাল মিয়া নামেই পরিচিত।

রিকশা এগিয়ে চলছে আমাকে নিয়ে সোজা উত্তর থেকে দক্ষিণে, ছোট্ট নড়াইল শহরের পুরোনো অংশের দিকে। হঠাৎ কতগুলা পুরোনো গাছ এবং পুরোনো দালানের ভাঙা ভিত দেখে একটু উৎসুক হয়ে রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল এলাকাটি নড়াইলের জমিদার বাড়ির। জমিদার বাড়িকে এখন কল্পনা করে নেয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। জমিদার বাড়ির লোকজনের নদীতে গোছল করার ঘাট ছাড়া আজ সব কিছুই বিলুপ্ত। কল্পনার পর্দায় একে একে ভেসে উঠলো জমিদার বাড়ির নানা ঘটনা যেগুলো শিল্পীর মুখ থেকে শুনেছিলাম ৭৬-এর দিন গুলোতে। এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলোম। হঠাৎ করে রিকশার বাঁয়ে মোড় নেয়া আমার সম্বিত ফিরিয়ে আনে। দেখলাম পিচঢালা পথ ছেড়ে রিকশা এগিয়ে চলছে সোজা পূর্ব দিকে ইট বিছানো রাস্তা ধরে। কিছুটা এগুতেই চোখ পড়লো আধুনিক নকশার একটি বড় ফটক যেখানে রাস্তাটি আবার বাঁয়ে এবং পরে ডানে ঘুরে সোজা চলে গেছে নদীর ধারে। রিকশা থেকে ফটকের গ্রীলের ফাঁকে চোখ পড়তেই দেখি শিল্পী সুলতানকে ঘিরে ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী ক'জন। রিকশা বিদায় করে ফটকের ভেতর কিছুটা এগুতেই শিল্পকলা একাডেমীর চারুকলা বিভাগের প্রদর্শনী অফিসার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, যিনি ওয়ার্কশপের সমন্বয়কারী, আমাকে স্বাগত জানাতেই ঘাড় ফিরিয়ে শিল্পী সুলতান বললেন—'আরে নাসিম যে! এখনই এলেন নাকি! রাস্তায় কোনো অসুবিধা হয়নি তো!' পাশের চেয়ার দেখিয়ে বললেন—'এই খানটিতে বসুন। একটু জিরিয়ে নিন। অনেকটা পথ তো আসতে হয়েছে। অনেক কষ্ট হয়েছে তাই না ভাই।'

সরকারী খরচে নড়াইলের এই কুড়িগ্রামে শিল্পী এস. এম. সুলতানের বাসগৃহ এবং স্টুডিও যেমনটি করে সাজানো হয়েছে সেটি এ রূপ—প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকতেই হাতের ডানে শিল্পীর স্টুডিও। সেটিকে পাশে রেখে একটু এগুলেই বাঁয়ে শিল্পীর বাসগৃহ। এই দু'ভবনের মাঝখানে প্রায় ফুট বিশেক খালি জায়গা। এখান দিয়েই স্টুডিও ও ভেতর আঙিনায় আসার রাস্তা ফটক থেকে প্রথমে পূর্ব-পশ্চিম পরে ডানে ঘুরে উত্তর-দক্ষিণ এবং এরপর বাঁয়ে ঘুরে ভেতর আঙিনায় চলে এসেছে শিল্পীর প্রাণপ্রিয় চিড়িয়াখানায়। যেটি তাঁর আবাসস্থলের দক্ষিণ এবং পূর্ব সীমানায় প্রাচীর ঘেঁষে অনেকটা ইংরেজী 'এল' এর মতন। আর একটি রাস্তা প্রধান ফটক থেকে

শিল্পীর বাসভবনের উত্তর দিকে বাগানের মধ্য দিয়ে পূর্ব প্রাচীরের ছোট গেইট দিয়ে সোজা চলে গেছে নদীর ঘাটে, যেখানে বাঁধা থাকে 'শিশু স্বর্গের' জন্য তৈরি করা যন্ত্রচালিত বজরা নৌকা। শিল্পীর সাধের গড়া 'শিশু স্বর্গের' ভবনটি নির্মিত হচ্ছে প্রাচীর ঘেরা জমির বাইরে। প্রধান ফটকে পৌছানোর ঠিক আগে ইট বিছানো রাস্তার বাঁ ধারে (উত্তরে) যে রাস্তাটি বাড়ির ভেতর আঙিনার দিকে ঢুকেছে তারই সাথে সমান্তরাল ভাবে পাতা আছে লাল রঙের বেঞ্চ, এবং তার সাথে লাল রঙের বাগানবিলাস যা লাল মিয়ার বাড়ি চেনাতে ভুল করে না। এ ছাড়া তাঁর বাসভবনের উত্তর পাশে বাগানের রঙ-বেরঙের পাতাবাহারও খুব সহজেই নজর কাড়ে। এখানে ফুলের চেয়ে বাহারী পাতার গাছই বেশী। আশেপাশের বড় বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে রোদের টুকরো টুকরো আলোগুলো যখন এই বিচিত্র রঙের পাতাগুলোর ওপর পড়ে তখন মনে হয় সমস্ত বাগানটাই যেন সুবৃহৎ একটি রঙের প্যালেট।

শিল্পী সুলতান একজন এ্যাজমা রুগী। শীতে তিনি একটু বেশি কাবু। বাচ্চাদের ছবি আঁকা শেখাবার জন্য যে বেঞ্চগুলো প্রথমে পূর্ব-পশ্চিম এবং পরে ডানে ঘুরে উত্তর-পূর্ব কোণের সৃষ্টি করেছে ঠিক সেখানে বসেই রোদ পোহাচ্ছিলেন তিনি। আমাদের মধ্যে একজন, সম্ভবত ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে সবেমাত্র স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নবীন শিল্পী আলপ্তগীন তুষার, তাঁর প্রতিকৃতি আঁকছিল। পরণে সাদা লুঙ্গি, পায়ে গরম মোজা, গায়ে ঘিয়ে রঙের শাল এবং মাথায় ঘিয়ে আর কালো রঙের ডোরা কাটা মাংকিক্যাপ। সকালের রোদের আলো পড়েছে তাঁর বাঁ-কাঁধ থেকে। অনেকটা ব্যাক লাইটিং বলা যায়। পাশের লালরঙের বাগানবিলাস আর বেঞ্চের লাল সার্ফেস থেকে লাল রঙ প্রতিফলিত হয়ে বড্ড চমৎকার পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। তাঁর পাশে বসতে বসতেই শিল্পী কে. এম. এ. কাইয়ুম এবং মাহবুব আকন্দ এসে যোগ দিল আমাদের সাথে। বেলা তখন পৌনে বারটা। আকন্দ বললো 'নাসিম ভাই অল্পের জন্য বড় মজার খিচুড়ী মিস করলেন'? ওকে থামিয়ে শিল্পী সুলতান বললেন—'আরে না মিস করবে কেন, ওর জন্য নিশ্চয়ই রাখা আছে। এই কে আছিস, এনে দে ওকে খিচুড়ী'। শিল্পীর ইচ্ছে অনুযায়ী তাঁরই ব্যবস্থাপনায় আমাদের সকলের খাবারের ব্যবস্থা তাঁর ওখানেই করা হয়েছে। জোগাড়যন্ত্র করে পাক করতে একটু দেরী হওয়ায় সকালের নাস্তা খেতে বেলা প্রায় ১১টা বেজেছিল। খিচুড়ী খাওয়া শেষে ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী অন্যান্যদের সাথে আলাপের ফাঁকে ফাঁকে ভালমত ঘুরে দেখে নিলাম শিল্পী সুলতানের আপন ভুবন।

ওয়ার্কশপ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য শিল্পী সুলতানের স্টুডিও আর বাসভবনের মাঝে বাচ্চাদের আঁকার জন্য যে বেঞ্চগুলো পাতা আছে তার ওপর সাময়িক ভিত্তিতে

টিনের চালা তৈরি করা হয়েছে বাড়তি ব্যবস্থা হিসেবে। আবার ক'জন নদীর ঘাটে বাঁধা বজরার ছাদকে বেছে নিয়েছেন তাদের স্টুডিও হিসেবে। ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী সকলকেই ৩×৩ ফুট পরিমাপের দুটো করে তৈলচিত্র সম্পন্ন করতে হবে এই ক'দিনে। সে অনুযায়ী ঢাকা থেকে ক্যানভাস, রঙ, তুলি আর পনেরটি ইজেল আনা হয়েছে। শিল্পী সুলতানের শারীরিক অবস্থা দেখে বুঝলাম তাঁর পক্ষে সশরীরে ওয়ার্কশপ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই তাঁর মতামত নিয়ে কাজ শুরু করাটা সমীচীন ভেবে আলাপ শুরু করতেই বিনয়ের সঙ্গে তিনি বললেন—'আপনাদের কিছুই দেখাবার নেই আমার। তা ছাড়া আমার শরীরও কথা শুনছেনা। আপনারা আমার এই অজপাড়াগাঁয়ে এসেছেন এতেই আমি খুশি। এ হচ্ছে নক্শী কাঁথার দেশ। নক্শী কাঁথার শিল্পীরা কখনও কাউকে গাইড করে না। আপন মনেই তৈরি করে অমন সুন্দর শিল্পকর্ম। আপনারাও যে যার স্টাইল অনুযায়ীই কাজ করুন। তবে আমি খুবই খুশি হব যদি আপনাদের ছবিতে এখানকার মানুষ আর প্রকৃতি ধরা পড়ে—'।

নক্শী কাঁথার প্রসঙ্গ উঠতেই প্রায় বছর দশেক আগে শিল্পী সুলতানের কিছু কথা আমার মনে পড়লো। ১৯৮৬ সাল। আমি তখন বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে কাজ করি। একদিন সকালে শিল্পী সুলতান সেখানে এসে হাজির। বললেন তিনি যাদুঘরটি ঘুরে দেখবেন। আমি নিজের ইচ্ছায় এগিয়ে এলাম। এক এক করে যখন আমরা নক্শী কাঁথার গ্যালারীতে হাজির হলাম তখন তিনি যা বলেছিলেন সেটি অনেকটা এরকম : 'কি সুন্দর কারুকাজ। কালান্তরে এসব এখন আমাদের বড় গর্বের লোকজ শিল্পকলা। অতি সাধারণ মানুষগুলোর ঐসব শৈল্পিক গুণাবলী দেখে আমরা ক্ষান্ত হচ্ছি। আমরা সকলে কি জানি এসব রচনার আড়ালে কত দুঃখ বেদনা হাসি কান্না লুকিয়ে আছে। গৃহস্ত বাড়ির বউ। সকল দিক সামাল দেয়া তার কাজ। তবুও কারো মন পাবার জো নেই। শাশুড়ি ননদী কথার ফোড়ন দিয়েই চলেছে। বউটির শৈল্পিক মন এরই ফাঁকে ফাঁকে বসছে কাঁথা নিয়ে। এখানেও শান্তি নেই, কোলের যে শিশুটি উঠোনে আপন মনে খেলছিলো সেও মাকে বসতে দেখে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে আবদার করছে দুধ খাবে বলে। এমনি পরিবেশে তাঁরা রচনা করেছেন এমন অসাধারণ লোকজ শিল্পকলা। বিশ্ববরেণ্য শিল্পী ভ্যান গগ সম্পর্কে বলা হয় তাঁর ছবিতে লাল রঙের প্রয়োজন হলে তিনি তুলি প্যালেটে না নিয়ে সেটি ডুবিয়ে দিতেন তাঁর হৃৎপিণ্ডে। গ্রাম বাংলার শিল্পীদের এসব কাঁথা দেখলে আমারও মনে হয় সামাজিক নানান প্রতিকূল পরিবেশে ওঁরা এসব শিল্পকলা রচনা করেছেন। সুঁইয়ের প্রতিটি ফোড়ন ওঁদের সেই ফোড় খাওয়া হৃৎপিণ্ডের কথাই আমাকে বার বার মনে

করিয়ে দেয়।'

পরের দিন ১১ই ফেব্রুয়ারী '৯৪। এক মিশ্র অনুভূতি নিয়ে খুব ভোরে আমার ঘুম ভাঙলো। সূর্য ওঠা পর্যন্ত বিছানায় এপাশ ওপাশ করে কাটালাম। বেলা উঠতেই শহীদুল্লাহ আর আমি সোজা চলে এলাম চিত্রা নদীর সরকারী ঘাটে। নড়াইলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল হোটেল সম্রাট -এ। এটি নদীর ঘাট থেকে খুবই কাছে। চিত্রা নদী সম্ভবতঃ পুরো নড়াইল শহরের পূর্ব দিক দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে এঁকে বেঁকে বয়ে গেছে। জোয়ার ভাঁটা নদীকে প্রভাবিত করে। ফলে প্রচুর কচুরিপানা জোয়ার ভাঁটার টানাটানিতে সব সময়ই সচল। বর্ষাকালে বাড়তি পানিতে নদী খাল বিল ভরে গেলে যেমনটি হয় অনেকটা সেই রকম এর দু'কূল। জোয়ার ভাঁটার কারণে নদীর পানি একটু ঘোলাটে বটে তবে নোংরা নয়। গোসল সেরে হোটেলে ফিরে কাপড় বদলে কাছের একটা রেস্টুরেন্ট থেকে নাস্তা করে একটি রিকশায় চড়ে রওনা দিলাম শিল্পী সুলতানের বাড়ির দিকে। আমাদের হোটেলটি রূপগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকায়। এখান থেকে শিল্পী সুলতানের বাড়ি প্রায় এক কিলোমিটার। সেখানে পৌঁছেই দেখি তিনি তাঁর দক্ষিণ বারান্দায় ক'জনের সাথে কি নিয়ে আলোচনা করছেন। আমাকে দেখেই বললেন—'চলুন ভাই নৌকোয় চড়ে একটু ঘুরে আসি দক্ষিণে—পেরুলী আর হাজীর হাটা থেকে'। আমি প্রস্তুত ছিলাম না। বললাম আসুক সকলে তারপর যে সিদ্ধান্ত হয় সেভাবেই কাজ হবে। ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের দল নেতা শিল্পী কাইয়ুমের সাথে আলাপ করে নৌকা ভ্রমণ পাকা করা হল।

আমরা প্রায় সকলেই যে যার প্রস্তুতি নিয়ে উঠে পড়লাম বজরায়। কিছু সময় পরে শিল্পী সুলতান এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। একজন তাকে নদীর ঢাল বাইতে সাহায্য করলো। বজরার সিঁড়িতে পা রাখতেই বললেন এবার আমি একাই পারবো। তাঁর পরনে হাল্কা ঘিয়ে রঙের সিল্কের পাঞ্জাবী। ঘাড়ে ঝোলানো পশমী শালটিও একই রঙের। সাদা ধবধবে ঢোলা ঢালা পায়জামা। পায়জামা আর পাঞ্জাবী দুটোই কড়া মাড়ে ইস্ত্রী করা, পায়ে বাদামী রঙের পাম্পশু পালিশে চক্‌চক্ করছে। হাতে দামী কালো রঙের ওয়াকিং স্টিক। লম্বা কোঁকড়া চুলে তেল দেয়ায় সেগুলো রোদের আলোয় রেশমের সুতোর মত দু'কান ঢেকে ঝুলে পড়েছে কাঁধের দু'পাশে। সব কিছু মিলে একটি ভিন্ন মানুষ। শিল্পী সুলতানকে এনে বসানো হল বজরার নিচের তলার ক্যাবিনের সামনে হাতলওয়ালা চেয়ারের ওপর। নিজের ঘর থেকে এ পর্যন্ত আসতেই তিনি হাঁপিয়ে উঠেছেন। দু'চোখ বন্ধ করে টেনে টেনে দম নিতে থাকলেন চেয়ারে বসে। এরই মধ্যে নদীর তীরে অনেক লোকের ভীড় জমেছে। একটিই ইচ্ছে তাদের দাদুকে (শিল্পী সুলতানকে) এক নজর দেখা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শিল্পী

সুলতান এ অঞ্চলের একজন কিংবদন্তী। তাঁকে এবং তাঁর গড়া 'শিশু স্বর্গ' বা চিড়িয়াখানা দেখার জন্য দূরদূরান্ত থেকে লোকজন এসে ভীড় জমায় প্রতিদিন। শিল্পী সুলতানের প্রতি এদের শ্রদ্ধা আর ভালবাসা দেখে অবাক লাগে। আমাদের মধ্যে ২/১ জন তখনও বজরায় এসে পৌছায়নি। তাই বজরা ছাড়া যাচ্ছে না। এদিকে শিল্পী সুলতান তাঁর শ্বাসকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এনেছেন দেখে আমি বজরার উপরতলায় এলাম। বজরাটি নির্মাণে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে সে অনুপাতে নির্মাণের সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং যথার্থ তত্ত্বাবধানের অভাবে এর সৌন্দর্য এবং সম্পন্নতা দুটোই অনুপস্থিত। বজরাটি লম্বায় আনুমানিক প্রায় ৪০/৫০ এবং পাশে ১০/১২ ফুট। ছাদের ওপর ছোট একটা ক্যাবিন জনা কয়েক লোক ঠাসাঠাসি করে বসতে পারবে। এর সামনের দিকে একটি মিনি ক্যাবিন সম্ভবতঃ হাল চালনার জন্য। তবে এখন বজরার পেছন থেকেই এটির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই খানেই আমাদের চার জন চেপে বসেছি। ক্যাবিনের সামনে ছোট্ট একটা পাটাতন। কতগুলো ফোল্ডিং চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেগুলো এই পাটাতনের ওপর পেতে বসেছে অন্যেরা। সবাই নদীভ্রমণ শুরু করার জন্য দলনেতাকে অনুরোধ করছে। ঠিক এমনি এক মুহূর্তে আমাদের বাকী সদস্যরা বজরায় এসে উপস্থিত। ইঞ্জিন অপারেটরকে বলা হল ইঞ্জিন চালু করার জন্য। বজরার নোঙর তোলা হয়েছে। ভাঁটার টানে বজরা কিছুটা ভাসতে শুরু করেছে। এদিকে শিল্পী সুলতানকে এক নজর দেখার জন্য নদীর তীরে যে মানুষগুলো ভীড় জমিয়েছে তাদের মানসিক অবস্থা চিন্তা করে আমি নীচে নেমে এসে শিল্পীকে অনুরোধ করলাম বজরার জানালা দিয়ে ওদের একটু দেখা দিতে। তিনি মুচকি হেসে বললেন—'ওরা সবাই পাগল, কেন যে আমাকে এতো ভালবাসে জানিনে'। তাঁকে জানালার ধারে নিয়ে আসতে সাহায্য করছি আর অন্য দিকে বজরার ইঞ্জিন চালু করার ব্যর্থ চেষ্টা চলছে। বজরার যাত্রীরা যে যার মত ইঞ্জিন অপারেটরকে গালমন্দ করছে। শিল্পী সুলতান জানালার ফাঁকে মাথা বের করে হাত তুলে অভিবাদন জানাতেই মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো আনন্দ আর উল্লাসে মাতিয়ে তুললো নদীর ধার। এরই মধ্যে ইঞ্জিন চালু হয়েছে। গিয়ার বদলের সাথে সাথে ইঞ্জিনের শব্দ আর বজরার গতি বৃদ্ধি পেতে থাকলো। নদীর ধারের মানুষগুলোর সেই সোরগোল ধীরে ধীরে আমাদের শ্রবণশক্তির বাইরে যেতে থাকলো। বজরার গতি এখন ক্রমেই দ্রুত থেকে দ্রুততর। এক সময় চিত্রার একটি বাঁক তাদেরকে আমাদের দৃষ্টির বাইরে নিয়ে গেল।

শিল্পীকে আবার চেয়ারে বসিয়ে আমি উঠে এলাম বজরার দোতলায়। এ মুহূর্তে বজরা চলেছে তার দ্রুততম গতিতে চিত্রার বুকে এঁকে বেঁকে। প্রতিটি বাঁকেই যেন সে

নতুনরূপে ধরা দিচ্ছে আমাদের চোখে বিচিত্র হয়ে। প্রচুর শুশুক (ডলফিন) ডাইনে বাঁয়ে সামনে ক্ষণিক দেখা দিয়ে আবার চোখের আড়াল হচ্ছে। এ দৃশ্য এখন অনেকটা দুর্লভ। চিত্রার দু'ধারে আনুপাতিক হারে লম্বা সারি সারি নারকেল, তাল, খেজুরের গাছ, আর তারই সাথে লাল টকটকে শিমুল। নজর কাড়া সুন্দরের মেলা যেন। নদীর ধারে ঝুঁকে পড়া বাঁশ ঝাড়ের নিচে রমণীদের ধোয়া-মোছা, কৃষকের গো-গোছল, শিমুলের ফাঁকে শিশুদের নদীতে ঝাঁপ। সব মিলিয়ে শিল্পী এস. এম. সুলতানের আঁকা ছবিগুলোর জীবন্তরূপ। শিল্পীর আঁকা ছবি বিশেষ করে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে আয়োজিত তাঁর একক চিত্র প্রদর্শনীটি যাদের দেখা আছে তারা কেউ এখানে এলে উপলব্ধি করতে পারবেন চিত্রার সাথে শিল্পী সুলতানের প্রেম কত নিগূঢ়, কত নিখাদ। '৭৬-এর ঐ প্রদর্শনীর জন্য তিনি প্রথমে ঢাকার রামপুরাস্থ ভাড়া-করা বাসভবনে এবং পরে ছবিগুলো চূড়ান্তভাবে শেষ করার জন্য শিল্পকলা একাডেমীর প্রধান গ্যালারীতে যখন কাজ করতেন তখন অবাক নয়নে দেখতাম কেমন করে ৪ × ১০ মাপের চাইনীজ হার্ডবোর্ডের পেছন দিকে উপর থেকে ক্রমাগত নিচের দিকে তুলিতে ছোট ছোট স্ট্রোক দিয়ে ছবিতে রূপান্তরিত করতেন। তিনি এই ছবিগুলো একবারেই ফিনিশ করতেন। চিত্রা নদীর প্রাকৃতিক রূপ আর শিল্পী সুলতানের ছবি আঁকার উৎসের কথা ভাবছিলাম। আমার এই ভাবনায় ভাঙন দিয়ে শহীদুল্লাহ্ এসে বললেন, 'নাসিম ভাই, সুলতান সাহেব আপনাকে নিচে ডাকছেন'।

বজরার নিচের তলাকে তিন ভাগ করলে পেছনের এক অংশ জুড়ে পায়খানা, রান্না করার জায়গা এবং ইঞ্জিন। মাঝখানের অংশে এক দিকে ফুট দু'য়েক ছেড়ে একটি ক্যাবিন এবং সামনের এক অংশ খালি। ক্যাবিনের মেঝেতে মোটা গদিপাতা বিছানা, ধবধবে সাদা চাদরে মোড়া, একটি বালিশ এবং তার সাথে বড় মাপের একটি কোল বালিশ। ইঞ্জিনের শব্দ সংগত কারণেই বেশি হলেও বিশ্রামের জন্য ক্যাবিনটি সত্যিই জুতসই। ক্যাবিনের ঠিক সামনে খালি জায়গায় চেয়ারে বসে আছেন শিল্পী সুলতান। চিত্রার নির্মল পরিবেশে তিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। এক চিলতে আলো বজরার জানালা দিয়ে শরীরের বাঁ অংশে গড়িয়ে পড়েছে ঠিক তাঁর কোলের উপর। অনেকটা বিখ্যাত শিল্পী রেমব্রান্টের লাইটিং-এর মত। আমি নিচে আসতেই হাসি মুখে বললেন, 'নাসিম কেমন লাগছে নদী ভ্রমণ—কেমন লাল রঙের শিমুল ফুটে আছে চারি দিকে। কি সুন্দর দৃশ্য। রঙ তুলি তো সঙ্গে আছে নাকি? এঁকে ফেলুন দু' একটা। আপনার তো ভাল দখল আছে জলরঙে'। আমি বললাম রঙ আনিনি তবে কালি আছে সাথে। আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন 'আরে ওতেই চলবে। কালো রঙের ওপর আর

কোনো রঙ হয় নাকি। এক রঙে ছবি আঁকতে বাহাদুরী বেশী। গত কাল যে ছবিগুলো কালি দিয়ে আঁকলেন তেমন করেই আঁকুন। বেশ মজা হবে—।' এই আহ্বানে আমি তাঁর আন্তরিকতাকে অনুভব করলাম। ভেতরে ভেতরে নিজের ওপর আমি আরো বিশ্বাসী হয়ে উঠলাম।

কাগজ, কালি আর তুলি নিয়ে বসে পড়লাম তাঁরই পায়ের কাছে মেঝেতে। আমি এঁকে চলেছি শিল্পী সুলতান এরই ফাঁকে বললেন আমাদের যাত্রা শুরু করতে বেশ দেরী হয়ে গিয়েছিল তাই ওদেরকে (বজরার মাঝিদের) বলেছি হাজী হাটা না গিয়ে যেন যাদবপুর যায়। আমি তাঁর কথায় যোগ না দিয়ে শুধু মাথা নেড়ে সায় দিলাম। এর মধ্যে প্রায় ঘণ্টা খানেক সময় পার হয়েছে। বজরার ইঞ্জিন থামানোর সংকেত বেজে উঠলে শিল্পী সুলতান বলে উঠলেন 'না এত তাড়াতাড়ি তো যাদবপুর পৌছানোর কথা নয়। এই কি হল রে!' এমন সময় বজরার ছাদের ওপর থেকে হট্টগোল শুনে এগিয়ে গিয়ে দেখি আমাদের গৌতম পাল বজরার ছাদ থেকে নদীতে পড়ে গেছে। প্রাণপণ সাঁতার কেটে তীরে আসছে। বজরা পারে ভিড়িয়ে গৌতমকে তুলে আবার শুরু হল যাত্রা। আমি নিচে এসে শিল্পীকে সব বলতে বলতে আমার অসমাপ্ত ছবি শেষ করার জন্য বসে পড়লাম। সব শুনে তিনি বলেন—'দেখ দেখি কি কাণ্ড, ওর কোনো ক্ষতি হয় নি তো!' আমি 'না' বলে কাজে মনোনিবেশ করলাম।

আমার ছবিগুলো ছিল মূলতঃ চিত্রা নদী আর তার দু' পারের নিসর্গ। ছবিগুলো ভালমত শুকোবার জন্য তাঁরই চেয়ারের সামনে বিছিয়ে রাখছিলাম। তিনি কখনও বাহ! কখনও চমৎকার! 'দেখ দিখি আমার চিত্রা কত সুন্দর হয়ে ধরা দিচ্ছে এই সাদা কালোতে—' এই সব বলে আমাকে উৎসাহিত করছিলেন। এক ফাঁকে শিল্পী সুলতানকে বললাম আপনি তো ফিগার ছাড়া কোনো ছবি আঁকেন না। আমার ছবিতে কোনো ফিগারই নেই। জবাবে তিনি বললেন—'ভাল ছবি দিয়ে কথা, তা ফিগার দিয়েই হোক আর ফিগার ছাড়াই হোক। প্রকৃতি নিজেই কথা বলে, এর গাছ-পালা, আলোছায়া পরিবেশ সবই। নির্জন প্রকৃতির রূপই আলাদা। কত গভীর।' এর মধ্যে অনেকটা সময় কেটে গেছে, আবার বজরা থামানোর সংকেত বেজে উঠলে শিল্পী সুলতান বললেন—'ভাই আমরা বোধহয় যাদবপুর এসে গেছি। গুছিয়ে নেন সবকিছু।' আমি তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দিতেই দেখি নদীর ধার দিয়ে দলে দলে নানা বয়সের মানুষ দৌড়ে আসছে বজরার পিছু পিছু। ছাদের ওপর থেকে একজন বললো এরা নাকি দৌড়ে আসে অনেক দূর থেকে। একটু সামনে তাকাতেই দেখি যে ঘাটে বজরাটি ভিড়বে সেখানে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে প্রচুর লোকজন।

এদের পোষাক-আশাক দেখে বুঝতে ভুল হয় না যে এটি হিন্দু প্রধান এলাকা এবং দরিদ্রতা এদের নিত্যদিনের সঙ্গী। বজরা পার ছুঁতেই জনাকয়েক বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ এসে আমাকে এক পাশে রেখে অনেকটা কোলে তুলে নামিয়ে নিয়ে গেলেন শিল্পীকে বজরা থেকে। এদের মধ্যে একজন আগেই বজরায় যে চেয়ারটিতে তিনি বসেছিলেন সেটি নিয়ে গেছেন। সবার শেষে আমি নামলাম বজরা থেকে। একটু এগিয়ে যেতেই আমার চোখে যে দৃশ্য ধরা পড়লো সেটি এক স্বপ্ন যেন।

মাঝারি ধরনের একটি উঠোন। উত্তর সীমানায় একটি চৌচালা টিনের ঘর। একটা হাল্কা লালরঙের বাগানবিলাস বেয়ে উঠেছে তার ওপর। পূর্বদিকে ছোট মাপের একটি রান্না ঘর। খোলা আকাশের নিচে বসে রান্নার জন্য বড় মাপের দুটো চুলো, গ্রাম অঞ্চলে এটা একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। পশ্চিম ভিটায় একটি বেড়ার ঘর। এ ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছোট একটি গোয়াল। গোয়াল ঘরের বাইরে তিনটে গাভী বাঁধা। এ দিকেই কয়েকটি নারকেল গাছ। বাড়ির দক্ষিণে চিত্রা নদী। নদীর ধার ঘেঁষে বেশ কয়েকটি খেজুর গাছ। আগেই বলেছি চিত্রা শান্ত প্রকৃতির। তাই খেজুর আর নারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে চিত্রাকে অনেকটা বড় দীঘির মত লাগছিল। চিত্রাকে পেছনে রেখে উত্তরমুখী হয়ে চেয়ারে ছড়ি হাতে আভিজাত্যের ছাপ নিয়ে বসে আছেন শিল্পী এস. এম. সুলতান। এখানে প্রায় সকলেই তাঁকে ঋষিকাকু বলে ডাকেন। তাঁর দু' পাশে বেঞ্চ পেতে আমাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের পেছনে অর্ধগোলাকৃতি হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে অপেক্ষাকৃত তরুণের দল। উত্তরে বসেছেন সব প্রবীণ এবং মেয়ের দল। সবাই প্রাণ ভরে দেখছেন তাঁদের ভক্তির মানুষটিকে। এক পর্যায়ে শুরু হল প্রণামের পালা। বয়োজ্যেষ্ঠরাই আগে এলেন। হাঁটু গেড়ে মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে এ শ্রদ্ধাঞ্জলি একেবারেই নির্মল, অকৃত্রিম। ছেলেদের পর মেয়েদের পালা। মাথায় পুরো ঘোমটা টেনে গলায় আঁচল জড়িয়ে সে প্রণাম। এসব দেখে খুব সহজেই বোঝা যায় এই প্রাণঢালা শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়া-নেয়ায় উভয় পক্ষই অভ্যস্ত। একে অপরের খোঁজ খবর জেনে নিচ্ছেন এরই ফাঁকে ফাঁকে। এমন ভক্তদের মধ্যে এসে শিল্পী সুলতান গুরু শিষ্যের পরিবেশটিই তৈরি করলেন যেন। এখানে তাঁকে অনেক বেশি ধীর স্থির মনে হচ্ছিলো। এরই ফাঁকে বাড়ির মেয়েরা আমাদের সামনে গুড় মুড়ি হাজির করেছে। প্রবীণদের মধ্যে একজন আমাদের জন্য ডাব পেড়ে দেয়ার জন্য বলেছেন। এখানে ডাব পাড়ার কৌশলটি বেশ আকর্ষণীয়, অন্তত আমার কাছে। গাছ থেকে একটি ডাব নিচে ফেলা হয়। গাছের নিচে একজন চটের বড় খালি বস্তার অপেক্ষাকৃত ছোট দৈর্ঘ্যের দুই কোনো হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরেন। ফেলে দেয়া ডাবটির মাটিতে আঘাত খাওয়ার আগ মুহূর্তে তার গতি এবং অবস্থান আন্দাজ করে

উচিয়ে মেলে ধরেন। ডাবটি বস্তায় আছড়ে পড়ার সাথে সাথেই এর গতিবেগ ব্যাহত হয় এবং অতি অল্প গতি নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ফলে ডাবটি ফেটে যায় না। আমাদের ক' জনের সঙ্গেই ক্যামেরা ছিল, উপরন্তু শিল্পকলা একাডেমীর ভিডিও ক্যামেরাও ছিল আমাদের সাথে। শিল্পী মাহবুব আকন্দ ওটা অপারেট করার দায়িত্বে ছিলেন। এই ডাবের পানি পান করতে করতে অনুভব করলাম আমরা সকলেই শিল্পী সুলতানকে ঘিরে এই স্বপ্ন রাজ্যে হারিয়ে গিয়েছিলাম। আমরা কেউ আমাদের ক্যামেরা ব্যবহার করিনি এই স্বপ্নগুলোকে ধরে রাখার জন্যে।

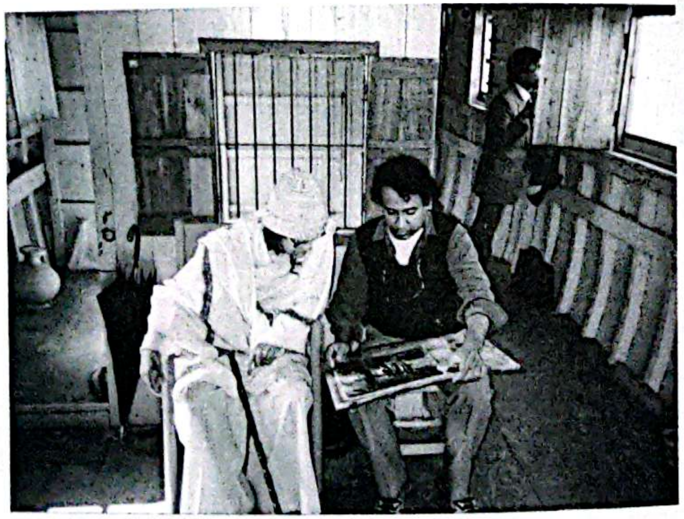
বজরা ভ্রমণে রওনা হওয়ার সময় দুপুরের খাওয়া বজরায় রান্নার জন্য সব কিছুই সাথে আনা হয়েছিল, বাবুর্চিও ছিল সাথে। বজরায় চুলোতে তেমন সুবিধে হয়নি তাই এই বাড়ির উঠোনে খোলা চুলোয় আমাদের রান্নার বাকি কাজটা করার ব্যবস্থা নেয়া হল।

আমাদের সকলের উদ্দেশে শিল্পী সুলতান বললেন—'আপনারা গ্রামের নির্মল অক্সিজেন গ্রহণ করুন ঘুরে ঘুরে।' স্থানীয়দের সাথে আলাপ করে জানা গেল ষাটের পুরো দশক শিল্পী এই এলাকায় কাটিয়ে ছিলেন। আমরা যে বাড়ির আঙিনায় বসেছিলাম সে বাড়িতেই ছিলেন প্রায় পাঁচ বছর। বাকী সময় গ্রামের অন্যান্য বাড়িতে। আমরা যে যার মত ছড়িয়ে পড়লাম গ্রামের এদিক ওদিক। একটু উত্তরে এগুতেই হাজির হলাম গাঁয়ের একটি প্রধান সড়কে। যেটি পূর্ব-পশ্চিমে চলে গেছে এঁকে বেঁকে। আর একটু এগিয়ে উত্তরে চোখ পড়তেই দেখি শিল্পী সুলতানের আঁকা সুবৃহৎ ক্যানভাস। সেই কুঁড়ে ঘর, ক্ষেতের আইলে খেজুর আর তাল গাছ, বিস্তীর্ণ প্রান্তর। নেই শুধু সবল গরু আর পেশাধারী সেই কৃষক কূল। একটি বিস্তীর্ণ আবাদী জমি। চারদিক থেকে ২/৩ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো বসতি নেই। শুধু ধু-ধু প্রান্তর। তারই মাঝখানে ছোট একটা বিলের ধারে কয়েকটি তালগাছ দেখিয়ে স্থানীয় একজন প্রবীণ বললেন ঋষিকাকু ঐ তাল গাছগুলোর নিচে গভীর রাতে বাঁশি বাজাতেন। তাঁর বাঁশি শুনে মাঝরাতে ঘুম ভাঙেনি এমন লোক এ এলাকাতে মেলা ভার। আর দিনের বেলায় লালরঙের শাড়ি পড়ে দু' পায়ে ঘুঙুর হাতে ত্রিশূল নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন একগ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। আমরা ঋষিকাকুর সাথে হেঁটে পারতাম না। দৌড়াতে হত। এমনি আরো অনেক বৈচিত্র্যময় ঘটনা বলতে বলতে প্রবীণ লোকটি আমাকে আবার বাড়ীতে ফিরিয়ে আনলেন।

বেলা পড়ে এসেছে, এবার বিদায়ের পালা। আবার প্রণাম শেষে সকলে মিলে তাঁদের ঋষিকে তুলে দিয়ে আসলেন বজরায়। এক সময় বজরার ইঞ্জিন গর্জে উঠে

যাদবপুরের মাটি ছাড়লো। আমাদের বজরা এগিয়ে চলেছে কুড়িগ্রামের দিকে। যাদবপুরের মানুষগুলো তাঁদের ঋষিকে যেন ছাড়তে চাইছে না। তাই অনেকটা পথ নদীর ধার ভেঙে আসলেন বজরার সাথে সাথে। পড়ন্ত বেলা আর চিত্রার বাঁক কখন তাদের আড়াল করেছে খেয়াল নেই।

সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। আমরা আমাদের দুপুরের খাওয়া খেতে বসলাম বজরার ছাদে। আমার ছবি আঁকার কালির দোয়াত রেখেছিলাম বজরার জানালার চৌকাঠে। কখন সেটি সবার অজান্তে পড়ে গিয়েছিল সেই জানালার নিচে রাখা রান্না করা ডালের ভেতর। ফলে ঐ ডাল ফেলে দেয়া ছাড়া উপায় থাকলো না। শুধু তরকারীই থাকল সবার জন্য। শিল্পী সুলতান আগেই বলেছিলেন তিনি বাসায় ফিরে একবারেই রাতের খাবার খাবেন। আমি খাওয়া শেষে নিচে এলাম। শিল্পী সুলতান আমাকে দেখে বললেন—'আর শরীরে কুলোচ্ছেনা, এবার একটু গড়িয়ে নেই'। আমি সাহায্য



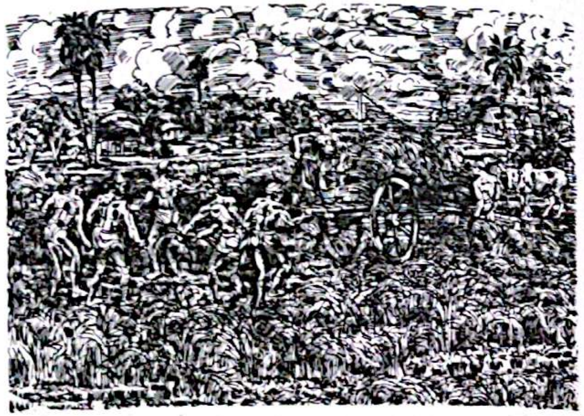
ছবি : মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

যাদবপুরের নৌভ্রমণে লেখকের আঁকা জলরং চিত্র দেখছেন শিল্পী সুলতান (১৯৯৪)

করলাম চেয়ার থেকে বিছানায় যেতে। বজরার গদিপাতা বিছানায় বসে তিনি গা থেকে পাঞ্জাবীটা খুলে ভাল মত শাল জড়িয়ে নিয়ে শুতে শুতে বললেন—'কেমন লাগলো যাদবপুর?' আমি উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম এত দিন পর এখানে এসে আপনার কেমন লাগলো? একটু গম্ভীর গলায় একটা শ্বাস টেনে বললেন—'যা যায় তা কি আর ফেরে কখনও। সেই সময়ও নেই বয়সও নেই যে ওদের একটু সুর শুনাবো। ঐ বাঁশি বাজানো আর শাড়ি জড়িয়ে নূপুর পায়ে পাগল সেজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো, এ সবই করেছি জেনেশুনেই। কারণ আমি জানতাম ওরা আমাকে এসব কারণেই ভালবাসে ওদের অন্তর থেকে। যা কিছু করেছি তা শুধু ওদের ঐ আন্তরিক ভালবাসার জন্যই।' এর মাঝে নানান কথায় চিত্রার প্রসঙ্গ উঠতেই শিল্পী যেন কিছুটা আবেগময় হয়ে গেলেন।

জড়ানো গলায় আপন মনে বলে চললেন : 'যৌবনে কল্পনার নানান আকর্ষণে আবেগে আপ্লুত হয়ে ঘুরে বেড়ালাম সারা ভারত বর্ষ। এতেও মন শান্ত হলনা, তাই পাড়ি জমালাম সাত সমুদ্র আর তের নদীর পাড়ে। সেখানেই ঘুরে বেড়ালাম আপন খেয়ালে। তারপর একদিন অনেকটা আচমকা মনের পর্দায় ভেসে উঠলো চিত্রাসুন্দরীর রূপপ্রকৃতি। রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করলাম তার প্রাণ উজাড় করা প্রেম আর ভালবাসাকে। আমি দিব্য চোখে দেখলাম চিত্রা আমায় হাতছানি দিয়ে বলছে তোমার আসন তো আমার অন্তরের মাঝখানে। কি লাভ ঐ মরীচিকার পেছনে ঘুরে। আমাদের বিরহকে দীর্ঘ করে! আমার মন উতলা হল আমি ফিরে এলাম ওর কাঁছে, না—ঘরবাঁধা হল না আমাদের। সময় সবকিছু উল্টা করে দিয়েছে। চিত্রা হল চিরবহমান আর আমাকে করলো বহেমিয়ান। সংসারই হল না যাদের তাদের আবার সন্তান! তাই তো জীবন সায়াহ্নে চিত্রার পাড়ে গড়ছি 'শিশু স্বর্গ'। কিছুটা থেমে আবার বিড়বিড় করে বলতে থাকলেন আমার জীবদ্দশায় না হোক চিত্রার প্রাণপ্রদীপ নিভে যাবার আগে এই 'শিশু স্বর্গ' নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে সেই চেষ্টাই যেন করে সকলে মিলে ...।'

ততক্ষণে বজরা ভিড়তে যাচ্ছে 'শিশু স্বর্গের' ঘাটে। সকলের হট্টগোলে লালমিয়ার শেষ কথাগুলো আর শোনা গেল না।



মাটি ও মানুষের শিল্পী সুলতান

আইয়ুব ভুঁইয়া

প্রখ্যাত ইংরেজ কবি কুপার বলেছেন, 'মানুষ তৈরি করেছে নগর, আর ঈশ্বর তৈরি করেছেন গ্রাম।' উপমহাদেশের নন্দিত শিল্পী সুলতানের ক্ষেত্রে একথাটিকে একটু পরিবর্তন করে বলা যায়, সমসাময়িক অন্যান্য শিল্পীরা যখন তাঁদের ক্যানভাসে নগর সভ্যতাকে ফুটিয়ে তুলতে ব্যস্ত তখন সুলতান তাঁর ক্যানভাসে গ্রাম বাংলার প্রকৃতি ও নিসর্গ এবং খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের জীবন সংগ্রামের গল্পকে অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন। সুলতান তাঁর ক্যানভাসে রং তুলির আঁচড়ে এ জনপদের মাটি ও মানুষের বঞ্চনাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর তুলির আঁচড়ে ক্যানভাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে এতদঞ্চলের মানুষের জীবন সংগ্রামের কাহিনী। তাই সুলতানকে বলা যায় মাটি ও মানুষের শিল্পী, প্রকৃতি ও নিসর্গের শিল্পী, জীবনের শিল্পী। যৌবনের উম্মাদনায় এ শতাব্দীর মাঝামাঝি সুলতান এশিয়া ও ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং অসংখ্য প্রদর্শনী করেছেন। কিন্তু মাটি ও মানুষের টানে, চিত্রা নদীর টানে, সুলতান মৃত্যুর প্রায় তিন দশক আগে আবার নড়াইলের মাটিতে ফিরে আসেন। যেমনিভাবে আরেক কৃতী মনীষী মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাটি ও মানুষের টানে, কপোতাক্ষ নদের টানে সুদূর ফ্রান্সের ভার্সাই নগরী থেকে ছুটে চলে আসেন। কি অপূর্ব মিল দু'জনের মধ্যে। দু'জনই আবার বৃহত্তর যশোরের অধিবাসী। আজ একজন চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন কপোতাক্ষ নদের তীরে, আরেকজন চিত্রা নদীর তীরে।

পৃথিবীতে খুব কম শিল্পীই সুলতানের মত এত ঘনিষ্ঠভাবে মাটি ও মানুষের সংগে, খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের সংগে জড়িত ছিলেন। এক্ষেত্রে সুলতানকে ডাচ শিল্পী ব্রুগেলের সংগে তুলনা করা যায়। গ্রামীণ ও কৃষক জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরার জন্য তাঁর বিপুল খ্যাতি ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর এ শিল্পী তখনকার সময়ের নেদারল্যাণ্ডের গ্রামীণ ও কৃষি জীবনকে তাঁর ক্যানভাসে চমৎকারভাবে তুলে ধরেন। কৃষক জীবনের নানা বৈচিত্র— বিভিন্ন মৌসুমে মাঠে কাজ করা, বীজ বোনা, ফসল কাটা ইত্যাদি জীবন্তভাবে তাঁর ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে। এর কারণও ছিল। ব্রুগেলের সময় নেদারল্যাণ্ডের কৃষকদের কঠিন সময় যাচ্ছিল। উৎপাদন ভাল হলেও মালিক শ্রেণীর হাতে তারা শোষিত হচ্ছিল। তারপরও হাসিগানে, উৎসবে, ভোজে তারা জীবন রাঙ্গিয়ে রেখেছিল। ব্রুগেলের বিষয়বস্তুর সংগে সুলতানের ছবির বিষয়বস্তুর চমৎকার মিল রয়েছে। ব্রুগেল যেমন কৃষক ও গণমানুষকে নিয়ে ছবি এঁকেছেন তেমনি সুলতানও গ্রামবাংলার মানুষকে নিয়ে প্রচুর ছবি এঁকেছেন। ব্রুগেলের 'হার্ভেস্ট টাইম' চিত্রে গ্রীষ্মকালে কৃষকের ফসল কাটার দৃশ্য চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। এ ছবিতে একটি বিশাল ফসলের মাঠে একজন কৃষক শস্য কাটছে। আর মাঠের এক পাশে গাছের তলায় নানা ভঙ্গিতে বিশ্রামরত কৃষকদের দেখা যাচ্ছে। এ ধরনের বিষয় নিয়ে সুলতানের অসংখ্য ছবি রয়েছে। ব্রুগেলের সংগে সুলতানের পার্থক্য শুধু এটুকু যে সুলতানের ছবির কৃষকরা পেশীবহুল, আর ব্রুগেলের কৃষকরা স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের। সুলতানের কৃষকরা বাংলার কৃষ্ণাঙ্গ আর ব্রুগেলের কৃষকরা নেদারল্যাণ্ডের শ্বেতাঙ্গ। তবে কৃষক জীবন নিয়ে আরো অনেকে ছবি এঁকেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন মিল, ভ্যান গগ ও কনস্টবল। মিলের একটি ছবির নাম হচ্ছে 'প্রার্থনা', এটি এক কৃষক দম্পতির ছবি। সন্ধ্যা নেমে আসছে, প্রার্থনায় যাবার সময় হয়েছে। কিন্তু তাদের গির্জায় যাবার সময় নেই। কাজের চাপ প্রচণ্ড। তাই স্বামী-স্ত্রী ক্ষেতের মাঝে দাঁড়িয়েই প্রার্থনা সেরে নিচ্ছে। কনস্টবল এবং ভ্যান গগের ছবিতেও আমরা কর্মরত মানুষের সাক্ষাৎ পাই। ভ্যান গগের 'পটেটো ইটার্স' এ ধরনেরই ছবি। এতে একটি দরিদ্র কৃষক পরিবার আলো আঁধারীতে বসে একনিষ্ঠ মনে আলু খাচ্ছে।

আগেই বলেছি সুলতানের তুলিতে এতদঞ্চলের মানুষের জীবন সংগ্রাম, ক্ষুধা ও দারিদ্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে তার 'মানুষের মানচিত্র' চিত্রটির কথা উল্লেখ করা যায়। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে স্পেনের গৃহযুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বাহিনী যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল গুয়ের্নিকা গ্রামে বিশ্ব নন্দিত শিল্পী পাবলো পিকাসো তাঁর বিদ্রোহী তুলির আঁচড়ে 'গুয়ের্নিকা' চিত্রে সে ধ্বংসলীলাকে জীবন্ত করে তোলেন। পাবলো পিকাসো তাঁর প্রতিবাদী ক্যানভাসে যে গুয়ের্নিকা সৃষ্টি করেন স্পেনের

গৃহযুদ্ধের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত গোটা ইউরোপকে বার বার সে চিত্রের বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। পিকাসো যেমন তাঁর 'গুয়ের্নিকা' চিত্রে স্পেনের গৃহযুদ্ধের ধ্বংসলীলাকে তুলে ধরেছেন তেমনি সুলতান তার 'মানুষের মানচিত্র' শিল্পকর্মে দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও সংগ্রামের কাহিনীকে তুলে ধরেছেন। গুয়ের্নিকা যেন হিরোশিমা ও নাগাসাকির ভবিষ্যৎ চিত্রকেই ধারণ করেছিল। 'মানুষের মানচিত্র' শিল্পকর্মে সুলতান নিয়ত সংগ্রামশীল বাংলার গণমানুষকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

সুলতান মূলতঃ ছবি এঁকেছেন রেনেসাঁসের আদর্শে। এ সম্পর্কে শিল্প সমালোচক শরীফ এ জামান লিখেছেন, রেনেসাঁস চিত্রকলায় পুরুষরা স্বাস্থ্যবান ও পেশীবহুল হিসেবে চিত্রিত। তবে রেনেসাঁস চিত্রকলায় পুরুষরা পেশীবহুল ও স্বাস্থ্যবান হিসেবে চিত্রিত হলেও নারীরা তা নয়। তারা স্বাভাবিক সৌন্দর্যে চিত্রিত। কিন্তু সুলতানের নারীরা পেশীবহুল, তারা কালো, মেদবহুল ও স্থূলকায় হলেও শ্রীহীনা নয়। গৌরবর্ণ হলেই যে সুশ্রী হয়না, শ্যামলা বা কালোর মাঝেও যে এক ধরনের আকর্ষণীয় সৌন্দর্য রয়েছে সুলতানের চিত্রকলা দেখলে তা বোঝা যায়। তাঁর নিপুণ হাতের তুলির স্পর্শে মাংসপেশীর উত্থান পতন সুকৌশলে চিত্রিত হওয়ায়, নারীচিত্র আঁকতে গিয়ে নির্দিষ্ট কোনো শাস্ত্রমত বা আদর্শ অনুসরণ না করেও তাঁর দেহগুলো অতি সুকোমল ও জীবন্ত।

রেনেসাঁসের দ্বিতীয় পর্বের শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেলএঞ্জেলো এবং রাফায়েলের চিত্রকর্মের সংগে সুলতানের ছবির আঙ্গিকগত মিল রয়েছে। সুলতানের ওপর এঁদের প্রভাব লক্ষণীয়। বিশেষ করে সুলতানের 'প্রথম রোপণ' (First Plantation)-কে সিসটিন চ্যাপেলের গম্বুজের মাঝখানে চিত্রিত মাইকেলএঞ্জেলোর 'মহাপ্লাবন' ও 'জগৎ সৃষ্টি'র দৃশ্যের ধারাবাহিকতা বলা চলে। সিসটিন চ্যাপেলে মাইকেলএঞ্জেলো মূলত: Old Testament থেকে বিষয় নিয়ে ছবি এঁকেছেন, যদিও সেখানে বাইবেল বহির্ভূত দৃশ্যও ছিল। সেখানে শিল্পী এঁকেছেন অবতারদের চিত্র যারা পৃথিবীতে যীশুর আগমন বার্তা প্রচার করছে। গম্বুজের ঠিক মাঝখানে আছে মহা প্লাবনের দৃশ্য, নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ এবং মানুষ ও জগৎ সৃষ্টির দৃশ্য। প্লাবন শেষে পৃথিবী শান্ত হলেও কোথাও প্রাণের চিহ্ন মাত্র নেই। মাটিতে তখনো রুক্ষ্মতা বিদ্যমান, সবুজ নিশ্চিহ্ন, দু'একটি লতাগুল্ম সবেমাত্র এখানে সেখানে জন্মেছে। আদমের নিকট পৃথিবী এক নতুন জায়গা। সুলতানের First Plantation-এ আমরা দেখতে পাই একজন সুঠাম পেশীর মানুষ একটি চারা রোপণ করছে আর দু'জন দেবকন্যা তাতে জল সিঞ্চন করছে। এ ছবিটিকে মাইকেলএঞ্জেলোর সিসটিন

চ্যাপেলের ধারাবাহিকতা হিসেবে ধরা যায়। এর যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণও আছে। মাইকেলএঞ্জেলো যেখানে শেষ করেছেন সুলতান সেখান থেকে শুরু করেছেন। সুলতানের ছবির পেশীবহুল, সুঠাম, শক্তিমান পুরুষটিই আদম যিনি ঈশ্বরের দানে পুষ্ট হয়ে প্রাণহীণ রুক্ষ্ম পৃথিবীর বুকে বৃক্ষচারা রোপণের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করছেন।

সুলতান কেন তার কৃষকদের স্বাস্থ্যবান করে চিত্রিত করলেন তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও রয়েছে। শিল্পী এখানে আমাদের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসের সাথে রাজনৈতিক জটিলতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমরা দ্রাবিড়, অস্ট্রিক ও অনার্যদের বংশধর যারা খুব শক্তিশালী ও কর্মঠ মানুষ ছিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধর্মের নামে ব্রাহ্মণ প্রভু, জমিদার, সামন্ত প্রভু ও বিদেশী প্রভুদের শোষণের ফলে তাদের সে স্বাস্থ্য হারিয়ে যায়। যুগ যুগ ধরে তাদের শ্রমের ফসল অন্যের পেটে চলে যায়। কিন্তু এত কিছুর পরও তারা টিকে আছে, জীবন সংগ্রামে হেরে যায়নি। এদের মধ্যে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন কর্মশক্তি আছে, এক ধরনের ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে এরা ধারণ করে আছে। সুলতান তাদের এ ঐশ্বরিক ক্ষমতা ও শক্তিকে রং তুলির খেলায় অনুপমভাবে তুলে ধরেছেন। সুলতানের কৃষকরা শক্তি ও ক্ষমতার প্রতীক। 'শক্তিই সৌন্দর্য'- সুলতান ছিলেন এ দর্শনে বিশ্বাসী। তাঁর ছবির ক্যানভাসেও তাই ফুটে উঠেছে।

শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে সুলতান মূলতঃ গুস্তাব কোরবে প্রবর্তিত প্রত্যক্ষবাদের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর কৃষকদের চলমান প্রাত্যহিকতায় প্রত্যক্ষ করতেন না। তাঁর দৃষ্টি চলে যায় অনেক দূর। তিনি স্বপ্ন দেখতেন তাঁর কৃষকরা তাদের হারানো স্বাস্থ্য ফিরে পাবে। আবার মাঠে মাঠে সবুজ ধান ফলাবে ও গান গাইবে।

১৯৪৬ সালে সিমলায় সুলতানের প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কাপুরতালার মহারাজা। একজন বিদেশী মহিলা এ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এ সম্পর্কে সুলতান শাহাদুজ্জামানের সংগে এক আলাপনে বলেছেন, 'ঐ প্রদর্শনীটা হয়েছিল একজন বিদেশিনীর উদ্যোগে। ওখানে (সিমলায়) আমি ছোটখাট ছবি আঁকতাম। সেগুলো বিক্রির জন্য একটা স্টুডিওতে দিয়ে আসতাম। একদিন সেখানে গিয়ে দেখলাম আমার নামে একজন মহিলা একটি চিরকুট রেখে গেছেন। চিরকুটে লিখেছে আমি যেন তার সংগে দেখা করি। গিয়ে দেখি একজন বয়স্ক অভিজাত মহিলা। সম্ভবত: কানাডীয় ছিলেন। নাম মিসেস হাডসন। পেইন্টিং-এর ভক্ত। মহিলা আমার ছবির খুব প্রশংসা করলেন। বললেন, আমিতো ভেবেছি এসব ছবির শিল্পী আরো বয়স্ক কেউ হবেন। তো সে মহিলাই প্রস্তাব

দিলেন যে তিনি আমার ছবির একটা একক প্রদর্শনীর আয়োজন করতে চান। ওখানকার মহারাজা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন। প্রদর্শনীতে অনেক গণ্যমান্য লোকের সমাগম হয়েছিল। সকলে ছবির বেশ প্রশংসা করলেন। বেশকিছু ছবি বিক্রিও হল। এভাবেই আমার প্রথম প্রদর্শনী হল।' সুলতানের জীবনের প্রথম প্রদর্শনীর ছবিগুলো কেমন ছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এ-ব্যাপারে লিখিত কোনো তথ্য নেই। তবে সুলতান বলেছেন, তখন তিনি কাশ্মীরের ল্যাণ্ডস্কেপ, বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের, কৃষকের, আগেকার দিনের গয়না পরা মহিলাদের ছবি এঁকেছেন। এছাড়া তিনি তখন কিছু বিমূর্ত ও আধা বিমূর্ত ছবিও এঁকেছেন বলে জানান। প্রথম প্রদর্শনীর পর করাচী, লাহোর, নিউইয়র্ক এবং লণ্ডনে সুলতানের মোট বিশটি প্রদর্শনী হয়। এসব একক ও সম্মিলিত প্রদর্শনীর মাধ্যমে সুলতান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিত্রকলার জগতে আলোড়ন তুলেছিলেন। ১৯৫১ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ২৫ বছর সুলতান কোন প্রদর্শনী করেননি। তাহলে প্রশ্ন ওঠে সুলতান কি এ-সময়ে কোনো ছবি আঁকেননি? ১৯৭৬ সালে শিল্পকলা একাডেমীর উদ্যোগে স্বাধীন বাংলাদেশে সুলতানের প্রথম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে সুলতান বলেছেন ছবি আঁকা এক রকম ছেড়েই দিয়েছিলাম। কারণ আমি শিশুদের নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। সাধারণ মানুষ ছবি আঁকুক। গ্রামের তরুণ প্রজন্ম ও বাচ্চাদের মধ্যে নান্দনিকতা বিস্তার লাভ করুক এ নিয়েই মত্ত ছিলাম। আমাকে শেষে ছবি আঁকতে ভীষণভাবে আগ্রহী করলো সে সময়কার ইরানী দূতাবাসের কালচারাল এটাসে ভদ্রলোক। তিনি আমার ছবি খুব পছন্দ করতেন। আমাকে বলতে বলতে এক সময় বাধ্যই করলেন ছবি আঁকতে। আমি বহুদিন পর নতুন উদ্যমে অনেক ছবি আঁকলাম।' তার এ দীর্ঘ নীরবতা সম্পর্কে শিল্পী আবুল মনসুর লিখেছেন 'বলা যেতে পারে এসময় তাঁর গর্ভযন্ত্রণাকাল, যথার্থ শিল্পভাষা অনুসন্ধান ও আত্মআবিষ্কারের রক্তাক্ত সাধনার কাল। কিন্তু তা মনে হয় না। দীর্ঘ ২৩ বছর তার অনুশীলন বা অনুসন্ধানের কোনো রেখা চিত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। শিল্পের মাধ্যমেই যিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন তাঁর জীবনসত্য ও শিল্পসৃষ্টির মধ্যেই যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন জীবন যাপনের স্বার্থকতা, তার দীর্ঘ তেইশ বছরের নীরবতার কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আমরা জানতে পারিনা।'

সুলতান সারা জীবনে ২৩টি প্রদর্শনী করেন। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে ২৪ বছরে তাঁর মাত্র ৩টি প্রদর্শনী হয়। ১৯৭৬ সালে শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৭ সালে জার্মান কালচারাল সেন্টার এবং ১৯৯৪ সালে গ্যালারী টোন তাঁর একক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। গ্যালারী টোনেরটা ছিল সুলতানের ড্রইং প্রদর্শনী। তবে এটাই ছিল

তাঁর জীবনের শেষ প্রদর্শনী। প্রদর্শনী চলাকালে একদিন গ্যালারী টোনে তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে যাই। এসময় শিল্পী সুলতান ছিলেন প্রচণ্ড রকম অসুস্থ। আমি তাঁকে বললাম এ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আমি আপনার গোটা জীবনকে তুলে আনতে চাই। আমাকে আপনি সেভাবে সহযোগিতা করবেন আশা করি। তিনি বললেন, আমাকে পুরোপুরি জানতে হলে আপনাকে আমার নড়াইলের বাসভবনে আসতে হবে। সেখানে রয়েছে আমার আলাদা এক পৃথিবী, যা দেখে আপনি আমাকে এবং আমার জীবনদর্শন ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পুরোপুরি জানতে পারবেন। তাঁকে কথা দিলাম আসব। সুযোগ খুঁজছি নড়াইল যাবার। ১৯৯৪ সালে আগস্টের প্রথম সপ্তাহে একদিন শিল্পকলা একাডেমীর চারুকলা বিভাগের পরিচালক সুবীর চৌধুরী টেলিফোন করে বললেন ১০ই আগস্ট সরকারীভাবে সুলতানের ৭০তম জন্মদিন পালন করা হচ্ছে। সেখানে ঢাকা থেকে কয়েকজন সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী যাচ্ছেন। আপনাকেও যেতে হবে। সুবীরদার আমন্ত্রণ পেয়ে মনটা আনন্দে নেচে উঠল। নড়াইলের বাসভবনে শিল্পী একটি 'শিশু স্বর্গ' তৈরি করেছিলেন। সেখানে তিনি শিশু-কিশোর, পশু-পাখি, প্রকৃতি ও নিসর্গের সঙ্গে মিতালী করে সময় কাটাতেন। সেখানে তাঁর একটি নৈসর্গিক বাগানবাড়ী ছিল। চিত্রা নদীতে ছিল তার একটা নৌকা। এতে তিনি শিশুদের নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। ১০ই আগস্ট বৃষ্টিস্নাত সকালে চিত্রা পাড়ের এ গ্রামটিতে বসে শিল্পীর জন্মদিনের জলসা। জন্মদিনকে ঘিরে শিল্পীর ভুবনে বসে শিশু-কিশোরদের আনন্দ মেলা। সকাল থেকেই অগণিত শিশু-কিশোরের কলকাকলিতে এবং পশু-পাখির বিচিত্র শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে সুলতানের শিল্পাঙ্গন। বরণ্যে শিল্পী সুলতানের জন্মদিন উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। ঢাকা থেকে যাওয়া আমরা সাংবাদিকরা যশোর হতে সকাল ৮টায় নড়াইল পৌঁছে যাই। শিল্পীর ভুবনে প্রবেশ করে দেখি অসুস্থ শিল্পী একটি বিশাল খাটের ওপর বসে আছেন। অসংখ্য শিশু তাঁকে চারদিকে ঘিরে আছে। কেউ শিল্পীকে হাত দিয়ে আদর করছে। কেউ চুমো খাচ্ছে। মনে হচ্ছে শিল্পী যেন ফুলের মেলায় বসে আছেন। প্রতিটি ফুটফুটে শিশুকে একেকটি ফুলের মতই দেখাচ্ছিল। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। যা শুধু চোখ দিয়ে দেখা যায়, ভাষায় প্রকাশ করা খুবই কঠিন। পরিবেশ আমাকে আবেগতাড়িত করে তোলে। পেশাগত পরিচয় ভুলে গিয়ে আমিও খাটে উঠে পড়লাম। শিশুদের প্রিয় 'দাদু' সুলতানকে জড়িয়ে ধরলাম। এরমধ্যে অসংখ্য শিশুর চাপে খাটটি মড়মড় করে ভেঙে গেল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে পড়লাম। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হল। আমার অসহায় অবস্থা দেখে সহকর্মী বন্ধুরা মৃদু হাসলেন। এরপর শিশুদের কলহাস্যের মধ্যেই শুরু হল সাংবাদিকদের সঙ্গে শিল্পীর একান্ত আলাপচারিতা। এতে শিল্পীর বিশাল কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। শিল্পী ধীরস্থির ভাবে সাংবাদিকদের

প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেন। জীবনের ৭০তম জন্মদিনে পা দিয়ে আজ তাঁর মনের অনুভূতি কি জিজ্ঞাসা করা হলে শিল্পী বলেন : 'জীবনের দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আসলেও আমি আমার স্বপ্ন অনুযায়ী কিছুই করতে পারিনি। আমি শুধু নড়াইলের কিছু শিশুকে নিয়েই পড়ে আছি। তিনি বলেন, যারা জীবনে বৃহৎ কাজ করেন জন্মদিনে তারা তাঁদের মনের অনুভূতির কথা বলেন। ফেলে আসা দিনের স্মৃতিচারণ করেন। আমারতো এখনও কোনো মহৎ কর্ম করা হয়নি, যা নিয়ে আমি গর্ব করতে পারি। আপনাদের ভালবাসা আমার জীবনে সবচেয়ে বড় পাওয়া। জন্মদিনে আপনারা আমার এখানে ছুটে এসেছেন সেজন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।' তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় পাওয়া কি জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'ইউরোপ এবং আমেরিকা আমাকে চেনে এবং জানে এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। এক সময়ে আমি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি, প্রদর্শনী করেছি। বরেণ্য শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলেছি। এসব স্মৃতি আমাকে আনন্দ দেয়।'

আপনার কোন স্বপ্ন অপূর্ণ রয়েছে কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি দুঃখ করে বলেন, 'শিশু স্বর্গ' তৈরির জন্য তাঁকে একাই লড়ে যেতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে কেউ সহযোগিতা করছে না। জীবনের সঙ্গে শিক্ষাকে, শিল্পকে মেলানোর বিষয়টা কেউ বুঝাতে চাইছে না। ক্ষোভের সঙ্গে সুলতান আরো বলেন, আমরা দেশে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন চাই। কিন্তু শুধু শহরকে নিয়েই দেশ নয়। আমাদের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ গ্রামে পড়ে আছে। তাদের উন্নয়ন ছাড়া দেশের সার্বিক সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু এই বিষয়টি কেউ বুঝতে চাইছে না।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর এই ভুবন এবং এই সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা কিভাবে চলবে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমার এসব সম্পদ একটি ট্রাস্ট গঠন করে সরকার পরিচালনা করুক তাই চাই। শিল্পকলা একাডেমী থেকে মাসিক যে ভাতা পান তাতে চলে কিনা জানতে চাওয়া হলে সদা বিনয়ী শিল্পী সরাসরি উত্তর এড়িয়ে যান। তিনি শুধু বললেন, 'আপনারাতো দেখছেন এখানে আমার কত খরচ'। কথার ফাঁকে ফাঁকে শিল্পী খাটের নিচে শুয়ে থাকা তাঁর প্রিয় কুকুরটির খোঁজ নেন, বৃষ্টির মধ্যে সেটা বাইরে চলে গেছে কিনা। এ জন্য তাঁকে বারবার আশ্বস্ত করতে হচ্ছে। এদিকে অসুস্থ শিল্পীকে আর বেশী কথা না বলানোর জন্য ভেতর থেকে শিল্পীর সেবা শুশ্রূষাকারী নীহারবালা আমাদের বারবার তাগাদা দিচ্ছিলেন। চিরকুমার এই মহান মনীষীর কাছে আমাদের সর্বশেষ প্রশ্ন ছিল কেন বিয়ে করেননি। তিনি বললেন, জীবনের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসে আজ প্রশ্নটি আমার নিজেরও। কেন বিয়ে করিনি? জীবনের প্রথম দিকে ভাবতাম বিয়ে করলে আমার শিল্পী জীবন

ব্যাহত হতে পারে। আমি আত্মকেন্দ্রিক ও বৈষয়িক হয়ে যাব। আমি আমার শিল্পের সাধনা থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবো। কিন্তু আবার যখন দেখি পৃথিবীর অনেক বড় বড় শিল্পী বিয়ে করেছেন, সংসার করেছেন এবং তাঁদের ছেলেমেয়ে আছে তখন আমি এই প্রশ্নের কোনো উত্তর পাই না। নন্দিত শিল্পী সুলতান মৃদু হেসে বলেন, আসলে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমার নিজের কাছেও নেই।



ছবি : আ.ব.ম. জালাউদ্দিন

১৯৯৪ সালের ১০ আগস্ট বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর উদ্যোগে সুলতানের নড়াইলের বাসভবনে শিল্পীর ৭০তম জন্মদিন পালিত হয়। ছবিতে অসুস্থ শিল্পীকে ঢাকা থেকে আগত জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে দেখা যাচ্ছে। এটাই ছিল সুলতানের জীবনের শেষ সাক্ষাৎকার



সুলতান : জীবন ও শিল্পবোধ

শওকাতুজ্জামান

প্রতিটি মানুষেরই একটি ঠিকানা থাকে। সুলতানেরও ঠিকানা ছিল। ঠিকানাটি বাংলাদেশ। বাঙালি হিসাবে বাংলাদেশকে তিনি মনে প্রাণে ভালোবাসতেন। তাই পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরে এসে ঠাঁই নিলেন এই দেশে। তাও আবার শহরে নয়, রাজধানীতে নয়, নড়াইলের গ্রামে। বন বাদাড়ের পশুপাখি আর মানব সন্তান নিয়ে বসবাস।

সুলতানের জন্ম কৃষিজীবী পরিবারে। বাবা কৃষক তাই শিশু কাল থেকেই অবলোকন করেছেন কি ভাবে খরায়, বন্যায়, রৌদ্র বৃষ্টিতে মানুষ মাটির বুক থেকে ফসল তুলে আনে। আর সে ফসলেও ভাগ থাকে অন্যজনের। সর্বসাকুল্যে যা পায় তাতে সারা বছরের আহার জোটানোর কষ্টকর জীবন যাপন।

গ্রামের পুকুরে নদীর তীরে বাংলার নারীদের দেখেছেন কলসী কাঁখে পানি আনতে, ধান ভানতে, শাপলা তুলতে খাদ্যের সংস্থানের জন্য।

শ্রমজীবী পরিবারে জন্ম নেয়া এই ক্ষণজন্মা মানুষটি জীবনের প্রতিপদে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। কারও প্রতি কোনো অনুযোগ অভিযোগ ছিলোনা তাঁর। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ জীবনে করেছেন কিনা সন্দেহ আছে। যদি তাই করতেন তবে হয়তো একজন প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পী হতেন ; প্রকৃত শিল্পী বা স্বভাব শিল্পী হতেন কিনা সন্দেহ আছে।

বিভাগ পূর্ব বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ পৃথিবীর বহুদেশে, বিচিত্র পরিবেশে বৈচিত্র্যময় জীবন যাপন করেও সুলতান স্থিতি নেননি কোথাও। যাযাবর জীবন যাপন ছিলো তাঁর সবচেয়ে পছন্দের। জীবনের বা মনের কোনো বন্ধনই তাঁর স্বভাবজাত ছিল না। একমাত্র দেশ ও দেশের মানুষের বন্ধনই তাঁকে ফিরিয়ে এনেছে, ধরে রেখেছে আপন করে।

ছেলেবেলায় বৃটিশ ভারতের খ্যাতনামা পন্ডিত, বিজ্ঞ চিত্র সমালোচক শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর সাহচর্য ও পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা সুলতানের মধ্যে সুলতানী মেজাজ তৈরী হয়েছিল। সে মেজাজে যৌবন কাটিয়েছেন তিনি। মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনই যাননি তিনি তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শিল্প শিক্ষার পাঠ চুকিয়ে ঘুরে বেড়ালেন সারা ভারত। পছন্দ হলো সিমলা। জীবনের বেশ কিছু সময় কাটালেন সেখানে, আঁকলেন প্রচুর ছবি। প্রদর্শনীও করলেন। ব্যতিক্রমী এক প্রদর্শনী। তখন ভারতবর্ষের ছবি আঁকার ধারার বিপরীত সে সব ছবি। উজ্জ্বল রঙ আর তুলির আঁচর দিয়ে জলরঙে আঁকা সে সব ছবি আজ বিরল, মাতৃভূমির সংগ্রহে আর থাকলো না। দেশভাগের পর চলে এলেন পাকিস্তানে (পূর্ব ও পশ্চিম), দেশে (পূর্ব) কদর না পেয়ে চলে গেলেন পাকিস্তানে। সমাদর পেলেন। সেখানে শিল্পীদের সাথে গড়ে উঠলো সখ্য। কাশ্মীরের ভূচিত্র এঁকে প্রশংসা কুড়ালেন। সে সব ছবি ছিল পশ্চিমা এক্সপ্রেশনিস্ট ধাঁচের রঙের ব্যবহার ছিল কিছুটা ঐ ধরনের। পরবর্তী জীবনে এসব রঙ তাঁর ছবিতে স্থায়ী ভাবে আসন লাভ করেছিলো।

ইউরোপ ভ্রমণের সুযোগ আসে পাকিস্তান শিল্পী-প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে। প্রখর দৃষ্টিতে অবলোকন করলেন তিনি সে সব দেশের শিল্প জগৎকে। অতীত বর্তমান সব কিছুই। হতাশামিশ্রিত আশা নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু আশার চেয়ে হতাশাই তাঁকে পেয়ে বসে বেশী। জীবন সম্পর্কে তাঁর মূল্যবোধ দাঁড়ায় অন্য রকম। জীবনকে বিলিয়ে দিলেন প্রেমপূজারী হিসাবে। পঞ্চাশের দশকে সুলতান হলেন প্রকৃত যাযাবর। ঘর নেই ঠিকানা নেই আহার বিহারে চিন্তা নেই। হাতে বাঁশী। কাঁধে বাঁশির ব্যাগ, পরনে গেরুয়া পোশাক ; এক সন্ন্যাস রূপ নিলেন তিনি। তাঁর বাঁশির সুর মানুষের মনে দোলা লাগাতো। কত মারধর খেয়েছেন সুলতান, কত গালমন্দ শুনেছেন, কোনো প্রতিবাদ করেন নি কখনও। নড়াইল বাসী তাঁকে অপমানিত অপদস্ত করেছে। ব্যতিক্রম যে ছিলোনা তা নয়, নড়াইল সরকারী কলেজের ছাত্ররা তাঁকে পছন্দ করতো। তাদের আশ্রয়ে থাকতেন, আবার একদিন কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ উধাও হয়ে যেতেন। আবার হয়তো কিছুদিন পর বিধ্বস্ত অবস্থায় ফিরে

আসতেন। নেশা আর বাঁশি এই ছিল তাঁর তখনকার জীবন। পুরো দশকটাই এমনি করে কেটে গেল। এই দশকের প্রথম কয়েক বছর তিনি সুস্থভাবে কাজ করেছিলেন। লাহোরে দু'টি প্রদর্শনীও করেছেন। ছবিও এঁকেছেন প্রচুর। ষাটের দশকে তেমন একটা সাড়া পাওয়া যায় নি সুলতানের। দু'একজন পরিচিত জন ছাড়া তাঁর খোঁজ খবর কেউ রাখতো কিনা বলা মুসকিল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৬ সালের দিকে তিনি আবার উদয় হলেন নবউদ্যোমে। হয়তো এই স্বাধীনতার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন তিনি। এ সময়ে ডাক পেলেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী থেকে একটি প্রদর্শনী করার। দীর্ঘ কয়েক মাস শিল্পকলা একাডেমীর বিশাল গ্যালারী কক্ষে একের পর এক সৃষ্টি করে গেলেন দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার। মনের ভেতরের পুঞ্জিভূত জীবন বোধকে, নিজের শিল্প বোধকে উজাড় করে দিলেন।

এই প্রদর্শনী থেকেই প্রকৃত নবপ্রজন্মের শিল্পানুরাগী শিল্পরসিক এবং শিল্পীরা সুলতানকে চিনতে শিখলেন। চারিদিকে সুলতানের ভক্ত – অনুরক্তের অভাব হলো না। শিল্প সংগ্রাহকগণ সুলতানের ছবি সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। দেশে বিদেশে তাঁর ছবি প্রদর্শিত হলো। হারিয়ে যাওয়া সুলতানকে আবার এদেশের মানুষ তাদের কাছে পেল।

শিল্পী সুলতানের জীবনবোধ ছিল ভিন্ন। তিনি যেখানে গিয়েছেন, দেখেছেন যে মানুষ কারিগর। মানুষ সৃষ্টি করে যাচ্ছে তার নিজের শ্রম, সৃজনশীলতা আর মেধা দিয়ে, গোড়া থেকে প্রতিটি ধাপ যাচ্ছে সাফল্যের দিকে। প্রতিটি ধাপের প্রক্রিয়া করণকৌশল সম্পর্কে সদা সচেতন, সতর্ক ভাবে সৃষ্টি করে যাচ্ছে। একজন কৃষক সচেতন সর্তক ভাবে মাঠে ফসল বুনছে, একজন মাঝি সচেতন সতর্ক ভাবে নৌকা বেয়ে যাচ্ছে। একজন গায়ের বধূ তার কর্ম সচেতন ভাবে করে যাচ্ছে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর পাশাপাশি সতর্ক সচেতন ভাবে কাজ করছে। এই যে সচেতনতা, সতর্কতার কারণ শিল্প নির্মাণ কৌশলের দ্বারা হয় না এজন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। সুলতানের মধ্যে এর সমন্বয় ছিল। এজন্যই তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছেন 'প্রথম রোপণ'–এর মত ছবি। এ ছবির বিষয়টি অতি সাধারণ। আমাদের লোকচক্ষুর অগোচরে হাজারো গাছ জন্মাচ্ছে কারও না কারো হাতে কিন্তু প্রথম যিনি গাছের চারা লাগালেন তার একটি রূপদান কি এতদিন অপেক্ষা করে ছিলো শুধু সুলতানের জন্য। আমার মনে হয় সত্যিই তাই। সুলতান না এলে হয়তো এমন করে জানতে পারতাম না প্রথম চারা লাগানো মানুষটিকে অর্থাৎ আদমকে।

সুলতান যদি ইউরোপে তাঁর ছবি আঁকতেন তবে হয়তো আলোড়ন হতো কিন্তু বাংলাদেশ বলেই তা হয়নি। শিল্পী আকোন্দি জেলখানায় আটক থেকে দেয়ালে ছবি এঁকেছিলেন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তা আজ সংরক্ষিত। সুলতানকে বন্দী করে রেখেছিলো সমাজ, প্রকাশ করতে দেয়নি তাঁর অন্তরের জ্বালাকে। জীবন সায়াহ্নে এসে উজাড় করে দিলেন সবকিছু।

সুলতানের ছবির নিজস্ব গঠন শৈলী ছিল, যে শৈলী তাঁকে স্বকীয়তা দান করেছে, করেছে অমর। তাঁর এক ভক্তের মুখে শুনেছিলাম। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে কয়েকজন বিদেশী শিল্পী নড়াইলে এসেছিলেন সুলতানের ছবি আঁকার করণ–কৌশল সম্পর্কে জানার জন্য। সুলতান সেদিন তাদের সারারাত ছবি আঁকার তালিম দিয়েছিলেন। তারা নিয়ে গেল সুলতানের কৌশল। কারণ আমাদের চোখ খুলেছে সত্তরের দশকে। আমরা তার আগে সুলতানকে চিনিনি। চিনিনি বলেই তিনি সব সময় রাজধানী থেকে দূরে থাকতেন, পছন্দও করতেন। নিজেকে গুটিয়ে রাখার একটি অভিনব অভিমান তাঁর ছিলো। তিনি বৈষয়িক ছিলেন না। বিষয় নিয়ে ভাবনা করেন নি। নিরাভরণ সন্ন্যাস জীবনযাপন করতেন। তাঁর কাছে জাতপাত হিন্দু মুসলমান কোনো ব্যাপার ছিল না। তাই তিনি নড়াইলের নব প্রজন্মের কাছে ছিলেন কাকু হিসেবে পরিচিত। আর সবার কাছে ছিলেন সুলতান ভাই।

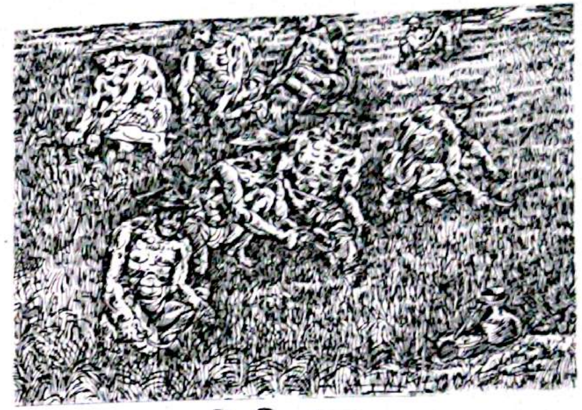
সহজ সরল এই মানুষটির ছবির বিষয় ছিল সহজ সরল। কোনো বুদ্ধির মারপ্যাচ নেই তাঁর ছবিতে। যা আমরা দেখেও দেখি না। আমাদের অতীত যা আমরা ভুলে যাই নগর জীবনে তিনি আঁকতেন সেসব ছবি। ছবির বিষয় সবই এদেশের কিন্তু তার কাঠামোগত দিক, গড়নগত বলিষ্ঠতা ভারতীয় ভাস্কর্যের সংগে তুলনীয়। ভারতশিল্পের এক বিরাট অংশ জুড়ে ভাস্কর্য (ডিপ রিলিফ) অজন্তা, ইলোরা, মহাবলীপুরম–এর শীলাকাব্য যেমন বলিষ্ঠ, যেমন সৌন্দর্যমন্ডিত, বীর্যবান, তেমনি সুলতানের ছবির মানব মানবী। তিনি তাঁর ছবির মানবমানবীকে কখনই অতি সাধারণ মানুষ হিসেবে দেখতেন না। যে মানুষ এই বিশাল পৃথিবীর সমস্ত জড় ও জীবের অধিকর্তা সে মানুষের নিয়ন্ত্রণের অধীন এ বিশ্ব প্রকৃতি, সকল সৃষ্টি, কোন অর্থে সে মানুষ ক্ষীণকায় দুর্বল হবে? সেই আদিকালে, আদিম মানুষ ভয়ংকর পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করে নিজেকে টিকিয়ে রেখে গেড়েছে সভ্যতার বীজ, গতিময় করেছে সংস্কৃতির ধারাকে। পাহাড়ের গায়ে এঁকেছে ছবি। কঠিন শীলাকে দিয়েছে মৃন্ময়রূপ। মানুষ জল, মাটি প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে টিকে আছে। তারা যদি ক্ষীণকায়, শীর্ণকায় হয় তবে উন্নতি কিভাবে হবে। মানুষকে হতে হবে সবচেয়ে শক্তিশালী,

একমাত্র মানুষই পারে অসম্ভবকে সম্ভব করতে। তাই আমরা তাঁর ছবিতে দেখতে পাই মানুষের অন্য রূপ। মানুষকে প্রাধান্য দিয়ে ক্যানভাসের দেয়ালে রং তুলির হাতুড়ী নিয়ে খোদাই করেছেন এদেশের জীবন গাথা। প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর যেমন গড়েছেন পাহাড়ের গায়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর কাল্পনিক অবয়ব। সে ধারাকে অক্ষুণ্ন রেখে শিল্পী সুলতান তাঁর ছবির পাত্রমিত্রকে দেবতা ও দেবীর রূপ দিয়েছেন। যারা শিল্পীর অভিজ্ঞতা প্রসূত ও কাল্পনিক সৃষ্টি। এর পেছনে শিল্পীর নিজস্ব দর্শন কাজ করেছে সে কথা অনস্বীকার্য। একটি আগ্নেয়গিরির জন্ম হয় পাহাড়ের অভ্যন্তরে। আমরা দেখতে পাই যখন তা বিস্ফোরিত হয়। তার আগে আমরা বুঝতে পারি না। সুলতান ছিলেন এমনি একজন শিল্পী যার ভিতর আগ্নেয়গিরির আগুন প্রজ্জ্বলিত ছিলো। কিন্তু বিস্ফোরিত হবার সুযোগ আসেনি। যখন এসেছে তখন বিশাল ক্যানভাস জুড়ে তাঁর শিল্প দর্শন, শিল্প বোধকে প্রকাশ করেছেন।

একজন মহৎ শিল্পী সারা জীবন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে থাকেন, কিন্তু প্রকাশ পায় সে অভিজ্ঞতার কিছু মাত্র। তাতেই আলোড়িত হয় দেশ, সমাজ, জাতি। একজন শিল্পীর জীবনবোধ ও শিল্পবোধ তখনই কল্যাণকর হয় যখন তার সৃজনশীলতা সমাজ ও জাতিকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। জাগিয়ে তুলতে পারে নিজস্ব সংস্কৃতি আর কৃষ্টিকে। শিল্পী সুলতান তেমনি এক শিল্পী যিনি এ দেশের সংস্কৃতিকে যোগান দিয়েছেন এমন এক ফল্গুধারা যার শেষ নেই।



লাঙলের পিছনে তেল রং ১৯৭৬



এস. এম. সুলতান : একজন শিল্পী মানুষ

ফৌজিয়া খান

এস.এম. সুলতান। একজন শিল্পী। একজন মানুষ। সংবেদনশীল এক মানুষ। জন্মেছিলেন বিশ শতকের শুরুর দিকে, নড়াইলে। কৃষক পরিবারের এক সন্তান তিনি। রাজমিস্ত্রি বাবা ছিলেন একজন চাষীও। ফসল ফলানোর অবসরে কিংবা অবসর তৈরি করে নিয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করেছেন তিনি। এই ছুতোর বাবাকে কাজে সাহায্য করতে গিয়েই খেলার ছলে ছবি আঁকা শুরু করেন আমাদের সুলতান।

বাংলার চাষী পরিবারে জন্ম। সুতরাং দরিদ্র তো বটেই। সুলতানের ছোটবেলা তাই কেটেছে দারিদ্রে। ছবি আঁকার প্রয়োজনীয় উপকরণ পান নি সব সময়। কিন্তু আঁকিয়ে সুলতান নজরে পড়েছেন স্থানীয় জমিদারের। পেয়েছেন পৃষ্ঠপোষকতা। তেরো বছর বয়সে কোলকাতা যান। সেখানে সে সময়কার বিখ্যাত চিত্র সমালোচক সাহেদ সোহরাওয়ার্দীর পরিবারে জায়গা পান ঘরের ছেলের মতো। ১৯৪১ সালে ভর্তি হন কোলকাতা আর্ট স্কুলে। তিন বছর পড়েন সেখানে। রেজাল্ট হচ্ছিলো বেশ ভালো। কিন্তু হুট করেই ছেড়ে দেন পড়াশোনা।

বেরিয়ে পড়েন পথের টানে। সমাজসেবামূলক সংগঠন খাকসার আন্দোলন-এর একজন হয়ে ঘর করে তোলেন পথকেই। ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ভারতবর্ষব্যাপী। কাশ্মীর, লাহোর, করাচী, সিমলায় থেকেছেন, বেশ কিছুদিন। তারপর ক্রমশ ইউরোপ-আমেরিকা। আজীবন ভবঘুরে, অবিবাহিত সুলতান বিশ্ব পরিভ্রমণ শেষে

'৫৩ সালে দেশে ফিরে এলেন। বসতি গড়েন জন্মভূমি নড়াইলে। আমৃত্যু সেখানেই যাপন করেছেন অনন্য এক জীবন।

এস. এস. সুলতান শিল্পী। জীবনাভিজ্ঞতাই তার শক্তির মূল ভিত্তি। কৃষক পরিবারে জন্ম এবং ভবঘুরে জীবনযাপন তার ছবির প্রাণ। ছোটবেলায় যখন নড়াইলে ছিলেন, ছবি এঁকেছেন কাঠ-কয়লা, হলুদ আর পুঁই ফলের রঙ দিয়ে। তারপর কোলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষা এবং ক্রমাগত ঘুরে বেড়ানোর যে জীবন সেই জীবনের কথাগুলো তাঁর ছবিতে। কাশ্মীরে যখন উপজাতিদের মধ্যে ছিলেন তখন চারপাশের মানুষ, সেখানকার নিসর্গ নিয়ে ছবি এঁকেছেন। এ ছবিগুলোর প্রায় সবই তেলরঙে আঁকা, তখন তার কাজে ভ্যানগগের সুস্পষ্ট প্রভাব। পরে তেলরঙের মাধ্যম থেকে সরে এসে অন্যান্য মাধ্যম নিয়ে নানা নিরীক্ষার পর ঝোঁকেন জলরঙে। মধ্য পঞ্চাশ পর্যন্ত একটানা তিনি জলরঙে শত শত ল্যান্ডস্কেপ এঁকেছেন। এস. আমজাদ আলীর মতে 'জল রং-এ সফট টোনে আঁকা বাংলার প্যানোরমাগুলোতে উঠে এসেছে শান্ত পরিবেশে জল আর আকাশের বিশাল বিস্তার, মিলিয়ে যাওয়া দিগন্ত, তালগাছ আর নৌকা, জেলে এবং কুঁড়েঘর। কাশ্মীরের প্যানোরমাগুলোর সবই বর্ণাঢ্য জমকালো-- গাঢ় বর্ণের পাহাড়, বিচিত্র সব লতাগুল্ম, গাছপালা, হ্রদ আর নদী।'

সুলতানের সৃজনশীলতার শুরু থেকে ছবির মূল বিষয় ছিল প্রকৃতি। মধ্য পঞ্চাশের পর থেকে তার কাজে পরিবর্তন আসে। পল্লীবাংলার ল্যান্ডস্কেপ করতে থাকেন তিনি—ল্যান্ডস্কেপে এলো ফসলের জমি, বাংলার কৃষিজীবন এবং ক্রমশ মানুষ। ষাটের শেষে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে মূর্ত হতে থাকে। তাঁর চিত্রকর্মের প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠলো মানুষের দেহাবয়ব। পরে ল্যান্ডস্কেপের পরিবর্তে মানুষই হয়ে উঠে তার ছবির অধিপতি।

মানব সভ্যতার যাত্রা কিন্তু কৃষিকর্ম থেকে। কৃষি-জমি ফলিয়ে আবাদ করা মানুষেরাই ভারতবর্ষে, মেসোপটেমিয়ায়, চীনে, ব্যাবিলনে সভ্যতার জয়ডঙ্কা উড়িয়েছিল প্রথম। যেখানেই মাটি কর্মীমানুষের সাধনায় ফসল দিয়েছে, দিয়েছে স্থায়ী আবাসগৃহ সেখানেই ইতিহাস গতি পেয়েছে। ইতিহাস-নির্মাতা এই কর্মী কৃষকেরাই শেষে সুলতানের ছবির নায়ক। সুলতানের আঁকা মানুষেরা তাই বাংলাদেশের হয়েও সমস্ত পৃথিবীর মানুষ। এ বিষয়ে আহমদ ছফার একটি লেখা থেকে উদ্ধৃতি : .... 'প্রকৃতি এবং ইতিহাসের গভীরতম অঙ্গীকার যারা নিরবধিকাল ধরে বহন করে চলেছে, নতুন ফুটন্ত ইতিহাসের আবেগ-উত্তাপ সবটুকু পান করে ফুটে উঠবার বীর্য এবং বিকাশমান সৃষ্টিশীলতা যাদের আছে। সেই শ্রমজীবী কিষাণ জনগণকে তিনি বাঙলার ইতিহাসের

নবীন কুশীলব হিসেবে দেখতে পেয়েছিলেন। ... সুলতানের কৃষক জয়নুল আবেদিনের কৃষক নয়। জয়নুল আবেদিনের কৃষকেরা জীবনের সংগ্রাম করে। সুলতানের কৃষকেরা জীবনের সাধনায় নিমগ্ন। তারা মাটিকে চাষ করে ফসল ফলায় না। পেশীর শক্তি দিয়ে প্রকৃতির সাথে সঙ্গম করে প্রকৃতিতে ফুলে-ফসলে সুন্দরী সন্তানবতী হতে বাধ্য করে। এখানে জীবনের সংগ্রাম এবং সাধনা, আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন, আজ এবং আগামীকালের একটি বিন্দুতে এসে মিশে গিয়েছে। সুলতানের কৃষকেরা নেহায়েত মাটির করুণা কাঙাল নয়।'

সুলতান তাঁর ছবির প্রতিটি দেহকেই মহামানবের মতো এঁকেছেন। এ উপমহাদেশের অসহায় মানুষগুলোর অস্তিত্ব অনিঃশেষ যন্ত্রণার রূপকথা। এই মানুষেরা বৃটিশ শাসনে শোষিত হয়েছে, বঞ্চিত হয়েছে পাকিস্তানী শাসনামলে। এখনো স্বাধীন দেশের ভূমিতে তারা শোষিত বঞ্চিত হয়ে চলেছে। তবে অকুতোভয় তারা। টিকে থাকার জন্যে প্রতিমুহূর্তে অদম্য সংগ্রামে লিপ্ত। এই নির্ভীক মানুষগুলোর সাহসী অন্তরাত্মার জন্যে মানানসই দেহ তাই অনিবার্য। সুলতানের ফিগারগুলো মানুষের অন্তর্গত সেই শক্তি এবং উত্তাপেরই বাহ্যিক প্রকাশ। মানুষ ও জীবজগতকে অনুভব করার এই ধারা শিল্পী পেয়েছেন ইউরোপীয় রেনেসাঁসের শিল্পীদের কাছ থেকে, এ সম্পর্কে আহমদ ছফার পূর্বোক্ত লেখা থেকে আরো একটি উদ্ধৃতি : 'শেখ সুলতানের ছবির মধ্যে দ্য ভিঞ্চি, মিকেলেঞ্জেলো, রাফায়েল প্রমুখ শিল্পীর প্রকান্ড কল্পনা এবং কল্পনার বলিষ্ঠতার ছাপ এতো গভীর এবং অনপনেয় যে মনে হবে এ চিত্রসমূহ কোনো রকমের মধ্যবর্তীতার বালাই ছাড়া, সরাসরি রেনেসাঁস যুগের চেতনার বলয় থেকে ছিটকে পড়ে এই উনিশশো ছিয়াত্তর সালে বাংলাদেশের কৃষক সমাজে এসে নতুনভাবে জন্ম গ্রহণ করেছে।'

তাঁর আঁকা পুরুষ ফিগারগুলোর মুখাবয়বে রয়েছে এক ধরনের আদিম রুক্ষ্মতা। জীবজন্তুর বিশেষ করে ষাড়গুলোর প্রতিকৃতিতে দেখি বলিষ্ঠতা। আদিম শক্তিতে মানুষ আর পশুর শ্রমের ঐকতান সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু নারী দেহগুলো এর বিপরীত। প্রাচ্য রীতি অনুযায়ী তারা আবৃত, উন্মুক্ত কেবল তাদের হাত-পা-মুখ। সোনা রঙে মাতৃময়ী মুখাবয়ব তাদের।

সুলতান বিমূর্ত চিত্ররীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'পেইন্টিং-এ এবস্ট্রাকশনটা, পুরো নন-অবজেকটিভ ছবির ব্যাপারটা ডেভেলপ করেছে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে। ওখানেই তো করবে। ওদের লাইফটা দেখুন। ওদের লাইফ কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে ভীষণ। ওদের চোখের সামনে শুধু ভারটিক্যাল লাইন ... তাছাড়া ওদের



জলকে চলা তেল রং ১৯৭৬

মনের ভেতরটা তালগোল পাকিয়ে গেছে। অত্যন্ত দ্রুত লাইফ, অহেতুক ফাস্ট, সবচেয়ে বড়ো কথা ওদের কোনো ইনার ফুড নেই। মানুষ মাত্রেরই কতোগুলো ইনার কনস্যালেশনের দরকার ; লাভ, এফেকশন পরস্পরের মানবিক সম্পর্ক। ওগুলো ওরা লস্ করেছে। যতই আপনি ডেভেলপড মডার্ন হন না কেন, এসব না হলে লাইফ অর্থহীন। এসব কারণে কোনো এনভায়রনমেন্টই তাঁকে সুখী করতে পারবে না। ফলে একটা ডিপ রুটেড ফ্রাসটেশন দেখা দিয়েছে। এ থেকে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ফিলিংস তৈরি হতেই পারে, যার রিফ্লেকশন ঐ ছবিগুলো। ... আমাদের এখানে এখন অ্যাবস্ট্রাক্ট পেইন্টিং করবার কোনো জাস্টিফিকেশন নেই। আমাদের লাইফ মোটেও ওয়েস্ট-এর মতো কমপ্লিকেটেড নয়। আমাদের এখন জীবনকে ভালবাসা দরকার। আমাদের জীবনের অনেক ডাইমেনশন এখনও আছে, ফাইট আছে। জীবনকে ভালবাসতে গিয়ে যদি, কৃষকের ছবি না আঁকতে চাই, কোনো অসুবিধা নেই, সিটি, এরাউন্ড ঢাকাকে কেন্দ্র করে অনেক কিছু আঁকা যেতে পারে। তা না করে যদি আমি শুধু হরাইজন্টাল, ভার্টিকাল, সার্কল এগুলো দিয়ে স্পেসকে ব্যালান্স করতে থাকি, তাহলে তা ডিজাইন ছাড়া বেশি কিছু হবে না।'

সুলতান নিজস্ব এক রীতিকে পরিচিত করেছেন আমাদের শিল্প অঙ্গনে। নিজস্বতা নির্মাণে তার কোনো ফাঁক কি রয়ে গিয়েছিলো? এ বিষয়ে শিশির ভট্টাচার্যের একটি লেখার অংশ বিশেষ ঃ '... বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির যে বৈচিত্র্য যা মানুষের চরিত্রের সাথে ওতপ্রোত জড়িত। সুলতান সেই দৃষ্টিকোণ দিয়ে প্রকৃতি দেখেন নি। যেহেতু সুলতান গ্রামকে এবং প্রকৃতিকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন সেহেতু তার কাছ থেকে প্রকৃতির সাধারণ উপস্থাপন, অনেক ক্ষেত্রেই সাজানো একঘেয়ে বা মুখস্থভাব থেকে আঁকা, এমনটি কাম্য নয়। মানুষকে উপস্থাপন করার একটা বিশেষ ধরন (স্বাস্থ্যবান পেশীবহুল) যত গভীরভাবে সুলতান বেছে নিয়েছেন ঠিক সেই গভীর ভাবনাটা মানুষ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই যে সমস্ত চিত্রে নিসর্গের উপস্থিতির চেয়ে মানুষই সমস্ত ক্যানভাস জুড়ে সেগুলো অনেক বেশি সম্পূর্ণ—তার মধ্যে The First Plantation এবং *চরদখল*-এর মতো চিত্রগুলি চলে আসে। যা তার সাধারণ বর্ণনামূলক চিত্রগুলিতে মেলে না।

নিরন্তর শোষণের মধ্যে ক্লীশ দিনযাপনে অভ্যস্ত আমাদের কৃষক সমাজ। অথচ এরাই আজো পর্যন্ত আমাদের অর্থনীতির মূল উৎস। শীর্ণকায় এই কৃষককে সুলতান দেখেছেন স্বপ্নময়, শক্তিমান এক চোখ দিয়ে। তার শক্তিমান দৃষ্টির ছোঁয়ায়, তুলির আঁচড়ে ক্যানভাসে কৃষকরা মহাশক্তির তেজে বলীয়ান। তার ক্যানভাস—মানুষ--প্রকৃতি সবই গেরুয়া-মেটে রঙ। এই মাটির রঙে আঁকা বাংলার কৃষক দেশকালের সীমা ছাড়িয়ে হয়েছে অনন্তের দিশারী। অতীত থেকে বর্তমানে, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের যাত্রাপথের কুশলী তো এরাই। শিল্পী এস.এম. সুলতান আমাদেরকে এই বিশ্বাসে বলীয়ান হতে বলেছেন, বলেছেন দেখো তাকিয়ে দেখো 'কি দর্পিত, কি ব্যঞ্জনাময় এই মানুষ শব্দটি।' এইখানেই সুলতানের অনন্যতা। কিন্তু অনন্য এই শিল্পীর নায়ককেও নিজ হাতে নিজের মাথা ছিঁড়তে হয়েছে, ভাঙতে হয়েছে নিজের হাত-পা। সমাজের অন্ধকার অশুভ ছায়াই তো সুলতানের নায়ককেও দু'এক সময় আত্মবিনাশী করে তুলেছিলো।

বোহেমিয়ান, প্রকৃতি সংলগ্ন, জীবপ্রেমী, অপ্রাতিষ্ঠানিক, প্রথা ভেঙে নিজস্ব প্রথাতে স্থিত এই শিল্পীমানুষের প্রয়াণে আমরা শোকগ্রস্ত। শান্তি পাক তাঁর আত্মা।

ঋণ স্বীকার : নৃ [সুলতান সংখ্যা]



শিল্পী সুলতানের কিছু স্মৃতি কিছু কথা

মহসিন হোসাইন

বিশ্বনন্দিত চিত্রশিল্পী শেখ মোহাম্মদ সুলতান চলে গেলেন। সুলতান চলে গেলেন জড় কালিমার বাঁকা সংসারের এপার থেকে আলোয় ঝলমল্ আরেক পৃথিবীতে। যে পৃথিবীতে খ্যাতি আর অখ্যাতি, পাওয়া আর না পাওয়ার কোনো হিসেব মেলাতে হয় না—যেখানে নেই সময় আর অসময়ের কোনো দ্বন্দ্ব। যেখানে আছে শান্তি ; শ্রান্তি ও ক্লান্তি অপনোদনের অখন্ড অবিরাম প্রতিবেশ। তাই আজ আর সুলতানের মহাযাত্রায় বিগলিত অশ্রুধারে নমিত হবো না। বরঞ্চ তাঁর স্মৃতি আলোচনা করবো।

মোহাম্মদ সুলতান বিশাল বটবৃক্ষের মতো। বিরাট মহীরুহ। সারা পৃথিবীর জড়তা ও দৈন্যের বিরুদ্ধেই যেন তিনি নীরব ভাষাচারী। তাঁর উচ্চারণ ছিলো ধীর ও সুরের ব্যঞ্জনায় মথিত; তেমনি নিরাপোষ ও বিপ্লবী। বিপ্লবী বলবো এ জন্য যে, স্বপ্ন ছিল তাঁর জড়তা ও মিথ্যাকে গুড়িয়ে সুন্দরের সৃজন করা।

সুলতানকে নিয়ে অনেক কথা বলার আছে। অসংখ্য পংক্তি সাজানোর প্রেরণা জাগে মনে। ইতোমধ্যে কিছু পংক্তি রচনার কাজ শেষও করেছি। বাংলাবাজারের একটি বড় প্রকাশনা মালিকের উদ্যোগে লিখেছিলাম *ছোটদের সুলতান*। প্রায় ৩ বছর আগের লেখা। সুলতান ভাই তা জানতেন। আশা করেছিলেন তিনি পুস্তকটি প্রকাশ হোক। কিন্তু একটি বিশেষ কারণে প্রকাশক বিনীত পত্রে তার প্রকাশনার অক্ষমতা জানিয়েছেন। সুলতান ভাইয়ের সাথে দীর্ঘ দিনের চলাফেরায় ও আলাপচারিতায় তার

বহু সংঘাতের সফল জীবনের কাহিনী শুনেছি—মনে রেখেছি শেষ দিকে লিখে ও টেপ করে পুস্তক সাজিয়েছিলাম, 'শিল্পী সুলতানের আত্মকথা।' এ ছাড়া তাঁর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুতেও লিখেছি কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা। আজ আর ঐভাবে নয়। আজ লিখবো শিল্পী শেখ মোহাম্মদ সুলতানের কিছু স্মৃতিকথা। সব কথা লেখার ও বলার সুযোগ নেই এখানে। তবু খন্ড মেঘের কণা বৃষ্টির মতো যদি সুর তোলে।

আমি যখন নড়াইল জেলার কলাবাড়িয়া পূর্বপার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র তখন লাল মিয়া নামের এক অদ্ভুত লোকের কথা কলেজ পড়ুয়াদের মুখ থেকে শুনেছি। শুনেছি, লাল মিয়া বাঁশি বাজাতে পারেন—কালো সাপের সাথে তাঁর বন্ধুতা আছে। একবার নাকি নড়াইল কলেজের কোনো অনুষ্ঠানে বাঁশি বাজিয়ে শ্রোতাদের এমন মুগ্ধ করেছিলেন যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ছাত্ররা লাল মিয়ার বাঁশি শুনে বাহ্যিক চেতনা হারিয়ে ফেলেন। তাই লাল মিয়া যখন বাঁশি বাজিয়ে অনুষ্ঠান থেকে তাঁর আস্তানার দিকে ফিরে যেতে থাকেন তখন শিক্ষক ও ছাত্ররা তাঁকে পুকুর পাড়ে গিয়ে মালা পরিয়ে দেন। এই কাহিনী শোনার পর, সেই কিশোর বয়সেই যাদুর বাঁশিওলা লাল মিয়াকে দেখার জন্য মনটা ব্যাকুল ছিল। যারা এই কাহিনীর মতো আরো অনেক কাহিনী সে সময়ে বলতো তারা আমাদের কলাবাড়িয়া গ্রামেরই কলেজ পড়ুয়া। তারা সবাই পড়াশুনা করতো নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজে। কলাবাড়িয়া বর্তমান নড়াইল জেলার একটি প্রাচীন জনপদ।

ঐ সময় আরো শুনেছি, লাল মিয়া যখন গভীর রাতে নড়াইলের জমিদার বাড়ির পুকুর ঘাটে বাঁশি বাজাতেন তাঁর বাঁশির সুরে কালো কালো কেউটে সাপ দু'পাশে নাচতো। সাপের উপস্থিতি আমার মনের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করলেও লাল মিয়াকে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে হতো। কিন্তু কি ভাবে কার সাথে নড়াইল যাবো? কে আমার এই সাধ সেদিন পূরণ করবে? আমার বাবা (আব্দুর রাজ্জাক মিয়া) প্রায়ই জমিজমার ব্যাপারে নড়াইল যেতেন। কিন্তু তাঁকে আমি লাল মিয়াকে দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করতে পারিনি। তিনি ছিলেন ভিন্ন চিন্তা ও মেজাজের লোক। একবার শুনতে পেলাম, বিশাল ঝাঁকড়াচুলে কালো গাউন গায়ে নড়াইলের সেই লাল মিয়া এসেছিলেন বড়দিয়া—মহাজনের লক্ষ্মীপুজোর আড়ং-এ। শুনেছিলাম, লাল মিয়া বড়দিয়ায় ছোট বড়ো নানা আকারের বাঁশের বাঁশি তৈরি করে বড়দিয়ার তেয়ারে (মেলা) বিক্রি করতে এসেছিলেন। অনেক লোকই তাঁকে দেখার জন্য ভিড় করেছিল। জানিনি, লাল মিয়ার বাঁশি কেমন বিক্রি হয়েছিল। বড়দিয়া একটি মোকাম। খুলনা-ঢাকা ও খুলনা-বরিশাল যাওয়া আসার লঞ্চ ও ইস্টিমারের বিখ্যাত ঘাট। মামাবাড়িতে (ফরিদপুরের পুকুরিয়া গ্রাম) যাওয়ার পথে নবগঙ্গা নদীতীরে অবস্থিত বড়দিয়ার

বিশাল মোকাম ও লক্ষ্মঘাট দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। কিন্তু মায়ের কঠিন প্রহরায় তখনো কোনোদিন বড়দিয়ার মাটিতে পা রাখার সুযোগ হয়নি। আমাদের বাড়ি থেকে বড়দিয়ার দূরত্ব ৯ মাইলের বেশি নয়। অনেকের মুখে যখন সেই কালো গাউন পরা লাল মিয়ার বাঁশি বিক্রির কথা শুনেছি তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আগামী বছরের শারদীয়া লক্ষ্মীপূজোর মেলায় আমি অবশ্যই লাল মিয়াকে বড়দিয়ায় গিয়ে দেখে আসবো। ১৯৬৬ সনের মেলায় বিশালদেহী ঝাঁকড়া চুলের যাদুর বাঁশিওলা লাল মিয়াকে দেখতে গিয়েছিলাম। তখন আমি কলাবাড়িয়া গ্রামের পার্শ্ববর্তী মুলখানায় ফুপুবাড়িতে থাকতাম। কিন্তু না, সেবার লাল মিয়াকে আমি দেখতে পাইনি। বালক বয়সে যতোটা পেরেছি লাল মিয়ার সন্ধান করেছিলাম। কোথাও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। আমাদের দলের একজন জানালো, লাল মিয়াতো পাগল। তাঁর তো ঠিক-ঠিকানা নাই। তিনি অন্য জগতের মানুষ। জীবনের প্রথমবার বড়দিয়ার মেলায় গিয়েছিলাম লাল মিয়াকে দেখতে—যাকে না দেখেই ভালবেসেছিলাম, শুধু তাঁর গল্প শুনে। সেদিন তাঁর দেখা না পেয়ে মেলার সব আনন্দই নিরানন্দে মিশে গেলো। ঐ বয়সে যা কিছু আনন্দ দেয় যেমন বাঁশি, পুতুল, মিষ্টি, নানা রকমের খেলনা, সবই কিনে সাথীদের সাথে শারদীয়া পূর্ণিমায় পথ চলতে চলতে যেমন প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে ছিলাম তেমনি লাল মিয়াকে দেখতে না পাওয়ার কষ্ট অনুভব করেছিলাম।

তারপর দীর্ঘ সময় কেটে গিয়েছে। লাল মিয়ার দেখা পেলাম ১৯৭৩ সনের শেষ দিকে। নড়াইলের রূপগঞ্জ বাজারের মুচিরপুল থেকে সোজা খেয়াঘাটে যাওয়ার পথে; হাতের ডাইনে গোডাউন মতো একটি দোকানে। মনে নেই কার সাথে ভয়ে ভয়ে গিয়ে লাল মিয়ার খাস আড্ডায় দাঁড়িয়েছিলাম। তাঁর গায়ে ছিলো মিশকালো গাউন। তার চেয়ে কালো একটি কলকে ছিলো হাতে। সামনে সেই কিংবদন্তির বিশাল বাঁশি। নির্বিকার দৃষ্টি ! পৃথিবীর কোনো দ্বন্দ্ব সংঘাত তাঁকে আচ্ছন্ন করেনি। তাঁর পাশের লোকেরা খুব মনোযোগী, তাঁর কথা শুনছেন। কথাগুলো এমন আকর্ষণীয় যা সবাইকেই নিবিষ্ট করে। বুঝতে পেরেছিলাম, — প্রতিক্রিয়ায় তিনি তখন বিভোর-- তবে কোনো ভাবেই বাহ্যিক জ্ঞান ও বিবেচনাবোধ হারিয়ে ফেলেননি। আমার সাথী আমার নামধাম এমন কি কবিতা ও গান রচনার দুর্বার নেশার কথা জানিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন লাল মিয়ার সাথে। লাল মিয়া আমাকে কবিতার কথা শোনালেন। কবিদের নিয়ে কিছু বললেন। প্রথম আলাপেই আমাকে কবি সম্বোধন করলেন। আমি অতি সতর্কতার সাথে তাঁর প্রতিটি কথা, চোখ মুখ হাত ও দৈহিক আন্দোলন লক্ষ্য করতে লাগলাম। হঠাৎ হেসে ফেললেন তিনি হো-হো করে। মুখে বললেন,

'কবিরা শব্দ নিয়ে ছবি আঁকেন। শব্দের রস সঞ্চারণে তাঁর ছবি হয় যুগোত্তীর্ণ। এই গাঙ্গেয় ভূমির কবিরা তাই করেছেন যুগে যুগে। আপনাকেও তা করতে হবে'। আমি তাঁর কথার এক ফাঁকে বললাম, 'আপনার কথাই তো কবিতা। আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি'। তিনি বললেন, 'আমি রঙ ও তুলি দিয়ে ক্যানভাসের ওপর পৃথিবীর কবিতা আঁকি।' একটু থেমে আমার বহু দিনের স্বপ্নলোকের মানুষ যাদুর বাঁশিওলা লাল মিয়া বাঁ হাতের তালুতে গাঁজার তামাক ঘষতে ঘষতে বললেন, 'কবিরা শব্দের ঘটকালি করেন। মাইকেলকে দেখুন না, তিনি বললেন ঃ

'কে কবি—কবে কে মোরে? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন
সেই কি সে যম-দমী? তার শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মন : কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তাগামী-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।'

কবিতাংশ পাঠ করে লাল মিয়া থামলেন। আমার মনে হলো, তিনি মাইকেল মধুসূদনের 'কবি' সনেটটির সবটাই পাঠ করতে পারতেন। পরে জেনেছিলাম, শিল্পী মাইকেল মধুসূদনের প্রতি অসম্ভব দুর্বল ছিলেন। অনেকবার তাঁর মুখ থেকে শুনেছি, 'মধুসূদন বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবি। মধুকে কেউ মাড়িয়ে যেতে পারেন নি'। পরবর্তীকালে তিনি আমাকে অনেক উর্দু ফার্সি কবিতাও মোশায়ারার ভঙ্গিতে শুনিয়েছিলেন।

এরপর কিছু সময়ের জন্য লাল মিয়া আমাকে তাঁর বিশালাকার বাঁশি বাজিয়ে শুনিয়ে ছিলেন। বাঁশি শেষ হলে আমি জানতে চেয়েছিলাম, 'কোন সুর?' তিনি বলেছিলেন, 'সুদূর লোকের ভেসে আসা সুর।' আস্তে আস্তে বুঝতে হয়। আমি একেবারেই কথা তুলিনি। কারণ গঞ্জিকার অতিমাত্রা তাঁকে বিষণ্ণ করে রেখেছিলো। যতদূর মনে পড়ে, তখন ছিলো শীতকাল। রূপগঞ্জ বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে বট-অশ্বত্থ ও অন্যান্য গাছের ছায়ায় সূর্যের ক্ষীণ প্রভা দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যা আসার আগাম আগমনী শীতের বাতাসে বাতাসে। কিন্তু লাল মিয়ার ঘরে ফেরার কিংবা স্থান ত্যাগের কোনো ব্যস্ততা দেখলাম না। আমি সেদিনও তার ঘর-গৃহ সংসার সম্বন্ধে কোনো ধারণা পাইনি। তাই চির পথিক লাল মিয়ার নিরাসক্ত ভাব আমাকে ব্যথাতুর করেছিলো।

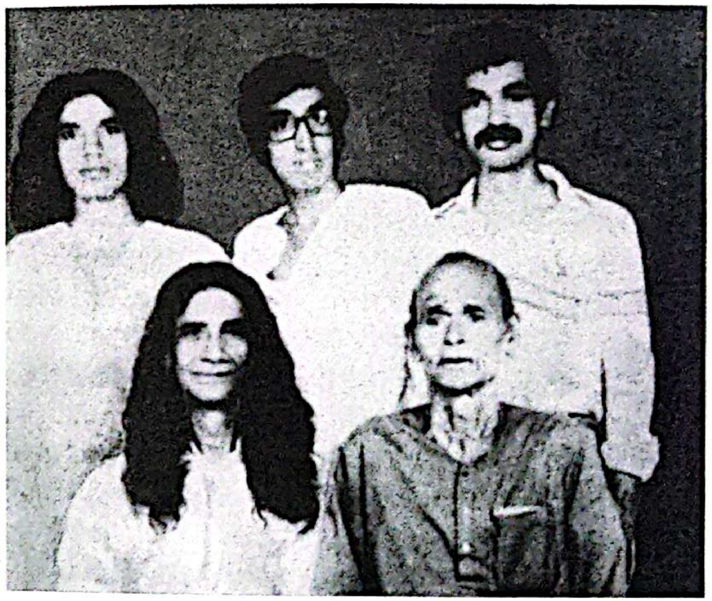
লাল মিয়ার সাথে প্রথম দিনের আলাপ বেশ দীর্ঘ হয়েছিলো। তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিদ্যাপতি, চন্ডিদাস, শেখ সাদি, আল্লামা ইকবাল, জামি, রুমি, হালি, গালিব, জোস মালিহাবাদি, লালন প্রমুখকে নিয়ে নানা কথা, এমনকি তাদের কবিতার কিছু কিছু অংশ উচ্চারণও করেছিলেন। লাল মিয়ার সঙ্গে প্রথম আলাপে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। ভেবেছি, একজন চিত্রশিল্পী হয়ে বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষার কবিদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ ও অনুসন্ধানী দৃষ্টি কিভাবে জন্মালো। তাই লাল মিয়ার সাথে আমাকে মিশতে হবে। শিল্পীর সঙ্গে প্রথম দিনের আলাপচারিতা, দীর্ঘ স্মৃতি, দীর্ঘ কথার সরিৎসাগর। সালাম জানিয়ে লাল মিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি নড়াইলের পার্শ্বে একটি গ্রামে আশ্রয় নেই। আমার সঙ্গীটি যাবার পথে আমাকে জানালেন, লাল মিয়া সাহেবের আসল নাম শেখ মুহম্মদ সুলতান—'লাল মিয়া' সুলতানের মা বাবার দেওয়া বাল্য নাম।

এরপর অসম্ভব প্রতিভার অধিকারী নড়াইলের বিশ্ববরেণ্য সন্তান সুলতান সাহেবের সঙ্গে বয়সের সব পার্থক্য ভুলে গিয়ে কেমন করে আমি বন্ধুত্বের অকাট্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলাম তা আঁচ করতে পারি নি। ধীরে ধীরে সম্পর্কের গভীরতায় পিতৃবয়সী এই বিশাল মানুষটাকে 'ভাই' সম্বোধন করে ফেলি। তিনি নিজেও কোনো কোনো সময়ে আমাকে আমার নামের সাথে ভাই শব্দটি জড়িয়ে 'মহসিন ভাই' বলে সম্বোধন করেছেন।

একবার এই 'ভাই' সম্বোধন নিয়ে সুলতান ভাই একটি দুষ্টচক্রকে দারুণ অপমান করেছিলেন। ঘটনাটি ছিলো এমন :

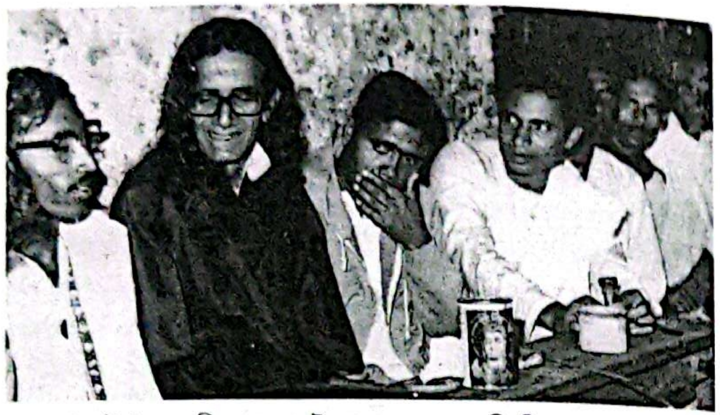
যতদূর মনে পড়ে, ১৯৮৫ সনে আমাদের কালিয়া উপজেলার তৎকালীন ইউ.এন.ও জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন আমার মতো কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তিকে একুশে ফেব্রুয়ারি উৎযাপন ও একটি একুশে সংকলন প্রকাশে উৎসাহী করেছিলেন। তিনি নানা জনের কাছ থেকে কিছু টাকাও জোগাড় করেছিলেন। জনাব শামসুদ্দীন সাহেবের আন্তরিকতায় ও তত্ত্বাবধানে আমরা 'শব্দের চাবুক' নামের একটি একুশে সংকলন করি। ওটির সম্পাদনা করেছিলাম আমি। ২০ ফেব্রুয়ারি খুব সকালে জনাব শামসুদ্দীন সাহেবের গাড়িতে চড়ে আমি, মানিক বিশ্বাস ও স্বয়ং ইউ.এন.ও সাহেব সুলতান ভাইয়ের নড়াইল চিত্রশালা ভবনে উপস্থিত হই। এর কয়েকদিন আগে আমরা তাঁকে কালিয়া পাবলিক লাইব্রেরিতে একুশে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলাম। যাহোক, সকাল বেলায় কালিয়া থেকে নড়াইলে গিয়ে আমরা সুলতান ভাইকে কালিয়া নিয়ে যাই। পথে সুলতান ভাই চাঁচুড়ি পুরুলিয়া স্কুলের (বহু কথিত

নন্দন কানন স্কুল) সামনে দাঁড়িয়ে ইউ.এন.ও সাহেবকে অনুরোধ করেন, স্কুলটিকে আর্থিক সাহায্য দানের জন্য। আমার জানা মতে ইউ.এন.ও সাহেব বিশ্ববরেণ্য শিল্পীর সম্মানে স্কুলটির উন্নয়নে আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলেন। যা হোক, নবগঙ্গা নদী ফেরির সাহায্যে পার হয়ে আমরা কালিয়ায় পৌঁছাই। আমরা শিল্পীকে যথাসাধ্য সম্মান দেখিয়ে বিকেল বেলায় কালিয়া পাবলিক লাইব্রেরি সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বে চারদিকে দেওয়ালঘেরা জায়গায় ২০ ফেব্রুয়ারিই একুশের অনুষ্ঠান ও 'শব্দের চাবুক' সংকলনটি প্রকাশ করি। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতার প্রারম্ভে ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারায় কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে 'শ্রদ্ধেয় মহসিন ভাই' বলার সাথে সাথে প্রথম সারিতে বসা কয়েকজন উকিল হেসে উঠেছিলেন। প্রথমতঃ অর্থকরী ব্যবসায় নিয়োজিত উকিলরা আমার মতো 'পদ্য লেখক'কে শ্রদ্ধার আসনে দেখতে রাজি ছিলেন না। তারা ভেবেছিলেন, সুলতান সাহেব আমার মতো বখে যাওয়া তরুণের নাম উচ্চারণ করতে শ্রদ্ধেয় শব্দটি বলবেন কোন দুঃখে। তাদের হাসিতে সুলতান ভাই দারুণভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি 'শ্রদ্ধেয় মহসিন ভাই' আবারো উচ্চারণ করে ঐ



ছবি সৌজন্যে : মহসিন হোসাইন

শিল্পী এস. এম. সুলতান ও কবিয়াল বিজয় সরকার। পেছনে দাঁড়িয়ে বাঁ থেকে মহসিন হোসাইন ও অন্যান্য (নড়াইল, ১৯৮১)



ছবি সৌজন্য : [illegible]

রূপগঞ্জ (নড়াইল) এর মুচির পুলের ছোট দোকানের আড্ডায় শিল্পী সুলতান

মহাশয়দের মুখ সেদিন ম্লান করে দিয়েছিলেন। তাদের মাথা নিচু হয়ে যায়। আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী ইউ.এন.ও শামসুদ্দীন সাহেব ও মানিক বাবু পরে এ নিয়ে বেশ মজা করেছিলেন। যে প্রসঙ্গে এই ঘটনা বলা তাহলো, সুলতান ভাই কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক এমনকি যে কোনো সৃজনশীল মানুষকে বয়সের সব তারতম্য ভুলে শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন। তাই কিশোর প্রায় কোনো তরুণকে তিনি 'ভাই' বলতে, 'শ্রদ্ধেয়' বলতে কার্পণ্য করতেন না। আর ঐ সম্বোধনে তিনি পরাজিত হয়েছেন এমন ভাবনা চিন্তা তাঁর মনের কোণে স্থান পেয়েছিল এমন ভাবতে পারি নি।

কিংবদন্তির শিল্পী এস.এম. সুলতানের সাথে আমার অগণিত দিনও রাত্রির আনন্দ, ক্লান্তি ও বঞ্চনার ইতিবৃত্ত জড়িয়ে আছে। ১৯৮১ সনে নড়াইলের মহকুমা হাকিম জনাব মমতাজুর রহমান নড়াইলের গুণীজন অর্থাৎ কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, কবিয়াল, জারিয়াল ও সাংবাদিকদের তাঁর বাসায় আহ্বান করেছিলেন। বলা যায়, সেটা ছিলো নড়াইল মহকুমার গুণীজন সমাবেশ। এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো চিত্রানদীর পশ্চিম তীরে 'নীলকুঠি', পরবর্তী কালে এস.ডি.ও সাহেবের বাসভবনে। ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী এস.এম. সুলতান, কবিয়াল বিজয় সরকার, জারিয়াল মসলেম বয়াতি প্রমুখ। সেখানে আমিও আমন্ত্রিত হয়ে 'নড়াইলের লোকসঙ্গীত' সংগ্রহ করে দ্রুত প্রকাশের জন্য বক্তৃতায় এস.ডি.ও সাহেবকে অনুরোধ করি। আমি ইতোমধ্যে অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দিনের 'হারামণি'-এর কয়েকটি সংকলনে লোকসাহিত্য সংগ্রহ করে দিয়ে এবং খুলনার কয়েকটি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে কিঞ্চিৎ পরিচিতি পেয়েছিলাম। সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিলো,

একজন লোকসাহিত্য গবেষকের সাহায্যে 'নড়াইলের লোকসঙ্গীত' গ্রন্থটি সম্পাদনা করা হবে। আমার গ্রামের বাড়ি শহর থেকে দূরে থাকায় সংকীর্ণতা ও আঞ্চলিকতায় বিশ্বাসী কয়েকজন শহরবাসী আমি যাতে গ্রন্থ সম্পাদনার দায়িত্ব না পাই সেই মতলবে ছিলেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থ সম্পাদনা ও গান সংগ্রহের দায়িত্ব প্রাপ্তিতে সুলতান ভাই আমার সমর্থক ছিলেন। আমি ঐ গ্রন্থটির সম্পাদনা কাজটি করি। কিন্তু প্রচ্ছদ তৈরির সময় এস.ডি.ও সাহেব সম্পাদক হিসেবে তার নামটি প্রচ্ছদে রেখেছিলেন। আমি ঐ আচরণে বিস্মিত হই। তবু তিনি আমার নামটিও সহসম্পাদক হিসেবে রেখে ছিলেন। সে অনেক ঘটনা অনেক ক্লেশদায়ক অভিজ্ঞতা : কি করে একজন আমলা বিনা সাধনা ও পরিশ্রমে সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের তকমা গায়ের জোরে গ্রহণ করেন। প্রথম সাহিত্য সম্মেলনের দিন অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে নিয়ে একটি ছবি তোলা হয়েছিলো। কিন্তু ছবি তোলার সময় আমরা সুলতান ভাইকে দেখতে পেলাম না। তাতে এস.ডি.ও সাহেবের মন ক্ষুণ্ণ হলো। 'নড়াইলের লোকসঙ্গীত' গ্রন্থের সম্পাদনা কাজ পেয়ে আমি নড়াইল সাহিত্য পরিষদের খরচায় দীর্ঘ দিন নড়াইল শহরে ও রূপগঞ্জে অবস্থান করেছিলাম। তখন সুলতান ভাইয়ের সাথে প্রতিদিনই আমার দেখা হতো। তিনি আমাদের অনুরোধে 'নড়াইলের লোকসঙ্গীত' গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছিলেন। যদিও প্রচ্ছদের জন্য আমরা তাকে পারিশ্রমিক দেওয়ার কথা ভাবতে পারিনি। তবে তাঁর জীবজানোয়ার, পশুপাখি ও পোষ্যদের জন্য এস.ডি.ও সাহেব টাকা দিতেন। তিনি কোনো কোনো সকাল ও বিকেলে রিকসায় দুবেলাই নড়াইল শহরে যেতেন। আমি প্রথম কিছুদিন লোকগানের সংগ্রহ নিয়ে নড়াইলের রাইফেল ক্লাব বা আনসার ক্লাবে থাকতাম। এস.ডি.ও সাহেব ও সুলতান ভাই কখনো পায়ে হেঁটে ক্লাবে যেতেন কখনো বা গাড়িতে। কারণ এস.ডি.ও ভবন থেকে ক্লাবের দূরত্ব বেশি নয়। অবশ্য পরে আমার থাকা ও দাপ্তরিক কাজের জন্য নড়াইলের ডাকবাংলার মাঝখানের কক্ষটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো। ক্লাবে অবস্থানকালে এক সকালে এস.ডি.ও সাহেব ও সুলতান ভাই বিনা নোটিশে রাইফেল ক্লাবে আমার রুমে হাজির হলেন সম্পাদনা কাজের অগ্রগতি দেখতে। প্রচুর বই পুস্তক ও কাগজপত্রের মধ্যে একখানি সুন্দর সুবিন্যস্ত পাটের দড়ি (রশি) দেখে উভয়েই ঘাবড়ে গেলেন। তারা দু'জনই একসাথে প্রশ্ন করলেন, আরে দড়ি কেন? (দড়ি রাখা আমাদের অঞ্চলে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার ইঙ্গিতবহ)। আমি তাঁদের সবিনয়ে জানালাম, 'ঝিনঝিনে'। 'ঝিনঝিনে'য় ঐ সময় দক্ষিণ বাংলায় পা থেকে হঠাৎ শুরু হওয়া ব্যথায় অগণিত লোক আক্রান্ত হতো। পায়ে যদি প্রতিবন্ধকতা থাকতো মানুষ রক্ষা পেতো। তাই রশির ব্যবস্থা তাঁদের হাসিতে আমি বেশ লজ্জা

পেয়েছিলাম। হাসি ফেলে সুলতান এস.ডি.ও সাহেবকে বললেন, 'দেখুন স্যার, এই রকম নিষ্ঠাবান লোকদ্বারাই আমাদের নড়াইলের কাজ হবে। এমন লোক আপনি জীবনেও পাবেন না। 'ঝিনঝিনের' ভয়েতো মানুষ একা পথ চলে না। একঘরে একা ঘুমায় না। অথচ কবি সাহেব আমাদের কাজের স্বার্থে (নড়াইলের লোকসঙ্গীত গ্রন্থ সম্পাদনা) ফাঁকা ঘরে একাই থাকছেন।' একথা শুনে এস.ডি.ও সাহেব খুশি হলেন। আর মুখে বললেন, 'যতো ছালা (শালা) পাগল এক জায়গায়!' এখানে একটি বিষয় বলে রাখা ভালো, নড়াইলের বুদ্ধিমান ও বিবেচক লোকেরা লোকসঙ্গীত সংগ্রহের সাথে জড়িত সবাইকে অনুৎপাদিত খাতে অর্থ ব্যয়ের জন্য পাগল আখ্যায়িত করেছিলো। দীর্ঘদিন নড়াইল রূপগঞ্জের দোকান-রেস্তরাঁয় আমাদের নামের আগে কিংবা পরে পাগল কথাটি জুড়ে দেওয়া হতো। সেদিনের ঐ পাগল গোষ্ঠীর মধ্যমণি ছিলেন সুলতান ভাই। তিনি তাঁর স্বীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি গেটআপ 'নড়াইলের লোকসঙ্গীত' গ্রন্থের জন্য এঁকে দিয়েছিলেন। আমি মনে করি এটি শিল্পী সুলতানের একটি বড়ো কাজ।

তবে সুলতান ভাই প্রচ্ছদ করতে স্বতস্ফূর্ত রাজি হয়েও বেশ দেরি করেছিলেন। আর এ জন্য নড়াইল থেকে আমাকে প্রায়ই তাঁর পুরানো দালানের বাসায় যেতে হতো। আড্ডা জমাতে হতো রূপগঞ্জের বিভিন্ন আড্ডাখানায়। প্রায়ই তাঁর বাজারের টাকা দিতে হয়েছে আমাকে। বাজারের টাকা দেওয়ার সাথে কাজের কোনো সম্পর্ক ছিলো না। তাঁর দৈন্য ও দুদর্শা আমাকে পীড়িত করতো তাই আমি মাঝে মাঝে অর্থ সাহায্য করেছি।

সেই ছবির প্রসঙ্গটি ভুলে গিয়েছি। এস.ডি.ও সাহেবের বাংলোর সামনে সবাই মিলে আমরা ছবি তুলেছিলাম ১৯৮১ সনের ১৯ জুন। সিদ্ধান্ত হলো, ঐ ছবিটা 'নড়াইলের লোকসঙ্গীত' গ্রন্থে ছাপা হবে। কিন্তু গ্রন্থের প্রচ্ছদ শিল্পী প্রিয় সুলতানের ছবি থাকছে না। আমি এস.ডি.ও সাহেবকে বুঝিয়েছিলাম, সুলতান ভাই ও এস.ডি.ও সাহেবের আরেকটি ছবিও গ্রন্থে প্রকাশ পাবে। সুলতান ভাই ছবি তুলতে রাজি হলেন। তবে ছবি দুজনের নয় তিন জনের যাবে। এরপর এস.ডি.ও সাহেব ডানে মাঝে সুলতান ভাই ও শেষে আমার দাঁড়ানো একটি ছবি এস.ডি.ও-এর বাংলোর সামনে থেকে তোলা হলো। ১৯৮১ সনেই ক্যাপশনসহ 'নড়াইলের লোকসঙ্গীত' গ্রন্থে আলোচিত ছবি দু'টো প্রকাশ পায়। তখনকার দিনে বরেণ্য শিল্পী সুলতানের কাছে আমার বয়স, পরিচিতি, যোগ্যতা ও খ্যাতি যে কতো নগণ্য ছিলো তা আমার জানা। তবু আমাকে ছাড়া তিনি যে প্রকাশিতব্য পুস্তকের জন্য ছবি তুলতে রাজি হননি, এটা ছিলো

আমার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসারই প্রমাণ।

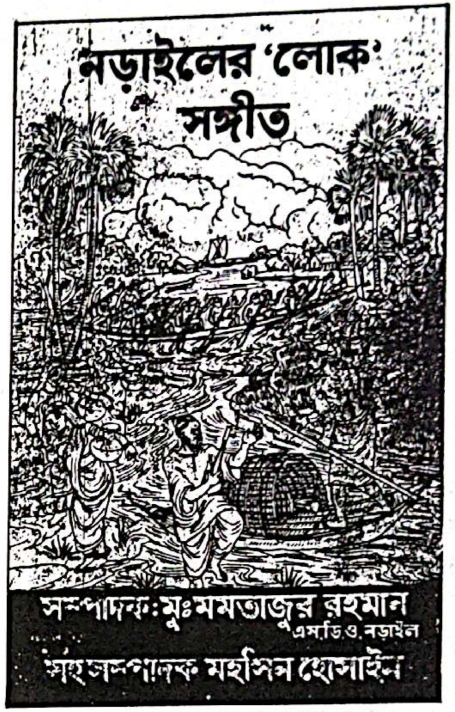
সুলতান ভাই সংসারের সমস্ত দোষকালিমার উর্ধ্বে ছিলেন, এমন মত আমি কখনো পোষণ করি না। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির অনেক জাতীয় পুরুষের সাথে আমার দীর্ঘ পারঙ্গমতা সৃষ্টি হয়েছিলো, যারা এখন আমাদের জাতীয়তার স্তম্ভস্বরূপ। সুলতান ছিলেন তাঁদের ব্যতিক্রম। অনেক মহাপুরুষকে জানি যারা তাঁদের স্বার্থে সুদূর গ্রাম থেকে চিঠি লিখে ঢাকায় এনে আমাকে একবেলা খাবার টেবিলে ডেকে বসাতেও সাহসী হননি। তাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁদের পুত্রকন্যারা দেখেছি পিতার উঞ্ছবৃত্তির সহযোগিতায় ইন্টেলেকচুয়াল আচরণ করেছেন। অথচ তাঁদের জন্য বছরের পর বছর আমার শ্রম, অর্থ ও মেধা ব্যয় হয়েছে। সুলতান ভাইয়ের দুর্বিসহ দুর্দিনে আমি তাঁকে নানাভাবে সহযোগিতা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যখন তাঁর সুদিন এসেছে তখন তিনি তা কোনোভাবে বিস্মৃত হননি। নতুন বাড়িতে যাওয়ার পরে অকারণেই রূপগঞ্জ থেকে ফেরার পথে আমায় রিকসায় তুলে নিয়েছেন। মৃদুস্বরে বলেছেন, 'আসেন কবি সাহেব, বড়ো মাছ আছে, ভাজি রান্না দুই-ই হবে।' আমি আমার কাজের ব্যস্ততায় তাঁকে যতোটা এড়াতে চেয়েছি তিনি ততটা শক্ত হয়েছেন, 'যেতে হবে'। গিয়েছিও। বাসায় গিয়েই 'বাসনা', 'পদ্ম' ওদের মা 'নীহারবালা'কে ডেকে সন্ধান নিয়েছেন জীবজন্তুগুলোর আহার হয়েছে কি না? জীবজন্তুর বিচিত্র সব নাম। সীমাহীন আদর আর যত্নে তিনি তাদের লালন করেছিলেন—যেন জন্ম জন্মান্তরের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মনে হয়, তারা সুলতানের ভাষা যতোটা বুঝতো তাঁর প্রতিবেশী বৈরী মানুষেরা তা বুঝতে পারতো না। জীবজন্তুর প্রতি সুলতানের দুর্বলতা কখনো কখনো সাধারণ শালীনতাকে ব্যাহত করেছে। তাঁর ভক্ত ও বন্ধুরা সেসব জানতেন কিন্তু অন্যরা কোনো ভাবেই তা গ্রহণ করতে পারতেন না। সম্ভবতঃ ১৯৮৩ সনের শরৎকালের কোনো এক সুন্দর সকালে আমি ও মাউলি গ্রামের মানিক বিশ্বাস নড়াইলের তারিক ভাইয়ের হোটেল থেকে সরাসরি রিকসায় সুলতান ভাইয়ের পুরানো বাড়িতে হাজির হলাম। আমরা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম এক প্যাকেট দামি বিস্কুট ও টেপরেকর্ডার। চা বিস্কুট খাবো আর শিল্প দর্শন বিষয়ে আলোচনা করবো। আর সেই আলোচনা রেকর্ড করবো। সুলতান ভাই তখন ভগ্নপ্রায় বাড়িটির দ্বিতীয় তলায় থাকতেন। দ্বিতীয়তলার মাঝের কক্ষে আমরা বসতাম, কথা বলতাম, তিনি ঐ কক্ষে ছবিও আঁকতেন। রাতের বেলা শিকলবন্দি তার প্রিয় কুকুর 'চম্পা'কেও রাখতেন। ছোট খাটো ব্রাউন কালারের রাশিয়ান কুকুরটির নাম ছিলো 'চম্পা'। যা হোক, সকালবেলায় আমার হাতে বিস্কুটের প্যাকেট দেখে সুলতান ভাই বেশ খুশি হলেন। চিৎকার করে পশ্চিম দিকের কক্ষে পদ্মকে লক্ষ্য করে বললেন, 'পদ্ম, দুই সাহেব

এসেছেন, একটু চা হবে?'

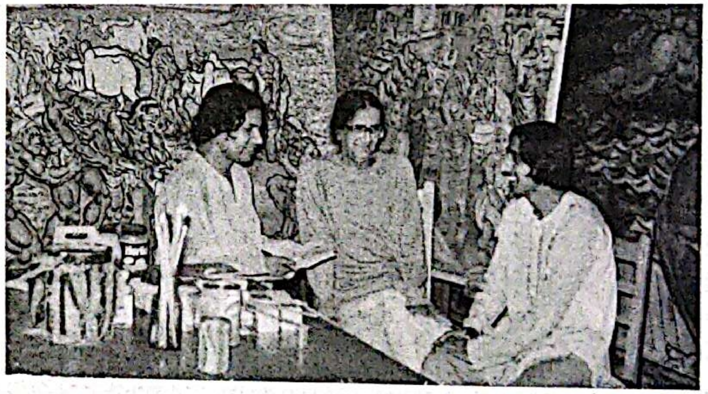
আমি সুলতান ভাইয়ের সাথে সুফী দর্শন, সুফী সাহিত্য, বৈষ্ণবদর্শন, পদাবলী সাহিত্য, বাংলা সাহিত্যে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের অবদান প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেছি। আর স্বল্পভাষী মানিক বিশ্বাস সব কথা টেপ করেছেন। বেশ কিছু সময় পরে আমাদের জন্য চা আসলো। আমি বিস্কুটের প্যাকেট খোলা মাত্র শিকল বাঁধা চম্পা লাফাতে থাকে। সুলতান ভাই বললেন, বিস্কুট খেতে চায়। এরপর সব বিস্কুটই তিনি চম্পাকে দিয়ে দিলেন।

কুকুরের পাশে রাখা একটি মাটির পাত্রে সুলতান ভাই তাঁর কাপের পুরোটা চা চম্পার জন্য ঢেলে দিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসতে থাকেন। ঐ ঘটনায় আমি বেশ উৎসাহ বোধ করলেও মানিক বিশ্বাস একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।

সুলতান ভাই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের সঙ্গে যেমন মিশতে পারতেন তেমনি অতিদীন কাংগাল অন্ত্যজ মানুষদের সাথে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতেন। মূলতঃ গরীব ও পিছেপড়া মানুষদের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিলো অধিকতর গভীর। উপমহাদেশের বড়ো বড়ো কবি-সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, গায়ক, যন্ত্রশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, রাজনীতিকেরা যেমন তাঁর বন্ধু ছিলেন, তেমনি গ্রামের অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত অসংস্কৃত কবিয়াল-জারিয়াল-ভিক্ষুগায়ক-বোষ্টম-বোষ্টমিরাও সুলতানকে আকর্ষণ করেছিলো। নড়াইল জেলার ডুমদি গ্রামের কবিয়াল বিজয় সরকার, চালনা গ্রামের প্রফুল্ল গোসাই, তারাপুরের জারিয়াল মসলেম বয়াতি, গাজিরহাটের গোবিন্দ গোসাই প্রমুখের সঙ্গে সুলতান ভাই সহজভাবে মিলে মিশে সঙ্গ দিতেন। আমি কৈশোর থেকে সংসার উদাসীন ও বিষয় বিরাগী হওয়ায় উল্লেখিত ব্যক্তিগণসহ অসংখ্য কবি, জারি, ভাবগান, অষ্টগান, কীর্তন ও যাত্রা গানের দলে থেকেছি, গান রচনা করেছি, পালা রচনা করেছি ও অভিনয় করেছি। সুলতান ভাইও আমাদের লোক-জীবনের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রাণের টানে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁর ও আমার আন্তরিক সম্পর্ক আমৃত্যুই ছিলো, কোনো ঝড়ো হাওয়ায় তা উৎপাটিত হতে পারেনি। একবার আমি নড়াইলের প্রায় ৪ মাইল পশ্চিমে তুলারামপুরার আসরের কবিগান সেরে পরদিন দুপুরে রূপগঞ্জ বাজারে সুলতান ভাইয়ের সাথে দেখা করি। বেশ কিছুদিন পরে দেখা হওয়ায় সুলতান ভাই বড়ো খুশি হলেন। দর্শন ও শিল্পের জটিল জটিল বিষয় নিয়ে আলাপ হলো তাঁর সাথে। আমি ঐদিন রাতে নড়াইল থেকে গেলাম। কথা রইলো কয়েকদিন পর (প্রায় ১৪ দিন) যখন নড়াইলের দক্ষিণ প্রান্তে বনখলিশাখালি গ্রামে কবিয়াল বিজয় সরকারের কবিগান হবে সুলতান ভাইকে নিয়ে



শিল্পী এস. এম. সুলতান
অংকিত প্রচ্ছদ (১৯৭৯)



ছবি সৌজন্যে : মহসিন হোসাইন

নড়াইলে নিজ স্টুডিওতে আলাপরত শিল্পী সুলতান (১৯৯০)

যেতে হবে। কবিয়াল বিজয় সরকারের কাছ থেকে জেনেছিলাম, সুলতান ভাই কবিয়াল বিজয় সরকারের দলে পেশাদার বাঁশিবাদক ছিলেন। পরবর্তীকালে আমিও ঐ কবির দলের বাঁধনদার বা সরকার ছিলাম। যা হোক, বনখলিশাখালির কবিগান শুরু হওয়ার দুদিন আগে আমি পায়ে হেঁটে সরকার মশাইয়ের ডুমদির বাড়িতে রাত যাপন করি। এবং শেষ রাতে পায়ে হেঁটে কুড়িগ্রামে সুলতান ভাইয়ের বাসার দিকে রওনা হই। কুড়িগ্রাম পৌছাতে সকাল ৭টা বেজে যায়। এরপর সুলতান ভাইয়ের ভাষায় 'বাল্যসেবা' সেরে রূপগঞ্জ থেকে লঞ্চে চড়ে গোবরা ঘাটে নেমে পড়ি। সুলতান ভাইয়ের গায়ে কালো লম্বা গাউন, হাতে বিশালকায় বাঁশি, মাথায় ঝাঁকড়াচুল। সে সময় আমারও মাথায় ছিলো দীর্ঘ মধ্য কুঞ্চিত কেশবাস, সাদা পাজামা পানজাবি ও খদ্দরের চাদর গায়ে। শীতের প্রায় দুপুরে গোবরা বাজারে পথ চলার সময় শত শত লোক আমাদের পিছু নেয়। গোবরার পাশের একজন পরিচিত গ্রাম্য ডাক্তার আমাদের উদ্ধার করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে নাস্তা করালেন। আজ আর মনে নেই, এরপর আমরা দুজনে গরুর গাড়িতে না রিকসাভ্যানে বনখলিশাখালীর ভাগ্যিদার ডাক্তারের বাড়িতে কবিয়াল বিজয় সরকারের কবিগানের দলের সঙ্গে মিলিত হলাম। ৩ দিনের অনুষ্ঠানে গিয়ে সুলতান সেখানে মাত্র ২ দিন থেকেছিলেন। তৃতীয় দিন সকালে তিনি নড়াইলে ফিরে যান। কথা ছিলো, তিনি আমাদের সাথে ৩ দিনই থাকবেন। কিন্তু একটি ঘটনায় তিনি ব্যথা পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। আমার প্রতি আমার চেয়ে বেশি বয়সী লোকদের সম্মান ও স্নেহ ছিলো বরাবরই। আমিও তাঁদের সব সময় শ্রদ্ধা করে আসছি। ভাগ্যিদার ডাক্তারের পশ্চিম পোতার টিনের ঘরের পূর্ব পার্শ্বের বারান্দার দক্ষিণাংশে সুলতান ভাই ও আমি এক বিছানায় রাত কাটাতাম। আর সারা দিন তাঁকে সঙ্গ দিতাম। তিনি যখন গঞ্জিকার তামাক কাটতেন আমি তখন গুলি বানাতাম। এর ফাঁকে সুলতান ভাই তাঁর হারানো দিনের স্মৃতিচারণ করতেন। দ্বিতীয়দিন বিকেল বেলায় কবিয়াল বিজয় সরকার সুলতানের গাঁজা সেবনের খুব সমালোচনা করেন। বিশেষত আমাকে রূঢ় কথা বলেন। সম্ভবতঃ সুলতান ভাইয়ের কানে কেউ ঐ কথা লাগিয়েছিলো। তাই তিনি তৃতীয়দিন সকালেই আমাদের ত্যাগ করে নড়াইল ফিরে গেলেন। এখানে উল্লেখ থাকা ভালো বিজয় সরকার শিল্পী সুলতানের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তবে তিনি সুলতানের সুসংগঠিত জীবন কামনা করেছিলেন। যা হোক, এই ঘটনা সুলতান এক সময় ভুলে গিয়েছিলেন। তাই পরবর্তীকালে আমাদের সম্পর্কের কোনো ছেদ ঘটেনি। এরপরও আমি, সুলতান ও কবিয়াল বিজয় সরকার বিভিন্ন জায়গায় চলাফেরা করেছি, ছবি তুলেছি এবং বৈঠক আলোচনায় যোগ দিয়েছি।

শিল্পী সুলতান যে শুধু বড়ো মাপের শিল্পী ছিলেন তা নয়—তেজদীপ্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারীও ছিলেন। যৌবনে তিনি অনেক অশালীন ও ঠগবাজ লোককে নিজ হাতে পিটিয়েছেন। তাঁর মারমুখি হওয়া আর অন্যায়কারীকে মেরে তাড়িয়ে দেওয়ার একাধিক ঘটনা তিনি আমার কাছে বলেছিলেন। নড়াইল জেলার কালিয়া থানার চাঁচুড়ি-পুরুলিয়া নন্দনকানন উচ্চ বিদ্যালয় ও নন্দন কানন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান ভাই। ওটা তাঁর মামা রাহাতুল্লাহর গ্রাম। ১৯৪৭ সনের দেশ বিভাগের পরে সুলতান ভাই ঢাকা আর্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের থেকে মানসিক ভাবে লাঞ্ছিত হয়ে নড়াইল ও যশোরের বিভিন্ন জায়গায় হতাশ জীবন যাপন করেন। এক পর্যায়ে তিনি পুরুলিয়ার কৈলাস সিকদারের পরিত্যক্ত প্রাচীন জংলা ভিটা স্থানীয় উৎসাহী যুবকদের নিয়ে পরিস্কার করেছিলেন। এরপর তো স্কুল প্রতিষ্ঠার বিচিত্র ঘটনা। যা হোক, ঐ স্বপ্নময় চাঁচুড়ি-পুরুলিয়া এলাকা কেন এবং কিভাবে ত্যাগ করলেন তা তিনি আমাকে এভাবে বলেছিলেন, 'দেখুন কবি সাহেব, আমার জীবনের দীর্ঘ নটি বছরের শ্রম আর মেধা খাটিয়েছিলাম নন্দন কানন স্কুলের জন্য। ওখানকার সবাই আমাকে জানে। সবাই আমাকে মানে। চাঁচুড়িয়া হাটের দিনে আমি হাটের কাছের এক হিন্দু বাড়িতে তামাক খেতে যাচ্ছি এমন সময় একজন লোক আমাকে উদ্দেশ্য করে কয়েকটা অশালীন কথা বলে। আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। আমি ঐ লোকটাকে বিনয়ের সাথে ডেকে কাছে আনলাম। লোকটা কিছু বোঝেনি। আস্তে করে মাথার উপর থেকে হাট সওদার ধামাও নামালাম, এরপর তার ঘাড় চেপে নিচু করে কিল মারতে শুরু করি। লোকটা প্রাণ ভয়ে চিৎকার করতে থাকে। আমি তাকে ছাড়িনি। এর মধ্যে পার্শ্বের পুলিশ ফাঁড়ি থেকে দুজন সিপাই এসে আমাকে থামিয়ে দেয়। আমি ঐ বদ লোকটাকে গুনে গুনে মোট ৫০টি কিল দিতে চেয়েছিলাম, পারিনি। বদটা বেহুঁশ হয়ে থাকলো। আর সারা গা ফুলে গেলো। পুলিশের সিপাইরা আমাকে তাদের ফাঁড়িতে নিয়ে উঠালো। আমি পরের দিন ঐ এলাকা ত্যাগ করেছি।' সুলতান যখন ঐ ঘটনাটা বলছিলেন তখনও তাঁর চোখে মুখে যুগপৎ ক্ষোভ ও অভিমানের আগুন নেভেনি। ঘটনাটি শোনার পরে একটু থেমে আমি বললাম, 'তাকে কি না মেরেও আমরা ক্ষমা করতে পারি না'? সুলতান বললেন, 'ঐ লোকটা আমাকে দীর্ঘ দিন ধরে চিনতো, জানতো। আমি তো তার কোনো ক্ষতি করিনি। সে কেন 'ছোট কাপের' মাত্রা ছাড়িয়ে 'বড়ো কাপে' কথা বলবে। তাই শাস্তি তাকে পেতেই হবে।' আমি তাঁর সাথে একমত হলাম। তিনি তখন হো হো করে হেসে উঠলেন। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন তা হলো, সুলতান ভাই ছাত্র জীবনে কিছু আরবি, ফার্সি বিদ্যাও অর্জন করেছিলেন। তিনি নড়াইল কলেজিয়েট স্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণী পাশ

করে পিতার ইচ্ছেয় ভর্তি হয়েছিলেন নাকসি এ.বি.এস জুনিয়ার মাদ্রাসার ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে। ঐ জুনিয়ার মাদ্রাসায় সুলতান ভাই ৭ম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালেই কোলকাতায় পাড়ি জমিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা যাবে। যা হোক সুলতান ভাইকে আমি ১৯৮০ সন থেকে ১৯৮৬ সনের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে 'বড়ো কাপ' 'ছোট কাপ'-এর প্রসঙ্গ, মানুষ 'বিসমিল্লাহ শরিফ' থেকে সরে যাওয়ায় নারীর ব্যাভিচার ও রাজনীতিকদের চৌর্যবৃত্তি বেড়ে গিয়েছে বলতে শুনেছি, ফসল হচ্ছে না মাঠে বলতে শুনেছি ঐ সময়। প্রায়ই তিনি বলতেন, মা বসুন্ধরার পবিত্র মাটিকে আমরা অপবিত্র হতে দেবনা। এভাবে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সুলতান ভাই 'বড়ো কাপ' 'ছোট কাপ' 'বিসমিল্লাহ শরিফ' ও 'মা বসুন্ধরা' তত্ত্বে নিজেকে সমর্পণ করে রেখেছিলেন। সুলতানের ঐ সব আলোচনার মধ্যে যেমন সমাজের করুণ চিত্র ফুটে উঠতো তেমনি তাঁর জীবনের তীব্র বঞ্চনা আর দুঃখ কষ্টের আগুনকে অনুভব করা যেতো।

সুলতান ভাই কখনও তাঁর অপছন্দ লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন না। তাই সাধারণ মানুষ মনে করতো, তিনি একেবারেই স্বল্পভাষী। কিন্তু না, তীব্র আপনত্বে যাদের তিনি আপন করে নিয়েছিলেন তাদের কাছে তিনি ছিলেন শিশুসুলভ সহজ ভাষী সুন্দর নমনীয় মানুষ। কথায় কথায় সহজ হাসিতে তিনি ঘরকে আলো ঝলমল করে তুলতেন। সামান্য আনন্দ ও সুন্দরের স্পর্শে সুলতানকে বড়োই সুন্দর দেখাতো। গভীর মমত্ব নিয়ে তিনি তাঁর পরিবেশকে বিবেচনা করতেন। কারো ক্ষতি কিংবা দুঃখ কষ্টের কিংবা যন্ত্রণার কারণ হতে তাঁকে দেখা যায়নি।

সুলতান ভাইয়ের আলাপসভার মূলকথক থাকতেন তিনি। রূপগঞ্জ বাজারের মুচির পুলের কাছে অন্ততঃ চারটি দোকানে তাঁকে আমি দীর্ঘদিন আড্ডা দিতে দেখেছি। আমিও নিজে দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর আলাপ-সভার আলাপে যোগ দিয়েছি। শুনেছি, তাঁর জীবনের বিশ্রুত আরো ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্মৃতি কথা। পুরানো দিনের কথা বলতে বলতে কখনও তিনি হারিয়ে যেতেন কোনো বিষাদের চোরাবালিতে। আবার কখনও আনন্দের ঝর্ণাধারা ঝরে পড়তো তাঁর চোখ আর মুখের নীলাকাশ থেকে। এভাবে আমি সুখ দুঃখ, আনন্দ ও বিষাদের জোড়া নৌকায় সুলতান ভাইকে অসংখ্য বার পারাপার হতে দেখেছি।

সুলতান নিতান্ত গরীব পরিবারের সন্তান। তবু পিতা মেছের ধাউড়িয়া অতি যত্নের সাথে তাঁকে লালন পালন করতে চেয়েছিলেন। মেছের ধাউড়িয়া মাছিমদিয়ার লোক। ধাউড়িয়া বাড়ির কেবলি দক্ষিণ পাশের বাড়িটি হাজের ধাইদের। ধাই বা ধাত্রী পেশার

লোকেরা নড়াইল জমিদার বাড়ির রওশন চৌকিতে শানদারের কাজ করতো। অর্থাৎ শানাই বাজিয়ে প্রহর শেষের শুনানি দিতো। ধাউড়িয়াদের সন্তান মেছের নড়াইল জমিদার বাড়ির রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। তিনি প্রথম বিয়ে করেছিলেন চাঁচুড়ি-পুরুলিয়ায়। সুলতান ও তাঁর সহোদরা ফুলমনিকে তার মা রেখে ইন্তেকাল করলে মেছের ধাউড়িয়া নড়াইলের দুর্গাপুর গ্রামের আয়তুন্নেসা বেগমকে বিয়ে করেন। কিন্তু গরীব পরিবারে টানাপোড়েন ছিল নিত্য সাথী। সৎ মায়ের সাথে রাগারাগী করে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সুলতান পাড়ি দিয়েছিলেন সেদিনকার মহানগরী কোলকাতায়। এটা ছিল ১৯৩৮ সনের ঘটনা। সুলতান ভাইয়ের মুখ থেকে শোনা, মাছিমদিয়া থেকে অর্থাৎ বাড়ি থেকে ৩ আনা বা ১২ পয়সা নিয়ে সামান্য কাপড় ও একটি ছাতা নিয়ে সুলতান হাট-বাড়িয়া লঞ্চ ঘাটের দিকে এগুতে থাকেন। পেছনে পেছনে বোন ফুলমনি মা হারা ভাইকে 'ফিরে আয়, ফিরে আয়' বলে কাঁদতে কাঁদতে পিছু নেয়। সুলতান বলেছিলেন, 'তুই ফিরে যা, আমি আবার আসবো।' এরপর নড়াইলের লাল মিয়া নড়াইলের জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের বাড়িতে আশ্রয় পান। কোলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে সোহরাওয়ার্দী পরিবারে থাকবার সুযোগ পান লাল মিয়া। শাহেদ সোহরাওয়ার্দী লাল মিয়ার নাম রাখেন মোহাম্মদ সুলতান। তবে শেখ পদবীটি কার দেওয়া তা আমি সুলতাই ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে পারিনি। তিনি তাঁর পৈত্রিক গোষ্ঠির নাম যে ধাউড়িয়া তাও কোনদিন উচ্চারণ করেননি। ধাউড়িয়া কি দাঁড়িয়া বংশনামের অন্য উচ্চারণ তা এ মুহূর্তে বলা কঠিন।

যা হোক, এরপর লাল মিয়া ধাউড়িয়া শেখ মুহম্মদ সুলতান নামে সভ্য পৃথিবীতে চিত্র শিল্পের প্রবাদ পুরুষ হিসেবে ১৯৫১ সনে নড়াইলের মাটিতেই ফিরে আসেন। তখন সুলতান এক ভিন্ন মানুষ ও বিশেষ মেজাজের অধিকারী। বিশ্ব নন্দিত এই শিল্পী পৈত্রিক ভিটায় গিয়ে দেখেন জনৈক আবুল হোসেন মিয়ার পরিবারের এক অংশ তাঁর পৈত্রিক ভিটায় বসবাস করছে। সুলতানের পিতা মেছের ঐ ভিটার ২৯ শতক জমি একরারনামার মাধ্যমে ১০০ টাকায় বন্ধক রাখেন। বন্ধক রাখার তারিখ ছিল ১৯৪৪ সনের ৩ জানুয়ারি। এর কয়েক মাস পরেই সুলতানের পিতা তাঁর দ্বিতীয় শ্বশুর বাড়ি দুর্গাপুরে বসবাস কালে মারা যান। একরার নামায় আবুল হোসেন মিয়ার পক্ষকে ১০০ টাকা ফেরৎ দিলে জমিও ফেরৎ দেওয়ার কথা ছিল। সুলতান পিতার ঐ ভিটেয় আর কখনও বসবাস করতে পারেননি। এই পৈত্রিক ভূমি খন্ড পাওয়ার আকাংখায় তিনি তাঁর সৎ ভাই আব্দুল ওয়াদুদ, বোন মোমেনা খানম প্রমুখের বিরুদ্ধে ১২/৫/৮৫ তারিখে উপজেলা মুন্সেফ আদালতে একটি মামলা রুজু করেন। এসব পরের কথা। পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনবিহীন পৈত্রিক ভিটায় দখল বা অবস্থান না পেয়ে

সুলতান ঢাকায় থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঢাকায় তখনকার খ্যাতিমান শিল্পীরা ঈর্ষাতুর হয়ে তাঁকে কোনো অবস্থান নিতে দেননি। অভিমানী কঠোর আত্মসম্মান-বোধসম্পন্ন সুলতান একবার যশোর, নড়াইল, কুড়িগ্রাম, রূপগঞ্জ, চাঁচুড়ি-পুরুলিয়া করে জীবন অতিবাহিত করলেন। মাটি আর মানুষের দুর্নিবার আকর্ষণ কাটিয়ে তিনি বিদেশেও পাড়ি জমাননি। আর কৈশোরের একটি প্রেমে ব্যার্থ হয়েও তিনি চিরকালের জন্য বিয়ে বিমুখ হয়ে রইলেন। আমেরিকা ও বিলাতফেরৎ ও সভ্য পৃথিবীর কাছে আদৃত মহান শিল্পী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অবজ্ঞা আর অনাদরে ক্লেশকর জীবন বেছে নিয়েছিলেন। আমি জানি তাঁকে বহুদিন ধরে অনিদ্রায় অনাহারে কাটাতে হয়েছে। সংসার বিমুখ এই মহৎ শিল্পীকে জীবনের সমস্ত না পাওয়ার তপস্যায় কাটাতে হয়েছে। সমাজের অবিচার অনীহা বেশির ভাগ সময়ই তিনি বৃদ্ধ অশ্বত্থ বৃক্ষের মতো সয়ে নিয়েছেন।

এবার শিল্পী সুলতানের এক দার্শনিকসুলভ রসিকতার কথা বলবো। যতদূর মনে পড়ে ১৯৮৫ সনের শেষ দিকে তখনকার ঢাকার জার্মান কালচারাল সেন্টারের পরিচালক পিটার সেভিৎজ তাঁর ধর্মপুত্র তালিব, ছফা ভাই (আহম্মদ ছফা), সুলতান ভাই ও আমি রূপগঞ্জ বাজার হতে সুলতান ভাইয়ের বাসায় দুপুরে খাবার খেতে যাচ্ছিলাম। আমরা হেঁটে হেঁটে চলছি। নিশিনাথ তলার উত্তর দিকে উপস্থিত হলে সুলতান ভাই তাঁর জুতার সামনে ছোট একটি মরা শুষ্ক সাপ পেলেন। সাপটা আকারে ছোট। রাস্তার তাপে ও মানুষের পায়ের ও রিকসা ভ্যানের চাপে ইংরেজি এস অক্ষরের আকার ধারণ করেছে। সুলতান ভাই ঐ শুকনো সাপের দেহটি বা হাতে উঠিয়ে আমাদের বললেন, 'বলুন তো সাপটি মরার আগে কি বলতে চেয়েছে?' আমি বললাম, 'আপনি বলুন,' সুলতান বললেন, 'সাপ দেহকে এস তৈরী করে বলছে 'সেভ', 'আমাকে বাঁচাও'। আমি বললাম, 'সাপটি মরার আগে বলছে 'স্নেক' অর্থাৎ 'আমি সাপ'—সাপ তার অস্তিত্বকে ঘোষণা করছে।' আমার কথায় সুলতান ভাই ও ছফা ভাই রাস্তার মাঝখানে হেসে উঠলেন। সেভিৎজ ও তালিব আমাদের ভাষা বোঝেনা। পুরো ঘটনা ও কথাগুলো যখন ছফা ভাই তাদের ইংরেজিতে বুঝিয়ে বললেন, তারাও হেসে উঠলেন। সুলতান আমাকে বললেন, 'আপনার কথাটি সুন্দর ও দর্শনপূর্ণ। প্রতিটি জীবনই তার অস্তিত্বের প্রতি দৃষ্টিবান। আল্লাহ এভাবেই সবাইকে সৃষ্টি করেছে'। সেদিন দুপুর বেলায় আমরা সুলতান ভাইয়ের বাসায় খুব সুখকর বিচিত্র খাবার খেয়েছিলাম। সুলতান ভাইয়ের সাথে আমার অজস্র সুখ-দুখের দিনরাত্রি যাপনের স্মৃতি আর ইতিবৃত্ত রয়েছে। তা আমার প্রকাশিতব্য গ্রন্থ 'শিল্পী সুলতানের আত্মোচ্চারণ ও অন্যান্য'-এ প্রকাশ করেছি। তাঁর সাথে আমার জীবনের

শেষ স্মৃতি এমন :

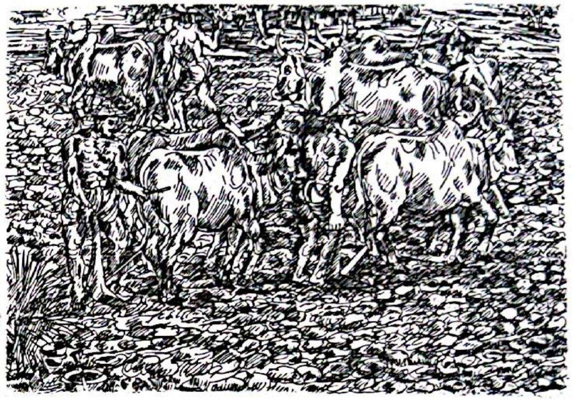
১৯৯৪ সনের ৭ জানুয়ারি থেকে ১৬ জানুয়ারি ঢাকার গ্যালারি টোনে ছিল সুলতান ভাইয়ের একক তৃতীয় ও শেষ চিত্র প্রদর্শনী। তিনদিন ধরে তাঁকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছি। সুলতান ভাইকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে জানতে পারিনি। ১১ জানুয়ারি গ্যালারি টোন থেকে শিল্পী মিঠু আমায় নিয়ে গেলেন 'হোটেল ডি আমাজানে'। সেখানে শীর্ণদেহী শ্বাস কষ্টের রোগী সুলতান ভাইকে পেলাম। তিনি আমায় দেখে শিশুর মতো কেঁদে ফেললেন। আমাকে বললেন, 'কবি সাহেব, আপনি আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান'। আমি সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলাম। তাঁকে সান্ত্বনা যোগালাম। বললাম, 'এই শীতে আপনার তো নড়াইলের বাইরে আসা ঠিক হয়নি'। তিনি জানালেন, 'এরা ছাড়েননি'। আমি জানি সুলতান ভাইয়ের ভালবাসার দায় ভোগে কতো না দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। জীবনের শেষ দিকে তার আর ব্যতিক্রম হবে কেন? সেটি ছিল হোটেলের ৭নং কক্ষ। কাঁথা কাপড় একেবারে ময়লা। সুলতান ভাইয়ের শীর্ণ দেহে একটি অতি সাধারণ গেঞ্জি জড়ানো। কিছু সময় পরে তিনি আমার কাছে দুটো ভেন্টোলিন টেবলেট চাইলেন। আমি ঔষধ আনতে উদ্যত হলে শিল্পী মিঠু কাউকে দিয়ে ভেন্টোলিন আনিয়ে দিলেন। সেদিন প্রায় পৌনে দু'ঘন্টা কথা হলো। ঢাকায় থাকার সুবাদে আমাদের আগের যোগাযোগ নেই বলে আমি দুঃখ করলাম। তিনি বললেন, 'কয়েকমাস আগেও যখন নড়াইলে দেখা হয়েছে, যোগাযোগতো আছে। আমি আপনার লেখা পড়ি। ভাল লাগে। দিন শেষে আবার নড়াইলে ফিরে যাবেন।' আমি কোনো জবাব দেইনি। সুলতান ভাইয়ের সাথে বন্ধুবর মিঠু আমারও একটি ছবি তুলে রাখলেন। আমি হেসে বললাম, 'এমনও হতে পারে



শিল্পী সুলতানের মৃত্যুর পর
তাঁর পোষা বিড়ালগুলোকে
খাবার খাওয়াচ্ছেন
নীহার বালা

এই আমাদের জীবনের শেষ ছবি।' সুলতান কিছু বললেন না। কেমন যেন মিইয়ে গেলেন। তাঁর তামাটে ছোট মুখ খানি কোন্ অজানা ম্লানিমায় ভরে গেল। মাথা নিচু করে রইলেন। চোখ দুটো তাঁর আলতো ভিজে গিয়েছে। ঐ দৃশ্যে আমি কষ্ট পেয়েছি। আমার ভেতরটা হাহাকার করে উঠেছে। কেন আমি এমন কথাটা বললাম। জীবনবাদী সুলতান শেষ হয়ে যাওয়ার শেষ কথা একেবারেই শুনতে চাইতেন না। এরপর এক সুঠাম দেহী মহিলা সুলতান আর নীহারবালার জন্য একটি শিশুকে সাথে করে ক্যারিয়ারে খাবার নিয়ে এলেন। দুপুরের খাবার খাবেন তাঁরা। সম্ভবত ৩ টার ফ্লাইটেই তিনি সেদিনই যশোর গিয়েছিলেন। আমার বাসাবোর ছোট্ট বাসায় আর তাঁকে আনা হলো না। বিদায় নেওয়ার সময় বললাম, 'সুলতান ভাই পত্রিকায় আছি জানেন। নড়াইল যাওয়ার সুযোগ কম। কি জানি কবে দেখা হয়।' তিনি আস্তে করে বললেন, 'তাইতো। আপনি সুখী হবেন। আবার দেশে ফিরে যাবেন।' কিন্তু আমি যখন দেশে ফিরে গিয়েছি তখন আমার চির অভিমানী সুলতান ভাই কিংবদন্তির পুরুষ শেখ মোহাম্মদ সুলতান এই মরদেহে আর নেই। তিনি তাঁর চির সুন্দরের দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। নড়াইলের দীর্ঘ ঘোরাফেরা বিষাদের কালিতে কালো হয়ে থাকলো—আমার সঙ্গীরা কেউ তা বুঝতে পারেনি। তবে ক্যামেরায় বন্দী করলাম সুলতান ভাইয়ের প্রিয় পশু-পাখী, বাসগৃহ, শিশুস্বর্গ, ও তাঁর মাটির শেষ শয্যা কবরগাহ।

সুলতান ভাইয়ের প্রসঙ্গে আমার অনেক বলার ছিল, অনেক বলার আছে। সব কথা বলার অবকাশ এখানে নেই। তবে তাঁর পিতৃ ভিটের শেষ কথাটি বলা দরকার। বন্ধক দেওয়া পিতৃভিটের ওপর দিয়ে ঢাকা-খুলনা হাইওয়ের ব্লুপ্রিন্ট ছিল বেশ আগেই। সুলতান ভাই কোর্টে ইনজাঙ্কশন জারি করিয়ে তাঁর জীবন কালে পিতৃ ভিটেটি রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পরে তাঁর পিতৃভিটে রক্ষার আর কেউ রইল না। আর তাই চিত্রা নদীর ব্রীজ নির্মাণে সুলতান ভাইয়ের জন্মভূমি বাঙালির স্মৃতিতীর্থ কোদালের আঘাতে চিরকালের জন্য বিলীন হয়ে গিয়েছে ইতোমধ্যে। আর আমরা সব অসম্ভবকে সম্ভব বলে গ্রহণ করলাম কোনো কষ্টই অনুভব করিনি।



অন্য এক সুলতান

শরীফ আশরাফউজ্জামান

নদীর নাম চিত্রা, তীরে প্রায় বিঘা দু'য়েক জায়গা জুড়ে ফুল, লতা-গুল্মে ঠাসা একটি বাড়ি, যেন মালী সযত্নে তার ঝাঁপিতে সাজিয়ে রেখেছে রং বেরংয়ের ফুল। সত্যিই অপূর্ব, বিচিত্র আয়োজনে পরিপূর্ণ এই বাড়িটি। রকমারি সব পাতাবাহার, লতানো গাছ—তা প্রায় কয়েকশ' রকমের ফুলের গাছ, ফলের গাছ : আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি। বাড়ির সীমানা ঘিরে নারিকেল সুপারীর গাছ সমস্ত এলাকার সীমা নির্ধারণ করে চলেছে, তার মাঝেই একটি কুটির., কবির ভাষায় 'যেন ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়।' বাগান বিলাস গাছগুলো মিলে-মিশে অর্ধচন্দ্রের মত তৈরি করেছে প্রধান ফটক, মাঝ দিয়েই আঁকা বাঁকা পায়ে চলা পথ, পিছনের দরজা খুললেই শান্ত সুন্দর কাক চক্ষু জলে প্রবাহিত চিত্রা নদী, যার বুক চিরে বয়ে চলে পাল তোলা নৌকা, মাঝি গায় ভাটিয়ালী সুর। সমস্ত জায়গাটিকে মনে হয় তপোবন।

এখানেই শেষ নয়, এই তপোবনে রয়েছে অনেক রকম জীবজন্তু—ইঁদুর, বিড়াল থেকে শুরু করে বিষাক্ত সাপ পর্যন্ত। বাড়ির সামনে একটি আর্ট গ্যালারি, উঠোনের মাঝে সারি সারি বেঞ্চ পাতা, এখানে প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার শ'দুয়েক শিশু এসে ছবি আঁকা শেখে। লাল ভাই নিজ হাতে তাদের ছবি আঁকা শেখান। এই মিনি চিড়িয়াখানার মাঝে বসে সব বাচ্চারা নির্মল আনন্দের মাঝে খেলার ছলে জীবজন্তু, গাছপালা ও প্রকৃতির ছবি আঁকে।

সব আয়োজন শিশুদের জন্যেই, আয়োজনে বিশ্ববরেণ্য শিল্পী এক জীবন্ত কিংবদন্তী এস. এম. সুলতান। হ্যাঁ এতক্ষণ এস. এম. সুলতানের কথাই বলছিলাম। তাঁর আর এক নাম লাল মিয়া, আমরা ছোটবেলা থেকেই লাল ভাই নামেই ডাকতাম, আর এ প্রজন্মের সব শিশুরা সুলতান কাকু বলেই ডাকে। শিল্পী সুলতান একটি নাম, এক বরেণ্য শিল্পীর জীবন আলেখ্য। যিনি জন্মেছিলেন ১৯২৩ সালের ১০ আগস্ট নড়াইলের এক গ্রামে। বসবাস করেছেন এই নড়াইল জেলারই রূপগঞ্জ বাজার হতে প্রায় এক কিলোমিটার দক্ষিণে নিশিনাথতলা পার হয়ে মাছিমদিয়া গ্রামে চিত্রা নদীর তীরে এই তপোবনে। শিল্পী সুলতানের নাম বাংলাদেশের সকলেই জানেন বিখ্যাত এক শিল্পী হিসেবে। আজ এখানে শিল্পী সুলতানের শিল্পী সত্তার বর্ণনা করবো না, তার জীবনের একটি অজানা দিক পাঠকদের সামনে তুলে ধরবো।

শিল্পী সুলতান শৈশবে ১৯২৮ সালে নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুলে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু করেন। ১৯৩৮ সালে কলিকাতা আর্ট কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু পড়াশুনা সমাপ্ত না করেই ১৯৪৪-এ প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেন। এখানে সেখানে কিছুকাল ঘুরে বেড়িয়ে কাশ্মীরের পাহাড়ে উপজাতীয়দের সাথে বসবাস শুরু করেন এবং তাদের নিয়ে ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন। ১৯৪৬-এ সিমলাতে প্রথম তাঁর একক চিত্র প্রদর্শনী হয়। ১৯৫০-এ তিনি আমেরিকা যান, ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাঁর প্রায় ২০ টি একক প্রদর্শনী হয়। ১৯৫৩-তে দেশে ফিরে আসেন এবং কোনো প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক সনদপত্র না থাকায় আর্ট কলেজে শিক্ষকতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

যা'হোক, তিনি ১৯৫৩-তে সোজা নড়াইলে চলে আসেন এবং দীর্ঘ ২৩ বছর তুলিতে আর রং লাগাননি। কারণ অজানা, তবে হতে পারে এ সমাজের প্রতি অভিমান, হয়তো কোনো দুঃখবোধ, হয়তোবা এটা শিল্পীর খেয়াল। মূলত এ সময়ই তিনি জীবজন্তুর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং জীবজন্তু প্রেমী হয়ে ওঠেন।

এই সময়কালে বিশেষত তিনি নড়াইল জমিদার বাড়ির শিব-মন্দিরে বসবাস করতেন। ভাবুক প্রকৃতির মানুষ তিনি, খুব সুন্দর বাঁশি বাজাতে পারতেন। মনে পড়ে ছোটবেলায় দেখেছি বিভিন্ন সময় তিনি 'নড়াইল টাউন ক্লাবে' বাঁশি বাজিয়ে শোনাতেন। অপূর্ব সে বাঁশির সুর, শুনে মনে হত যেন তিনি বাঁশি বাজাতেই ওস্তাদ। যেখানে তিনি বসবাস করতেন সেটি ছিল পরিত্যক্ত একটি শিবমন্দির, চারদিকে ঘন বনজঙ্গলে ভরা, মন্দিরের ছাদে বট গাছের শেকড় বিস্তার করে তার সদর্প উপস্থিতি ঘোষণা করছে। তার ভয়ে খসে পড়ছে চুন, সুড়কী, গাঁথুনী। ফাঁক ফোঁকরে বসবাস

করতো বিষাক্ত সাপ। ভয়ে চলে আসেননি সেখান থেকে বরং পরম স্নেহে তাদের লালন পালন করতেন, দুধ কলা খাওয়াতেন এবং তাদেরকে সঙ্গে নিয়েই সেখানে বসবাস করতেন। জীবজন্তুর প্রতি ছিল তার নিখাদ ভালবাসা। তাই বোধ হয় সকলে তার সঙ্গে মিত্রতা গড়তো কোনো শত্রুতা ছিল না। ছোটবেলায় দেখেছি কোনোদিন হয়তো বিড়ালের বাচ্চা, কোনোদিন কুকুরের বাচ্চা, কখনও বাঁদর, কখনও শেয়ালের বাচ্চা আবার কখনওবা শজারুর বাচ্চা কোলে আর এক হাতে একটা বাঁশি নিয়ে নড়াইলের রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। লম্বা ছিপছিপে গড়ন, পায়ের গোড়ালী অবধি ছাই রংয়ের পাঞ্জাবি পরা, লম্বা লম্বা চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে, সুন্দর বাঁকা হাসি হেসে আমাদের স্নেহ করতেন আর দেখাতেন তাঁর কোলের জন্তুটি কত ভাল বন্ধু। এমন কোনো জন্তু দেখিনি যার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়নি। আমরা তখনও তার শিল্পী প্রতিভার কথা জানতাম না, তখন তাকে জানতাম লম্বা ছিপছিপে দীর্ঘ চুলওয়ালা পাগলের মত এক জন্তুপ্রেমী হিসেবে। বড় হয়ে জানতে পারলাম জীবন্ত এক কিংবদন্তী আমাদের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কি সাধারণ মানুষের বেশে। এমনকি সেইদিনগুলোতে অনেক অর্থকষ্টেও দিনযাপন করেছেন, দশজনার সহযোগিতায়, কখনওবা কারো বাড়িতে আশ্রিতের মত দিন যাপন করতে হয়েছিল।

দেখা যেত কখনও কখনও ঘন্টার পর ঘন্টা চায়ের দোকানে বসে গল্প শুনিয়ে, বাঁশি বাজিয়ে আনন্দ দিতেন সকলকে। খাওয়া দাওয়া চাল-চুলোর কোনো নিশ্চয়তা নেই, ঘর বাড়ির কোনো ঠিকানা নেই, আর থাকবেইবা কেমন করে, তিন কূলের তাঁর কেউ ছিল না, এমনকি তিনি বিয়েও করেননি যে ছেলেমেয়ে কেউ থাকবে। এ জগতের সকলেই ছিল তাঁর আত্মীয় স্বজন। সংসার-ধর্ম কিছুই তাঁর ভাল লাগতো না। দিনে যাযাবরের মত ঘুরে ঘুরেই কাটিয়ে দিতেন আর রাত হলে ঐ শিবমন্দিরে ঘুমুতেন। এরপর তিনি শিবমন্দির ত্যাগ করে মাছিমদিয়া গ্রামে জমিদারদের আর এক পরিত্যক্ত এবং বাসের অনুপযুক্ত এক বাড়িতে এসে উঠলেন। চুন সুড়কি খসে পড়ছে, ছাদ দিয়ে পানি চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে, আস্তর খসা দেওয়াল, ভ্যাপসা পরিবেশ। এখানে অবস্থানকালে তাঁর সংসারের সদস্য সংখ্যা একে একে বাড়তে থাকলো। কয়েক ডজন গিনিপিগ, ইঁদুর, বিড়াল, কুকুর, বাঁদর, কয়েক প্রকার পাখী ইত্যাদি। এগুলোই ছিল তার সন্তানের মত। এদের খাবারের জন্য প্রতিদিন প্রয়োজন হত প্রায় ৫ সের দুধ, কয়েক ডজন কলা, মাছ, মাংস আরো কত কি। এদের নিয়ে এমনি করেই কেটে গেল ২৩টি বছর। ১৯৭৬-এ তার মোহভঙ্গ হল, স্বাধীন বাংলায় তাঁর প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী হল ঢাকায়, দ্বিতীয়টি হল তার ১০ বছর পর ১৯৮৬-এ।

এই বহেমিয়ান শিল্পীর দুর্দশা দেখে সম্ভবত ১৯৮৫-র দিকে বাংলাদেশ সরকার মাসিক আর্থিক ভাতায় এবং সরকারী খরচে ঢাকাতে থাকার ব্যবস্থা করেন। থাকলেনও কিছুদিন। ঢাকাতে একবার দেখা হল, জিজ্ঞাসা করলাম— লাল ভাই কেমন আছেন? ভাল আছি এবং এখন থেকে ঢাকাতেই থাকবো, কি ভাল হল না? বললাম খুব ভাল। মনে মনে খুব খুশী হলাম এই ভেবে যে, অন্তত এতদিনে লাল ভাইয়ের যাযাবরী জীবনের অবসান হল, অন্তত অর্থকষ্টে ভুগতে হবে না।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তিনি হাঁফিয়ে উঠলেন। শহুরে যান্ত্রিক পরিবেশ তাঁর মোটেও ভাল লাগলো না। যেন নির্বাসিত হয়েছেন তিনি। মুক্তির লক্ষ্যে একদিন ঢাকা শহরের মানুষকে খোদা হাফেজ জানিয়ে, সরকারের সংগে সকল চুক্তি ছিন্ন করে চলে এলেন নড়াইলের সেই পোড়োবাড়িতে তাঁর সন্তানদের মাঝে। চড়ুই পাখির মত পাকা ইমারত তাঁর পছন্দ হল না, বাবুইয়ের মত খড়ের ঘরেই আবার চলে এলেন। যেখানে গিনিপিগ নেই, বিড়াল নেই, ইঁদুর নেই, কুকুর নেই, সর্বোপরী যেখানে তাঁর আদরের নিমাই নেই, সেখানে সুলতান বাঁচতে পারেন না।

বলাবাহুল্য তাঁর পোষা জীবজন্তুর প্রত্যেকের এক একটি নাম ছিল এবং তাদেরকে সেই নামেই ডাকতেন। বিড়ালকে বিড়াল বা কুকুরকে কুকুর বলে ডাকতেন না। যেমন দু'টি এ্যালসেশিয়ান কুকুরের নাম যথাক্রমে জিমি আর ববি, একটি বিড়ালের নাম মিনি, যেটি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সারাক্ষণ ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াতো। সব থেকে প্রিয় একটি হনুমান ছিল তার নামই নিমাই। সর্বশেষ যখন তাঁর বাড়িতে গেলাম, তিনি তাঁর জীবজন্তুদের মাঝে নিয়ে গেলেন এবং সবাইকে একে একে দেখিয়ে সবার শেষে এলেন নিমাই-এর খাঁচার সামনে। নিমাই লাল ভাইকে দেখে লাফালাফি শুরু করে দিল, যেন বলছে এখনই খাঁচা খুলে দাও, দেখাচ্ছি তোমাদের মজাটা। নিমাইয়ের উত্তেজনার কারণ, তার একটু আগেই স্থানীয় এক বাচ্চা ছেলে লাঠি দিয়ে খোঁচা মেরেছিল। লালভাই বললেন ও খুব দুষ্ট হয়ে গেছে-খুব করে বকুনি দিলেন- 'বন্য কোথাকার'। এতেই নিমাই যেন কুঁকড়ে গেল এবং শরমিন্দা হল।

তিনি এদের সবাইকে নিয়ে একটি চিড়িয়াখানা গড়েছিলেন। তাঁর এই চিড়িয়াখানার বহরে আছে ছোট বড় মিলিয়ে ডজন দু'য়েক বিড়াল যেগুলো সারা বাড়িময় যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতো, দেশী বিদেশী মিলিয়ে গণ্ডা দুয়েক কুকুর, গিনিপিগ ছিল তা শ' দুয়েক, বানর বিভিন্ন প্রজাতির গোটা দশেক, হনুমান গোটা চারেক, মদনটাক পাখী ছিল একটা। এই পাখীটির একটি ইতিহাস আছে—একদিন সুলতান সাহেব নদীর পাড়ে হাঁটছিলেন, এমন সময় দেখলেন একটি মদনটাক পাখী আহত হয়ে নদীর পাড়ে পড়ে

আছে, তিনি সেটিকে বাড়িতে নিয়ে এলেন, ওষুধ লাগিয়ে দিলেন ক্ষতস্থানে, সুস্থ করে তুললেন এবং এখানেই তার এক নিরাপদ আশ্রয় হল, তার জন্যে সুন্দর খাঁচা বানিয়ে দিলেন, সবার দর্শনের জন্য তিনি তাঁর এই চিড়িয়াখানার সদস্যপদও দিলেন।

এরপর ছিল বনবিড়াল একজোড়া, ভল্লুক একটা, বাঘ ছিল একটা, বললেন অসুখ হয়ে মারা গেছে, বেজী তিনটা, পাখি ছিল প্রায় বিশ রকমের তাও প্রায় শ'খানেক হবে, টিয়া, ময়না, কাকাতুয়া, মুনিয়া, শালিক, দোয়েল ইত্যাদি। গয়াল জাতীয় পাহাড়ী গরু ছিল দুটি, ঘোড়া ছিল দু'টি, রাজহাঁস ছিল ডজনখানেক, সাপও ছিল ডজন খানেক তবে ছাড়া থাকতো, ফুলের বাগানই তাদের বিচরণ ক্ষেত্র এবং এখানেই তাদের বসবাসের জায়গা। কখনই কাউকে কোনো ক্ষতি করতে শোনা যায়নি।

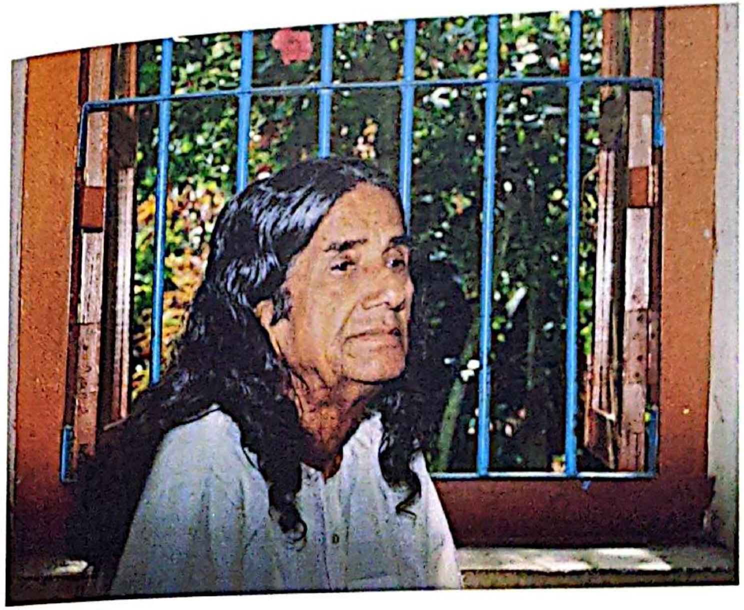
সবগুলোই মোটামুটি খাঁচার ভিতর থাকতো, শুধু কুকুরগুলো ছাড়া থাকতো বাড়ি পাহারায়। বিড়ালগুলো ঘরে বাইরে, বিছানায়, চৌকিতে, টেবিলে, চেয়ারে, আলমারীর ওপরে যেখানে সেখানে বসে অথবা ঘুমিয়ে থাকতো, হয়তো টেবিলে বসে কোনো মা বেড়াল তার ৬ বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতো। বলা যায়, এই দু'বিঘার মত জায়গা জুড়ে পুরোটাই ছিল একটা চিড়িয়াখানা। আলাপে জানতে পারলাম-একবার রাঙ্গামাটি থেকে একজোড়া হরিণের বাচ্চা উপহার পেয়েছিলেন তাঁর চিড়িয়াখানার জন্য। সেখান থেকে নড়াইল আনার পথে চট্টগ্রামের কাছাকাছি কোনো এক চেকপোস্টের কাছে পুলিশ সীজ করে নিয়ে গেছে, যেহেতু সেসময় সঙ্গে কোনো সরকারী অনুমতি ছিল না। এসকল জীব-জানোয়ারের জন্য নাকি সরকারী অনুমতি লাগে। তিনি কথায় কথায় আরও বললেন, 'যদি কেউ একটা অনুমতি এনে দিতে পারতো বন ও পশুপালন মন্ত্রণালয় হতে তবে এসকল অপ্রচলিত জীব-জানোয়ার দিয়ে এই চিড়িয়াখানাকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারতাম।'

শিশুদের তিনি খুব ভালবাসতেন। তাদের জন্য গড়েছেন 'শিশু স্বর্গ'। সুলতান সাহেবের বাড়ির আঙ্গিনায় সারি সারি বেঞ্চ পেতে শিশুদের সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার আঁকা শেখানো হত। প্রায় শ'তিনেক শিশু ছিল এই শিশু স্বর্গের সদস্য। খুব সকালে যখন তারা দল বেঁধে আসত, প্রথমে তাদের দুধ খাওয়ানো হ'ত, তারপর শিল্পী সুলতান নিজ হাতে তাদের আঁকা শেখাতে শুরু করতেন। পাশেই ছিল তাঁর আর্ট গ্যালারী, নাচের স্কুল ইত্যাদি।

সুলতানের চিড়িয়াখানা গড়ার উদ্দেশ্য হল—চিড়িয়াখানার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে

সকল বাচ্চারা প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবজন্তু, গাছপালা যা দেখবে তারই ছবি আঁকবে এবং এতে করে তাদের সৃজনশীল মননের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। এ প্রসংগে তিনি বলতেন– তিনি ওটি করেছিলেন 'In order to bring children in close contact with and expose them to animals and birds which will bring up their moral development from childhood. Love for animals and birds at early stage of their life will create love and affection for all creatures including human beings, the extraordinary need for the present world to bring world peace and tranquility.' তিনি হয়তো বর্তমান সমাজের অস্থিরতা, সংঘাত, যুব সমাজের মাঝে উচ্ছৃংখলতা দেখে অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তায় ভীত ছিলেন। হতে পারে এ বিশ্বাস ছিল যে বিশ্বশান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এ সকল শিশুদের শৈশবকাল থেকে প্রকৃতি, পাখী ও জীবজন্তুর প্রতি ভালবাসা শেখাতে হবে যা থেকে মানুষের প্রতি ভালবাসা গড়ে উঠবে, ফলে তাদের নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়ক হবে, যাতে করে তারা এ সমাজকে একটা সুখী সুন্দর শান্তিপূর্ণ কাল উপহার দিতে পারে। যদিও এ প্রয়াস সারাবিশ্বের শান্তি প্রক্রিয়ার প্রেক্ষিতে খুবই সীমিত। তবুও সাধ্যমত চেষ্টা করতে দোষ কোথায়? এমনওতো হতে পারে সুলতানের উদাহরণ অনুসরণ করে আরো অনেকে এমন দায়িত্ব নেবেন সমাজের শান্তি ফিরিয়ে আনতে, হয়তো তা একদিন ফিরেও আসবে।

শিশুদের জন্য তিনি ১২ লাখ টাকা ব্যয় করে গড়েছিলেন ৬০ ফুট দীর্ঘ এক নৌকা। উদ্দেশ্য তাঁর কোন এক জন্মদিনে এসকল শিশুদের নিয়ে চিত্রা নদী বেয়ে খুলনায় রূপসা নদী পার হয়ে সমুদ্র ভ্রমণে যাবেন, সেখান থেকে হিরণ পয়েন্টে। শিশু স্বর্গের শিশুরা এই নৌকার জানালায় জানালায় বসে চারদিকের সব প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকবে আর নৌকা এগিয়ে যাবে তর তর করে সমুদ্রের পানে। এমনি করে সমুদ্রের দিকে চলতেই থাকবে, চলতেই থাকবে আর কোনোদিন এই দুঃখ, জরা, বেদনা ভরা সংসারে ফিরে আসবে না—ঠিক হ্যামিলনের বংশীবাদকের মত। জানি না কেন? হয়তো এটাও ছিল শিল্পীর আর একটি খেয়াল।



মৃত্যুর দু'মাস আগে নির্জন দুপুরে জানালার পাশে শিল্পী সুলতান





মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে অসুস্থ শিল্পী সুলতান (সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪)

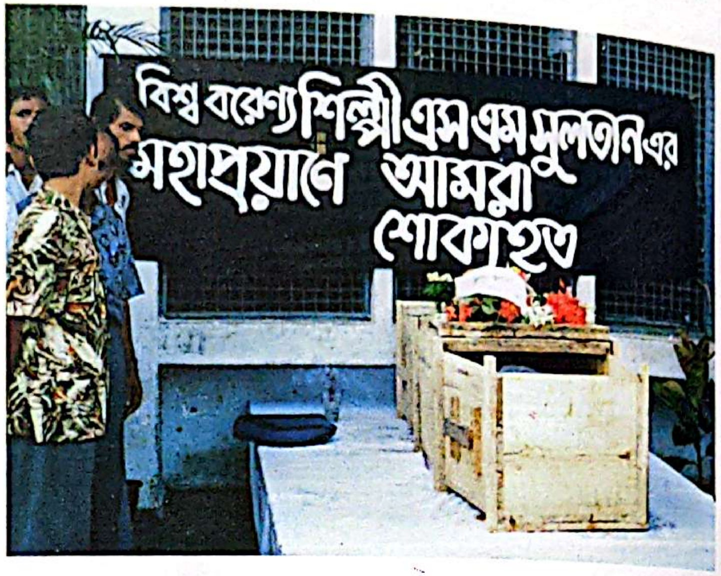
ছবি : সুইর চৌধুরী



১০ অক্টোবর ১৯৯৪ বিকেল ৪–৩৫ মিনিটে যশোরের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে শিল্পী সুলতানের মৃত্যুর সময়ে তোলা ছবি

ছবি : সুইর চৌধুরী





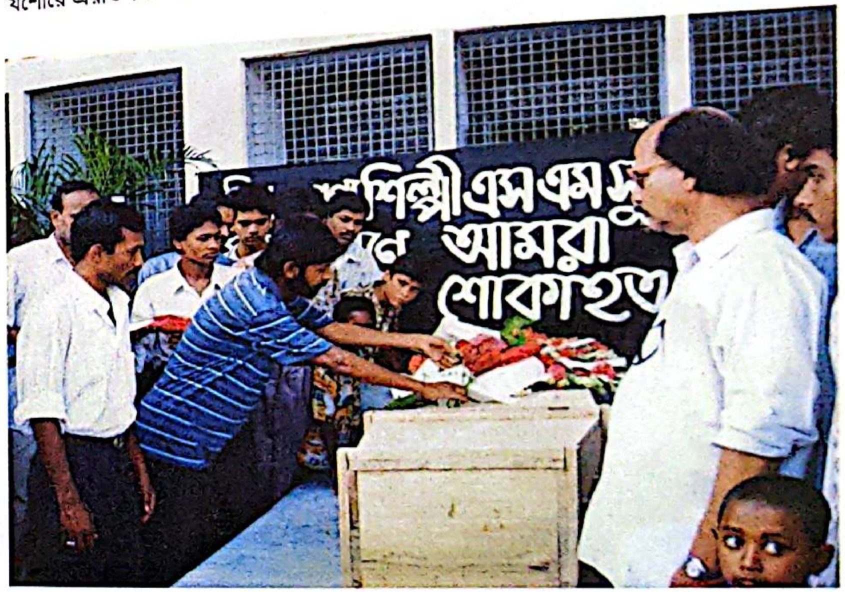
১১ অক্টোবর সকালে যশোর পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে শিল্পী সুলতানের কফিন জনসাধারণের দেখার জন্য রাখা হয়

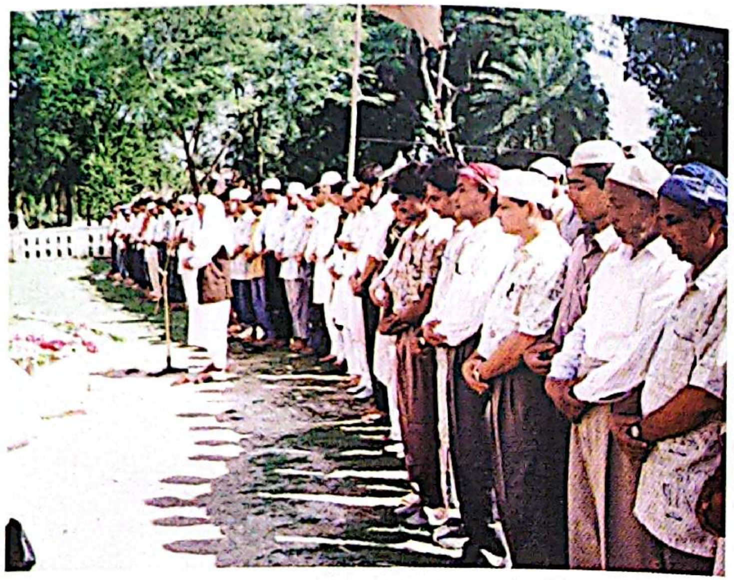






যশোরে প্রয়াত শিল্পীর প্রতি সর্বস্তরের জনগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি





যশোরে জানাজার নামাজের দৃশ্য

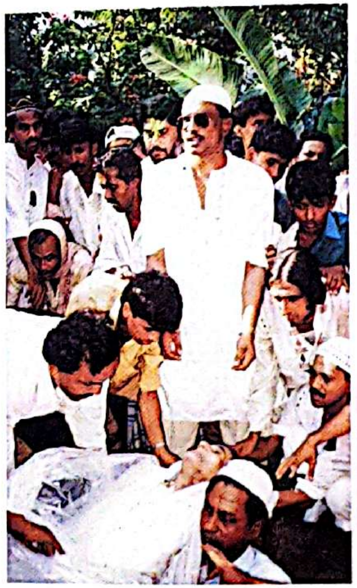
নড়াইলের জানাজার নামাজের দৃশ্য

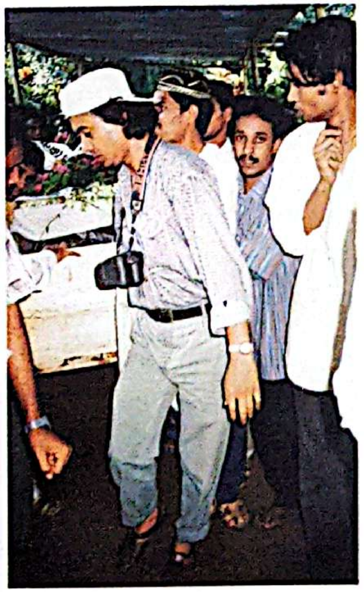


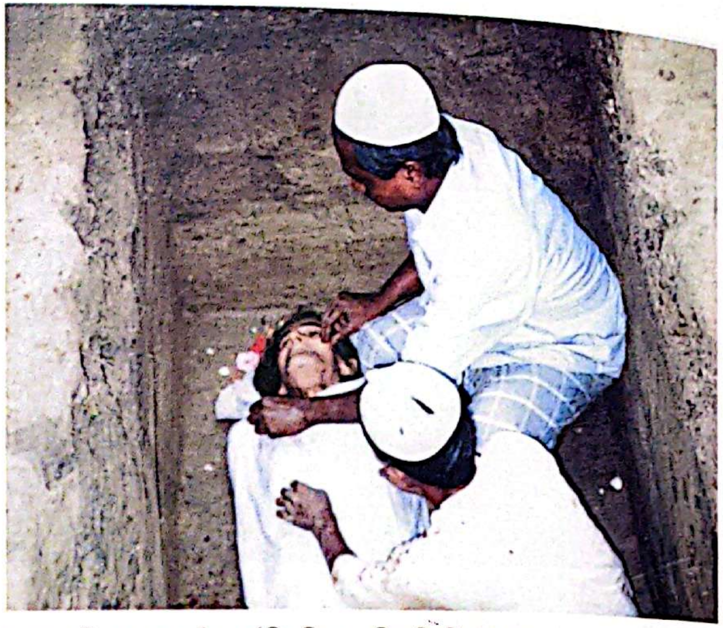
ছবি : সুবীর ভৌমিক



শিল্পী সুলতানের কফিন নিজ বাসভবন প্রাঙ্গণে দাফনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে







কবরে মাটি দেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে চির নিদ্রায় শায়িত শিল্পী শেখ মুহম্মদ সুলতান (১১ অক্টোবর ১৯৯৪, বিকেল ৫-০০টা)



শিল্পীর কবরে নড়াইলের সকল স্তরের জনগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি



চারুশিল্পের সোনালী পুরুষ এস. এম. সুলতানের কথা

শরাফুল ইসলাম

একজন বিরহী বাউলের মতো অন্তরমুখী অথচ মানবকল্যাণব্রতী মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল গতকাল। নাম তাঁর এস.এম. সুলতান। একজন মানবদরদী প্রতিবাদী বাউলের নাম। চারুশিল্পের একজন সোনালী পুরুষের নাম। এর আগেও দেখা হয়েছে অনেকবার। কখনো বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে, কখনো বাংলা একাডেমীতে, কখনো কোনো আর্ট গ্যালারীতে, কখনো বা সেমিনারে।

গতকাল চারুশিল্পের এই মরমী বাউলের সঙ্গে দেখা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে। তৃতীয় আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবে এসেছেন প্রধান অতিথি হয়ে। বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে, অতিথিরা সবাই তখনো এসে পৌছান নি। তাই দীর্ঘ বিলম্ব। এস.এম. সুলতান হাতে ছড়ি নিয়ে প্রবীণ শরীরকে সপে দিয়েছেন চত্বর ঘেরা দেয়ালের গায়ে। ছড়ির মধ্যে খানিকটা ভর ছিল শরীরের।

এগিয়ে গেলাম চিরাচরিত নিয়মের কেশ বিন্যাসে বাউল গাথার বরপুত্র এস.এম. সুলতানের কাছে। কুশল জানলাম। হাসলেন সেই আগে দেখা, অনেক চেনা মানুষের মতো। বললাম, আপনার শরীর কেমন? এক হাত ছড়িতে ভর রেখে অন্য হাত নেড়ে বললেন, 'ভালোইতো আছি'। তাঁর সঙ্গে আরেকবার বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে দেখা হওয়ার পর যখন কুশল জানতে চেয়েছিলাম, তখন সেই কালো পোশাক পরিহিত সোনালী পুরুষ ক্রোধের সঙ্গে জবাব দিয়েছিলেন 'সত্য বলবো, না

মিথ্যা বলবো?' তখন তাঁর আত্মজার মতো কন্যাটি তাঁকে উত্তেজিত হতে বারণ করেন। মূলতঃ তখন তাকে শিল্পকলা একাডেমী 'আর্টিস্ট ইন রেসিডেন্স' হিসেবে চাকরী দেয়ার নাম করে কি যেন ঝামেলা করছিল। কিন্তু গতকালের এস.এম. সুলতান অনেক বদলে গেছেন। শরীর ভেঙ্গে খান খান হয়ে গিয়েছে। বললাম, 'এখানে কষ্ট করে দাঁড়িয়ে না থেকে ভেতরে গিয়ে বসলে ...'। আমার কথা থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'না না, এখানেই উদ্বোধন হবে। তারপর ভেতরে হবে অনুষ্ঠান। তাই এখানে থাকাটাই ভালো।'

বললাম, অতিথিরা সবাইতো এখনো এসে পৌছান নি। তাই একটু দেরী হচ্ছে। উত্তরে তিনি বললেন, 'আমাদের সব কিছুইতো দেরী হয়ে যাচ্ছে। কোনো কাজইতো সময় মতো শেষ করতে পারছি না। জানিনা আর পারবো কিনা।'

এবার তিনি ছড়িটি পাশে রেখে বসে পড়লেন ঘাসের ওপর। আমিও বসলাম মুখোমুখি। ভাবলাম, হয়তো এমন সুযোগ আর নাও আসতে পারে। নীরব, নিশ্চুপ এমন একজন মহান শিল্পীর নিঃসঙ্গতা দূর করার অজুহাতে জানতে চাইলাম, 'চলচ্চিত্র উৎসবে প্রধান অতিথি হলেন কি ভেবে?' বললেন, 'ছেলেরা সবাই ধরেছে, তাই রাজী হয়ে গেলাম।'

: চলচ্চিত্র নিয়ে কখনো কিছু ভাবেন?

: বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের রাজত্বে মানব কল্যাণে চলচ্চিত্রের মতো গ্রহণযোগ্য, বৃহৎ এবং শক্তিশালী আর কোনো মাধ্যম আমি দেখিনা। একটি ছবি একটি বিপ্লব ঘটাতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। ভাববেন না কথার কথা বলছি। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তবে আমাদের দেশে শুধু নয়, সারা বিশ্বেই চলচ্চিত্রের দু'টি ধারা বিরাজমান। আসলে এটা শুধু চলচ্চিত্রে বলা ভুল হবে। সব ক্ষেত্রেইতো একই অবস্থা। ভালো আর মন্দের দ্বন্দ্ব নিয়েইতো সারা বিশ্বে যত সংঘাত, যুদ্ধ আর হানাহানি। চলচ্চিত্রেও এরকম ভালো মন্দের বিরোধ রয়েছে। এবং তা থাকবেও। তবে সাময়িকভাবে খারাপটাই প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন 'সৎ চলচ্চিত্র' সিনেমা হলে চলে না। অথচ নাচ গানের ছবির নাকি টিকেট ব্ল্যাকে বিক্রি হয়। তবে ভালোর কদর কিন্তু পারমানেন্ট।

: এমন কোনো চলচ্চিত্রের কথা আপনার মনে পড়ে, যা নিয়ে কিছু বলতে পারেন?

: কেন 'জীবন থেকে নেয়া।' আগেই বলেছি, একটি চলচ্চিত্র একটি বিপ্লব ঘটাতে পারে। তার প্রমাণ আমাদের জহির রায়হানের 'জীবন থেকে নেয়া'। আমি এই ছবির কথা কখনো ভুলবো না। এখানেই প্রমাণ হয়, পেশার প্রতি মানুষের সততার মূল্য

কত। সততা ছাড়া এমন ছবি করা যায় না। এই ছবিটা আমার কাছে একটা বিপ্লবের সমান মনে হয়েছে। এখানে সততা ছিল, প্রতিশ্রুতি ছিল, সৎ সাহস ছিল, যুদ্ধ ছিল।

: আমাদের চারু শিল্প নিয়ে আপনার ভাবনা কি?

: ভাবনা আর কি। ভালো হচ্ছে কাজ। অনেক নতুন নতুন শিল্পীরা আসছেন। তাদের কাজও ভালো হচ্ছে। তারা সুযোগও অবশ্য বেশী পাচ্ছে। তবে তাদের আরও বেশী আন্তরিক হতে হবে। রাতারাতি নাম ডাক খুঁজলে চলবে না। অনেকেই কাজ



ছবি সৌজন্যে : বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ ফেডারেশন

তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করছেন শিল্পী সুলতান

রেখে নাম তাকের জন্য ব্যস্ত। এ ব্যাপারে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও নজর দিচ্ছেনা। বরং ওখানেও নানান রঙের রাজনীতি। ফলে প্রতিভাবান হওয়া সত্বেও সুযোগের অভাবে প্রতিভার প্রকৃত বিকাশ ঘটাতে পারছে না। কিছু মনে করবেন না, সবাই আসলে অসৎ হয়ে পড়েছে। সবাই বলতে সর্বক্ষেত্রে। ফলে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এমন আকার ধারণ করেছে যে, গুণের কদর নীরবে কাঁদে। তাই প্রশাসনে সৎ মানুষের দরকার।

: এই সময়ে দেশের প্রধান সমস্যা হিসেবে আপনি কোন বিষয়কে চিহ্নিত করবেন?

: সমস্যাতো পদে পদে। তবে আমি শংকিত যুবকদের নিয়ে। যুব সমাজকে সংহত করে মানব কল্যাণে নিযুক্ত করতে পারলেই দেশ ও জাতি সবচাইতে বেশী উপকৃত হবে। যুবকরাইতো আমাদের ভাষা প্রতিষ্ঠা করেছে, যুবকরাইতো স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু যুবকদের আমরা কিছুই দিতে পারি নি। তাই তারা এখন পঙ্কিলতার পথে এগুচ্ছে। যুব শক্তির পতন একটি জাতির পতনের চাইতে কম কিছু নয়। যুবকদের এই পরিস্থিতির কথা ভাবলেই আমি শংকিত হই। তাহলে জাতিকে রক্ষা করবে কারা। তাই এই ব্যাপারে বিশাল পরিকল্পনা নিয়ে সরকারের অনতিবিলম্বে এগিয়ে আসা উচিৎ। অন্যথায় বিজয়ী জাতির বিপর্যয় অসম্ভব কিছু নয়।

আমাদের কথার এই মুহূর্তে বেশ কজন অতিথি এসে গেলেন। আয়োজকদের সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন উৎসব শুরুর জন্যে। এস.এম. সুলতানও ভাবলেন, তাঁকে এক্ষুণই বুঝি উঠতে হবে। বললেন : কত কথাইতো বললাম, লিখে আর কি হবে।

এমন সময় ডাক এলো তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধনে তাঁকে যোগদানের জন্যে। আমার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাতে তুলে দিলাম ছড়িটা। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন পায়রা ও বেলুন ওড়ানোর পর্বের অনুষ্ঠানে।



সুলতানের শেষ জন্মদিনে

এরশাদ ইবনে ওমর

একটুও বুঝিনি যে লাল ভাইয়ের সাথে আর দেখা হবে না। আর কোনোদিন তাঁকে লাল ভাই বলে ডাকতে পারব না। সেদিন ১০ই আগস্ট। গিয়েছিলাম ঢাকা থেকে নড়াইলের মাছিমদিয়া গ্রামে। এস. এম. সুলতানের প্রিয় 'শিশু স্বর্গে'। লাল ভাইয়ের বড় সাধের শিশু স্বর্গ। নড়াইল শহর থেকে মাত্র ১ কিলোমিটার আর রূপগঞ্জ বাজার থেকে সিকি কিলোমিটার দূরে সুলতানের বাড়ি। রূপগঞ্জ থেকেই মানুষের ভীড়। সবাই চলেছে সুলতানের বাড়ী। তার ৭০তম জন্মদিনে। শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাতে, তাঁকে এক পলক দেখতে আমার মনটা ভীষণ ব্যগ্র। কখন পৌছব। কখন দেখব আমার প্রিয় লাল ভাইকে। বাস থেকে রূপগঞ্জ বাজারে নেমে রিক্শা নিলাম কিন্তু রাস্তায় মানুষের ঢল। কোনো পর্ব নেই, উৎসব নেই, মেলা নেই অথচ উপচেপড়া মানুষ রং বেরং-এর পোশাকে সেজে চলেছে সুলতানের জন্মদিনে তাঁকে আর্শীবাদ করতে। আমার উৎকন্ঠার শেষপ্রান্তে এসে আমি যখন লাল ভাইয়ের শিশু স্বর্গের কাছে পৌছলাম তখন সকাল ৯-৩০ মিঃ। রূপগঞ্জ—গোবরা পাকা রাস্তা থেকে শিশু স্বর্গ প্রায় ৭০/৮০ গজ পথ। বড় একটি ঝলমলে গেট নানা বর্ণে সাজানো। রাস্তার দুপাশেও শিল্পীর ছবিআঁকা কাগজে সাজানো। নানা রং বেরং-এর কাগজ দেবদারু পাতায় সাজানো 'শিশু স্বর্গ'। আমার কাছে বড় মনোরম মনে হলো। আমার দীর্ঘ জীবনে কতবার এসেছি, কতদিন এসেছি শিল্পীর বাড়ীতে। সেই জীর্ণশীর্ণ ভাঙা দোতলা বাড়ী থেকে আরম্ভ করে সরকার প্রদত্ত নতুন বাড়ী। অনেক দিনের কথা। এমন আলো ঝলমল

কখনো দেখিনি।

রিকশা থেকে নেমে প্রায় ছুটে গেলাম মঞ্চে, যেখানে শিল্পীকে তাঁর ৭০তম জন্মদিনে দেয়া হচ্ছে মনোজ্ঞ সংবর্ধনা। আমার পৌছতে একটু বিলম্ব হয়েছে। সবাই তখন মঞ্চে। আমার আগেই পৌছে গেছেন সকল আমন্ত্রিত অতিথি। আমার প্রিয় কবি আসাদ ভাই আমাকে দেখে মৃদু হাসলেন। আমি নিম্নস্বরে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর পাশেই আরও একজন বিশিষ্ট অতিথি, নামটি এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। তারপরই সেই বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস. এম. সুলতান। যিনি তাঁর কীর্তিতে তাঁর সৃষ্টিতে অম্লান। তাঁর নামে নয়, তাঁর কর্মে।

আমার চোখ শিল্পী সুলতানের দিকে। মঞ্চে উপবিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দিকে নয়। সুন্দর একটি ফুলের মালা পরে শিল্পী মঞ্চে। প্রথম দর্শনে বেশ উৎফুল্ল মনে হলো। অবশ্য আজকের সুলতানের সাথে আগের দেখা সুলতানের অনেক অমিল। বেশভূষা অনেক সুন্দর ও সাবলীল আজকের সুলতানের। আগের সেই আলুথালু বাউন্ডুলে ভাব আমি দেখছি না। এ যেন আমার চেনা অতি প্রিয় সেই সুলতান নন। আজ তাঁকে সাজিয়ে গুছিয়ে মঞ্চে আনা হয়েছে।

বক্তারা খুব ভালো কথা বলছেন। কেউ বলছেন সুলতানের 'শিশু স্বর্গ' প্রতিষ্ঠার কথা, কেউ বলছেন শিল্পীকে জাতীয়ভাবে সুচিকিৎসার কথা। কিন্তু আমার কানে কারো কোনো কথাই ঢুকছে না। আমি শুধু অপেক্ষা করছি লাল ভাইয়ের কথা শোনার। কখন তাঁর দু'টি কথা শুনবো। অনুষ্ঠানের শুরুতে কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। মঞ্চে আমার মাথার উপরের সামিয়ানা নিচু হয়ে মাঝে মধ্যে এক ঝলক করে পানি পড়ছে। আমরা দু'একজন উঠে পানি ঝেড়ে আবার বসছি। একবার আসাদ ভাইও কিছুটা ভিজে গেলেন। মঞ্চে একেবারে ঠাসা ভীড়। আর উপচেপড়া মানুষের ঢল মঞ্চের সামনে অসমাপ্ত শিশু স্বর্গের মধ্যে। বাইরে, দু'পাশে, রাস্তায় সর্বত্র মানুষ আর মানুষ। অনেকক্ষণ, অনেক মানুষের কথা বলার পর লাল ভাই কথা বললেন। মঞ্চে তাঁর আসনে বসে। সেই মর্মস্পর্শী কথা। আমার কানে শোনা লাল ভাইয়ের শেষ বক্তৃতা। খুব আস্তে আস্তে ছোট ছোট কথা। যেমন আমি বহুবার শুনেছি, বহু অনুষ্ঠানে, ঘরোয়া পরিবেশে, একান্ত অন্তরঙ্গ মুহূর্তে, আমার বাসায়। লাল ভাইয়ের সেই ভাঙা দোতলায়, ঠিক সেই রকম লাল ভাই বলছিলেন—'আমার স্বপ্নের সাধ আমার এই 'শিশু স্বর্গ'। এখানে আসবে সব দেবশিশুরা। যারা নিষ্পাপ, যারা সুন্দর, যারা সত্যিকার ছবির মত। যে শিশুরা দু'বেলা খেতে পারে না, যারা ন্যাংটো থাকে, পরার কাপড় নেই, উদোম গায়ে থাকে, যাদের পাঁজরের হাড়গুলো গুনে নেয়া যায়

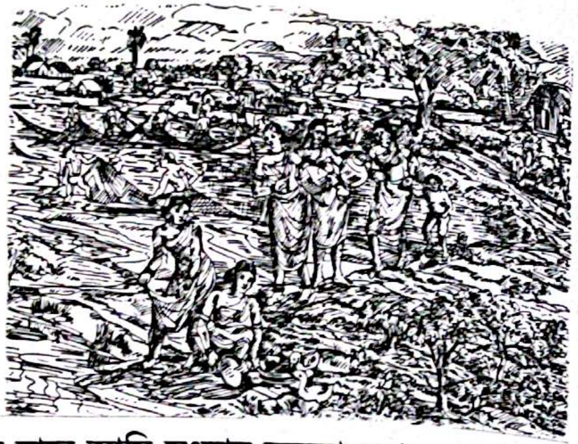
তাদের নিয়ে আমি শুরু করেছিলাম এই 'শিশু স্বর্গ'। ওদের দেখে আমি ছবি আঁকা ভুলে গিয়েছিলাম। আমি তখন ভালো ছবি আঁকতে পারতাম না। আমার তুলিতে ওই হাড় জিরজিরে কঙ্কালসার শিশুগুলির ছবি ভাসতো। এখন গ্রামের অনেক শিশু এখানে আমার 'শিশু স্বর্গে' এসেছে। তারা এখন বই নিয়ে পড়তে পারে। ছবি আঁকতে পারে। আগে ওদের মা-বাবা এখানে আসতে দিতে চাইত না। ছবি আঁকতে দিতো না। এখন আর বাধা দেয় না। তারা বুঝতে পেরেছে হয়ত মানুষ হবে। আমি দেশের সব শিশুকে আমার ছবির মানুষের মত হৃষ্টপুষ্ট দেখতে চাই। আমি চাই সব শিশু পেটপুরে দুধভাত খাবে। সুন্দর স্বাস্থ্যবান শিশু হবে। ওরা প্রাণ খুলে গান গাইবে, ছবি আঁকবে, খেলবে। এখন আমি আর আগের মত গ্রামের মানুষের মুখে গান শুনিনা। আমি আর নদীর বুকে মাঝির কন্ঠে সেই মনমাতানো গান শুনি না। এখন আর রাখাল বাঁশি বাজায় না। এমন কেন হলো।'

শিল্পী আর কথা বলতে পারলেন না। ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শেষে আধো আধো গলায় সবাইকে তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। মঞ্চ থেকে তাঁর চলে আসার ব্যস্ততা। সবাই ঝুঁকে পড়েছে। এমন সময় আমি আমার ডায়রির ১০ আগস্ট '৯৪-এর পাতা খুলে সামনে ধরলাম। বললাম কিছু লিখুন আপনার জন্মদিনে। শিল্পী তাঁর অটোগ্রাফ দিলেন কোনরকমে। কারণ তিনি তখন ভালো করে দেখতে পান না।

তারপর অনেকগুলো ছবি তুললাম। আমার সাথে। শিল্পীর একার। আরতি এবং খুলনা আর্ট কলেজের লাল ভাইয়ের এক ছাত্রীর সাথে। প্রায় ১৫/১৬টি। এরপর খুব আব্দার করে আবার ধরে বসলাম লাল ভাইকে। আমার ডায়রির ১০ আগস্টের পাতা খুলে অনুরোধ করলাম একটি স্কেচ করে দিতে। প্রথমে একটু না না করলেন। কিন্তু আমার পীড়াপীড়িতে কলম হাতে নিলেন। বললেন, কি আঁকবো। আরতিকে কাছে আসতে বললেন। প্রায় হাতের আন্দাজে বলপেন দিয়ে আঁকলেন এক মানবী মূর্তি। তাঁর সেই চিরাচরিত পেশীবহুল ছবি। নিচে অস্পষ্ট তাঁর স্বাক্ষর এবং তারিখ।



ভার বহন   তেল রং   ১৯৭৬



ঘর করলাম নারে আমি সংসার করলাম না

রফিক ইসলাম

এক

চিরস্বপ্নজীবী জীবন শিল্পী শেখ মুহাম্মদ সুলতান ১৯৯৪ সালের ১০ অক্টোবর বিকেলে যশোর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিশাল কর্মযজ্ঞের অধিকারী এই শিল্পীর মুখরিত ক্যানভাস, স্বপ্নের জনপদ আর 'শিশু স্বর্গ' তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে এখন ধরা ছোঁয়ার বাইরে। জাগতিক সব ক্রিয়াকাণ্ড থেকে অনেক নিরাপদ আশ্রয়ে বিশ্বলোকের টানে তিনি সত্তার বাইরে গেছেন। সুলতান একজন কিংবদন্তীর মানুষ। জীবনকে সাজিয়েছিলেন অপরিসীম বর্ণাঢ্যতায়, কর্মমুখরতায় সজীবতায়—ছেলেবেলা থেকে খেয়াল খুশির যে রাজ্যটি তিনি আপন মানসপটে নির্মাণ করেছিলেন জীবনের শেষ ধাপে এসে ৬২ ফুট দীর্ঘ ১৫ ফুট চওড়া নৌকা বানিয়ে প্রমাণ করলেন, জীবন উপভোগের। এক মুঠোয় হাজার হাজার টাকা ভিক্ষুককে দিয়েছেন, আবার পকেটে বাতাসকে অবাধে বিচরণ করতে দিয়ে দিনের পর দিন না খেয়ে থেকেছেন। ভোগের সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি সুলতান গঞ্জিকা সেবন করে কাটিয়েছেন দিনের পর দিন। আলোকচিত্রী শামসুল ইসলাম আল-মাজীর একটা আলোকচিত্র আছে সুলতানের : গাঁজায় দম দিচ্ছেন। ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে আছে সুলতান-এর গাঁজা খাওয়ার নিয়ম কানুন। সেই এক হাতি কল্কে, আর মাঝখানে ড্রেন হয়ে যাওয়া এক টুকরো সেগুন কাঠ, পুরিয়ার পর পুরিয়া 'আবগারী'-এখন সুলতানের সতীর্থদের স্মৃতিচারণার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

দুই

একটা কথা সবারই জানা যে, সুলতান ছবি এঁকেছেন নিজস্ব দর্শনকে সামনে রেখে। 'তাঁর মতো কেউ ছিলো না এবং তিনিও কারো মতো নন'—নোয়েল কাওয়ার্ড সম্পর্কে এই কথা বলেছিলেন জন ওসবর্ন বেশ ক'বছর আগে। সুলতান সম্পর্কেও ঠিক নির্দ্বিধায় কথাটি চালিয়ে দেয়া যায়। তাঁর সত্তরোর্ধ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই ছিলো চরম নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ। দীর্ঘদেহী লম্বাচুলের শীর্ণকায় সুলতান বৃটিশের রাজত্বকালে আবির্ভূত হয়ে জীবন সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির সাথে নিরন্তর বোঝাপড়া করে যাপিত দিনগুলোকে ভোগ করেছেন ইচ্ছেমতো।

শেখ মুহাম্মদ সুলতানের আঁকা অসংখ্য ক্যানভাস এবং পেপারে তেলরং, ড্রয়িং এবং জলরং-এ স্থাপিত শক্তিশালী মানুষের অবয়ব দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড, মানুষের বিশ্রাম, কৃষক-শ্রমিক-জেলে-মাঝির গলদঘর্ম পরিশ্রম, বলিষ্ঠ দেহবল্লরীর রমণীদের স্নান কিংবা জলকে চলা; অনাগরিক ইমেজের ভেতর বন্দী এইসব মানুষের প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দ, কষ্ট-যন্ত্রণা, প্রতিদিনের চিৎকার-ক্রন্দন, দীর্ঘবিরতিহীন অভাবের বিরুদ্ধে চিরন্তন সংগ্রামে লিপ্ত মানুষের দৃপ্ত মনোবল, চরদখলের অভিযানে ঘর থেকে বের হওয়া মানুষের আদিমতা, পশুদের সাথে মানুষের গভীর সখ্য—মোটামুটি এইসব বিষয় বারবার স্থান পেয়েছিলো তাঁর ক্যানভাসে। এক শ্রেণীর প্রকরণবাদীর ধারণা, উপস্থাপনার ধরন একই রকম হওয়ায় তাঁর শিল্পকর্মসমূহ টাইপড হয়ে পড়েছে। তাঁর বিশ্বাস এবং বোধ প্রাগ্রসর চিন্তার ধারক নয়, পরিবর্তনশীলও নয়, তাই তাঁর ক্রমোত্তরণ চোখে পড়েনি; একই রকম বিন্যস্ত কতোগুলো ফিগরকে সামনে রেখে গল্প বলে যেতে চাইছেন; যার মধ্যে সরলতা আছে, জটিলতা মুক্ত গল্প বলে যেতে তিনি অভ্যস্ত বলেই তাঁর শিল্পকর্মসমূহে উচ্চকিত সহজিয়া সুর। আধুনিক চিত্রকলার উজ্জ্বল সৌকর্যভূমিতে তাঁকে নিষ্প্রভ মনে হতে পারে অনেকের কাছে।

অনেকেই মনে করেন, সুলতানকে বিচার করতে হবে সামগ্রিক শিল্প আন্দোলনের কয়েকটি ঘটনা, সন-তারিখ ধরে ধরে; উল্লেখযোগ্য, বৈপ্লবিক, যুগান্তকারী অধ্যায়সমূহের প্রতি নজর রাখতে হবে। তারপর ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসতে হবে আধুনিকতাবাদীদের দিকে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে 'আধুনিক' শিল্পী হিসেবে তাঁর পরিচিতি কতোটুকু সেটাও ভেবে দেখতে হবে গভীরভাবে। সমসাময়িক অন্যান্য

শিল্পীর তুলনায়—যেখানে অহরহ নাম নিচ্ছি ব্র্যাক, পিকাসো, ক্লী, কান্দেনিস্কি, দালি প্রমুখের—যারা এখনও সমান চর্চিত এবং আলোচিত দেশে দেশে, সেই তুলনায় সুলতানের চিত্রকলার আন্তর্জাতিকতা, আধুনিকতা কতোটুকু, সেটা বিশ্লেষণ করা জরুরী বলেও তারা মনে করেন। প্রশ্নে প্রশ্নে তত্ত্বে তত্ত্বে ভারাক্রান্ত করে সুলতানকে বিশ্লেষণ না করে একজন সত্যিকারের বাংলাদেশের শিল্পী হিসেবে তাঁকে দেখতে হবে। নিরহংকার, জটিলতামুক্ত, সরল, অকপট প্রকাশভঙ্গির জন্য যিনি বিখ্যাত, তাঁর শিল্পকর্মের ভেতর অন্যকিছুর সন্ধান করা পন্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়।

তিন

১০ আগস্ট ১৯২৩ সালে যে জীবনের সূচনা হয়েছিলো কালের অমোঘ নিয়মে ১০ অক্টোবর ১৯৯৪-এ এসে সে যাত্রা থামলো। সত্তরোর্ধমহাজীবন আকাশ গঙ্গার ছলাৎ ছলাৎ শব্দের ভেতর তলিয়ে গেলো। আর কোনোদিন তিনি জাগবেন না। জাগতিক সকল প্রাত্যহিকতা, কর্মব্যস্ততা থেকে তিনি দূরে। রং, তুলি, ঈজেল, ক্যানভাস, চিত্রা নদীর পাড়, বন অরণ্যানী, পশু-পাখি, সাপ-খোপ, সৃজন-স্বজন-দুর্জন-প্রিয়জন-বন্ধুজন সবার থেকে দূরে।

সুলতানের জীবিতাবস্থায় সংস্কৃতির অঙ্গনে একটা সরব-নীরব গুঞ্জন ছিলো, তাঁর চিরকুমারত্ব নিয়ে। বিয়েথা কেন করেননি, সারাটি জীবন শুধু ছবি এঁকে কেনোইবা কাটিয়ে দিলেন, যে নারী জাতিকে তিনি এতো শ্রদ্ধা করতেন তাদের কোন একজনকে কেন জীবনের সাথে বন্ধনে জড়িয়ে ফেললেন না ইত্যাদি। এ সব গুঞ্জন সুলতানের কানেও গেছে। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস তাঁরও যে বুকের জমিন অন্ধকার করে পড়েনি, তেমনি নয়, অতিক্রান্ত দিনগুলোর কথা ভেবে। তবে সুলতানের প্রেমপর্ব নিয়ে খুব বেশি কথা শোনা যায় না। বিয়ে না করা নিয়ে তাঁর সর্বশেষ জন্মদিনে যে কথাগুলো বলেছেন : 'এ জীবন কিছুই না—এরকম আধ্যাত্মিক চিন্তা থেকে কি বিয়ে করিনি? নিজেকে এ প্রশ্ন করি। তাতো ঠিক নয়। আমার নিজের ফ্যামিলি না থাকলেও (আমার) দায়দায়িত্ব অনেক। মনে হত নিজের সন্তান, নিজের পরিবার নিয়ে যদি জীবন কাটিয়ে দিই সেটা একধরনের স্বার্থপরতা হবে। হয়তো এ-ভাবনা থেকেই বিয়ে করিনি।'



সুলতানের সাম্রাজ্য

জিয়াউল করিম

"And anyway, I do not wish to represent the man as he is, but only as he might be."

--Paul Klee

"... Creation, whether of God, man, or nature, seems to be an activity whose only intention is to abolish intention, to eliminate final dependence on a relation to something else ..."

-- Northrop Frye

১

প্রথমেই প্রবন্ধের অভিপ্রায়টি স্পষ্ট করে নেয়া প্রয়োজন বর্তমান। দু'টি অংশে আমি সুলতানকে আলোচনা করতে চাই। প্রথমত, সুলতানকে নিয়ে যে কোনো আলোচনায় একটি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় যা অনেকটাই ধাঁধার মতো। তাঁকে কোন ধারায় ফেলা যায়? ঘুরিয়ে বললে, তাঁর ওপর প্রভাবকে ঠিক কিভাবে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে? তাঁকে কেউ কেউ পিকাসো কিংবা সেজানের lineage এ ফেলতে চান। কিন্তু যে বিষয়টি আমি প্রবন্ধের প্রথম অংশে তুলবো তা হলো, সুলতানকে পাশ্চাত্যের শিল্পধারায় যেমন যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, অন্যদিকে প্রাচ্যের শিল্পধারাও তাঁকে বোঝার জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু কেন এ জটিলতা? আমি এ

বিষয়ে পরে আসছি। দ্বিতীয়ত, *প্রথম রোপন* ছবিটির আমি একটি নিবিড় পাঠ বা close reading দিতে চাই। নিবিড় পাঠের মধ্য দিয়ে আমি দেখাতে চাই সুলতানের জগতে প্রবেশ করার জন্য এই ছবিটি গল্পের সেই সোনার চাবির মতোই মূল্যবান। আর সেই চাবি উন্মোচন করে এমন এক দরোজা যেখান দিয়ে পৌছান যায় তাঁর শিল্পদর্শনে এবং সর্বোপরি তাঁর weltanschauung-এ।

২

সুলতানকে শিল্পকলার কোনো ঘরানায় কিংবা ধারায় ফেলতে গিয়ে বোরহেসীয় সেই হেত্বাভাসকেই মনে পড়ে যায় : "Every writer creates his own precursors": যেন সেই বই যার প্রথম আর শেষ পৃষ্ঠা হারিয়ে গেছে। সম্ভবত এই ধাঁধা থেকেই উৎপত্তি হয়েছে : 'সুলতান অরিজিনাল'। সন্দেহ নেই সুলতানের মৌলিকতা প্রসঙ্গে। প্রশ্ন অন্য জায়গায়। তাঁর মৌলিকতাটি ঠিক কোথায়? আরও স্পষ্ট করতে চাইলে, তাঁর মৌলিকতার মডেলটি কি?

পশ্চিমের প্রতিষ্ঠিত মডেল দিয়ে ছবিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টাকে সুলতান চ্যালেঞ্জ করেন, আর তা যে ভ্রান্ত তা বোধ হয় সুলতানই প্রথম আগেই ধরতে পেরেছিলেন। তাঁর এই অনুধারণাকে আরো স্পষ্ট দেখতে পাই উত্তর-উপনিবেশী সাহিত্যতত্ত্বে, যে কারণে এই সাহিত্যতত্ত্বের আগমনের আগে সুলতানকে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। উত্তর-উপনিবেশিকতা কিভাবে সুলতানের ছবি বুঝতে সাহায্য করবে তা স্পষ্ট করে নেয়ার আগে আরো কিছু জিজ্ঞাস্য রয়ে গেছে। প্রাচ্যের ধারা থেকে সুলতান কোথায় ভিন্ন? এই ভিন্নতা খুবই স্পষ্ট, সুলতানের আইডেনটিফাইং মার্কও বলা যায়। সুলতান এবং পেশী এখন প্রায় সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে। আমি এখানে প্রাচ্য অর্থে ভারতীয় ধারাকেই মূলত বোঝাতে চাই। তবে ব্যাপক অর্থে এশীয় ধারাকে অন্তর্ভুক্ত করলেও তা আমার বক্তব্যেরই সমর্থন দেবে। সে যাই হোক, ফিরে আসা যাক আবার প্রাচ্য ধারা প্রসঙ্গে। একটি বিষয় আমার অনেকদিন যাবৎ মনে হচ্ছে, এ প্রসঙ্গে তা বোধ হয় বলা যেতে পারে। ময়েনজোদারো কিংবা হরপ্পা থেকে মোঘল বা রাজপুত ঘরানা কিংবা ভারতীয় ভাস্কর্য কিংবা অজন্তা ইলোরা যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি না কেন একটা বিষয় স্পষ্ট—যাকে গ্রীক অর্থে বা পাশ্চাত্যের শিল্প অর্থে পেশী বলে, তা অনুপস্থিত। গ্রীক মডেলে বিচার করলে ভারতীয় ছবির কিংবা ভাস্কর্যের পুরুষদের বলতে হবে ফেমিনিন, মেয়েলী। কিন্তু কেন ঘটল এই বিষয়টি? কিংবা আদৌ এর কোনো উত্তর আছে কি? একটি উত্তর আমার মনে উঁকিঝুঁকি দেয়।

য়ুরোপ তার সম্ভাব্যতার জন্মলগ্ন থেকেই ক্ষমতার চর্চা করে আসছে। শিল্প সাহিত্যে, দর্শনে তার রূপ দেয়ার চেষ্টাও করছে। দর্শনে ক্ষমতা যদি নিৎশে আধুনিক যুগে য়ুরোপীয় মানসিকতার স্পষ্ট রূপ দিয়ে থাকেন তাহলে ফুকো তাকে আলোকিত করেছেন। আর এই য়ুরোপীয় ক্ষমতার মানসিকতার বীভৎ রূপটি নিশ্চয়ই হিটলার। শিল্প আর সাহিত্য থেকে ভুরি ভুরি উদাহরণ দেয়া সম্ভব। সে চেষ্টা শুধু শুধুই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করবে। আর একটি বিষয় যুক্ত করতে চাই যা বোধকরি খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। লক্ষ্যনীয়, যন্ত্রপাতি সহযোগে ব্যায়ামের ধারণাও পশ্চিমের। ভারতে ব্যায়ামের যে ধারা তা যোগ। যোগ শুধু শরীর নয় আধ্যাত্মিকতার সাথেও যোগীকে যুক্ত করে। Strong is beautiful—এ ধারণা পশ্চিমে সৃষ্ট। নিবেদন বা উৎসর্গ করার কিংবা "আমার মাথা নত করে দাও হে প্রভু তোমার চরণ ধুলার পরে" এই মানসিকতা ভারতীয়। সুলতান ভারতীয় কোমল নিবেদনকে কেন নিলেন না কিংবা শান্ত গ্রাম্য রমণীকে আঁকলেন না? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে তার approach-কে খুঁজে পাওয়া যাবে। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে যে ইউরো-কেন্দ্রিক রুচি বা মানদন্ড সৃষ্টি হয়েছে সুলতান তাকে আঘাত করছেন কেন্দ্রের ভাষায়। অর্থাৎ য়ুরোপীয় পেশী ও অংকন রীতি স্থাপন করছেন ভারতীয় পটভূমিতে। যে নেটিভ চাষি দুর্বল তাকে সবল করে তুলছেন য়ুরোপীয় ভাষায়। উত্তর-উপনিবেশী বাক্যবন্ধ ঘুরিয়ে বললে, "Empire paints back"। উনিশ শতকের অস্ট্রেলীয় উপন্যাসিক ক্যামবেল প্রেইড তার এক চরিত্রের মুখে বলিয়েছেন, "To be colonial is to talk Australian slang; to be ... everything that is abominable"। তাই যে ভাষা রুচি এবং মূল্যের পরশপাথর ধরে নেয়া হয় অর্থাৎ শিল্পের য়ুরোপীয় মডেল, সুলতান তাকে শুধু দেশজই করেন নি, কেন্দ্রের ভাষায় কেন্দ্রকে প্রতিবাদ করেছেন। এবার আসা যাক তার Textual Strategy প্রসঙ্গে। উত্তর উপনিবেশবাদী লেখার প্রধানত দুটো স্ট্র্যাটেজির কথা বলা হয়—এক, Abrogation, দুই Appropriation। প্রথম ধারায় কেন্দ্রকে অস্বীকার করে ভিন্ন ভাষা তৈরির চেষ্টা-- যেটা আমরা দেখি যামীনি রায়, কামরুল হাসান, নন্দলাল বসু, জয়নুলের মধ্যে। অন্যটি কেন্দ্রের ভাষাকে নিজের মত করে ব্যবহার করা। রাজা রাও চমৎকারভাবে তার উপন্যাস কান্থাপুরা-র মুখবন্ধে বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন "One has to convey in a language that is not one's own the spirit that is one's own"। আর একটি প্রশ্ন থেকে যায় তা হল সুলতানের মধ্যে এই ভিন্ন কণ্ঠ খোঁজার সচেতনতা সৃষ্টি হল কি ভাবে? আমাদের পক্ষে শুধু অনুমান করাই সম্ভব। সুলতান য়ুরোপীয় আধুনিকতার জন্মদাতা এমন বেশ কিছু শিল্পীর—পিকাসো, ব্র্যাক, দালি,

স্ত্রী—সঙ্গে প্রদর্শনী করেছেন। এই প্রদর্শনীই কি তাঁর মধ্যে ভিন্ন সুর খোঁজার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে?

৩

সুলতানের কাজের মুখোমুখি হলে প্রথম দৃষ্টিতে তাঁকে স্বাপ্নিক বলেই মনে হয়। মনে হয় এক শিল্পী এল দোরাদোর স্বপ্নে বিভোর কিংবা আর এক হোসেন মিঞা ভিন্ন এক বসতি স্থাপনে মগ্ন। কিন্তু নিবিড় পাঠে মনে হয় সুলতান কোনো আর্কেডিয়ার স্বপ্নে বিভোর নন। বরং স্বপ্ন এবং বাস্তবের দেয়াল সুলতান ভেঙ্গে দিচ্ছেন। যে শিল্পী ইউরো-কেন্দ্রিক আধুনিকতার কখনো পৃষ্ঠপোষকতা করেন নি, তাঁর কাছে জীবন ও শিল্প দুটোই সমান সত্য। নিৎশে তার *দি বার্থ অব ট্র্যাজেডি*-তে যে সত্যকে উপলব্ধি করেন— "arts make life possible and worth living"— সেই সত্য যেন সুলতানের জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে কাজ করেছে।

প্রথম রোপন সুলতানের সবচেয়ে পরিচিত কাজ, বিখ্যাতও বটে। এই লোকাস ক্লাসিকাসকে কেন নিবিড় পঠনের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করলাম তা পূর্বে বলার চেষ্টা করেছি। এখন কোন পথে অগ্রসর হলে যে দরোজা খোলার চেষ্টা করা হচ্ছে তা সফল হবে দেখা যাক। সঠিক পথে অগ্রসর হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ, না হলে যে ছবিকে আপাত সরল বলে অনুমান হচ্ছে তা হয়ে উঠতে পারে এক গোপন চোরাবালি। পুরো ছবিটাকে আমি বলতে চাই এক বিশাল উৎপ্রেক্ষা। সরলভাবে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? দেখতে পাচ্ছি আমাদের পূর্বপুরুষের, আদি পিতার প্রথম বৃক্ষ রোপন প্রচেষ্টা। খুব যত্ন নিয়ে এই রোপন কর্মটি প্রত্যক্ষ করছেন দুজন নারী। একজন মৃত্তিকার কাছাকাছি অন্যজন আকাশচারী। রোপনকারীকে দেখান হয়েছে পুরুষরূপে। কিন্তু নৃতত্ত্ব বলে, মানব ইতিহাসে উদ্ভিদকে গৃহপালিত করার দায়িত্বটি পালন করেছে নারী। কিন্তু এই ভ্রান্তি কেন? একটা কারণ এমন হতে পারে নব্যপ্রস্তর যুগের সেই প্রথম বৃক্ষরোপন দৃশ্য পুনঃনির্মাণ সুলতানের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য বৃক্ষের গৃহপালিতকরণকে রূপকে পরিণত করে অন্য বিশ্বাসকে ব্যক্ত করা। এখন দেখার বিষয় বৃক্ষ বা উদ্ভিদকে গৃহপালিত করার সাথে মানুষের মধ্যে কি পরিবর্তন এলো। প্রথম পরিবর্তন হল যাযাবর জীবনের অবসান। খাদ্যের সন্ধানে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে বেড়ানোর প্রয়োজন শেষ হলো। শিকারী মানুষ পরিণত হল কৃষকে। লক্ষ্যণীয় সুলতান সারাজীবন যে মানব মানবীকে তাঁর পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন তারা সবাই কৃষক। এখন প্রশ্ন, প্রথম বৃক্ষ রোপন এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো কেন? এমনভাবে কি বলা যায় যে, বৃক্ষ রোপনের সঙ্গে সঙ্গে সুলতান তাঁর শিল্প

সৃষ্টির বিষয়কেও রোপন করলেন, বপন করলেন তার জীবন দর্শনের বীজ। এই বীজ বপনের দরকার হলো কেন? এই জন্য কি যে "ঈশ্বর মৃত"? সুলতান যা রোপন করলেন তাকে য়ুরোপীয় আধুনিকতার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশকেও ইঙ্গিত করে, যে আধুনিকতাকে য়ুরোপের হতাশাবাদী ধারা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, কলিন উইলসন যাকে আরো সুন্দরভাবে বলেছেন : অর্থহীনতার যুগ।

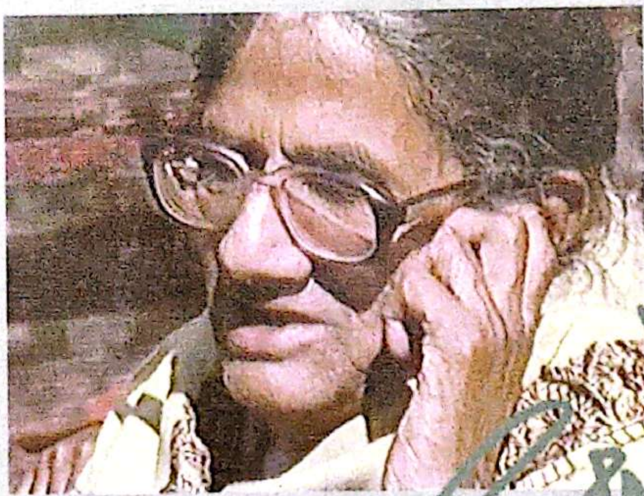
বিশ্বাস বা faith সুলতানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেহের জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি আত্মার অস্তিত্বের জন্য বিশ্বাস অপরিহার্য। বিশেষ করে এমন এক সময়ে যখন সব কিছুই নিম্নগামী—সংস্কৃতি, নৈতিকতা। সুলতান বিশ্বাস করেন, এই পড়োজমিতে আশা আকাঙ্খার ধান ফলানোর জন্য faith জরুরি। এখন দেখা যাক সেই বিশ্বাসটি ঠিক কি যা মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে পারে। এর উত্তর দেয়ার আগে আর একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় স্পষ্ট করে নেয়া যেতে পারে যা আমাদের একটু আগে তোলা প্রশ্নের উত্তরের জন্যই সহায়ক হবে। য়ুরোপীয় আধুনিকতাকে ঠিক কিভাবে দেখছেন সুলতান? *প্রথম রোপন* আমাদের সে উত্তর দিয়ে দেয়। উদ্ভিদকে গৃহপালিত করার সঙ্গে মানব সভ্যতার এক ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এই গৃহপালনের সাথে মানুষকে হতে হয় সংযমী ও দূরদর্শী। অর্থাৎ দুটো মৌলিক পরিবর্তন ঘটলো স্বভাবগত ও ধারণাসংক্রান্ত। কৃষি জীবনযাপনের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম শৃংখলা প্রয়োজন, প্রয়োজন দূরদর্শীতারও। ফসল উৎপাদন করে সব বীজ খাওয়া চলবে না। সঞ্চয় করতে হবে। ঠিক সময় হিসাব করতে হবে ফসল বোনার, লক্ষ্য রাখতে হবে জলবায়ুর প্রতি। তাই সুলতানের ছবির আপাত সরলতা স্কুল পাঠ্য কবিতার পঙতিকে স্মৃতিতে উপস্থিত করলেও তার অভিপ্রায় গুপ্ত থাকে না যেখানে গৃহী মানুষ তার সীমানা চিহ্নিত গ্রামীণ ভুগোলে পিতৃপুরুষদের উত্তরাধিকার ভোগ করতে এবং সেই মাটিতে জীবনের নিঃশ্বাস নিতে পারলেই পরিতৃপ্ত।

তাঁর ছবি আধুনিকতার সাথে তাল মিলাতে না পেরে গ্রাম্য সরলতার দিকে যাত্রা নয় কিংবা গ্রাম্যতায় পালিয়ে আশ্রয় খোঁজাও নয়। আধুনিকতার শূন্যতাকেই প্রতিবাদ করে তাঁর বিশ্বাসের বীজ বপন। তিনি সৃষ্টি করতে চান এক সাম্রাজ্য, যেখানে ছবির পর ছবিতে তিনি কৃষক জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়কেই সারা জীবন ধরে আঁকবেন— ধান কাটা, গরুকে খাওয়ানো, গোসল করানো, শস্য ঝাড়া, ধান মাড়াই ইত্যাদি। সুলতানের সব ছবিতেই একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। সবাই কাজ করছে। কর্মের প্রতি এই অতিরিক্ত জোর দেয়ার কি অর্থ হতে পারে? এটা কি আধুনিক মানুষের অকর্মতার প্রতি প্রতিক্রিয়া? কর্ম বা activism কে এতটা গুরুত্ব কোন শিল্পী সম্ভবত দেননি।

প্লেটো তার আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিদের বিদায় করতে চেয়েছিলেন, সুলতান তার রাষ্ট্র থেকে কর্মহীনতা, কর্মবিমুখিতাকে বিদায় করতে চান। যে সংযম, যে দূরদৃষ্টি কৃষিজীবনের সাথে মানুষ পেয়েছিল যা রচনা করছিল সভ্যতার ভিত্তি প্রস্তর, সুলতান তাকে আবার সৃষ্টি করতে চান—কেননা একমাত্র সেই জীবনই পারে মানুষকে আবার পতনের মুখ থেকে রক্ষা করতে।

গ্রাম্য জীবন   তেল রং





বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী